অস্‌কার ওয়াইল্ড গল্পসমগ্র

লেখকের একমাত্র উপন্যাস 'দ্য পিকচার অফ্ ডোরিয়েন গ্রে' সহ সমস্ত গল্পের একত্র সংকলন

অনুবাদ

সুনীলকুমার ঘোষ

তুলি-কলম

১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

তুলি-কলম

প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ১৪১৫, জানুয়ারি ২০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ: বইমেলা ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক: শুভপতি দত্ত || তুলি-কলম || ১এ, কলেজ রো, কলকাতা—৯

মুদ্রক: এন. বসাক অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ৯এ, রামধন মিত্র লেন, কলকাতা—৪

প্রচ্ছদ: নীল দত্ত || অলংকরণ: শুভ্রনীল ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান: সাহিত্য তীর্থ || ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা—৭৩

লেখক পরিচিতি

জাতিতে আইরিশ, কবি, ছোটো গল্পলেখক, এবং নাট্যকার অস্‌কার ফিঙ্গাল ও'ফ্ল্যাহার্টি উইলস ওয়াইল্ডের জন্ম হয় ডাবলিনে ১৬ই অক্টোবর ১৮৫৪ সালে। প্রখ্যাত চোখের ডাক্তার এবং কর্ণ শল্যচিকিৎসক স্যার উইলিয়ম ওয়াইল্ড তাঁর বাবা; মায়ের নাম জেন ফ্র্যানসিসকা এলজি। আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে যাঁরা সেযুগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছিলেন ইনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মায়ের ব্রিটিশ বিদ্বেষ অস্‌কারকে প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আর তার সদস্যদের তাই তিনি কোনোদিনই সুনজরে দেখতে পারেননি। ইংলন্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, তার রীতি-নীতির বিরুদ্ধে, তার চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কটুক্তি আর ব্যঙ্গোক্তি করতে কোনো দিনই দ্বিধাগ্রস্ত হতে তাঁকে দেখা যায়নি। বিশেষ করে লর্ড শ্রেণীর কর্মবিমুখ বাকসর্বস্ব নর-নারীদের প্রকৃতি স্বরূপ উদঘাটন করতে কোনোদিনই তিনি পিছিয়ে আসেননি।

১৮৬৪ সালে এনিসকিলেনের পরটোরা রয়্যাল স্কুলে অস্‌কার ভর্তি হন; ১৮৭১ সালে ভর্তি হন ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে; তারপরে অধ্যয়ন করেন অকস্‌ফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে তিনি রাসকিন আর প্যাটারের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত এবং প্রভাবিত হন। এই সময়েই কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেন তিনি। ১৮৭৮ সালে তাঁর রচিত কবিতা র‍্যাভেনার জন্যে তিনি নিউডিগেট পুরস্কার লাভ করেন।

যুবক অস্‌কার ইংলন্ডে এসে নতুন আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চিন্তা, মননশীলতা, আর ব্যবহারিক দিক থেকে ইংলন্ডে তখন নতুন একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃতির জগতে এই আন্দোলনই Art for Arts Sake—নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের কর্ণধারদের মতে নিছক আনন্দদান করা ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। এতদিন ইংরাজ লেখকদের চিন্তাধারা যাঁরা প্রভাবান্বিত করে এসেছেন তাঁদের অনেকেই সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুঁজে বার করেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস কাব্য-নাটক নিছক সাহিত্য নয়, আরো কিছু বেশি। মানুষের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখকে সমানভাবে উপলব্ধি করার দায়িত্ব এই সাহিত্যের; তাদের জীবনকে সুন্দরতর করার ঝুঁকি নিয়েছে এই সাহিত্য। তাঁদের মতে যে-সাহিত্য জীবনের সুখের অংশ, দুঃখের ভাগ গ্রহণ করতে রাজি নয়—যা পড়ে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হয় না, যা মানুষকে ক্ষণিকের আনন্দ থেকে বৃহত্তর সাধনার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়, তা কোনোদিনই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কিন্তু আর একদল চিন্তাবিদদের মতে সাহিত্যের লক্ষ্য নিছক আনন্দ দেওয়া, ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না;

তাঁদের কাছে আনন্দ, তা যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, অনস্বীকার্য নয়; যে সাহিত্য নীতির চাপে পড়ে সেই আনন্দের ভোজে মানুষকে নিমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধা করে তা কোনোদিনই সাহিত্য পদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। এই আন্দোলনের পুরোধায় এসে যুবক অস্‌কার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অচিরে। তিনি লম্বা চুল রাখলেন, কিম্ভুতকিমাকার পোশাক পরলেন, বুকে গুঁজলেন সানফ্লাওয়ার, লিলি আর নীল চীনা ফুল—এতদিনকার ঐতিহ্যমণ্ডিত লাল গোলাপকে দিলেন বিসর্জন। গির্জা আর পাদরীদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গোক্তি করে নিজের নাস্তিকবাদকে জাহির করে তুললেন। নাস্তিকবাদকে ধারক আর বাহক হিসাবে তথাকথিত নীতিবাগীশদের সমস্ত বিরূপ আলোচনা ধূলিসাৎ করে দিয়ে ১৮৮২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডাতে নিমন্ত্রিত হলেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে; সংযুক্ত রাষ্ট্রেও সেই একই উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ালেন তিনি তার পরের একটি বছর। ইতিমধ্যে ১৮৮১

সালে তাঁর হালকা কবিতার একখানি সঙ্কলন প্রকাশিত হল। ১৮৮৪ সালে কনসট্যানস লয়েড-এর সঙ্গে বিয়ে হল তাঁর। দুটি ছেলেও জন্মাল তাঁদের। পরের কয়েকটি বছর সাংবাদিকতার কাজ করলেন, বিশেষ করে পুস্তক সমালোচনার কাজ, ১৮৮৭ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি "Woman's World" নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করলেন। ১৮৮৮ সালে "Happy Prince and Other tales" এই নামে একখানি গল্প সংকলন প্রকাশিত হল। ১৮৯১ সালে আর একখানি সংকলন—A House of Pomegranates.

লেখক হিসাবে অস্কার ছিলেন বহুমুখী। গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস—যে-বিষয়েই তিনি হাত দিয়েছেন সে-বিষয়েই তিনি মাৎ করেছেন বাজার। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে শেকস্‌পীয়রের সনেটের ওপরে The Portrait of Mr. W.H. তাঁর নিবন্ধটি Black-Wood's magazine-এ প্রকাশিত হয়; সামাজিক সমস্যা নিয়ে তাঁর রচনা The Soul of Man under Socialism প্রকাশিত হল ১৮৯১ সালে Fortnightly Review-এ, ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হল Lord Arthur Savile's Crime and Other Stories; সেই সঙ্গে ব্যঙ্গ রচনা Intentions. এই সময় তাঁর উপন্যাস The Picture of Dorian Grey প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটানা ছি-ছি-ছির ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল চারপাশ। এত বড়ো নির্লজ্জ আর নীতিহীন কাহিনী নাকি এর আগে আর কোন ইংরাজ লেখকের লেখনী থেকে বেরোয়নি। বারবণিতাদের তারা চেনে—কিন্তু এ যে পুরুষ বেশ্যা! ডোরিয়েন তখনকার অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি প্রতীক মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই ডোরিয়েনের ছবি দেখে অভিজাত সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, গ্রন্থটিকে তাই অনেকেই অশ্লীল বলতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু মূলত ওটাই অস্কার ওয়াইল্ডের Art for Arts Sake—নীতির-ই একটি উদাহরণ বিশেষ। যৌবনই মানুষের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। অথচ সমস্ত সৌন্দর্যের মতো ওটাও ক্ষণস্থায়ী। সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী বলেই তা মানুষের কাছে এত মূল্যবান। সেই সৌন্দর্যকে শাশ্বত করে রাখতে গেলেই তা মূল্যহীন কদর্য হয়ে যায়। ডোরিয়েন সেই সৌন্দর্যকে আর্টিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে না দেখে ভোগের আয়োজনে নিয়োজিত করেছিল বলেই জীবনটাকে সে গোগ্রাসে গিলতে চেয়েছিল। ভোগের আয়োজনটাই কদর্য; এই কদর্যতায় ডোরিয়েন শাপভ্রষ্ট দেবতা বিশেষ। তাই উপন্যাসটি যতখানি কদর্য তার চেয়ে অনেক বেশি মর্মান্তিক।

১৮৮০ সালে রচিত তাঁর নাটক Vera ১৮৮৩ সালে নিউইয়র্কে প্রথম মঞ্চস্থ হয়; তারপরের নাটক হচ্ছে The Duchess of Padua (১৮৮৩); এটি মঞ্চস্থ হয় ১৮৯১ সালে; কিন্তু এ দুটি নাটক বেশি দিন চলেনি; বা, পরবর্তী নাটকগুলির রচনাশৈলী এগুলির মধ্যে নেই। নাট্যকার হিসাবে তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তা আমরা দেখতে পাই Lady Winderemere's Fan এ এটি মঞ্চস্থ হয় ১৮৯২ সালে; তারপরের নাটকগুলি হচ্ছে A Woman of No Importance, An Ideal Husband, The Importance of Being Earnest.

প্রথম তিনটি নাটক ব্যঙ্গাত্মক; বুদ্ধিদীপ্ত, সরস রচনাশৈলীতে উজ্জ্বল; এগুলির মধ্যে চিরাচরিত গল্পাংশ বা Conventional plot বলতে আমরা যা বুঝি তা ততটা নেই; রয়েছে কথার ছটা—এগুলিকেই আমরা বলি Dialoguedrama. ইংলন্ডের নব-নাট্য আন্দোলনে এই জাতীয় নাটকগুলি বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। In these dramas, Wilde's witty and Epigrammatic dialogues transform the conventional plot;...and the result is a light hearted farcical comedy that has deservedly become a classic.

ফ্রান্সে তিনি অনেকবার ঘুরে এসেছেন; ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব তাঁর ওপরে যথেষ্ট পড়েছিল। ফরাসী ভাষায় তিনি 'সালোম' রচনা করেন। নাটকটির মধ্যে বাইবেলের চরিত্র

থাকার ফলে ইংলন্ডে নাটকটিকে মঞ্চস্থ করা যায়নি। ১৮৯৩ সালে ফরাসী ভাষায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়; ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ বেরোয় ১৮৯৪ সালে।

১৮৯১ সালে অসকার ওয়াইল্ডের বন্ধুত্ব হয় লর্ড আলফ্রেড ডগলাসের সঙ্গে, আলফ্রেড ছিলেন কুইনসবেরীর নবম মারকোয়েস-এর তৃতীয় সন্তান। এই আত্মকেন্দ্রিক এবং কলহপ্রিয় যুবকটিকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসাই তাঁর কাল হল। জনসাধারণের সমালোচনা উপেক্ষা করেই তিনি সর্বত্র তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। কুইনসবেরী এ-মেলামেশাটা মোটেই পছন্দ করেননি। একদিন পিতাপুত্রের কলহের মাঝখানে পড়ায় তিনি অপমানিত হন। অপমানিত হয়ে মারকোয়েসের বিরুদ্ধে তিনি মানহানির মামলা দায়ের করেন; সেই মামলায় হেরে যাওয়ার পরে, মারকোয়েস তাঁর বিরুদ্ধে পুত্রের ওপরে ব্যভিচারের অভিযোগ করে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় অস্কার ওয়াইল্ড হেরে যান; ১৮৯৫ সালের ২৫ শে মে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি। এই সময় খবরের কাগজেও তাঁর কুৎসা রটনা করা হয়। বুদ্ধিজীবি নাট্যকার হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তাকে সাময়িকভাবে নষ্ট করে ফেলা হয়। জেলে বসে ১৮৯৭ সালে লর্ড আলফ্রেডকে পালটা অভিযোগ করে একটি তিক্ত দীর্ঘ চিঠি লেখেন তিনি। এইটি De Profundis নামে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৭ সালের মে মাসে Reading Goal জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ইংলন্ডের মাটি ছেড়ে চিরদিনের জন্যে ফ্রান্সে চলে যান। বাকি জীবনটা তিনি Sebastian Melmoth নাম নিয়ে ফ্রান্স আর ইতালিতে ঘুরে বেড়ান। সামাজিক অস্বীকৃতির ফলে নিজের নামে তিনি আর লিখতে ভরসা পাননি। ফলে তাঁকে আর্থিক কষ্টে পড়তে হয়। দারিদ্রের মধ্যে অতি সাধারণভাবেই তিনি জীবনের শেষ কটা দিন গুটিকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হেসে-খেলে কাটিয়ে দেন। ১৯০০ সালের তিরিশে নভেম্বর প্যারিসে দেহত্যাগ করেন তিনি।

—সুনীলকুমার ঘোষ

সুখী রাজকুমার
The Happy Prince

শহরের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু বেদীর ওপরে সুখী রাজকুমারের প্রতিমূর্তি দাঁড় করানো ছিল। মূর্তিটার সারা গায়ে পাতলা সোনার পাত দিয়ে মোড়া। তার চোখ দুটি ছিল নীলকান্ত মণির। তার তরোয়ালের বাঁটের ওপরে জ্বলজ্বল করছিল একটা বেশ বড়ো লাল রঙ-এর রুবি।

সবাই এই মূর্তিটি দেখে খুব প্রশংসা করত। চারুশিল্পের সমঝদার হিসাবে নাম কিনতে চাইতেন এমন একজন শহরের কাউনসিলার বললেন—মূর্তিটা ঠিক বায়ু-নিশানের মতোই সুন্দর। পাছে লোকে তাঁকে অবাস্তব বলে মনে করে, আর অবাস্তব প্রকৃতির মানুষ তিনি সত্যিই ছিলেন না, এই ভয়ে তিনি যোগ করলেন—তবে ততটা প্রয়োজনীয় নয়।

একটা বাচ্চা ছেলে চাঁদ ধরার জন্যে কাঁদছিল। তাকে তার বিজ্ঞ মা বললেন—তুমি সুখী রাজকুমারের মতো হতে পার না কেন? কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে কান্নাকাটি তিনি করতেন না।

জীবনে হতাশ হয়েছে এইরকম কোনো মানুষ এই অদ্ভুত সুন্দর মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে বলত—জগতে যে একজন মানুষও সুখী হতে পেরেছে এটা জেনে আমি আনন্দিত।

চকচকে পরিষ্কার পোশাক পরে গির্জা থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেরা বলত—দেখতে একেবারে দেবদূতের মতো।

অঙ্কের শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতেন—তোমরা কী করে জানলে? দেবদূত তো তোমরা কোনোদিন দেখনি?

ছেলেরা বলত—স্বপ্নে দেখেছি।

এই কথা শুনে গম্ভীর হয়ে শিক্ষক মশাই ভ্রূ কুঞ্চিত করতেন; কারণ, ছেলেদের স্বপ্ন দেখাটা তিনি বেশ পছন্দ করতেন না।

একদিন রাত্রিতে একটা ছোটো দোয়েল পাখি শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। প্রায় ছ'সপ্তাহ আগে তার বন্ধুরা ইজিপ্টে উড়ে গিয়েছে। কিন্তু সে পেছনে পড়েছিল। তার কারণ, সে একটি সুন্দর শরগাছের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল। বেশ বড়ো একটা বেগনে প্রজাপতির পেছনে ধাওয়া

করার উদ্দেশ্যে সে একদিন যখন নদীর জলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এমন সময় একটি প্রথম বসন্তে তার সঙ্গে শরগাছটির দেখা হয়। শরগাছের সরু কোমর দেখে সে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে তার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে সে থেমে গেল।

দোয়েলটি সোজাসুজি কথা বলতে ভালোবাসত। তাই সে জিজ্ঞাসা করল—তোমাকে কি আমি ভালোবাসব? শরগাছটি মাথা নীচু করল তার। তখন সে নদীর ওপরে রূপালি ঢেউ তুলে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। এইভাবে সে তার ভালোবাসা জানাল; আর এটা চলল সারা গ্রীষ্মকাল ধরে।

অন্য সব দোয়েল পাখিরা ঠাট্টা করল তাকে—এই ভালোবাসা দেখে হাসি পাচ্ছে আমাদের। মেয়েটার কোনো দাম নেই। আত্মীয়-স্বজনও ওর অনেক। আর নদীটা যে শরগাছে বোঝাই ছিল সেকথা তো মিথ্যে নয়। তারপরে, শরৎকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই উড়ে গেল।

বন্ধুরা সবাই চলে গেলে তার বড়ো একা-একা লাগল। তার প্রেমিকাকে তার আর যেন ভালো লাগল না। সে বলল—ও কোনো কথা বলতে পারে না। তা ছাড়া ও বড়ো ঢঙি। বাতাস একবার বইতে শুরু করলেই ব্যস। ও তার সঙ্গে অমনি ঢঙ করতে শুরু করে দেবে। আর কথাটা সত্যিই। যখনই বাতাস বইত তখনই ও সুন্দর ভাবে কোমর দুলিয়ে তাকে অভিবাদন জানাত। সে বলে গেল—স্বীকার করছি ও ঘরোয়া। কিন্তু নানা দেশ বেড়িয়ে আমার ভালো লাগে; আর আমার স্ত্রীরও সেই রকম বেড়াতে ভালো লাগা উচিত।

সে একবার শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে? কিন্তু শরটি মাথা নেড়ে বলল—না। ঘরে থাকার মোহ তার এত বেশি।

সে কান্নার সুরে বলল—এতদিন তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করেছ। আমি পিরামিডের দিকে উড়ে চললাম। বিদায়! এবং সে উড়ে গেল।

সারা দিন ধরেই সে উড়েছে। রাত্রিতে সে শহরে এসে হাজির হল। সে বলল—কোথায় আমি থাকব? আশা করি এই শহরে থাকার মতো জায়গা নিশ্চয় কোথাও রয়েছে।

তারপরেই লম্বা বেদীর ওপরে সে সেই মূর্তিটা দেখতে পেল।

সে বলল—আমি এইখানেই থাকব। বেশ সুন্দর জায়গা পরিষ্কার বাতাসও রয়েছে প্রচুর। এই বলে সে সুখী রাজকুমারের দুটি পায়ের মাঝখানে এসে বসে পড়ল।

চারপাশে তাকিয়ে দেখেই সে বলল—আমার শোওয়ার ঘরটা তো দেখছি সোনার। এই বলেই সে ঘুমানোর ব্যবস্থা করল। কিন্তু সবেমাত্র সে পালকের ভেতরে মাথাটা তার ঢুকিয়ে দিয়েছে এমন সময় বড়ো এক ফোঁটা জল তার গায়ে এসে পড়ল। সে প্রায় চিৎকার করে উঠল—অবাক কাণ্ড! আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। নক্ষত্রগুলি বেশ পরিচ্ছন্ন আর উজ্জ্বল। তবু বৃষ্টি হচ্ছে? উত্তর ইউরোপের আবহাওয়াটা সত্যিই বড়ো ভয়ঙ্কর। শরগাছ বৃষ্টি বড়ো ভালোবাসত। সেটা তার স্বার্থপরতা।

আর এক বিন্দু জল পড়ল।

সে বলল—বৃষ্টিই যদি ঠেকাতে না পারল তাহলে স্ট্যাচু থাকার দরকারটা কী? আমাকে একটা চিমনি খুঁজে বার করতে হবে। এই বলেই সে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু উড়ে যাওয়ার জন্যে পাখা দুটো মেলে ধরার আগে তৃতীয় বিন্দুটি পড়ল। সে ওপর দিকে তাকাল—দেখল—হায়রে, কী দেখল সে?

দেখল, সুখী রাজপুত্রের চোখ দুটি জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। তার সোনালি গাল দুটি বেয়ে সেই জল গড়িয়ে পড়ছে। চাঁদের আলোতে তার মুখটা এতই সুন্দর দেখাচ্ছিল যে সেই ক্ষুদে দোয়েলটির মন করুণায় ভরে গেল।

জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে?

আমি হচ্ছি সুখী রাজকুমার।

তাহলে তুমি কাঁদছ কেন? এত কাঁদছ যে চোখের জলে আমাকে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছ।

সেই মূর্তিটি বলল—আমি যখন মানুষ ছিলাম, যখন আমার মানুষের হৃদয় ছিল তখন চোখের জল কাকে বলে তা আমি জানতাম না। কারণ আমি তখন স্যানসসোসির রাজপ্রাসাদে বাস করতাম—কোনো দুঃখই সেখানে ঢুকতে পারত না। দিনের বেলায় সঙ্গিদের সঙ্গে আমি বাগানে খেলা করতাম—সন্ধেবেলায় 'গ্রেট হল'-এ আমি নৃত্য পরিচালনা করতাম। বাগানের চারপাশে ছিল উঁচু পাঁচিল—কিন্তু তার ওপাশে কী রয়েছে তা কোনোদিনই আমি জানতে চাইতাম না। আমার চারপাশে এমন সুন্দর সুন্দর জিনিস ছড়িয়ে থাকত যে সে সব কিছু জানার প্রয়োজনই আমার হত না। আমার সভাসদেরা আমাকে সুখী রাজকুমার বলে ডাকতেন। আর আনন্দটা যদি সুখ হয় আমি তাহলে সত্যিই সুখী ছিলাম। এইভাবেই আমি বেঁচে ছিলাম, আর এইভাবেই আমি একদিন মারা গেলাম। আমি মারা যাওয়ার পরে তারা আমাকে এত উঁচু বেদীর ওপরে বসাল যে আমার শহরের সমস্ত কদর্যতা আর দুঃখ আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। আর যদিও আমার হৃদয়টা ওরা সীসে দিয়ে তৈরি করেছে তবু আমি না কেঁদে পারছি নে।

দোয়েল পাখি নিজের মনে-মনেই বলল—কী! ওর সমস্তটা কি সোনা নয়?

সে এতটা নম্র ছিল যে এই ব্যক্তিগত মন্তব্যটা সে চেঁচিয়ে বলতে পারল না।

আস্তে-আস্তে সুরেলা কন্ঠে মূর্তিটি বলল—অনেক দূরে—অনেক দূরে রাস্তার ওপারে একটা কুঁড়ে রয়েছে। ওই ঘরের একটা জানালা খোলা। তারই ভেতর দিয়ে একটি মহিলাকে আমি টেবিলের পাশে বসে থাকতে দেখছি। তার মুখটা রুগ্ন, ক্লিষ্ট। তার হাত দুটি লাল খসখসে, ছুঁচে বেঁধা—কারণ মেয়েটি পেশায় দর্জি। রানির সব চেয়ে সুন্দরী একটি সহচরী পরবর্তী 'কোর্ট বল'-এ নাচবে। তারই জন্যে সাটিনের গাউনের ওপরে সে 'প্যাশান ফ্লাওয়ার' আঁকছে। তার ঘরের এক কোণে তার শিশুটি অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। তার জ্বর হয়েছে। সে কমলালেবু খেতে চাইছে। নদীর জল ছাড়া তাকে আর কিছু খেতে দেওয়ার সামর্থ্য তার মায়ের নেই। তাই সে কাঁদছে। দোয়েল দোয়েল, আমার ছোট্ট দোয়েল, আমার তরোয়ালের বাঁটের ওপরে যে রুবিটা রয়েছে সেটা কি তুমি তাকে একটু দিয়ে আসবে না? আমার পা দুটো এই মাঁচার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। আমি যে নড়াচড়া করতে পারি নে।

দোয়েল বলল—ইজিপ্টে বন্ধুরা আমার প্রতীক্ষা করছে। আমার বন্ধুরা নীল নদের ওপরে পাক খেয়ে-খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড়ো-বড়ো কুমুদ ফুলের সঙ্গে গল্প করছে তারা। শীঘ্রই তারা সম্রাটের কবরখানার মধ্যে ঘুমোতে যাবে। চিত্রবিচিত্র কফিনে সম্রাটও সেইখানে ঘুমোচ্ছেন। নানারকম সুগন্ধী মশলা দিয়ে মাখা বেগনে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে তাঁর দেহ। তাঁর গলায়

রয়েছে বিবর্ণ জীর্ণ ঘোড়ার একটা শেকল। তাঁর হাত দুটি শুকিয়ে যাওয়া পাতার মতো।

রাজপুত্র বলল—দোয়েল, দোয়েল, আমার ছোট্ট দোয়েল, তুমি কি একটা রাত্রি আমার কাছে থাকবে না—হবে না আমার দূত? বাচ্চাটার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে ওর মা।

দোয়েল বলল—ওই সব বাচ্চাদের আমার খুব একটা ভালো লাগে না। গত গ্রীষ্মে আমি যখন নদীতে বাস করছিলাম তখন কলওয়ালার দুটো বদমাইশ ছেলে সব সময় আমার দিকে ঢিল ছুঁড়তো। সেই সব ঢিল আমার গায়ে অবশ্য লাগেনি। আমরা অনেক দূরে ঘুরে বেড়াই। তা ছাড়া, আমি যে বংশের পাখি তারা ডানার জোরের জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু তবু এটা একটা অসম্মান তো!

কিন্তু সুখী রাজকুমারকে এত বিষণ্ন দেখাল যে খুদে দোয়েলের কেমন কষ্ট হল। সে বলল—জায়গাটা বড়ো ঠান্ডা। তবু আজ রাত্রিতে আমি তোমার কাছে থাকব—কাজ করে দেব তোমার।

রাজকুমার বলল—ধন্যবাদ।

সুতরাং দোয়েল পাখিটি রাজকুমারের তরোয়ালের বাঁট থেকে সেই বড়ো রুবিটা খুলে নিয়ে ঠোঁটে করে অনেক বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

গির্জার উঁচু গম্বুজের পাশ দিয়ে সে উড়ে গেল। সেইখানে দেবদূতদের শ্বেত পাথরে আঁকা মূর্তিগুলি খোদাই করা রয়েছে। সে প্রাসাদের পাশ দিয়ে উড়ে গেল; শুনতে পেল নাচের শব্দ। একটি সুন্দরী মেয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারান্দার ওপরে বেরিয়ে এল। প্রেমিকটি তার প্রেমিকাকে বলল—তারাগুলি কী অদ্ভুত সুন্দর! প্রেমের ক্ষমতা কী অদ্ভুত!

মেয়েটি বলল—আশা করি স্টেটবল-এর আমার নতুন পোশাকটা তৈরি হয়ে যাবে। আমি তার ওপরে প্যাশান ফ্লাওয়ার এঁকে দিতে বলেছি। কিন্তু মেয়ে-দর্জিগুলো বড়োই অলস।

সে নদীর ওপর দিয়ে উড়ে গেল; দেখল জাহাজের মাস্তুলের ওপরে লন্ঠন ঝুলছে। উড়ে গেল জু'দের বসতির ওপর দিয়ে; দেখল, তারা দরকষাকষি করে তামার দাঁড়িতে করে টাকা ওজন করছে। অবশেষে সে দরিদ্র কুটিরে হাজির হয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। বাচ্চাটা জ্বরের ঘোরে বিছানার ওপরে গড়াচ্ছে। মা তার ঘুমিয়ে পড়েছে—বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। লাফাতে লাফাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে টেবিলের ওপরে যেখানে মেয়েটির সেলাই পড়েছিল তারই পাশে সেই বিরাট রুবিটি রেখে দিল। তারপরে সে ধীরে-ধীরে বিছানার চারপাশে উড়তে লাগল; ছেলেটির কপালে তার ডানা দিয়ে হাওয়া করল। ছেলেটি বলল—আমার গা-টা ঠান্ডা হয়ে গেল। আমার নিশ্চয় জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। এই বলে মিষ্টি ঘুমের আমেজে সে ঢলে পড়ল।

দোয়েলটি ফিরে এল নিজের জায়গায়; সে যা করেছে সে-সব কথা সুখী রাজকুমারকে বলল। তারপরে মন্তব্য করল—কী অদ্ভুত! যদিও এত ঠান্ডা, তবুও আমার বেশ গরম লাগছে।

রাজকুমার বলল—তার কারণ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছ।

এবং সেই ছোট্ট দোয়েলটি চিন্তা করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়ল। চিন্তা করতে-করতে সব সময়েই সে ঘুমিয়ে পড়ত।

সকাল হলে সে নদীতে গিয়ে স্নান করে এল। পক্ষীতত্ত্ববিশারদ একটি অধ্যাপক সেই সময় পুলের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। দোয়েলকে দেখে বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন—কী অদ্ভুত ঘটনা! শীতকালে দোয়েল! স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে এই নিয়ে তিনি দীর্ঘ একটি চিঠি লিখলেন। প্রত্যেকেই এটি পড়ল, আলোচনা করল; কিন্তু চিঠিতে এত শব্দ ছিল যে তারা তার বিন্দুবিসর্গও হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না।

দোয়েল বলল—আজ রাত্রিতে আমি ইজিপ্টে যাচ্ছি। এই যাওয়ার আনন্দে তাকে বেশ উত্তেজিত দেখা গেল। যত মঠ-মন্দির আর দেখার জায়গা ছিল সব সে দেখে বেড়াল। গির্জার চূড়ার ওপরে অনেকক্ষণ ধরে সে বসে রইল। যেখানেই সে গেল সেখানেই চড়াই পাখিরা তাকে দেখে কিচিরমিচির করে নিজেদের ভেতরে বলাবলি করতে লাগল—কী সম্ভ্রান্ত এই বিদেশি পাখি! এইভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সে যথেষ্ট আনন্দ পেল।

আকাশে চাঁদ উঠলে সে সুখী রাজকুমারের কাছে উড়ে গিয়ে বলল—ইজিপ্টে কাউকে কিছু বলার রয়েছে তোমার? আমি এবার যাচ্ছি।

রাজকুমার বলল—দোয়েল, দোয়েল, ছোট্ট দোয়েল—আর একটা রাত্রি কি তুমি আমার কাছে থাকবে না?

দোয়েল বলল—ইজিপ্টে বন্ধুরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আগামীকাল তারা দ্বিতীয় জলপ্রপাত দেখতে যাবে। সেখানে শরগাছের ঝোপের মধ্যে নদী-ঘোড়া লুকিয়ে থাকে; আর গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি বিরাট একটা ঘরের ওপরে মেমনন দেবতা বসে রয়েছেন। সারা রাত্রি ধরে তিনি তারামণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকেন; ভোরের তারা চকচক করে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আনন্দে একবার চিৎকার করেই শান্ত হয়ে যান। দুপুর বেলা পীতাভ সিংহেরা নদীর ধারে আসে জল খেতে। তাদের চোখগুলি সবুজ পান্নার মতো চকচকে; তাদের গর্জন জলপ্রপাতের গর্জনের চেয়েও জোরাল।

রাজকুমার বলল—দোয়েল, দোয়েল, ছোট্ট দোয়েল—শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চিলেকোঠার মধ্যে আমি একটি যুবককে দেখতে পাচ্ছি। কাগজে বোঝাই টেবিলের ওপরে মাথাটি রেখে সে বসে রয়েছে। তার পাশে একটা গামলার ভেতরে রয়েছে কয়েকটা শুকনো ভায়লেট ফুল। তার মাথার চুলগুলি কটা আর কোঁকড়ানো। তার ঠোঁট দুটো ডালিমের মতো লাল—বড়ো আর স্বপ্নালু চোখ। থিয়েটারের জন্যে সে একটা নাটক লিখছে; কিন্তু তার এত শীত করছে যে তার হাত সরছে না। তার কামরায় কোনো আগুন নেই। খিদেতে সে বড়ো কাতর হয়েছে।

দোয়েলের হৃদয়টা ছিল সত্যিই বড়ো কোমল। তাই সে বলল—বেশ। আর একটা রাত্রি আমি তোমার জন্যে থেকে যাব। তার কাছে কি আর একটা রুবি আমি পৌঁছে দেব?

রাজকুমার বলল—হায়রে, আমার তো আর কোনো রুবি নেই। আছে কেবল এই চোখ দুটি। এই চোখ দুটি আমার দুষ্প্রাপ্য নীলকান্ত মণির। এই মণি দুটি হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে কিনে আনা হয়েছিল। তারই একটা মণি খুলে নিয়ে তাকে দিয়ে এস। সোনার দোকানে সে সেটা বিক্রি করে জ্বালানি কাঠ কিনবে—তারপরে নাটকটা শেষ করবে সে।

দোয়েল বলল—প্রিয় রাজকুমার, ও কাজ আমি করতে পারব না। এই বলে সে কাঁদতে লাগল।

রাজকুমার বলল—দোয়েল, ছোট্ট দোয়েল—আমার নির্দেশ তুমি পালন কর।

সুতরাং দোয়েল রাজকুমারের চোখ থেকে একটা মণি খসিয়ে নিয়ে ছাত্রটির চিলেকোঠায় পৌঁছে দিয়ে এল। ছাদের মুখে একটা গর্ত ছিল। তাই ঘরে ঢোকাটা খুব সহজ ছিল তার কাছে। সেই গর্তের ভেতর দিয়ে সে তীরবেগে ভেতরে ঢুকে গেল। যুবকটি তার দুটো হাতের মধ্যে মাথাটা চিপে বসেছিল। সেইজন্যে পাখির ডানার শব্দ তার কানে গেল না। মুখ তুলে সে দেখল শুকনো ভায়লেট ফুলের পাশে একটা সুন্দর নীলকান্ত মণি বসানো রয়েছে।

নীলকান্ত মণি দেখে ছেলেটি চিৎকার করে উঠল—আমার গুণপনা মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এটা নিশ্চয় আমার গুণমুগ্ধ কোনো ভক্ত পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন আমার নাটকটি আমি শেষ করে ফেলি।

ছেলেটি বেশ খুশি হয়েছে বোঝা গেল।

পরের দিন দোয়েলটি বন্দরের দিকে উড়ে গেল। একটা বিরাট জাহাজের মাস্তুলের মাথায় গিয়ে বসল; দেখল, নাবিকরা সব চিৎকার করতে-করতে জাহাজের খোল থেকে দড়ি বেঁধে বড়ো-বড়ো পেটি নামাচ্ছে। দোয়েল চিৎকার করে বলল—আমি ইজিপ্টে যাচ্ছি। কিন্তু তার কথায় কান দিল না কেউ। তারপরে আকাশে যখন চাঁদ উঠল সে আবার সুখী রাজকুমারের কাছে গিয়ে বলল—আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

রাজকুমার বলল—দোয়েল, দোয়েল, আমার ছোট্ট দোয়েল; তুমি কি আর একটা রাত আমার কাছে থাকবে না?

দোয়েল বলল—এখন শীতকাল; শীগগিরই ঠান্ডা কনকনে বরফ জমবে এখানে। ইজিপ্টে সবুজ পাম গাছের ওপরে সূর্য গরম হয়ে উঠেছে। মাটির ওপরে কুমিররা সব শুয়ে অলসভাবে তাকিয়ে রয়েছে পরস্পরের দিকে। বলবেক-এর মন্দিরে আমার বন্ধুরা বাসা তৈরি করছে। সাদা আর গোলাপী ঘুঘু পাখিরা তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গুঞ্জন করছে। প্রিয় রাজকুমার, তোমাকে ছেড়ে আমাকে যেতেই হবে; কিন্তু আমি তোমাকে ভুলব না; এবং আগামী বসন্তে যে মণিটি তুমি বিলিয়ে দিয়েছ তার বদলে দুটি সুন্দর মণি তোমাকে এনে দেব। লাল গোলাপের চেয়েও সেই রুবিটা হবে লাল; আর নীলকান্ত মণিটি হবে বিরাট সমুদ্রের চেয়েও অনেক বেশি নীল।

সুখী রাজকুমার বলল—নীচে ওই পার্কের মধ্যে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িতে সে কিছু টাকা না নিয়ে গেলে তার বাবা তাকে মারবে। সেইজন্যেই সে কাঁদছে। তার জুতো বা মোজা নেই। তার মাথা খোলা। তুমি আমার আর একটা চোখ খুবলে মণিটা নিয়ে ওকে দিয়ে এস। তাহলে তার বাবা আর তাকে মারবে না।

দোয়েল বলল—তোমার সঙ্গে আর এক রাত্রি থাকতে আমি রাজি রয়েছি; কিন্তু তোমার চোখ খুবলোতে রাজি নই। তুমি তাহলে একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে।

রাজকুমার বলল—দোয়েল, দোয়েল, ছোট্ট দোয়েল; আমি যা বলছি তা-ই তুমি কর।

সুতরাং রাজকুমারের আর একটা চোখ সে খুবলে নিল; তারপর সেই চোখটা নিয়ে সে তীরবেগে বেরিয়ে গেল। মেয়েটির সামনে নীচু হয়ে তার হাতের চেটোয় ফেলে দিল সেটি।

কী সুন্দর গ্লাসের টুকরো!—সেই বাচ্চা মেয়েটা আনন্দে চিৎকার করেই বাড়ির দিকে ছুটে গেল।

তারপর দোয়েল পাখিটা রাজকুমারের কাছে উড়ে এসে বলল—তুমি এখন অন্ধ হয়ে গিয়েছ। সেই জন্যে আমি তোমার কাছে সব সময় থাকব।

হতভাগ্য রাজকুমার বলল—না, ছোট্ট দোয়েল; এবার তোমাকে ইজিপ্টে যেতে হবে।

দোয়েল বলল—আমি তোমার কাছে সব সময় থাকব। এই বলে সে রাজকুমারের পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের সারাটা দিনই সে রাজকুমারের পিঠের ওপর বসে রইল; বিদেশ-বিভুঁই-এ সে যা দেখেছে সেই সব গল্প তাকে বলল। সে তাকে লাল সারস পাখিদের কথা বলল—এই সব পাখিরা নীল নদের তীরে লম্বা লম্বা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর গোল্ড ফিশ ধরে। শোনাল পৃথিবীর মতো পুরাতন ফিনিক্সের কাহিনি। হাতে রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে উটের পিছু-পিছু হাঁটছে এমন সব বণিকদের কথা বলল; বলল আবলুস কাঠের মতো কালো কুচকুচে চন্দ্রপাহাড়ের রাজার কথা, পামগাছের কোটরে যে সব সাপেরা ঘুমোয় তাদের কথা—এই সাপেদের মধু-মাখানো পিঠে দিয়ে কুড়িটি পুরোহিত ভোজন করায়। লম্বা-লম্বা পাতার ভেলায় চড়ে যে সব পিগমিরা বড়ো লেকটার ওপরে ঘুরে বেড়ায় আর সব সময় প্রজাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শোনাল তাদের কথা।

রাজকুমার বলল—প্রিয় ছোট্ট দোয়েল, তুমি আমাকে অনেক অদ্ভুত কাহিনি শোনালে; কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে মানুষের দুঃখ। দুঃখের মতো রহস্য আর কিছু নেই। আমার এই শহরের ওপর দিয়ে একবার উড়ে এসে আমাকে বল কী তুমি দেখলে।

সুতরাং উড়ে গেল দোয়েল সেই বিরাট শহরের ওপর দিয়ে; দেখল ধনীরা তাদের সুন্দর-সুন্দর বাড়িতে আনন্দ করছে; আর তাদেরই ফটকের ধারে বসে রয়েছে ভিক্ষুকরা। সে অন্ধকার গলির মধ্যে উড়ে গিয়ে দেখল ক্ষুধাতুর শিশুগুলি বিবর্ণ মুখে হতাশ চোখে কালো রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পুলের নীচে নিজেদের গরম করার জন্যে দুটি ছেলে জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে। তারা বলল—বড্ড খিদে পেয়েছে। পাহারাদাররা ধমক দিল—এখান থেকে ওঠ্ ওঠ্। বৃষ্টির ভেতরে বেরিয়ে পড়ল তারা।

তারপর সে ফিরে এসে যা দেখেছে সব রাজকুমারকে বলল।

রাজকুমার বলল—আমার সারা গায়ে সোনার চাদর মোড়া। একটা একটা পাত খুলে নিয়ে তুমি আমার দরিদ্রদের বিলিয়ে দাও। জীবন্ত মানুষরা সব সময় মনে করে সোনার ঝালর গায়ে দিয়ে আমি খুব সুখী।

একটা একটা সোনার পাত খুলতে লাগল দোয়েল। বিশ্রী চেহারা হল রাজকুমারের। একটা একটা সোনার পাত সে দরিদ্রদের দিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাস্তার ওপরে খেলতে শুরু করল তারা; আনন্দে চিৎকার করে বলল—আমাদের খাওয়ার সংস্থান রয়েছে।

তারপরে বরফ নামল, নামল ঘন কুয়াশা। মনে হল সব রাস্তাটাই রুপোর তাল হয়ে গিয়েছে। গলা রুপোর মতোই তারা চকচকে করে লাগল। সবাই ফারকোট গায়ে দিয়ে বেরোতে লাগল রাস্তায়।

বেচারা দোয়েলও দিন-দিন ঠান্ডায় কুঁকড়ে যেতে লাগল। কিন্তু রাজকুমারকে সে এতই

ভালোবেসে ফেলেছিল যে কিছুতেই সে তাকে ছেড়ে যেতে পারল না। রুটিওয়ালার অসাক্ষাতে তার দরজা থেকে দু'এক টুকরো রুটি সে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে আসত; আর ডানা নেড়ে-নেড়ে গরম রাখার চেষ্টা করত নিজেকে।

কিন্তু শেষকালে সে বুঝতে পেরেছিল—তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে। কোনরকমে আর একবার সে রাজকুমারের পিঠের ওপরে উঠে এল; বলল—প্রিয় রাজকুমার, বিদায়। তোমার হাতে একটু চুমু খেতে দেবে?

রাজকুমার বলল—আমার ছোট্ট দোয়েল তুমি যে শেষ পর্যন্ত ইজিপ্টের দিকে রওনা হতে পেরেছ তাতে আমি খুশি হয়েছি। অনেকটা বেশি সময় তোমাকে এখানে থাকতে হয়েছে। তুমি আমার এই ঠোঁটে চুমু খাও—কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।

দোয়েল বলল—আমি ইজিপ্টে যাচ্ছি নে—যাচ্ছি মরণের ঘরে। মৃত্যুই তো ঘুমের ভাই। তাই না?

এবং সুখী রাজকুমারের ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে সে মারা গেল, তারপর পড়ে গেল মূর্তিটির পায়ের কাছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মূর্তিটার ভেতরে একটা অদ্ভুত ভাঙনের শব্দ হল—মনে হল কিছু যেন একটা ভেঙেছে। আসল কথাটা হচ্ছে মূর্তির সীসের মাথাটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কুয়াশাটা সত্যিই ভীষণ জমাট বেঁধে গিয়েছে।

পরের দিন প্রত্যুষে টাউন কাউনসিলরদের নিয়ে মেয়র পার্কে বেড়াচ্ছিলেন। সেই উঁচু বেদীটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি একবার মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন—হায় কপাল! সুখী রাজকুমারের চেহারা এ কী হয়েছে!

কাউনসিলাররাও সব সময়েই মেয়রের সঙ্গে একমত। তারাও একবাক্যে চিৎকার করে উঠল—আরে, ছি-ছি!

মেয়র বললেন—তরোয়াল থেকে রুবিটা পড়ে গিয়েছে, চোখ দুটো নেই। সোনার পাতও দেখছি নে। মনে হচ্ছে রাজকুমার একেবারে ভিক্ষুক হয়ে গিয়েছেন।

হ্যাঁ, ঠিক একেবারে ভিক্ষুক—সায় দিল পারিষদবর্গ।

মেয়র বলে গেলেন—আর এঁর পায়ের তলায় সত্যি সত্যিই একটা মরা পাখি। আমাদের এখনই একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা উচিত যে এখানে আর কোনো পাখিকেই মরতে দেওয়া হবে না।

কর্পোরেশনের কেরানি কথাগুলি টুকে নিল।

তারপরে তারা মূর্তিটাকে ভেঙে ফেলল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টের প্রফেসর বললেন—রাজকুমার তার মূল্য হারিয়েছে, কারণ তার আর কোনো সৌন্দর্য নেই।

তখন তারা তাকে আগুনে গালিয়ে ফেলল। ধাতুটাকে নিয়ে কী করা হবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে মেয়র একটা সভা ডাকলেন। তিনি বললেন—আমাকে অবশ্য আর

একটা মূর্তি গড়তে হবে—আর সেটা হবে আমার।

সভাসদেরা বলল—আমার, আমার।

এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা ঝগড়া করতে শুরু করল। শেষ খবর আমি যতটুকু পেয়েছি তা থেকে জানা যায় তারা এখন-ও ওই নিয়ে ঝগড়া করছে।

ধাতু গলানোর কারখানায় একজন কারিগর বলল—কী আশ্চর্য! এই ভাঙা সীসের হৃদপিণ্ডটা কিছুতেই আগুনের চুল্লিতে গলছে না।

সেই জন্যে তারা সেটাকে একটা ময়লা ফেলার জায়গায় ফেলে দিল। সেই মরা পাখিটার দেহও পড়েছিল সেইখানে।

ঈশ্বর তাঁর দেবদূতদের বললেন—শহরের সবচেয়ে দুটি মূল্যবান জিনিস আমাকে এনে দাও। তাঁর দেবদূতেরা তাঁকে এনে দিল সেই সীসের হৃৎপিণ্ড আর মরা পাখিটার দেহ।

ঈশ্বর বললেন—তোমরা ঠিক জিনিসই এনেছ; কারণ, আমার প্যারাডাইসের বাগানে এই ছোট্ট পাখিটা অনন্তকাল ধরে গান করবে; আর আমার সোনার শহরে এই সুখী রাজকুমার আমার বন্দনা গাইবে চিরদিন।

নাইটিংগেল পাখি ও গোলাপ ফুল
The Nightingale and the Rose

একটি তরুণ ছাত্র আক্ষেপ করে বলল—মেয়েটি কথা দিয়েছে আমি যদি তাকে একটি লাল গোলাপ এনে দিতে পারি তাহলে সে আমার সঙ্গে নাচবে। কিন্তু হায়রে, আমার সারা বাগানে একটি লাল গোলাপ নেই।

ওক গাছের ডালে বসে একটি নাইটিংগেল তার কথাগুলি শুনল; তারপরে সে পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

ছেলেটির সুন্দর চোখ দুটি জলে টলটল করছে।

সারা বাগানে আমার একটিও লাল গোলাপ ফোটেনি। হায়রে, কত ছোট ছোট জিনিসের ওপরেই না মানুষের সুখ নির্ভর করে! জ্ঞানী মানুষেরা আজ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছেন সে-সবই আমি পড়েছি; দর্শনশাস্ত্রের গোপন রহস্যটুকুও আমার জানা। তবু একটি লাল গোলাপের অভাবে আমার জীবন আজ নষ্ট হতে বসেছে।

নাইটিংগেল পাখি বলল—এতদিন পরে সত্যিকারের একজন প্রেমিকের দেখা পেলাম। আমি জানতাম না এরই জন্যে রাতের পর রাত আমি প্রেমের গান গেয়েছি। রাত্রির পর রাত্রি নক্ষত্রদের কাছে আমি এরই গল্প বলেছি। এখন সাক্ষাতে দেখলাম একে। এর চুলগুলি কচুরিপানার ফুলের মতো কালো কুচকুচে, ঠোঁট দুটি কামনার গোলাপী রঙে রাঙানো; কিন্তু উদগ্র কামনার বিবর্ণ হাতির দাঁতের মতো এর রঙ; গভীর একটা দুঃখ এর কপালে তার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

যুবকটি বিড়বিড় করে বলল—কাল রাত্রিতে রাজকুমার নাচের আসর বসাবেন। আমার প্রেমিকা যাবে সেখানে নাচতে। আমি যদি তাকে একটা লাল গোলাপ দিতে পারি তাহলে সে আমার সঙ্গে সারা রাত নাচবে। আমি যদি তাকে একটা লাল গোলাপ এনে দিতে পারি তাহলে সে আমার বাহুর মধ্যে ধরা দিয়ে আমার বুকের ওপরে তার মাথাটা রাখবে; তার দুটি হাত আমার দুটির কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু আমার বাগানে কোনো লাল গোলাপ নেই; তাই আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে রয়েছি; সে আমাকে অগ্রাহ্য করে চলে যাবে; সে তাকাবে না আমার দিকে; আমার হৃদয় যাবে ভেঙে।

নাইটিংগেল বলল—এইতো আসল প্রেমিক। আমি যে দুঃখের গান গাই সেই দুঃখই এ ভোগ করছে; আমার কাছে যেটা আনন্দ, এর কাছে সেইটাই দুঃখ। প্রেম কতই না আশ্চর্য বস্তু!

এমারেলড-এর চেয়েও দামি, ওপ্যাল পাথরের চেয়েও ও প্রিয়। কোনো দামেই ওকে কেনা যায় না; হাটে-বাজারে ও-জিনিস বিকোয় না।

যুবকটি আক্ষেপ করতে শুরু করল—নাচের মজলিসে বাজনাদারেরা বসে-বসে বাজনা বাজাবে, সেই বাজনার সুরে-সুরে আমার প্রেমিকা নাচবে। এমন লঘু পদসঞ্চারে সে নাচবে যে মেঝের ওপরে তার পা-ই যাবে না দেখা। রাজপুরুষেরা ভিড় করে দাঁড়াবে তার চারপাশে, কিন্তু আমার সঙ্গে সে আর নাচবে না—আমি তাকে কোন লাল গোলাপ দিতে পারিনি।—এই বলে সে ঘাসের ওপরে মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে থাকে।

লেজ তুলে তার পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতে-যেতে একটা সবুজ রঙের গিরগিটি হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—ছেলেটা কাঁদছে কেন?

সূর্য-কণার উদ্দেশ্যে উড়তে-উড়তে একটা প্রজাপতিও সেই একই প্রশ্ন করল—তাইতো, তাইতো!

একটা ডেইজি ফুল তার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপারটা কী বল তো?

উত্তর দিল নাইটিংগেল—ও কাঁদছে লাল গোলাপের জন্যে।

সবাই চিৎকার করে উঠল—লাল গোলাপের জন্যে? অবাক কাণ্ড! ওদের মধ্যে সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদী বাচ্চা গিরগিটিটা হেসে উঠল হো-হো করে।

কিন্তু ছেলেটির দুঃখ কোথায় তা বুঝল নাইটিংগেল। ওক গাছের পাতার মধ্যে চুপটি করে বসে সে প্রেমের রহস্যের কথা ভাবতে লাগল।

হঠাৎ দুটো ডানা মেলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল শূন্যে; তারপরে হাওয়ার বুকে উড়তে লাগল। তারপরে ছায়ার মতো সে বাগানের ওপর দিয়ে গেল উড়ে। ঘাসের জাজিমের মাঝখানে একটি সুন্দর গোলাপ গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। তারই পাশে গিয়ে সে বলল—আমাকে একটা লাল গোলাপ দাও।প্রতিদানে তোমাকে আমি আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

ঘাড় নেড়ে গোলাপ গাছটি বলল—আমার সব ফুলই সাদা। সমুদ্রের ফেনার মতো সাদা। পাহাড়ে যে বরফ জমে থাকে এর রঙ তার চেয়েও সাদা। পুরনো সূর্য-ঘড়ির কাছে আমার ভাই রয়েছে। তুমি বরং সেইখানে যাও; তুমি যা চাইছে সে হয়তো তোমাকে তা দিতে পারে।

সূর্য-ঘড়ির কাছে গিয়ে নাইটিংগেল সেই গোলাপ গাছটিকে বলল—আমাকে একটি লাল গোলাপ দাও। প্রতিদানে আমি তোমাকে আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

গাছটি ঘাড় নেড়ে বলল—আমার ফুল হলদে—জলে অপ্সরীদের কেশদামের মতো পীতবর্ণের, মাঠে-মাঠে যে ড্যাফোডিল ফুল ফোটে তাদের চেয়েও বেশি পীত। কিন্তু ওই ছাত্রটির জানালার ধারে আমার একটি ভাই থাকে। তার কাছে যাও, সে হয়তো তোমাকে লাল গোলাপ দিতে পারে।

ছাত্রটির জানালার নীচে যে গোলাপ গাছটি জন্মেছে নাইটিংগেল তার কাছে গিয়ে বলল—আমাকে একটি লাল গোলাপ দাও। আমি তোমাকে আমার সব চেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

কিন্তু গাছটি ঘাড় নেড়ে বলল—আমার সব গোলাপই লাল—ঘুঘু পাখির পায়ের মতো লাল—সমুদ্রের তলায় যে প্রবাল রয়েছে তার চেয়েও লাল। কিন্তু শীত আমার শিরাগুলিকে ঠান্ডায় জমাট বাঁধিয়ে দিয়েছে; আর ফোটার আগেই কুয়াশা নষ্ট করে দিয়েছে আমার কুঁড়িগুলিকে। ঝড়ে ভেঙেছে আমার ডাল। সারা বছরই আমার ডালে কোনো ফুল ফোটেনি।

নাইটিংগেল চিৎকার করেই বলল—আমি কেবল একটি লাল গোলাপই চাই—মাত্র একটি। সেটা পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই?

গাছটি বলল—আছে। কিন্তু সেটি এত বিপজ্জনক যে বলতে আমি সাহস পাচ্ছি নে।

আমাকে বল। কোনো কিছু করতেই আমি ভয় পাব না।

গাছটি বলল—যদি তুমি লাল গোলাপ পেতে চাও তাহলে চাঁদর আলোয় গান গেয়ে তোমাকে তা তৈরি করতে হবেঃ রঙিন করে তুলতে হবে তোমার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। কাঁটার বুকে বুক ঠেকিয়ে আমাকে তোমার গান শোনাতে হবে। সারা রাত ধরেই গান গাইতে হবে তোমাকে; সেটা প্রবেশ করবে তোমার হৃদয়ের গভীরে; তোমার হৃদয়ের রক্ত ঝরে-ঝরে আমার শিরায় প্রবেশ করে আমার নিজস্ব হয়ে উঠবে।

নাইটিংগেল চিৎকার করে বলল—একটা লাল গোলাপের জন্যে মৃত্যু—দামটা বড়ো বেশি হয়ে যাচ্ছে। জীবন সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। সবুজ অরণ্যের মধ্যে বসে থাকা বড়ো মধুর, বসে-বসে সোনার রথে সূর্য আর মুক্তার রথে চাঁদকে ভেসে বেড়াতে দেখতে খুবই ভালো লাগে। তবু জীবনের চেয়ে মহত্তর প্রেম; আর মানুষের হৃদয়ের কাছে পাখির হৃদয়ের দাম কতটুকু!

এই ভেবে তামাটে রঙের পাখা মেলে সে আকাশে উড়ে গেল।

যুবকটির ঘাসের ওপরে পড়ে কাঁদছিল;সে ফিরে এসে দেখল তার সুন্দর চোখ দুটির ওপর থেকে তখনও জলের দাগ মুছে যায়নি।

সে চিৎকার করে বলল—শান্ত হও। লাল গোলাপ তুমি পাবে। চাঁদের আলোতে বুকের রক্ত দিয়ে সারা রাত্রি গান করে তোমার জন্যে একটি লাল গোলাপ আমি সৃষ্টি করব। প্রতিদানে আমি কেবল এইটুকু চাই যে তুমি সত্যিকার প্রেমিক হবে; কারণ বিজ্ঞ দার্শনিকের চেয়েও প্রেম বিজ্ঞ, ক্ষমতাশালীর চেয়েও প্রেমের ক্ষমতা অনেক বেশি।

মুখ তুলে তাকিয়ে ছেলেটি কথাগুলি শুনল; কিন্তু পাখিটি কী বলতে চাইছে তা সে বুঝতে পারল না; কী করে পারবে? বই-এ লেখা না থাকলে কোনো কিছুই সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু ওক গাছ সবই বুঝতে পারল; এবং পেরে দুঃখিত হল। তার কোটরে নাইটিংগেল পাখি বাসা বেঁধেছিল। তাকে ওক গাছ সত্যিই বড়ো ভালবাসত।

ঝোপের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ছেলেটি নিজের মনে-মনেই বলল—মেয়েটির চেহারা যে নিখুঁত সে-বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় কিন্তু অনুভূতি বলে তার কি কিছু রয়েছে? সেদিক থেকে আমার সন্দেহ যথেষ্ট। আসল কথাটা হচ্ছে অধিকাংশ আর্টিস্টের মতোই তার রয়েছে কেবল ভঙ্গিমা—আর সেটাই হল অন্তঃসারশূন্য। পরের জন্যে কোনোরকম আত্মত্যাগ সে করবে না। সে কেবল তার সঙ্গীতের কথাই চিন্তা করে আর সবাই

জানে যে কলা মাত্রেই স্বার্থপর, কিন্তু তবু তার কন্ঠস্বরটি যে বড়ো সুন্দর সেকথা স্বীকার করতেই হবে। কী দুঃখ! কন্ঠস্বর অর্থহীন। কারও কোনো মঙ্গল তা দিয়ে হয় না।

আকাশে চাঁদ উঠতেই নাইটিংগেল পাখিটি সেই গোলাপ গাছের কাছে উড়ে এল। কাঁটার মুখে ঠেকিয়ে দিল তার বুক। সেইভাবে বুকটা রেখে সারা রাত্রি ধরেই সে গান গাইল। হেলে পড়ে সেই গান শুনতে লাগল চাঁদ। সারা রাত্রি ধরেই গান গাইতে লাগল সে। আর কাঁটাটা মুহূর্তে-মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে ঢুকতে লাগল। একটু একটু করে ধীরে-ধীরে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে শেষ হয়ে এল তার ধমনীর রক্ত। গোলাপ গাছের ডালে একটি সুন্দর ফুল ফুটে উঠল।

কিন্তু গোলাপ গাছটির চিৎকার করে বলল—আরো জোরে, আরো জোরে? খুদে নাইটিংগেল! নতুবা, গোলাপ ফোটার আগেই সকাল হয়ে যাবে।

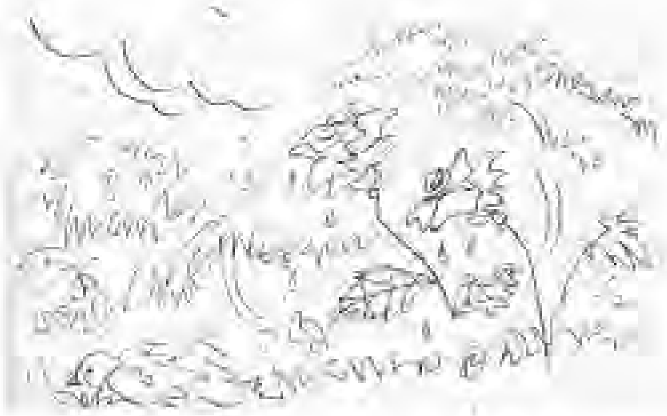

সুতরাং নাইটিংগেল আরো জোরে কাঁটার মুখে নিজের বুকটা চেপে ধরল, আর সেই সঙ্গে তার গান জোরে থেকে জোরাল হয়ে উঠল।

প্রেমিকের চুম্বনে প্রেমিকার গণ্ডে যেমন লজ্জাবিধুর লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে, গোলাপ ফুলের পাতার ওপরেও তেমনি মিষ্টি একটি লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কাঁটাগুলি তখনও তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেনি। সেই জন্যে গোলাপের হৃদয়টি তখনো সদাই রয়ে গেলঃ কারণ পাখিটির হৃদয়ের রক্ত না পেলো। গোলাপের হৃদয় রক্তবর্ণ ধারণ করবে না। একটা ভীষণ যন্ত্রণা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই যন্ত্রণা যতই বাড়তে লাগল ততই তার গান তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল; কারণ তার গান ছিল প্রেমের, যে প্রেম মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সার্থক। কবরখানার মধ্যে তো প্রেমের বিনাশ হয় না।

এবং প্রভাতের মতো সেই অপরূপ গোলাপটি রঙিন হয়ে উঠল।

কিন্তু নাইটিংগেলের কন্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল; ঝপট করতে লাগল তার খুদে পাখা দুটি; চোখের ওপরে নেমে এল অন্ধকারের ছায়া। তার গান অস্পষ্ট হতে লাগল; মনে হল তার গলাটা যেন আটকে আসছে।

তারপরে সে আর একবার জোরে গান গেয়ে উঠল। সাদা চাঁদ সেই গান শুনলো:প্রভাতের কথা ভুলে গিয়ে আকাশের গায়ে অপেক্ষা করতে লাগল। লাল গোলাপ সেই গান শুনল; আনন্দের আতিশয্যে হিল্লোল লাগল তার গায়ে; শীতার্ত প্রভাতের বাতাসে সে তার পাপড়িগুলিকে দিল মেলে।

গোলাপ গাছ চিৎকার করে উঠল—দেখ, দেখ! গোলাপ ফোটা শেষ হল। কিন্তু নাইটিংগেল কোনো উত্তর দিল না। কারণ, লম্বা ঘাসের বনে, হৃদয়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে সে মৃত অবস্থায় রইল পড়ে।

এবং দুপুরের দিকে ছাত্রটি তার জানালা খুলে বাইরে দিকে তাকাল। তারপরেই সে চিৎকার করে উঠল—কী ভাগ্য! এইতো এখানে একটা লাল গোলাপ! জীবনে এত সুন্দর লাল গোলাপ আর কখনো আমি দেখিনি। এটা এত সুন্দর যে মনে হচ্ছে এর একটি কোনো ল্যাটিন নাম রয়েছে।

এই বলে ঝুঁকে পড়ে সে লাল গোলাপটি তুলে নিল। তারপরে মাথায় টুপিটা চড়িয়ে সেই গোলাপটি হাতে নিয়ে সে দৌড়ে গেল প্রফেসরের বাড়িতে।

প্রফেসরের কন্যা দরজার সামনে বসে নীল রঙের সিল্কের সুতো গুটাচ্ছিল তখন। তার বাচ্চা কুকুরটা শুয়েছিল তার পায়ের কাছে।

ছাত্রটি চেঁচিয়েই বলল—তুমি বলেছিলে একটি লাল গোলাপ এনে দিলে তুমি আমার সঙ্গে নাচবে। এই সেই গোলাপ—তামাম দুনিয়ায় এর চেয়ে সুন্দর গোলাপ আর কোথাও তুমি পাবে না। এটি তুমি আজ আমার বুকের কাছে পরবে। আমরা যখন নাচবো তখন এটিই তোমাকে বলে দেবে আমি তোমাকে কত ভালবাসি।

ভ্রুকুটি করল মেয়েটি। বলল—ভয় হচ্ছে আমার পোশাকের সঙ্গে এটি মানাবে না। আর তা ছাড়া চেম্বারলেন-এর ভাইপো আমাকে কয়েকটি আসল জহরৎ পাঠিয়েছেন। সবাই জানে জহরতের দাম ফুলের চেয়ে অনেক বেশি।

ছাত্রটি রাগ করে বলল—সত্যি বলতে কি বড়োই অকৃতজ্ঞ তুমি।

এই বলে ফুলটিকে সে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেইখানে গাড়ির চাকার নীচে পড়ে সে মিশে গেল মাটির সঙ্গে।

মেয়েটি বলল—অকৃতজ্ঞ! তুমি বড়ো অভদ্র তো! তাছাড়া তুমি এমন কি একটা বস্তু? মাত্র একজন ছাত্র। চেম্বারলেন-এর ভাইপোর মুক্তোর যে জুতোর লেস রয়েছে আমার বিশ্বাস তোমার সেটুকু সম্পদও নেই।

এই কথা বলে সে চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

ফিরে যেতে যেতে ছাত্রটি বলতে লাগল—ভালোবাসাটা কী বাজে জিনিস! লজিকের যা দাম রয়েছে, এর দাম রয়েছে, এর দাম তার অর্ধেকও নয়, কারণ, এ কিছুই প্রমাণ করে না। এ এমন সব কথা বলে যা কোনো দিন ঘটে না; মানুষকে এ এমন সব জিনিস বিশ্বাস করায় যা কোনো দিনই সত্যি হয়ে ওঠে না। আসল কথাটা হল প্রেম জিনিসটাই অবাস্তব; আর এ জগতে যা বাস্তব নয় তা কোনো কাজের নয়। তার চেয়ে আবার আমি দর্শন আর অধিবিদ্যা শাস্ত্রই পড়তে শুরু করি।

এই বলে নিজের ঘরে গিয়ে ধুলোমলিন বিরাট একটা বই বার করে পড়তে শুরু করল।

লাখপতি মডেল
The Model Millionaire

অর্থশালী না হলে নিছক সুপুরুষ হয়ে লাভ নেই। রোমান্সে একমাত্র অধিকার রয়েছে ধনীদের; বেকারদের এটা পেশা হতে পারে না। দরিদ্রদের থাকা চাই বাস্তব বুদ্ধি; তাদের হতে হবে সাংসারিক। মনোহর হওয়ার চেয়ে স্থায়ী রোজগারী হওয়া অনেক ভালো। আধুনিক জীবনের এই মহান সত্যগুলি হিউজি আর্সকিনের মাথায় ঢুকত না। বেচারা হিউজি! আমাদের স্বীকার করতেই হবে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে ছেলেটা কিছু নয়। মানুষকে চমকে দিতে পারে জীবনে এমন একটা উঁচু দরের অথবা নীচু দরের কথাও সে কখনো বলেনি। কিন্তু তাহলেও একথা আমাদের বলতে হবে যে চুল, তার কোঁকড়ানো তীক্ষ্ণ চেহারা, আর ধূসর চোখ নিয়ে তাকে দেখতে সত্যিই বড়ো চমৎকার। পুরুষ অথবা নারী সকলেই তাকে বেশ প্রশংসা করত; গুণ ছিল তার অনেক; দোষ ছিল তার একটি—সে রোজগার করতে জানত না। উত্তরাধিকারসূত্রে তার বাবা তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন একটা তরোয়াল, আর পেনিনসুলার যুদ্ধের ওপরে লেখা পনেরো খণ্ডের ইতিহাস। হিউজি তরোয়ালটা ঝুলিয়ে রেখেছিল তার আয়নার গায়ে, আর বইগুলি ঢুকিয়ে রেখেছিল একটা কুলুঙ্গির ভেতরে। বৃদ্ধা এক খুড়িমা তার জন্যে বছরে যে দু'হাজার পাউন্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন তারই ওপরে নির্ভর করে সে জীবিকা নির্বাহ করত। তবে রোজগারের চেষ্টা সে যে একেবারে করেনি তা নয়; অনেক করেছে। ছ'মাস ধরে সে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ ঘুরেছে; কিন্তু ষাঁড় আর ভালুকদের দলে সে একটা প্রজাপতি ছাড়া আর কী? বেশ কিছুদিন ধরে সে চায়ের ব্যবসা করেছে; কিছু হয়নি। তারপরে চেষ্টা করেছে ড্রাই শেরি বিক্রি করার। তাতেও ফায়দা হয়নি কিছু। তারপরে সে সব কিছু করা ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে একটি পরিপূর্ণ বেকার সুন্দর যুবক ছাড়া সে আর কিছু নয়।

বিপদের ওপরে বিপদ। সে আবার প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম লরা মার্টন, অবসরপ্রাপ্ত একটি কর্নেলের মেয়ে। ভারতে চাকরি করার ফলে ভদ্রলোক তাঁর মেজাজ আর হজমশক্তি দুটিই হারিয়েছেন; আর তাদের ফিরে পাননি। লরা সত্যিই তাকে বড়ো ভালোবাসত; আর সে-ও তার জুতোর ফিতেতে চুমু খাওয়ার জন্যে সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকত। লন্ডন শহরে তারাই ছিল সবচেয়ে সুন্দর নর আর নারী; কিন্তু কপর্দকহীন এবং কপর্দকহীনা। হিউজিকে কর্নেল খুবই ভালোবাসতেন: কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে ছিল তাঁর ঘোরতর আপত্তি।

"প্রিয় বৎস, তোমার নিজের দশটি পাউণ্ড জমলে আমার কাছে এসো। তখন ভেবেচিন্তে দেখা যাবে"।—এই কথাই তিনি বলতেন।

একদিন সকালে হল্যান্ড পার্কের দিকে, এইখানেই মার্টনরা থাকত, যাওয়ার পথে অ্যালেন ট্রেভরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে নেমে পড়ল। ট্রেভর ছিল তার প্রাণের বন্ধু আর একজন নামকরা চিত্রকর। অবশ্য আজকাল অনেকেই ছবি আঁকে; কিন্তু সে ছিল একজন আর্টিস্ট;

আর্টিস্টরা সচরাচর বড়োই বিরল। ব্যক্তিগতভাবে ট্রেভরকে অত্যন্ত রুক্ষ প্রকৃতির বলে মনে হবে; ভুরু জোড়াটা থাকত তার সব সময় কুঞ্চিত; দাড়ি ছিল লাল—আর অযত্নবর্ধিত। সে যাই হোক, একবার তুলি আর বুরুশ হাতে নিলে ব্যস, একেবারে দক্ষ চিত্রকর সে। তা ছাড়া বাজারে ছবির-ও বেশ কদর ছিল তার। একথা অনস্বীকার্য সে সুন্দর চেহারার জন্যে প্রথম প্রথম সে হিউজির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সে বলত—একমাত্র মূর্খ আর সুন্দর মানুষদেরই আর্টিস্টদের চেলা উচিত। ফুলবাবু আর মনোহরণকারীরাই পৃথিবী শাসন করে; অন্তত, করা উচিত। তারপরে হিউজের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তার উচ্ছল স্বভাবের জন্যে তাকে তার ভালো লাগত।

হিউজি ভেতরে ঢুকেই দেখল ট্রেভর একটি অপরূপ প্রমাণ মাপের ভিক্ষুকের ছবির ওপরে শেষ তুলি বোলাচ্ছে। স্টুডিয়োর এক কোণে একটি উঁচু বেদীর ওপরে স্বয়ং ভিক্ষুক মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখের চামড়া চুপসে গিয়েছে, বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে তার সর্বাঙ্গে, তার সারা দেহের ওপরে করুণ আর্তির একটা মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়েছে। তার কাঁধের ওপরে চাপা রয়েছে একটা ছেঁড়া ময়লা চাদর। তার মোটা কুর্তা তালি আর তাপ্পিতে ভরে উঠেছে। একটা হাত দিয়ে সে ছড়ির ওপরে ভর করে রয়েছে, আর একটা হাতে ছেঁড়া টুপিটা বাড়িয়ে দিয়েছে ভিক্ষের আশায়।

বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করে হিউজি বলল—কী অদ্ভুত মডেল!

খুব জোরে চিৎকার করে উঠল ট্রেভর—অদ্ভুত মডেল? আমারও তাই ভাবা উচিত। এইরকম ভিক্ষুকের দেখা রোজ পাওয়া যায় না। এইটিই আমার নতুন আবিষ্কার! হায় ভগবান, রেমব্রঁনত একে পেলে কী অদ্ভুত ছবিই না আঁকতেন?

হিউজি বলল: হতভাগ্য মানব! কী করুণই না দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার মতো চিত্রকরের কাছে ওর মুখটাই ওর সৌভাগ্য বয়ে আনবে।

ট্রেভর বলল: নিশ্চয়! কোনো ভিক্ষুক সুখী হোক তা তুমি নিশ্চয় চাও না! চাও কি?

আরাম করে বসে হিউজি জিজ্ঞাসা করল—এইরকম মডেল হওয়ার জন্যে ওরা কত করে পায়?

ঘণ্টায় এক শিলিং।

এই ছবিটার জন্যে তুমি কত পাবে?

তা দু'হাজার।

পাউন্ড?

গিনি। চিত্রকর, কবি, আর ডাক্তাররা সব সময় গিনি পায়।

হাসতে-হাসতে হিউজি বলল—আমার মনে হয় তার একটা ভাগ মডেলদেরও পাওয়া উচিত। তাদেরও তোমাদের মতো কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

বোকা কোথাকার! সারাদিন ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে রঙ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা যে কী

কষ্টকর সেটা তোমার ভেবে দেখা উচিত। আমার মনে হয় হিউজি, আর্ট মাঝে মাঝে মাটি কোপানোর মতো পরিশ্রম পরিণত হয়। কিন্তু এখন আর বকবক করো না। চুপচাপ সিগারেট খাও। বর্তমানে খুব ব্যস্ত রয়েছি আমি।

কিছুক্ষণ পরে চাকর এসে সংবাদ দিল একজন ছবি বাঁধাইকারী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বেরিয়ে যেতে-যেতে ট্রেভর বলল—হিউজি, তুমি পালিয়ে যেও না—আমি এখুনি আসছি।

ট্রেভর বেরিয়ে যেতেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি একটু বিশ্রাম লেওয়ার জন্যে তার পেছনে রাখা একটা বেঞ্চের ওপরে একটু বসল। তাকে এত দুঃখী আর অবসন্ন মনে হল যে তার ওপরে কেমন যেন মায়া হল হিউজির। সঙ্গে সঙ্গে সে তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল মাত্র একটি সভারেন আর কিছু তামার পেনস রয়েছে তার পকেটে। নিজের মনে-মনেই সে বলল—বৃদ্ধ দরিদ্র; আমার চেয়ে ওর প্রয়োজনটাই বেশি—যদিও এর অর্থ হচ্ছে হেঁটেই আমাকে বাড়িতে ফিরতে হবে।

এই ভেবে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিক্ষুকের হাতে সভারেনটা গুঁজে দিল সে।

বৃদ্ধটি চমকে উঠল; একটা ছোট্ট হাসি খেলে গেল তার শুকনো ঠোঁটের ওপরে।

সে বলল—ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ!

তারপরে ফিরে এল ট্রেভর। সভারেনটা বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে একটু লজ্জিত হয়ে বিদায় নিল হিউজি। লরার কাছে সারাদিন কাটাল; এই অমিতব্যয়িতার জন্যে লরার কাছ থেকে মিষ্টি ধমক খেল একটা; এবং তারপরে, বাড়ি ফিরে গেল হেঁটে।

সেইদিনেই সন্ধের সময় প্রায় এগারোটা নাগাদ সে বেড়াতে-বেড়াতে প্যালেট ক্লাবে হাজির হল। দেখল, ধূমপানের ঘরে ট্রেভর বসে মদ খাচ্ছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হিউজি বলল—ছবিটা বাঁধানো হয়ে গিয়েছে তো হে?

ট্রেভর বলল—হয়েছে। হ্যাঁ শোন, তোমারই তো লাভ হয়েছে বেশি। সেই বৃদ্ধ মডেলটির খুব ভালো লেগেছে তোমাকে। তাকে তোমার বিষয়ে সব কথাই আমাকে বলতে হয়েছে। তোমার আয় কত, ভবিষ্যৎ কী—ইত্যাদি ইত্যাদি...

চেঁচিয়ে উঠল হিউজি—বল কী হে? বাড়ি গিয়ে আমি হয়তো দেখব আমার জন্যে সে অপেক্ষা করে বসে আছে। অবশ্য তুমি ঠাট্টা করছ। হতভাগ্য বৃদ্ধ! ইচ্ছে যায় তার জন্যে আমি কিছু করি। আমার ধারণা, এই রকম দারিদ্র যে-কোনো মানুষের পক্ষেই বিপজ্জনক। বাড়িতে আমার অনেক পুরনো পোশাক রয়েছে। তোমার কি মনে হয় সেগুলোর কিছু তার পছন্দ হবে? ওর পোশাক ছিঁড়ে একেবারে কুটি-কুটি হয়ে গিয়েছে।

ট্রেভর বলল—কিন্তু ওই পোশাকেই ওকে বড়ো চমৎকার দেখায়। ফ্রককোট পরলে কোনো কিছুর মোহেই আমি ওর ছবি আঁকতে যেতাম না। তুমি যাকে ছেঁড়া পোশাক বলছ তাকেই আমি বলি রোমান্স। তোমার কাছে যেটাকে দারিদ্র্য বলে মনে হয় আমার কাছে সেইটাই অপরূপ সুন্দর। যাই হোক, তোমার এই প্রস্তাব তাকে জানাব।

হিউজি বেশ গম্ভীরভাবেই বলল—চিত্রকরেরা বড়োই নিষ্ঠুর।

ট্রেভর বলল—আর্টিস্টের হৃদয় হচ্ছে তাদের মাথা। আর তাছাড়া, আমাদের ব্যবসাটাই হচ্ছে পৃথিবীটি যে রকম ঠিক সেই রকম ভাবেই তাকে দেখা। তাকে সংস্কার করা আমাদের কাজ নয়। প্রত্যেক মানুষকেই তার নিজের নিজের ব্যবসা দেখতে হবে। এখন বল, লরা কেমন আছে। বৃদ্ধ মডেলটি তার সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছে।

তার কাছে লরার সম্বন্ধে তুমি আলোচনা করেছ একথা নিশ্চয়ই তুমি বলছ না?

নিশ্চয় বলছি। দুর্দান্ত কর্নেল, সুন্দরী লরা, আর দশ হাজার পাউন্ড—এই সমস্ত কথা সে জানে।

রেগে লাল হয়ে উঠল হিউজি—আমার সব ঘরোয়া কথা তাকে তুমি বলেছ?

ট্রেভর হেসে বলল—প্রিয় বৎস, ওই বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি হচ্ছেন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কোনো ধার না করেই কালই তিনি গোটা লন্ডন শহরটা কিনে ফেলতে পারেন। প্রতিটি রাজধানীতে তাঁর একটি করে বাড়ি রয়েছে, সোনার প্লেটে তিনি খান; এবং ইচ্ছা হলে রাশিয়াকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন।

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল হিউজি—কী বলছ তুমি?

ট্রেভর বলল—আমি বলতে চাই আজ সকালে আমার স্টুডিওতে যে ভিক্ষুকটিকে তুমি দেখছিলে তিনি হচ্ছেন ব্যারন হাউসবার্জ। তিনি আমার খুব বড়ো বন্ধু, আমার সব ছবিই তিনি কেনেন; তার ওপরে একটা ভাগ কমিশন হিসাবে আমাকে তিনি দেন। মাসখানেক আগে ভিক্ষুকের বেশে তাঁর একটা ছবি আঁকার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। লাখপতির একটা খেয়াল বলতে পার। তাঁর ওই ছিন্ন পোশাকে তাঁকে বেশ চমৎকারই দেখাচ্ছিল, অথবা, বলতে পার আমারই দেওয়া ছিন্ন পোশাক। ওগুলো আমি স্পেন থেকে সংগ্রহ করেছিলাম।

চিৎকার করে উঠল হিউজি—ব্যারন হাউসবার্জ! হায় ভগবান! তাঁকেই আমি একটা সভারেন দিয়েছি?

এই বলেই হতাশায় সে চেয়ারের উপরে ঢলে পড়ল।

চিৎকার করেই হো-হো হেসে উঠল ট্রেভর—বল কী হে! তাঁকে দিয়েছ সভারেন! ওটিকে তুমি আর দেখতে পাবে না। তাঁর কাজই অন্য মানুষের টাকা নিয়ে কারবার করা।

একটু বিমর্ষ হয়ে হিউজি বলল—একথা আমাকে তোমার আগেই বলা উচিত ছিল অ্যালেন। তাহলে এরকম বোকা বনতে হত না আমাকে।

ট্রেভর বলল—প্রথমত আমি জানতাম না এইভাবে বেপরোয়া তুমি অর্থ নষ্ট কর। একটি সুন্দরী মডেলকে তুমি চুমু খাও—এর অর্থ আমি বুঝতে পারি; কিন্তু তাই বলে একটা কুৎসিত

ভিক্ষুককে তুমি একটা সভারেন দান করবে! ছি-ছি! তাছাড়া, আজকে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করুক তা আমি চাই নে। তুমি আসার পরে হাউসবার্জ তাঁর নাম তোমার কাছে প্রকাশ করতে চান কিনা তাও আমি জানতাম না।

হিউজি বলল—আমাকে তিনি কী মনে করলেন বল তো?

কিছুই মনে করেননি। তুমি চলে যাওয়ার পরে তাঁকে বেশ স্ফূর্তি করতে দেখলাম। তিনি তোমার সম্বন্ধে এত কথা জানতে চাইলেন কেন তা আমি বুঝতে পারলাম না; কিন্তু এখন আমি সব বুঝতে পারছি। তিনি তোমার ওই সভারেনটি ব্যবসায় খাটিয়ে প্রতি ছ'মাস অন্তর তোমাকে তার সুদ দিয়ে যাবেন; আবার ডিনারের পরে এই নিয়ে বেশ মুখরোচক গল্প বলতে বসবেন।

হিউজি গজগজ করে বলল—হা হতোস্মি! এখন সবচেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। কিন্তু ভাই, একথা তুমি যেন আর কাউকে বলো না। তাহলে আমি লজ্জায় একেবারে মারা যাব।

বোকা কোথাকার! পরোপকার করার স্পৃহা যে তোমার কত বড়ো এই থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পালিয়ো না। আর একটা সিগারেট ধরাও। সিগারেট খেতে-খেতে লরার সম্বন্ধে যত ইচ্ছা বলে যাও।

কিন্তু হিউজিকে ধরে রাখা গেল না। ট্রেভর হো-হো করে হাসতে লাগল। তাকে সেই অবস্থায় হোটেলে ফেলে রেখে সে দুঃখিত মনে বাড়ি গেল।

পরের দিন সকালে সে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসেছিল এমন সময় চাকর একটা কার্ড নিয়ে হাজির হল। কার্ডের ওপরে চোখ বুলিয়ে সে বুঝতে পারল ব্যারন হাউসবার্জের কাছ থেকে একটি ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সোনার চশমা পরা শ্বেত মস্তকের একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি মঁসিয়ে আর্কসিলের সঙ্গে কথা বলছি?

হিউজি তার মাথা নোয়াল।

আমি ব্যারন হাউসবার্জের কাছ থেকে এসেছি। ব্যারন...

হিউজি আমতা আমতা করে বলল—আপনি দয়া করে ব্যারনকে বলবেন যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত...

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—ব্যারন আমাকে এই চিঠিটি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন—এই বলে বন্ধ করা খামখানা তার দিকে এগিয়ে দিলেন।

খামের বাইরে লেখা ছিল—"একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুকের কাছ থেকে হিউজি আকর্সিল আর লরা মার্টনের বিবাহের যৌতুক"। ভেতরে ছিল দশ হাজার পাউন্ড-এর একটি চেক।

তাদের বিয়েতে অ্যালেন ট্রেভর-এরই জয়জয়কার; আর সেইখানে বক্তৃতা ব্যারন হাউসবার্জ।

ট্রেভর অ্যালেন বলল—লাখপতি মডেল পাওয়া কষ্টকর; কিন্তু মডেল লাখপতি খুঁজে পাওয়া

আরও কষ্টকর।

স্বার্থপর দৈত্য
The Selfish Giant

প্রতিদিন বৈকালে স্কুল থেকে ফিরে আসার পথে শিশুরা দৈত্যের বাগানে ঢুকে খেলা করত। বাগানটি বেশ বড়ো আর সুন্দর। নরম ঘাসে একেবারে বোঝাই। ঘাসের বনে এখানে-ওখানে নক্ষত্রের মতো সুন্দর-সুন্দর ফুল থাকত ফুটে। বাগানে ছিল বারোটা পিচ ফলের গাছ। বসন্তের সমাগমে সে-সব গাছে পাটল বর্ণের আর মুক্তার মতো সাদা ধবধবে ফুল ফুটত; শরতে ধরত ফল। গাছের ডালে বসে পাখিরা এমন মিষ্টি গান গাইত যে ছেলেরাও খেলা ভুলে গিয়ে তাদের গান শুনত। নিজেদের ভেতরে চিৎকার করে তারা বলাবলি করত—আমরা এখানে খেলা করে কত সুখী হয়েছি।

একদিন সেই দৈত্য এসে হাজির। সে বেড়াতে গিয়েছিল তার বন্ধু কর্নিশ দৈত্যের বাড়িতে। সেখানে সাত বছর সে ছিল। কথাবার্তায় সে যে বিশেষ পটু ছিল তা নয়। তবু এই সাত বছরে যতটুকু আলাপ করা দরকার তা সে বন্ধুর সঙ্গে করেছে; তারপরে নিজের দুর্গে ফিরে আসতে সে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ফিরে এসেই সে দেখতে পেল ছেলেরা তার বাগানে খেলছে।

বেশ রাগত কণ্ঠেই সে জিজ্ঞাসা করল—তোমরা এখানে কী করছ হে?

এই কথা শুনেই ছেলেরা দৌড়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

দৈত্যটা বলল—আমার নিজের বাগান আমার নিজের সম্পত্তি। যে-কোনো মানুষই তা বুঝতে পারে। এখানে আমি কাউকে খেলা করতে দেব না; খেলব আমি কেবল নিজে।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাগানের চারপাশে সে বিরাট একটা দেওয়াল তুলে দিল; তার ওপরে ঝুলিয়ে দিল একটা বিজ্ঞাপন—

বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে
দণ্ডনীয় হতে হবে

দৈত্যটি বড়োই স্বার্থপর!

বেচারাদের এখন আর কোথাও খেলার জায়গা নেই। তারা রাস্তার ওপরে খেলতে চেষ্টা করল; কিন্তু ধুলো আর শক্ত পাথর-কুচিতে রাস্তা একেবারে বোঝাই। রাস্তাটা তাদের ভালো লাগল না।

পড়াশুনা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তারা ওই উঁচু দেওয়ালের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—এর মধ্যে কত আনন্দেই না থাকতাম আমরা!

তারপর বসন্ত এল। সারা অঞ্চল জুড়ে ছোটো-ছোটো ফুল আর পাখিতে গেল ভরে। কেবল সেই স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে তখনো শীতকাল কায়েমি হয়ে রইল। সেখানে শিশুরা ছিল না বলে পাখিরা সেখানে গান গাইতে চাইল না, গাছেরা ভুলে গেল ফুল ফোটাতে। একবার একটি সুন্দর ফুল ঘাসের ভেতর থেকে মাথাটা তুলতেই ঝোলানো বিজ্ঞাপনটা তার চোখে পড়ল; সেই দেখে ছেলেদের জন্যে তার মনটা এতই খারাপ হয়ে গেল যে মাথাটা সে ঘাসের বনে লুকিয়ে সটান ঘুমিয়ে পড়ল। যারা সত্যিকারের খুশি হল তারা হচ্ছে বরফ আর কুয়াশা। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল—বসন্ত এই বাগানের কথা ভুলে গিয়েছে। সুতরাং সারা বছরই আমরা এখানে কাটিয়ে দেব। বরফের বিরাট সাদা আলখাল্লা দিয়ে ঘাসগুলিকে ঢেকে দিল তারা। জমাট হিমকণা গাছগুলিকে রাঙিয়ে দিল সাদা রঙে। তারপরে তাদের সাহচর্য দেওয়ার জন্যে তারা আহ্বান জানাল উত্তর-বাতাসকে। উত্তর-বাতাস সাড়া দিল সেই ডাকে। পশমের আলখাল্লা জড়িয়ে সে সারাদিন বাগানের মধ্যে গর্জন করে ঘুরে বেড়াল; উড়িয়ে ফেলে দিল চিমনিগুলিকে। সে খুশি হয়ে বলল—জায়গাটা বড়ো চমৎকার। ঝঞ্ঝা না ডাকলে আর চলছে না। সুতরাং ঝঞ্ঝা এল। প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে দুর্গের ওপরে সে নাচতে লাগল—ভেঙে ফেলল কাচের শার্সিগুলি। তারপর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সে বাগানের মধ্যে ছুটতে শুরু করল। পোশাক তার ধূসর রঙের; নিঃশ্বাস তার বরফের মতো ঠান্ডা কনকনে।

জানালার ধারে বসে ঠান্ডা সাদা বাগানের দিকে তাকিয়ে স্বার্থপর দৈত্যটি গজ-গজ করে বলল—বসন্ত আসতে দেরি করছে কেন তা আমি বুঝতে পারছি নে। আশা করি এই আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে।

কিন্তু বসন্তও এল না, গ্রীষ্মও এল না। প্রতিটি বাগানে শরৎ তার সোনালি ফল বিছিয়ে দিল; দৈত্যের বাগানে দিল না কিছুই। সে বলল—'দৈত্যটা বড়োই স্বার্থপর'। সুতরাং বাগানটা অধিকার করে রইল কেবল শীত, উত্তরে-বাতাস, ঝঞ্ঝা আর হিমকণা। আর গাছের ভেতর দিয়ে নেচে-নেচে বেড়াতে লাগল কেবল বরফের দল।

একদিন সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দৈত্যটি একটি মিষ্টি গান শুনতে পেল। গানটা তার কানে এতই মিষ্টি লাগল যে তার মনে হল রাজার গাইয়েরা গান করতে-করতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি গান গাইছিল জানালায় বসে একটি লিনেট পাখি। কিন্তু এতদিন পরে সে পাখির গান শুনতে পেয়ে তার মনে হল পৃথিবীতে এইটিই বোধ হয় সবচেয়ে মিষ্টি গান। এই গানের সঙ্গে-সঙ্গে ঝঞ্ঝা থেমে গেল—উত্তরে-বাতাস থামিয়ে দিল গর্জন করা, খোলা জানালার ভেতর দিয়ে একটা মিষ্টি গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। দৈত্যটি বলল—'মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত বসন্ত এল'। এই বলেই সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল।

কী দেখল?

দেখল একটি অদ্ভুত দৃশ্য। দেওয়ালের গায়ে ছোটো একটা গর্তের ভেতর দিয়ে ছেলেরা সব গুঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে এসেছে; আর তারা সব গাছের ডালে বসে রয়েছে। সে দেখতে পেল প্রতিটি গাছে একটা করে শিশু বসে রয়েছে। তাদের কাছে পেয়ে গাছগুলি এতই খুশি হয়েছে যে তারা তাদের শরীর ফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। ছেলেদের মাথায় হাওয়া করছে ডাল দিয়ে। মনের আনন্দে কিচমিচ করতে-করতে পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে; সবুজ ঘাসের ভেতর থেকে ফুলগুলি মাথা তুলে মনের আনন্দে হাসছে. সত্যিই বড়ো আনন্দের দৃশ্য! কেবল একটা কোণে তখনো শীত রয়েছে। অংশটা হল বাগানের একেবারে প্রত্যন্তে; আর সেখানে একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু। সে এত ছোটো যে কিছুতেই সে ডালের নাগাল পাচ্ছে না—ভীষণ

কাঁদতে-কাঁদতে সে গাছের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই গাছটা তখন বরফ আর হিমকণায় বোঝাই হয়ে ছিল। আর গর্জন করে তার মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল উত্তরে-বাতাস। গাছটা বলেছিল—প্রিয় শিশু, তুমি আমার ডালে উঠে এস; নিজের ডালটাকে যতটা সম্ভব সে নীচে নামিয়ে দিচ্ছিল; কিন্তু শিশুটা যে একেবারে বাচ্চা।

এই দেখে দৈত্যের হৃদয়টা গলে গেল। সে বলল—সত্যিই আমি কী রকম স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করেছি। এখন আমি বুঝতে পারছি বসন্ত আসতে এত দেরি করেছে কেন? আমি ওই বাচ্চাটাকে গাছের ডালে চড়িয়ে দেওয়াল দেব ভেঙে। তাহলে চিরদিন ছেলেরা এই বাগানে খেলা করতে পারবে। কৃতকর্মের জন্যে সত্যি সে বড়ো অনুতপ্ত হল।

এই কথা বলে গুঁড়ি দিয়ে সে নীচে নেমে এল; খুব আস্তে আস্তে সামনের দরজা খুলল—তারপরে বেরিয়ে এল বাগানে। কিন্তু শিশুরা তাকে দেখে এত ভয় পেল যে একছুটে পালিয়ে গেল সবাই। পালাল না কেবল সেই বাচ্চাটা। তার চোখ দুটো জলে এত বোঝাই হয়ে ছিল যে দৈত্যটা যে আসছে তা সে দেখতে পায়নি। দৈত্যটি চুপি চুপি তার পেছনে গিয়ে তাকে সন্তর্পণে নিজের হাতের ওপরে তুলে নিল; তারপরে তাকে ডালের ওপরে বসিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে গাছে ফুলের সমারোহ জাগল, পাখিরা ছুটে এসে গান জুড়ে দিল, আর বাচ্চাটা দু'হাতে দৈত্যের গলাটা জড়িয়ে চুমু খেল তাকে। আর অন্যান্য ছেলেরাও যখন দেখতে পেল দৈত্যটা আর এখন দুষ্টু নয় তখন তারা সবাই দৌড়ে ভেতরে এসে হাজির হল—তাদের পিছু পিছু এল বসন্ত। দৈত্যটি বলল—শিশুরা, এখন থেকে এটা হল তোমাদের বাগান। এই বলে বিরাট একটা কুড়ুল নিয়ে সে দেওয়ালটাকে দিল ভেঙে। বেলা বারোটার সময় বাজারে যাওয়ার সময় সবাই দেখল একটি অতি সুন্দর বাগানে ছেলেদের সঙ্গে দৈত্যটি খেলা করছে।

সারা দিন ধরেই তারা খেলা করল; সন্ধেবেলা ছেলেরা দৈত্যের কাছে থেকে বিদায় নিতে এল।

সে জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু যে বাচ্চাটাকে আমি গাছের ডালে বসিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের সেই শিশু বন্ধুটি কোথায়?

তাকে চুমু খেয়েছিল বলেই শিশুটিকে দৈত্যটি ভালোবাসত।

শিশুরা বলল—জানি নে। সে চলে গিয়েছে।

তোমরা তাকে নিশ্চিত বলবে কাল যেন সে আসে।

কিন্তু ছেলেরা বলল সে কোথায় থাকে তা তারা জানে না; তাকে তারা আগে কোনোদিন দেখেওনি। এই কথা শুনে দৈত্যটি খুব দুঃখিত হল।

প্রতিদিন বৈকালে স্কুল ছুটি হওয়ার পরে ছেলেরা বাগানে এসে দৈত্যটির সঙ্গে খেলত। কিন্তু যে শিশুটিকে দৈত্য অত ভালোবাসত তার দেখা আর পাওয়া গেল না। দৈত্যটি সব ছেলেদেরই খুব পছন্দ করত; তবু সেই খুদে বন্ধুটিকে দেখার জন্যে সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে প্রায়ই বলত—তাকে দেখতে আমার কতই না ইচ্ছে যায়।

বছরের পর বছর গেল কেটে। দৈত্যটি বৃদ্ধ আর অথর্ব হয়ে উঠল। আর সে খেলতে পারত না। তাই সে বিরাট একটা আরাম কেদারায় শুয়ে ছেলেদের খেলা দেখত; বলত—আমার বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল রয়েছে; কিন্তু শিশুরা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর।

একদিন শীতের সকালে পোশাক পরতে-পরতে সে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখল। এখন আর সে শীতকে ঘৃণা করে না; কারণ সে জানত এটা শীত নয়, ঘুমন্ত বসন্ত; এবং ফুলেরা এখন বিশ্রাম করছে।

হঠাৎ সে চোখ দুটো ঘষে অবাক হয়ে তাকাল—একবার নয়, বারবার। সত্যিই বড়ো অদ্ভুত দৃশ্য। বাগানের একটি প্রত্যন্ত অংশে একটা গাছ; সুন্দর ফুলে ভরে উঠেছে তার দেহ। ডালগুলি সোনালি; রূপালি ফলগুলি ঝুঁকে পড়েছে ডাল থেকে। আর তারই নীচে যে শিশুটিকে সে ভালোবাসে সেই শিশুটি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৈত্যটি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল; ঢুকল বাগানে। ঘাসের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল; এল সেই শিশুটির সামনে। খুব কাছে আসতেই তার চোখ দুটো রাগে আরক্ত হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল—'তোমাকে আঘাত করেছে এত সাহস কার?' কারণ শিশুটির হাতের চেটোতে দুটো পেরেক ফোটানোর দাগ—ছোটো দুটি পায়ের ওপরেও দাগ দুটি পেরেক ফোটানোর।

দৈত্যটি চিৎকার করে উঠল—কে তোমাকে মেরেছে? এত সাহস কার? আমায় তার নামটা বল। আমার সেই বিরাট তরোয়ালটা নিয়ে এখনই তাকে আমি হত্যা করব।

শিশুটি বলল—না, না। এগুলি হচ্ছে প্রেমের ক্ষত।

দৈত্যটা জিজ্ঞাসা করল—কে তুমি?

একটা ভয় এসে তাকে গ্রাস করে ফেলল, সে সেই শিশুটার সামনে হাঁটু মুড়ে বসল।

শিশুটি দৈত্যের দিকে তাকিয়ে হাসল; বলল—তুমি একদিন আমাকে বাগানে খেলতে দিয়েছিলে; আজ তুমি আমার সঙ্গে আমার বাগানে যাবে। সেই বাগানের নাম প্যারাডাইস।

এবং সেদিন বৈকালে ছেলেরা যখন খেলতে এল তখন তারা দেখল গাছের তলায় দৈত্যের মৃতদেহটি পড়ে রয়েছে; সাদা ফুলে ঢাকা পড়েছে তার দেহ।

অনুরক্ত বন্ধু
The Devoted Friend

একদিন সকালে একটা বুড়ো জলো ইঁদুর গর্ত থেকে তার মাথাটা বার করে দিল। তার ছোটো ছোটো চোখ দুটো চকচকে, শক্ত গোঁফ জোড়া ধূসর রঙের আর ন্যাজটা হচ্ছে কালো ভারতীয় রবারের মতো। ছোটো-ছোটো হাঁসগুলো সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছিল পুকুরে। দেখতে তাদের হলদে ক্যানারি পাখির মতো। তাদের মার পা দুটো সত্যিকার লাল। কেমন করে জলে মাথার ওপরে দাঁড়াতে হয় মা তাদের সেই শিক্ষাই দিচ্ছিল। সে তার বাচ্চাদের বারবার সাবধান করে দিচ্ছিল—'মাথার ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না শিখলে কোনো উঁচু সমাজে তোমরা কলকে পাবে না।' কিন্তু বাচ্চারা সেকথা গ্রাহ্যই করছে না। বাচ্চা বলেই বোধ হয় সভ্য সমাজে ঢুকতে পারার সুবিধে কত তা তারা জানত না।

জলের ইঁদুর চিৎকার করে উঠল—বেয়াদপ ছোকরা সব বটে! ওদের ডুবে মরাই ভালো।

মা-হাঁসটা বলল—মোটেই না। প্রত্যেককেই শেখার সুযোগ দিতে হয়। তাছাড়া, মাদের কোনো বিষয়েই ধৈর্য হারালে চলে না।

জলের ইঁদুর বলল—তাই নাকি! তা, বাপ-মায়ের অনুভূতির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। সংসার বলতে কিছু নেই আমার। আসল কথাটা হচ্ছে, আমি কোনো দিন বিয়ে করিনি; ভবিষ্যতে বিয়ে করার ইচ্ছেও আমার নেই। একদিক থেকে প্রেম জিনিসটা ভালোই; তবে অনুগত বন্ধুত্ব তার চেয়েও ভালো।

কাছাকাছি একটা উইলো গাছের ডালে একটা সবুজ রঙের লিনেট পাখি বসেছিল। ওদের আলোচনা শুনে সে বলল—তাই বুঝি! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি অনুগত বন্ধুর দায়-দায়িত্ব কী?

মা-হাঁসটা বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ; ঠিক ওই কথাটা আমিও জানতে চাই। এই বলে সে সাঁতার কাটতে-কাটতে পুকুরের আর একপাশে গিয়ে কেমন করে মাথার ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয় সেইটাই তার বাচ্চাদের দেখাতে লাগল।

জলের ইঁদুর বলল—কী বোকার মতো যে প্রশ্ন কর! আমার অনুগত বন্ধু যে হবে সে আমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে এটা অবশ্যই আমি চাই।

ছোটো-ছোটো পাখনা উড়িয়ে আকাশে ভাসতে-ভাসতে বাচ্চা পাখিটা জিজ্ঞাসা করল—আর প্রতিদানে কী করতে হবে তোমাকে?

জলের ইঁদুর বলল—কী যে ছাই-ভস্ম সব বল আমার তা মাথায় ঢোকে না।

লিনেট বলল—একটা গল্প শোন।

আমার সম্বন্ধে! তাহলে শুনব। গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।

লিনেট বলল—এ গল্প তোমার সম্বন্ধেও খাটবে। এই বলে সে উড়ে গিয়ে পুকুরের ধারে বসে গল্প শুরু করল: এক সময় হ্যানস নামে একটা সৎ জীব বাস করত।

বেশ সম্ভ্রান্ত গোছের?—জিজ্ঞাসা করল জলের ইঁদুর।

লিনেট বলল—না। সদয় হৃদয় আর পরিচ্ছন্ন হাসিখুশি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু সম্ভ্রান্ত ছিল বলে আমার মনে হয় না। একা-একা সে ছোটো একটা ঘরে থাকত; আর প্রতিটি দিনই সে বাগানে কাজ করত। সারা দেশে তার বাগানের মতো সুন্দর বাগান আর কারও ছিল না। সব ঋতুতেই তার বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে থাকত।

অনেক বন্ধু ছিল মানুষটির; কিন্তু তার সবচেয়ে অনুরক্ত বন্ধু ছিল মিলার হিউ। সত্যি কথা বলতে কি এই ধনী হিউ তার এতই অনুরক্ত ছিল যে এমন কোনো দিন সে বাগানের পাশ দিয়ে যায়নি যেদিন যে বাগানের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বড়ো একটা সুন্দর ফুলের গুচ্ছ অথবা পকেট ভর্তি করে প্লাম আর চেরি তুলে নিয়ে যায়নি—অবশ্য বাগানে সেগুলি থাকলে।

মিলার হিউ বলত—সত্যিকার বন্ধু তারা যারা একজনের জিনিস সবাই মিলে ভাগ করে নেয়।

এই কথা শুনে হ্যানস হাসত আর ভাবত এত উঁচু আদর্শবাদী বন্ধু আর কার রয়েছে?

মাঝে-মাঝে অনেকেই অবাক হয়ে ভাবত ওই ধনী হিউ, যার কলে একশ বস্তা ময়দা সব সময় মজুত হয়ে থাকে, যার রয়েছে ছ'টা দুধওয়ালা গরু আর লম্বা-লম্বা সুন্দর লোমশ অজস্র ভেড়া—সেই মানুষটি হ্যানসকে প্রতিদানে কখনো কিছু দেয় না কেন। কিন্তু এসব ছোটো-খাটো ব্যাপার নিয়ে হ্যানস কোনো দিন মাথা ঘামাত না। বন্ধুদের নিঃস্বার্থপর দানের সম্বন্ধে মিলার হিউ যে সমস্ত লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দিত, হ্যানস সেই সব বক্তৃতা খুব মন দিয়ে শুনত আর উপভোগ করত।

বাগান থেকে হ্যানস যে বিশেষ কিছু পেত তা নয়। শরৎ, গ্রীষ্ম আর বসন্তে সে মোটামুটি খুশিই থাকত; কিন্তু শীতকালটাই ছিল তার কাছে মারাত্মক; কারণ, ওই সময়ে তার বাগানে কিছুই ফলত না; অনেকদিন এমন-ও হয়েছে যে সে কিছু শুকনো ফল মুখে দিয়ে ঘুমোতে গিয়েছে। তা ছাড়া, এই সময়টা সে বড়ো নিঃসঙ্গও বোধ করত; কারণ গোটা শীতকালটা মিলার হিউও পথ দিয়ে হাঁটত না।

মিলার তার স্ত্রীকে বলত—যতদিন শীত থাকবে ততদিন হ্যানসকে না দেখতে যাওয়াই ভালো। কারণ, মানুষ যখন দুঃখে পড়ে তখন তার কাছে কারও যাওয়া উচিত নয়। তাতে তাকে বিব্রত করা হয়। অন্তত, প্রকৃত বন্ধুত্ব বলতে এইটাই আমি বুঝি। আর এ বিষয়ে আমি যে ঠিক সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। সুতরাং বসন্তকাল না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব; তারপরে আমি দেখা করব তার সঙ্গে। সে তখন আমাকে এক বাক্স প্রিমরোজ উপহার দিয়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবে।

প্রচুর পাইন কাঠের আগুনের ধারে মেজাজি একটা আরাম কেদারায় বসে তার স্ত্রী বলল—অন্য লোকের সম্বন্ধে তুমি বেশ চিন্তাশীল দেখছি। বন্ধুত্বের সম্বন্ধে তোমার এই ধরনের কথা শুনতে আমার বেশ ভালো লাগছে যদিও পাদরি বাবা বিরাট তিনতলা বাড়িতে থাকেন এবং কড়ে আঙুলে সোনার আংটি পরেন তবুও আমি নিশ্চিত যে তিনিও এইরকম সুন্দর কথা বলতে পারবেন না।

মিলারের সবচেয়ে ছোটো ছেলেটা বলল—কিন্তু তাঁকে কি আমরা এখানে আনতে পারি নে? যদি তিনি সত্যিকার দারিদ্র্যে পড়ে থাকেন আমি তাহলে তাঁকে আমার অর্ধেকটা খাবার দিতে পারি—আর দেখাতে পারি আমার সাদা খরগোসগুলি।

মিলার বেশ উঁচু স্বরে বলল—আচ্ছা বোকা ছেলে তো! তোমাকে স্কুলে পাঠিয়ে যে কী সুরাহা হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি নে। কিছুই শিখছ বলে তো মনে হচ্ছে না। হ্যানস যদি এখানে এসে আমাদের এই ভালো-ভালো খাবার, ভালো-ভালো লাল মদ, আর এমন আরামের গৃহস্থালী দেখে তাহলে তার মনে হিংসার উদয় হতে পারে, এই হিংসাটাই হচ্ছে বন্ধুত্বের পক্ষে বড়োই বিপজ্জনক। এতে মানুষের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। আমি কিছুতেই হ্যানসকে তার চরিত্র নষ্ট করতে দেব না। তার সবচেয়ে প্রিয়ে বন্ধু আমি। সব সময় আমি তার ওপরে নজর রাখব। দেখব সে যাতে লোভের পথে পা না বাড়ায়। তাছাড়া সে যদি এখানে আসে তাহলে আমার কাছ থেকে ধারে কিছু ময়দা নেওয়ার প্রস্তাব সে দিতে পারে। কিন্তু আমি তাকে ধার দিতে পারি নে। ময়দা আর বন্ধুত্ব এক জিনিস নয়। দুটো জিনিসের বানানই আলাদা। তাদের অর্থও যে আলাদা সেকথা সবাই জানে।

বিরাট একটা পাত্রে মদ ঢেলে তার স্ত্রী বলল—বা! কী সুন্দর কথা! মনে হচ্ছে, আমি গির্জায় রয়েছি।

মিলার বলল—অনেক মানুষই ভালো অভিনয় করতে পারে। কিন্তু ভালো কথার শক্তি কম মানুষেরই রয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় দুটোর মধ্যে ভালো কথা বলাটাই বেশি শক্ত—আর সেই সঙ্গে সূক্ষ্মতর।

এই বলে ছেলের দিকে এমন রুষ্টভাবে সে তাকিয়ে রইল যে বেচারা লজ্জায় মাথা নীচু করল। যাই হোক, তার বয়স এত কম যা তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

জলের ইঁদুর জিজ্ঞাসা করল—তোমার গল্প শেষ?

লিনেট বলল—মাত্র শুরু।

জলের ইঁদুর বলল—তুমি তো তাহলে দেখছি সেকেলে হয়ে গিয়েছ। আজকাল প্রতিটি দক্ষ কথকই শেষ থেকে শুরু করে, তারপরে চলে যায় প্রথমে, শেষ করে মাঝখানে। এইটিই হচ্ছে নতুন রীতি। সেদিন একজন সমালোচক একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে পুকুরের ধারে বেড়াতে বেড়াতে এই কথা বলছিলেন। আমি তা শুনেছি। কথাটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে আমার। কারণ ভদ্রলোকের চোখে নীল চশমা, মাথায় টাক আর যখনই যুবকটি কিছু বলতে চাইছিল তখনই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাঁর কন্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল একটিমাত্র ধ্বনি—পুঃ। কিন্তু গল্পটা শুরু কর ভাই। তোমার এই মিলারটিকে আমার বেশ ভালো লাগছে। অনেক সৎগুণ তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

লিনেট বলল—বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে মিলার তার স্ত্রীর কাছে ঘোষণা করল যে খুদে

হ্যানস-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

তার স্ত্রী সানন্দেই বলল—সত্যিই তোমার হৃদয় কত উদার। তুমি সব সময় অন্য লোকের কথা ভাবছ। যাই হোক, ফুল আনার জন্যে সেই বড়ো ঝুড়িটা নিয়ে যেতে ভুলো না যেন।

যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে মিলার হ্যানস-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

গুডমর্নিং হ্যানস। শীতকালটা কাটল কেমন?

হ্যানস বলল—প্রশ্নটা করে তোমার হৃদ্যতারই পরিচয় দিয়েছ। না, খুব কষ্টেই গিয়েছে। কিন্তু বসন্তকাল এসে গিয়েছে। আমি এখন খুশিই। আমার ফুল সব ভালোই কাটছে।

মিলার বলল—সারা শীতকালটাই আমরা তোমার কথা ভেবেছি। তুমি যে কেমন করে কাটাচ্ছ তাই ভেবেই অবাক হচ্ছিলাম আমরা।

ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা আমাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছ।

তোমার কথা শুনে অবাক হচ্ছি হ্যানস। বন্ধুত্ব কাউকে ভুলতে দেয় না। এর সম্বন্ধে ওইটাই হল সবচেয়ে আশ্চর্য কথা। মনে হচ্ছে, জীবন-কাব্য বলতে কী বোঝায় তা তুমি জান না। ভালো কথা! তোমার ওই প্রিমরোজগুলি সত্যিই কী সুন্দর।

হ্যানস বলল—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার ভাগ্য ভালো যে অতগুলো সুন্দর প্রিমরোজ ফুল আমার বাগানে ফুটেছে। আমি ওগুলি বাজারে নিয়ে গিয়ে বার্গোমাস্টারের মেয়েকে বিক্রি করব; আর সেই টাকায় আমার একচাকার ঠেলাগাড়িটা ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

ফিরিয়ে আনবে? তুমি কি সেটা বিক্রি করে দিয়েছিলে?

বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বুঝতেই পাচ্ছ শীতকালটাই হচ্ছে আমার দুঃসময়। তখন রুটি কেনার মতো পয়সাও আমার হাতে থাকে না। প্রথমে বিক্রি করলাম রুপোর বোতাম, তারপরে রুপোর চেন, তারপরে সেই বড়ো পাইপ, তারপরে ঠেলাগাড়ি, এখন আমি সব কটাই ফিরিয়ে আনব।

মিলার বলল—হ্যানস, আমি তোমাকে আমার ঠেলাগাড়িটা দেব। গাড়িটা অবশ্য খুব একটা ভালো অবস্থায় যে নেই সেকথা অবশ্য মিথ্যে নয়। তবু সেটা আমি তোমাকে দেব। আমি জানি এ থেকে আমার হৃদয়টা যে কতটা দরাজ তাই প্রমাণিত হবে; আর ওটা বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে অনেকে যে আমাকে মূর্খ বলবে সেদিক থেকেও আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বিশ্বের আর দশটা মানুষের মতো নই। আমি জানি উদারতাই হচ্ছে বন্ধুত্বের মূল কথা। আর তা ছাড়া, আমার একটা নতুন ঠেলাগাড়ি রয়েছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি ওটা তোমাকে দেব।

খুদে চেহারার হ্যানস-এর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সে বলল—সত্যিই বড়ো উদার তুমি। বাড়িতে আমার কিছু কাঠের তক্তা রয়েছে। ওগুলি দিয়ে কম খরচেই আমি ওটা সারিয়ে নিতে পারব।

মিলার বলল—কী বললে! কাঠের তক্তা। আরে, আমার গোলার ছাদের জন্যে ঠিক ওইগুলিই

তো আমার চাই। ছাদে একটা বিরাট গর্ত হয়েছে। সেই গর্তটা বোজাতে না পারলে বৃষ্টির জলে আমার সব শস্য নষ্ট হয়ে যাবে। কী সৌভাগ্য যে তুমি খবরটা দিলে! একটা সৎকাজের ইঙ্গিত আর একটা সৎকাজের সংবাদ কী করে দেয় এইটাই হল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমি তোমাকে আমার ঠেলাগাড়ি দিয়েছি; তুমি আমাকে তোমার তক্তা দাও। অবশ্য তক্তার চেয়ে ঠেলাগাড়ির দাম অনেক বেশি। কিন্তু সত্যিকার বন্ধুত্ব কোনোদিন দর কষাকষি করে না। অনুগ্রহ করে ওগুলি আমাকে দাও; আমি এখনই কাজ শুরু করে দিই।

নিশ্চয়—নিশ্চয়—এই বলে হ্যানস দৌড়ে গিয়ে তক্তাগুলি টেনে আনল।

সেই দিকে তাকিয়ে মিলার বলল—তক্তা তো বেশ বড়ো নয় হে। ভয় হচ্ছে আমার চাল সারানোর পরে এমন কিছু তক্তা বাঁচবে না যা দিয়ে তোমার ঠেলাগাড়ি সারানো চলবে। অবশ্য তার জন্যে আমি দায়ী নই। এখন আমি তোমাকে আমার ঠেলাগাড়িটা দিয়ে দিলাম। তারই প্রতিদানে নিশ্চয় তুমি আমাকে কিছু ফুল দেবে। এই নাও ঝুড়ি; ওটা ভর্তি করে দিতে ভুলো না যেন।

একটু দুঃখিত হয়ে হ্যানস জিজ্ঞাসা করল—ভর্তি?

সে জানত অতবড়ো ঝুড়ি ভর্তি করতে গেলে বাগানে তার আর কোনো ফুলই থাকবে না; অথচ তার রুপোর বোতামটা ফিরিয়ে আনার জন্যে ফুল নিয়ে তখনই বাজারে যাওয়া চাই।

মিলার বলল—তোমাকে আমি ঠেলাগাড়িটা দিয়ে দিলাম। তার বদলে কয়েকটা ফুল চাওয়াটা এমন কিছু বেশি নয়। আমার হয়তো ভুল হয়েছিল। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সত্যিকার বন্ধুত্বের মধ্যে দেনা-পাওনার ব্যাপারটা একেবারেই গৌণ।

খুদে হ্যানস বলল—প্রিয় বন্ধু, নিয়ে যাও আমার বাগানের সব ফুল। আমার রুপোর বোতামের চেয়ে তোমার উপদেশ অনেক বেশি মূল্যবান।

এই বলে সে সেই বিরাট ঝুড়ি নিয়ে ফুলে সেটা বোঝাই করে দিল।

বিদায় হ্যানস—এক কাঁদে তক্তা আর এক হাতে ঝুড়িটা নিয়ে মিলার বিদায় নিল।

পরের দিন সে যখন বাগানে কাজ করছিল এমন সময় পিঠে বিরাট একটা ময়দার বোঝা নিয়ে মিলার তার বাগানের ধারে এসে হাজির হল, বলল—প্রিয় হ্যানস, এই বোঝাটা আমার হয়ে তুমি একটু বাজারে বয়ে নিয়ে যাবে?

হ্যানস বলল—সত্যিই আমি খুব দুঃখিত। আজ আমার অনেক কাজ রয়েছে বাগানে।

মিলার বলল—সত্যিই আমাকে অবাক করলে। তোমায় ঠেলাগাড়িটা দেব এই কথা শুনেও কি এটুকু কাজ না করাটা তোমার পক্ষে অবন্ধুর কাজ করা হবে না?

হ্যানস চিৎকার করে বলল—আর ওকথা বলো না। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও আমি অবন্ধুর মতো কাজ করব না। চল।

দিনটা সত্যিই গরম ছিল। শুধু যে ভীষণ গরম তাই নয় একেবারে ধুলোতে ভর্তি। কিছুটা গিয়েই সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে বিশ্রামের জন্য তাকে বসে পড়তে হল। তা সত্ত্বেও সে

বীরত্বের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে একসময় বাজারে পৌঁছল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে বেশ ভালো দামে সে ময়দা বিক্রি করে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরল; কারণ তার ভয় হল রাত হয়ে গেলে পথে সে দস্যুদের কবলে পড়তে পারে।

ঘুমোতে যাওয়ার সময় খুদে হ্যানস নিজের মনে-মনেই বলল—আজ সারা দিনটাই খুব পরিশ্রম হয়েছে। কিন্তু মিলারের কাজ করতে আমি যে অস্বীকার করিনি সেটা ভালোই হয়েছে, কারণ, মিলারই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তাছাড়া সে আমাকে তার ঠেলাগাড়িটা দেবে বলেছে।

পরের দিন খুব ভোরেই ময়দার দাম নেওয়ার জন্যে মিলার তার বাড়িতে এসে হাজির হল; কিন্তু ক্লান্ত হ্যানস তখনো বিছানা থেকে ওঠেনি।

মিলার বলল—তুমি বড়োই অলস হয়ে উঠছ। সত্যি বলতে কি, তোমায় আমি আমার ঠেলাগাড়িটা দেব বলেছি। বিশেষ করে সেই জন্যেই তোমার কঠোর পরিশ্রম করা উচিত। আলস্য হচ্ছে মহা পাপ। আমার বন্ধুরা কেউ অলস হোক তা আমি চাই নে। স্পষ্ট কথা বলছি বলে কিছু মনে করো না। তোমাকে যদি বন্ধু বলে না ভাবতাম তাহলে এসব কথা বলার চিন্তাও আমি করতাম না। কিন্তি মনের কথাটা প্রকাশ করে যদি বলতেই না পারলাম তাহলে বন্ধু হয়ে আর কী লাভ আমার? ইত্যাদি ইত্যাদি।

চোখ রগড়াতে খুদে হ্যানস বিছানায় উঠে বসে বলল—সত্যিই বড়ো দুঃখিত; কিন্তু গতকাল আমি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ভাবলাম আজ একটু বেশিক্ষণ শুয়ে থেকে পাখির গান শুনব। পাখির গান শোনার পরে আমার কাজ করার শক্তি অনেক বেড়ে যায় তা কি তুমি জান?

খুদে হ্যানস-এর পিঠে চাপড় দিয়ে মিলার বলল—তোমার কথা শুনে খুশি হলাম। তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে আমার মিল-এ এস। ছাতাটা সারিয়ে দিতে হবে।

ফুলগাছ দু'দিন জল পায়নি; বেচারা হ্যানস-এর তাড়াতাড়ি বাগানে যাওয়া দরকার; যে এমন সৎ বন্ধু যে মিলারকে নিরাশ করতে তার ইচ্ছে যাচ্ছিল না।

একটু লজ্জিতভাবে সে বলল—আজ আমি ব্যস্ত রয়েছি। না গেলে কি কিছু মনে করবে?

মিলার বলল—এ কী বলছ! তোমাকে আমি ঠেলাগাড়িটা দেব বলছি। তারপরে একাজটা করে দেওয়ার জন্যে তোমাকে কিছু বলারই আমার দরকার রয়েছে বলে ভাবিনি। কিন্তু যদি তুমি যেতে অস্বীকার কর তাহলে অগত্যা নিজেই করে নেব।

হ্যানস তাড়াতাড়ি বলল—না, না। আমি এখনই যাচ্ছি।

এই বলেই সে লাফিয়ে উঠে জামাকাপড় পরতে এগিয়ে গেল।

মিলার উৎসাহিত হয়ে বলল—অপরের কাজ করে দেওয়ার মতো নয়নাভিরাম কাজ আর নেই।

সারাদিন কাজ করার পর সন্ধের সময় বিশ্রাম নিতে-নিতে আর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হানস বলল—তুমি যা বল তা শোনা পরম উপাদেয়। কিন্তু তোমার এই সুন্দর আদর্শের কথা

কোনোদিনই যে আমার মাথায় আসবে আমি ভাবতে পারিনি।

মিলার সাহস দিয়ে বলল—আসবে, আসবে, কিন্তু আরো কষ্ট করতে হবে তোমাকে। বন্ধুত্ব কাকে বলে তা শিখতে এইতো সবে শুরু করেছ। একদিন আসবে যখন সব বুঝতে পারবে তুমি।

পারব? সত্যি বলছ?

নিঃসন্দেহে। কিন্তু আজ তুমি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। কাল সকালে আমার মেষগুলোকে চরাতে নিয়ে যেতে হবে।

বেচারা হ্যানস এর প্রতিবাদ করতে ভয় পেল। পরের দিন সকালেই মিলার তার একপাল মেষ নিয়ে হাজির হল তার বাগানের ধারে। সেই পাল নিয়ে হ্যানস ছুটল পাহাড়ের ওপরে। সারাদিন মেষ চরিয়ে ফিরে এল সন্ধেবেলায়; কিন্তু তখন সে এত ক্লান্ত যে চেয়ারে বসেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল হওয়ার আগে আর তার ঘুম ভাঙেনি।

আজ বাগানে কাজ করে আমি বেশ আনন্দ পাব—এই কথা বলে সে তক্ষুনি বাগানে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু তার বন্ধু মিলার প্রায়ই তার বাগানে এসে নানা কাজে তাকে ডেকে নিয়ে যেতে লাগল; ফলে মন দিয়ে সে বাগানে কাজ করার সময় পেল না। এই জন্যে মাঝে মাঝে সে মনে বড়ো কষ্ট পেত; কিন্তু এই ভেবে নিজেকে সে সান্ত্বনা দিতে চাইত যে মিলার তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। মিলারের সব ভালো-ভালো কথাগুলি সে একটা খাতায় টুকে নিয়ে প্রতিদিন রাত্রিতে সে সেগুলি পড়ত।

একদিন সন্ধেবেলায় খুদে হ্যানস ঘরের মধ্যে বসে-বসে আরাম করে আগুন পোয়াচ্ছিল এমন সময় দরজায় বেশ জোরে-জোরে কে যেন আঘাত করল। রাত্রিটা ছিল ঝড়ো; বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়ের দাপাদাপি চলেছে। সে ভাবল ওই ঝড়ই তার কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু তারপরেই আবার একটা ধাক্কা এল, তারপরে আবার, আবার। আর প্রতিটি ধাক্কাই আগের ধাক্কার চেয়ে বেশি জোরাল।

নিশ্চয় কোনো হতভাগ্য পথিক—এই মনে করে সে দৌড়ে এসে খিল খুলে দিল। দেখল একটা লন্ঠন আর লাঠি নিয়ে মিলার দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চেঁচিয়ে বলল মিলার—প্রিয় হ্যানস, আমি বড়োই বিপদে পড়েছি। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আমার বাচ্চা ছেলেটা খুব চোট খেয়েছে। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। কিন্তু তিনি এত দূরে থাকেন, আর রাত্রিটা এত খারাপ যে হঠাৎ আমার মনে হল তোমাকে ডাক্তারের বাড়ি পাঠানোটাই সব দিক থেকে ভালো হবে। তুমি জান তোমাকে আমার ঠেলাগাড়িটা দান করছি। সেই দিক থেকে এটাই সঙ্গত যে প্রতিদানে তুমি আমার এই কাজটা করে দেবে।

হ্যানস উৎসাহিত হয়ে বলল—নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি যে এসেছ এতে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করছি। আমি এখনই যাচ্ছি। কিন্তু তোমার ওই লন্ঠনটা দাও—কারণ রাত্রিটা বড়ো অন্ধকার—আলোর অভাবে আমি হয়তো খানায় পড়ে যেতে পারি।

মিলার বলল—খুবই দুঃখিত। এটা এইমাত্র কিনেছি কিনা! এটার কিছু হলে আমার অনেক

ক্ষতি হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি অন্ধকারেই বেরিয়ে যাচ্ছি।

এই বলেই সে ঝড়ের রাতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

ওঃ! কী ভীষণ রাত! এত অন্ধকার যে তার পক্ষে পথ চেনা দায় হয়ে উঠল, এত ঝড়ের দাপাদাপি যে রাস্তায় পা ফেলাই দায়। যাই হোক, দুঃসাহসী ছিল বলেই হয়তো প্রায় ঘন্টা তিনেক ঝড় আর অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করে সে ডাক্তারের বাসায় এসে হাজির হল এবং দরজায় করাঘাত করল।

শোওয়ার ঘরের জানালার ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—কে?

খুদে হ্যানস, ডাক্তার।

কী চাই?

মিলারের ছোটো ছেলেটা সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে চোট খেয়েছে; সে আপনাকে এক্ষুনি যেতে বলেছে।

'ঠিক আছে,'—এই বলে ডাক্তার সাজপোশাক করে লন্ঠন নিয়ে গাড়িতে চেপে তক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন মিলারের বাড়ির দিকে। আর তারই পিছু পিছু বেচারা হ্যানস চলতে লাগল হেঁটে-হেঁটে।

কিন্তু ঝড়ের দাপাদাপি বাড়তে লাগল; শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। কোন দিকে যাচ্ছে হ্যানস-এর পক্ষে তা বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল; গাড়ির সঙ্গেও আর সে তাল দিয়ে চলতে পারল না। তারপরে একসময় সে পথ হারিয়ে ফেলে সোজা জনবিরল মাঠের চারপাশে ঘুরতে লাগল। জায়গাটা ছিল বিপজ্জনক। খানাখোঁদল আর গভীর জলাশয়ে ভর্তি ছিল জায়গাটা। তাদেরই একটা জায়গায় বেচারা হ্যানস ডুবে মারা গেল। পরের দিন বিরাট একটা জলাশয়ে তার মৃতদেহটাকে ভাসতে দেখল মেষপালকরা। তারপরে তার দেহটাকে তার বাড়িতে বয়ে আনা হল।

খুদে হ্যানসকে ভালোবাসত সবাই; সেই জন্যে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সবাই যোগ দিতে এল। মিলারই হল সেই ক্রিয়ার প্রধান পাণ্ডা।

মিলার বলল—আমিই ছিলাম তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু; তাই আমারই উচিত এই সভার সবচেয়ে ভালো স্থানটি দখল করা।

এই বলে গায়ে কালো পোশাক চড়িয়ে, কালো রুমালে মাঝে-মাঝে চোখের জল মুছতে-মুছতে সে শোকযাত্রার পুরোভাগে চলতে শুরু করল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষে সরাইখানায় আরামের সঙ্গে বসে মশলা দেওয়া মদ আর মিষ্টি কেক খেতে-খেতে কামার বলল—খুদে হ্যানস-এর মৃত্যু প্রত্যেকের কাছে একটা ক্ষতি।

মিলার বলল—অন্য কারো কথা জানি নে; কিন্তু তার মৃত্যু আমার কাছে নিঃসংশয়ে বিরাট একটা ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়। সে আমার এত প্রিয় বন্ধু ছিল যে তাকে আমার ঠেলাগাড়ি

আর একটু হলে দানই করে ফেলতাম। এখন সেটাকে নিয়ে আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না। সেটা বাড়িতে ফেলে রাখতে আমার অসুবিধে হচ্ছে। তার অবস্থা এতই খারাপ যে এমন অবস্থায় বিক্রি করেও বিশেষ কিছু ঘরে আসবে না। এর পরে আর কাউকে যাতে কিছু দেওয়ার বাসনা আমার না হয় সেদিক থেকে খুব সতর্ক হতে হবে। উদার হতে গেলে মানুষকে দুঃখ পেতেই হয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে জলের ইঁদুর বলল—মানে?

লিনেট বলল—মানে, এইখানেই আমার গল্প শেষ।

জলের ইঁদুর জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু মিলারের শেষ পর্যন্ত কী হল?

লিনেট বলল—তা আমি জানি নে; আর জানারও ইচ্ছে নেই।

জলের ইঁদুর বলল—এতেই বোঝা যাচ্ছে তোমার চরিত্রে সহানুভূতি বলে কোনো পদার্থ নেই।

লিনেট বলল—এই গল্পের নীতিটা কী তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ না।

জলের ইঁদুর প্রায় গোঙিয়ে উঠল—কী—কী বললে!

নীতি।

তুমি বলতে চাও গল্পটার একটা নীতি রয়েছে?

নিশ্চয়।

রাগে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে ইঁদুর বলল—বটে, বটে! সেকথা শুরু করার আগে তুমি আমাকে বলনি কেন? তা যদি বলতে তাহলে তোমার এ গল্প আমি শুনতামই না। সত্যি কথা বলতে কি সেই সমালোচকের মতো আমি শুধু বলতাম—পুঃ।

এই বলে গভীর বীতশ্রদ্ধায় ল্যাজ নাড়িয়ে একটা চকিত শব্দ করে সে তার গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল।

কয়েক মিনিট পরে সাঁতার কাটতে কাটতে ফিরে এসে হাঁসটা জিজ্ঞাসা করল জলের ইঁদুরকে—কেমন লাগল তোমার? ওর সত্যিই কিছু ভালো বক্তব্য রয়েছে; কিন্তু আমি হচ্ছি মা; মা-এর অনুভূতি রয়েছে আমার মধ্যে। যারা চিরকুমার তাদের দিকে চোখের জল না ফেলে আমি তাকাতে পারি নে।

লিনেট বলল—মনে হচ্ছে আমি তাকে বিরক্ত করেছি। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে আমি তাকে এমন একটি গল্প বলেছিলাম যার মধ্যে একটা নীতি রয়েছে।

হাঁসটা বলল—তাই বুঝি! ওটাই সর্বক্ষেত্রে বিপজ্জনক।

এবং তার সঙ্গে আমিও একমত।

রহস্যহীনা মহিলা
The Sphinx Without a Secret

কোনো এক অপরাহ্ণে কাফে দি লা পেইক-এর বাইরে বসে পারস্যের বিলাসবহুল আর দুঃখভারাক্রান্ত জীবনযাত্রার মিছিল দেখছিলাম, আর মদের গ্লাস মুখে নিয়ে অবাক হয়ে ভেবেছিলাম কেমন করে দম্ভ আর দারিদ্র্য এভাবে পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখতে পারে। এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। পেছন ফিরে দেখি লর্ড মার্চিশন। কলেজ ছাড়ার পরে আর আমাদের দেখা হয়নি; সেও প্রায় বছর দশেক হবে। তার সঙ্গে দেখা হতেই আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম; করমর্দন করলাম দুজনে। অক্সফোর্ডে আমাদের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব ছিল। মানুষটি দেখতে সুন্দর, সাহসী, আর সম্ভ্রান্ত। তাকে আমার খুবই ভালো লাগত। আমরা সবাই বলাবলি করতাম সব সময় সত্যি কথা না বললে সে যশের শিখরে উঠতে পারবে। আমার ধারণা তাকে যে আমরা অত প্রশংসা করতাম তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সে সব খোলাখুলিই বলত। সেদিন দেখলাম তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কেমন যেন উদ্বিগ্ন হতচকিত দেখাচ্ছে তাকে। কোনো একটা বিষয়ে তার যেন একটা সন্দেহ জেগেছে। আমার মনে হল এর পেছনে আধুনিক নৈরাশ্যবাদ নেই। সেই জন্যেই আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে নিশ্চয় কোনো নারীঘটিত ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়েছে। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বিয়ে করেছ?

সে বলল—মেয়েদের আমি ভালোভাবে বুঝতেই পারি নে।

বললান—বৎস জিরাল্ড, মেয়েদের জন্মই হয়েছে ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে, বোঝার জন্যে নয়।

যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি নে তাকে আমি ভালোবাসতে পারি নে।

বললাম—তোমার জীবনে নিশ্চয় কোনো রহস্য রয়েছে, জিরাল্ড। আমাকে সব খুলে বল।

সে বলল—চল, মোটরে করে একটু বেরিয়ে পড়ি। এই জায়গাটি বড়োই জনবহুল। না-না ওই গাড়িটা নয়—অন্য রঙের কোনো গাড়ি নাও।—ওই ওখানে যে ঘন সবুজ একটা গাড়ি রয়েছে—ওতেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বুলেভার্ডের পাশ দিয়ে মেদেলিনের দিকে ছুটতে লাগলাম।

কোথায় যাবে?

সে বলল—যেদিকে তোমার ইচ্ছে। বয়-এর কোনো রেস্তোরাঁয় চল। সেখানে ডিনার খেয়ে তোমার কাহিনি বলবে।

বললাম—তোমার কাহিনি আমি প্রথম শুনতে চাই। তোমার গোপন কথাটা কি বল।

রুপোর ঢাকনি দেওয়া একটা মরক্কো চামড়ার ব্যাগ বার করে সেটি সে আমার হাতে দিল। খুলে দেখলাম তার ভেতরে একটি মহিলার ফটো রয়েছে। মহিলাটি দীর্ঘাঙ্গিনী, ক্ষীণতন্বী; তাঁর সেই ভাষা-ভাষা চোখ আর খোলা চুলে অপরূপা দেখাচ্ছিল তাঁকে। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের; দামি পশমে ঢাকা ছিল তাঁর দেহ।

সে বলল—মুখটা দেখে কী মনে হয় তোমার? সত্যবাদিনী?

বেশ ভালোভাবেই পরীক্ষা করলাম আমি। মনে হল এ মহিলার মধ্যে কোনো গাপন রহস্য রয়েছে; কিন্তু সেটা ভালো কি মন্দ তা আমি বুঝতে পারলাম না তাঁর সৌন্দর্য অনেক রহস্য মিশিয়ে অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক; বাস্তব নয়; এবং তাঁর ঠোঁটের ওপরে হাসির যে মৃদু রশ্মিটি ছড়িয়ে পড়েছে সেটি অনেক গভীর, সত্যিকার মিষ্টি বলে চিহ্নিত হওয়ার পথে যথেষ্ট বাধা রয়েছে তার।

সে একটু অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল—কী দেখছ বল?

বললাম—রহস্যময়ী রমণী। এঁর সম্বন্ধে সব কথা আমাকে বল।

সে বলল—ডিনারের পরে।

ডিনার শেষ হলে হোটেলের চাকর যখন কফি আর সিগারেট দিয়ে গেল তখনই আমি জিরাল্ডকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। চেয়ার থেকে উঠে ঘরময় দু'চার বার পায়চারি করে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়ল সে; তারপরে বলে গেল তার কাহিনি—

একদিন বিকেলে পাঁচটার সময় বন্‌ড স্ট্রিটের দিকে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। রাস্তার ওপরে একটা দুর্ঘটনা ঘটার ফলে চারপাশের সব গাড়িই জটলা পাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ফুটপাতের একেবারে ধারে হলদে রঙের একটা ব্রোহাম দাঁড়িয়েছিল। কী জানি কেন তার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সেই গাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মুখ তার ভেতর থেকে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এল। যে মুখটি এইমাত্র তুমি দেখলে সেটি হচ্ছে সেই মুখ। দেখামাত্র আমি চমকে উঠলাম। সারা রাত্রি আর তার পরের সারাটা দিনই সেই মুখটির কথা আমি ভাবতে লাগলাম। সেই পথের ধারে ধারে আমি অনেকবার আসা-যাওয়া করলাম, প্রতিটি গাড়ির ভেতরে দেখলাম, সেই হলদে রঙের ব্রোহামটি দেখতে পাব আশা করলাম; কিন্তু আমার সেই অজ্ঞাতনামা সুন্দরীর দেখা আর পেলাম না। ভাবতে লাগলাম তাঁকে আমি স্বপ্নেই দেখেছি। প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে মাদাম দি রাসটেল-এর সঙ্গে ডিনার খাওয়ার আমার একদিন আমন্ত্রণ ছিল। সময় ছিল রাত্রি আটটা, কিন্তু সাড়ে আটটা বেজে গেল। তখনো আমরা বসার ঘরে বসে রয়েছি। এমন সময় দরজা খুলে দিয়ে চাকরটি জানাল যে লেডি অ্যালবয় উপস্থিত হয়েছেন। এই মহিলাটিকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে এলেন তিনি। আমার সবচেয়ে আনন্দ হল যখন তাঁকে ডিনারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মাদাম আমাকেই নির্দেশ দিলেন। খেতে বসার পরে নিরপরাধ মন্তব্য করলাম আমি—লেডি অ্যালবয়, মনে হচ্ছে দিন কয়েক আগে বন্‌ড স্ট্রিটে আপনাকে একবার আমি দেখেছিলাম। হঠাৎ কেমন যেন ম্লান হয়ে গেলেন তিনি; আমাকে নীচু গলায়

বললেন—অনুগ্রহ করে এত জোর কথা বলবেন না। অন্য কেউ শুনতে পেতে পারে। শুরুতেই এই ধরনের মন্তব্য শুনে আমি একটু দুঃখিত হলাম। তারপরেই মরিয়া হয়ে ফরাসি নাটকের আলোচনায় মেতে উঠলাম। তিনি কথা বললেন কমই; যেটুকু বললেন তাও শুনতে লাগল মৃদু গুঞ্জনের মতো। মনে হল, কেউ পাছে তাঁর কথা শুনতে পায় এই ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত। সত্যি কথা বলতে কি নিতান্ত মূর্খের মতোই আমি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম। তাঁর চারপাশের রহস্য আমার কৌতূহলকে আরো বাড়িয়ে দিল। ডিনার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যখন উঠে পড়লেন তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমি কি তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি? তিনি একটু ইতস্তত করলেন, তাঁর কথা কেউ শুনছে নাকি চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখলেন; তারপরে বললেন—আসুন, কাল বিকেল পৌনে পাঁচটার সময়।

তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যে মাদামকে আমি অনুরোধ করলাম। কিন্তু যেটুকু সংবাদ পেলাম তা হচ্ছে এই যে ভদ্রমহিলা বিধবা, এবং পার্কলেনের একটি সুন্দর বাড়িতে তিনি বাস করেন। এই শুনে বাড়ি ফিরে এলাম আমি।

পরের দিন যথাসময়ে আমি তাঁর বাড়িতে হাজির হলাম; কিন্তু তাঁর বাটলার আমাকে জানাল যে তিনি সেইমাত্র বেরিয়ে গিয়েছেন। খুব দুঃখ আর বিভ্রান্তির সঙ্গে আমি ক্লাবে চলে গেলাম; তারপরে অনেক ভেবেচিন্তে একটা চিঠি দিয়ে জানতে চাইলাম অন্য কোনো বিকালে তাঁর ওখানে আমি যেতে পারি কিনা। কয়েক দিন তার কোনো উত্তর এল না। তারপরে ছোটো একটা চিরকুট এল একদিন। তাতে লেখা ছিল যে রবিবার বেলা চারটের সময় তিনি বাড়িতে থাকবেন। সেই সঙ্গে ছিল অদ্ভুত একটি পুনশ্চ—অনুগ্রহ করে এই ঠিকানায় আর আমাকে চিঠি পাঠাবেন না। দেখা হলে এর কারণটা আমি আপনাকে জানাব। রবিবার দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে সাদরেই অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু আমি যখন উঠে আসছি সেই সময় তিনি বিনীতভাবে আমাকে বললেন—যদি কোনোদিন আমাকে চিঠি দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আমার এই ঠিকানা দেবেন—মিসেস নক্স, কেয়ার অফ হুইটাকার লাইব্রেরি, গ্রিন স্ট্রিট। আমার বাড়িতে আমার নামে কোনো চিঠিপত্র আসতে দিতে যে আমি চাইনে তার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে।

তারপরে অনেক দিনই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে; কিন্তু কোনো দিনই তাঁর রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত হয়নি। মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়েছে অন্য কোনো পুরুষের কবলে পড়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে আসা যে কোনো মানুষের পক্ষেই এতই কষ্টসাধ্য ছিল যে সেরকম কোনো সম্ভাবনাকে আমি আমল দিতে পারিনি। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সমাধানে আসা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল—কখনো তাঁকে মনে হত পরিষ্কার ঝরঝরে, আবার কখনো মনে হত দারুণ অস্পষ্ট। শেষকালে একদিন আমি মনস্থির করে ফেললাম—তাঁকে আমার স্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেব। লাইব্রেরির ঠিকানায় তাঁকে একটি পত্র দিলাম আমি—পরের সোমবার ছ'টায় সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে কিনা জানতে চাইলাম। রাজি হলেন তিনি। চিঠি পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। আমি তাঁকে দেখে পাগল হয়েছিলাম। রহস্যময়ী তখনকার তাঁকে দেখে তো বটেই—এবং এখনো। ওই রহস্যটাই আমাকে অস্থির করে তুলেছিল, উন্মত্ত করেছিল আমাকে। হঠাৎ তাঁর চলার পথে আমি এসে দাঁড়ালাম কেন?

জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে তুমি তা আবিষ্কার করতে পেরেছিলে?

সে বলল—মনে হচ্ছে যেন। তুমিই তা বিচার করে দেখ।

সোমবার দিন কাকার সাথে আমি লাঞ্চ খেতে গিয়েছিলাম। চারটে নাগাদ আমি মেরিলিবোন স্ট্রিটে এসে দাঁড়ালাম। তুমি বোধ হয় জান আমার কাকার বাড়ি হচ্ছে রিজেন্ট পার্কে। আমার যাওয়ার কথা পিকাডেলিতে। অনেক নোংরা ছোটো রাস্তা দিয়ে পথটা সংক্ষেপ করার জন্যে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। হঠাৎ দেখলাম কালো ঘোমটার মুখ ঢেকে আমার সামনে দিয়ে লেডি অ্যালবয় হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তাটার শেষ বাড়ির কাছে এসে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। একটা ল্যাচ-কী বার করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। দেখে মনে হল বাড়িটা হচ্ছে ভাড়াটেদের। মনে-মনে বললাম—রহস্যটা এইখানে। দরজার কাছে দেখি তাঁর রুমালটা পড়ে রয়েছে। আমি সেটা তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম। তারপরে কী করা উচিত সেইটাই ভাবতে লাগলাম আমি। পরিশেষে আমি এই সমাধানে এলাম যে তাঁর ওপরে গোয়ান্দাগিরি করার কোনো অধিকার আমার নেই। এই ভেবে ক্লাবে গেলাম। সেখান থেকে ছ'টার সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সোফার ওপরে বসেছিলেন তিনি। সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। তিনি বললেন—আপনাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি। সারাদিনই আমি বাড়ি থেকে বেরোইনি।

কথাটা শুনে অবাক হয়ে তাঁর দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। তারপরে, পকেট থেকে রুমালটা বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বললাম—আজ বিকালে কুমনর স্ট্রিটে আপনি এটা ফেলে গিয়েছিলেন।

শান্তভাবেই কথাটা বললাম আমি। আমার দিকে বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি; কিন্তু রুমালটা নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করলেন না। জিজ্ঞাসা করলাম—ওখানে গিয়েছিলে কেন? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ওই প্রশ্ন করার আপনার অধিকার কী? আমি বললাম—তোমাকে আমি ভালোবাসি—আমার অধিকার সেইটুকু। আমাকে তুমি বিয়ে কর এই প্রস্তাব নিয়েই আমি আজ এসেছি। এই শুনে দু'হাতে মুখ ঢেকে তিনি হু-হু করে কেঁদে ফেললেন।

আমি বললাম—আমাকে বলতেই হবে সব কথা।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—লর্ড মার্চিশন, আপনাকে বলার মতো কিছুই আমার নেই

আমি চিৎকার করে উঠলাম—নিশ্চয় তুমি কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। এইটাই তোমার রহস্য।

হঠাৎ কেমন যেন সাদা হয়ে গেলেন তিনি; বললেন—কারো সঙ্গে দেখা করতে আমি যাইনি।

তুমি কি সত্যি কথা বলতে পার না?

আমি সত্যি কথাই বলছি।

উন্মত্ত হয়ে উঠলাম আমি। সেদিন কী যে বলেছিলাম তা আমার মনে নেই। তবে নিশ্চয় কিছু ভয়ঙ্কর কথা। শেষকালে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। পরের দিনই তিনি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। সে চিঠি না খুলেই আমি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপরেই আমি অ্যালেন কোলভিলের সঙ্গে নরওয়ের দিকে চলে গেলাম। মাসখানেক পরে ফিরে এসেই মর্নিং পোস্ট-এ পড়লাম যে লেডি অ্যালবয় মারা গিয়েছেন। অপেরায় যাওয়ার ফলে তাঁর ঠান্ডা লেগেছিল; তারই ফলে ফুসফুস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। খবরটা পেয়েই ঘরের মধ্যে নিজেকে আমি পুরে রাখলাম। কারো সঙ্গে দেখা করলাম না। আমি তাঁকে খুব ভালোবাসতাম। হা ঈশ্বর! তাঁকে আমি এত ভালোবাসলাম কেমন করে?

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি সেই রাস্তায়, সেই বাড়িতে আর গিয়েছিলে?

সে বলল—হ্যাঁ। একদিন আমি কুমনর স্ট্রিটে গিয়েছিলাম। না গিয়ে পারিনি। একটা সন্দেহ আমাকে কেবলই পীড়া দিচ্ছিল। দরজার ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা দরজা খুলে দিলেন। ভাড়া দেওয়ার জন্যে তাঁর কোনো ঘর খালি রয়েছে কিনা আমি তা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন—সম্ভবত ড্রয়িং রুমটা ভাড়া দেওয়া চলতে পারে। যে ভদ্রমহিলা ওইটা ভাড়া নিয়েছিলেন তাঁকে তিন মাস আমি দেখতে পাইনি। তাঁর কাছে তিন মাসের ভাড়া আমার বাকি রয়েছে। সেটা আপনি নিতে পারেন।

তাঁর ফটোটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ইনিই কি তিনি?

তিনি চিৎকার করে বললেন—ঠিক, ঠিক। তিনি কবে ফিরছেন স্যার?

বললাম—তিনি মারা গিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন—কী বলছেন? তিনি ছিলেন আমার সেরা ভাড়াটে। মাঝে-মাঝে এখানে এসে বসার জন্যে তিনি আমাকে সপ্তাহ তিন গিনি করে দিতেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—আর কেউ কি এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত?

তিনি আমাকে নিশ্চিত করে বললেন—কেউ আসত না—একটি প্রাণীও নয়।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে তিনি এখানে এসে করতেন কী?

তিনি বললেন—চুপচাপ বসে বই পড়তেন। মাঝে-মাঝে চা খেতেন।

কী যে বলব তা আমি বুঝতে পারলাম না। একটা সভারেন তাঁর হাতে দিয়ে আমি ফিরে এলাম। এখন বল তো, এসবের অর্থ কী? তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস কর না যে মহিলাটি আমাকে সত্যি কথা বলেছেন?

বিশ্বাস করি।

তাহলে লেডি অ্যালবয় সেখানে যেতেন কেন?

প্রিয় জিরালড, লেডি অ্যালবয়-এর রহস্যের ওপরে একটা ঝোঁক ছিল, ওই যাকে তোমরা বল বাতিক। মাথায় ঘোমটা দিয়ে তিনি ওখানে যেতেন—নিজেকে সেই রহস্যের একটি নায়িকা বলে মনে করতেন। গোপন রহস্যের প্রতি তাঁর একটা উদ্দাম কৌতূহল ছিল; কিন্তু নিজের রহস্য বলতে কিছু ছিল না।

তুমি কি সত্যিই তা মনে কর?

সত্যই মনে করি।

মরোক্কোর ব্যাগটা খুলে সেই ফটোটার দিকে সে চেয়ে রইল—তারপর শেষকালে বলল—অবাক কাণ্ড!

পরমাশ্চর্য রকেট
The Remarkable Rocket

রাজপুত্রের বিয়ে হবে। চারপাশে আনন্দের বান ডেকেছে। রাজপুত্র তাঁর কনের জন্য সারাটা বছর অপেক্ষা করেছেন। অবশেষে রাজকন্যা উপস্থিত হয়েছেন। ইনি হচ্ছেন রাশিয়ান রাজকন্যা। ছটি বল্গা-হরিণের টানা স্লেজ গাড়িতে চেপে ফিনল্যান্ড থেকে সারা পথটা তিনি এসেছেন। গাড়িটাকে বিরাট একটা সোনালি হাঁসের মতো করে সাজানো হয়েছিল; রাজকুমারী বসেছিলেন সেই হাঁসের দুটি ডানার মধ্যে। আরমিনের লোম দিয়ে তৈরি ঢিলে জামাটা তাঁর পা পর্যন্ত ছিল ঝোলানো। তাঁর মাথার উপরে ছিল রুপোর সুতো দিয়ে তৈরি করা ছোটো একটা টুপি। বরফের প্রাসাদেই চিরকাল তিনি বাস করতেন বলেই রঙটাও তাঁর ওই বরফের মতোই শ্বেতাভ হয়ে উঠেছিল। তাঁকে এতই বিবর্ণ দেখাচ্ছিল যে রাস্তা দিয়ে আসার সময় মানুষরা সব অবাক হয়ে তাকিয়ে বলছিল—'আরে, ইনি যে একটি শ্বেত গোলাপ দেখছি।' এই বলে জানালা থেকে তাঁর ওপরে ফুল ছুঁড়ে দিয়েছিল।

দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য রাজকুমার অপেক্ষা করছিলেন। তিনি রাজকন্যার হাতে চুম্বন করে বললেন—তোমার ছবিটি বড়ো সুন্দর; কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর তুমি।

একটি যুবক ভৃত্য তার প্রতিবেশীকে বলল—রাজকন্যা আগে শ্বেত গোলাপের মতো দেখতে ছিলেন; এখন তিনি দেখতে হয়েছেন রক্ত গোলাপের মতো।

এই কথা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠল সবাই।

পরের দিন লোকের মুখে কেবল ওই দুটি কথা—'শ্বেত গোলাপ, রক্ত গোলাপ, রক্ত গোলাপ, শ্বেত গোলাপ।' রাজা খুশি হয়ে ভৃত্যের মাইনে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন। ভৃত্যটি কোনো মাইনে পেত না বলেই এই বেতন-বৃদ্ধিতে তার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হল না; কিন্তু সবাই এটাকে পরম সম্মানের বস্তু বলে মন করল; রাজপুরীর গেজেটেও সেই সংবাদ প্রকাশিত হল।

তিন দিন পরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। এটা অদ্ভুত একটি আনন্দোৎসব। ছোটো ছোটো মুক্তা দিয়ে খচিত বেগুনে রঙের ভেলভেটের চাঁদোয়ার নীচে দিয়ে সদ্য বিবাহিত দম্পতি পরস্পর হাত ধরাধরি করে বেড়ালেন। তারপরে পাঁচদিন ধরে চলল স্টেট ব্যাংকোয়েট। রাজকুমার আর রাজকুমারী গ্রেট হল-এর শিখরে বসে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পেয়ালার একসঙ্গে মদ্যপান করলেন। কেবলমাত্র আসল প্রেমিক-প্রেমিকারাই এইরকমভাবে একই পাত্র থেকে মদ্য পান করার সৌভাগ্য রাখে। যারা তা নয় তাদের ঠোঁটের স্পর্শে পাত্রটা বিবর্ণ হয়ে যায়।

সেই ছোট্ট চেহারার ভৃত্যটি বলল—এঁরা যে পরস্পরকে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসা ওই স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ।

সেই শুনে মহারাজ আবার তার মাইনে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন।

সভাসদেরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—কী সম্মান! কী সম্মান!

ব্যাংকোয়েটের পরে শুরু হল 'বল'। দম্পতিদের সেখানে গোলাপ নৃত্য দেখানোর কথা। মহারাজ কথা দিলেন সেই নাচে তিনি বাঁশি বাজাবেন। বাজালেন তিনি খুবই জঘন্য; কিন্তু তিনি রাজা। সেকথা তাঁর মুখের ওপরে কে বলবে! সবাই তাই চিৎকার করে বলল—আহা—হা! চমৎকার!

এই কর্মসূচীর সমাপ্তি হচ্ছে বাজি দিয়ে। বিরাট আয়োজন হয়েছে তার। কাঁটায় কাঁটায় রাত্রি বারোটার সময় শুরু হবে এই বাজি ছোঁড়া। রাজকুমারী কোনো দিন আতশবাজির খেলা দেখেননি। তাই মহারাজ হুকুম দিলেন বিয়ের দিন আতশবাজিকের সব সময় উপস্থিত থাকবে।

রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজকুমারী—আতশবাজি কী?

যাকেই প্রশ্ন করা হোক, মহারাজ তার উত্তর দেবেনই। তিনি বললেন—ঠিক সুমেরু-জ্যোতির মতো। তবে এটা হল একটু বেশি স্বাভাবিক। নক্ষত্রগুলি যখন ফুটে ওঠে তখন তাদের তুমি দেখেছ। ব্যক্তিগতভাবে এইসব নক্ষত্রদের চেয়ে আমি আতশবাজিদের বেশি পছন্দ করি; কারণ তা আমার বাঁশি বাজানোর মতোই মধুর, তুমি নিশ্চয়ই তা দেখতে পাবে।

এইজন্যে রাজার উদ্যানের শেষ প্রান্তে বেশ বড়ো একটা মাচা বাঁধা হল। আর রাজা আতশবাজির সব আয়োজন প্রস্তুত করে ফেললেন। সেই সময় বাজিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল।

বাচ্চা পটকাটা বলল—এই পৃথিবীটা সত্যিই বড়ো সুন্দর। ওই হলদে টিউলিপ ফুলগুলিকে দেখ। বাহ্! ওরা যদি সত্যিকারের ক্র্যাকার হত তাহলে কখনই এত সুন্দর হতে পারত না। আমি যে অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি, সেজন্যে আমি খুশি। বিদেশ ভ্রমণই মনকে অদ্ভুত ভাবে উন্নত করে, আর নষ্ট করে দেয় যাবতীয় কুসংস্কার।

বড়ো রোমান ক্যানডাল বলল—ওরে মূর্খ পটকা, রাজার বাগানটা বিশ্ব নয়। বিরাট বিশ্ব হচ্ছে—এটাকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে তোমার তিন দিন লাগবে।

বিষণ্ন ক্যাথারিন হুইল বলল—যে-কোনো জায়গাই তোমার কাছে বিশ্ব।

এই হুইল প্রথম জীবনে একটা বাক্সের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং হৃদয়টা তার ভেঙে যাওয়ার জন্যে সে বেশ গর্বিত। সে বলল—কিন্তু আজকাল প্রেম এমন একটা প্রচলিত রীতিসম্মত নয়। কবিরাই একে জবাই করে ফেলেছে। তারা এই প্রেম নিয়ে এত কথা লিখেছে যে কেউ আর তা বিশ্বাস করতে চায় না। এবং আমি তাতে আশ্চর্যও হই না। সত্যিকার প্রেম দুঃখ পায়; সে কোনো প্রতিবাদ করতে চায় না। আমার একবার বেশ মনে রয়েছে...কিন্তু যাকগে। রোমান্স এখন আমার কাছে অতীতের বস্তু।

রোমান ক্যানডাল বলল—মূর্খ কোথাকার! রোমান্স কোনো দিন মরে না। চাঁদের মতো; চিরকাল ও বেঁচে থাকে।

কিন্তু ক্যাথারিন হুইল নিজের মতে অটুট; সে মাথা নেড়ে বলল—রোমান্স মৃত, মৃত, মৃত।

যারা জানে একটা কথা বারবার বললে তা শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে দাঁড়ায় এ হচ্ছে সেই জাতীয় বস্তু।

হঠাৎ একটা শুকনো তীক্ষ্ণ কাশির আওয়াজ হতেই সবাই সেই দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কাশিটা আসছিল একটা লম্বা উদ্ধত রকেটের কাছ থেকে। রকেটটা একটা লম্বা ছড়ির শেষ কোণে বাঁধা ছিল। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কোনো কিছু বলার আগে সব সময়েই সে কাশে।

সে বলল—আহেম, আহেম—শোন।

শোনার জন্যে সবাই তার দিকে ঘুরে তাকাল—একমাত্র হতভাগ্য ক্যাথারিন হুইল ছাড়া। সে বেচারা তখনো নিজের ঝোঁকে মাথা নেড়ে-নেড়ে বলছে—রোমান্স মরে গিয়েছে, মরে গিয়েছে।

চেঁচিয় উঠল ক্র্যাকার—'অর্ডার! অর্ডার!' তার মেজাজ অনেকটা রাজনীতিবিদদের মতো। স্থানীয় নির্বাচনে সে সব সময় বিশেষ অংশগ্রহণ করেছে। এই সব ক্ষেত্রে কি ধরনের পার্লামেন্টারি রীতি অনুসরণ করা যেতে পার তা সে জানে।

ক্যাথারিন হুইল ফিসফিস করে বলল—'মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে।' এই বলেই সে ঘুমানোর আয়োজন করল।

সবাই চুপচাপ হয়ে গেল। রকেট তৃতীয়বার কেশে শুরু করল তার বক্তৃতা। তার বক্তৃতা অন্যদের ওপরে কী রকম প্রভাব বিস্তার করছে তা জানার জন্যে কথার ফাঁকে-ফাঁকে সে অন্য সকলের ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁচিয়ে দেখতে লাগল। আসল কথাটা হচ্ছে তার ধরনটি সত্যিকারের অভিজাত।

আকাশে যেদিন আমাকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে ঠিক সেইদিন রাজকুমারের বিয়ে। কী ভাগ্যবান তিনি!...কিন্তু রাজকুমাররা চিরকালই সৌভাগ্যবান!

পুঁচকে পটকাটা বলল—যা বাব্বা! আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। রাজকুমারের সম্মানে আমাদেরই ফাটানো হচ্ছে—এই ছিল আমার ধারণা।

রকেট বলল—ওটা তোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। হতে পারে বলছি কেন, হয়েছে; কিন্তু

আমার বিষয়টা স্বতন্ত্র। আমি একটি অত্যাশ্চর্য রকেট; আমার পূর্বপুরুষরাও সত্যিকারের অভিজাত। আমার মা ছিলেন সে-যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্যাথারিন হুইল। সুষম নৃত্যের জন্যে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। যেদিন তিনি প্রকাশ্যে বিরাট নাচের আসরে নামলেন সেদিন তিনি আকাশযাত্রা করার আগে উনিশ বার ঘুরে ঘুরে নেচেছিলেন; তিনি প্রতিবার বাতাসে সাতটি পাটলবর্ণের নক্ষত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কটিদেশের পরিমাণ ছিল সাড়ে তিন ফিট; আর শরীরটা ছিল সেরা গান-পাউডারে তৈরি। আমার বাবাও আমারই মতো রকেট ছিলেন; কিন্তু তাঁর ধমনীতে ছিল ফরাসি রক্ত। তিনি এত উঁচুতে উঠে যেতেন যে লোকেদের ভয় হত আর বুঝি তিনি নামবেন না। কিন্তু তিনি নামতেন; আর নামার সময় সোনালি রঙের বৃষ্টিতে ভরিয়ে দিতেন চারপাশ। খবরের কাগজের সংবাদদাতারা তো মুহ্যমান হয়ে পড়তেন—তাঁর সম্বন্ধে লম্বা লম্বা প্রশস্তি বার করতেন কাগজে। রাজার গেজেটেও বলা হত পলিটেকনিক আর্টের বিজয় অভিযান ছিলেন তিনি।

বেঙ্গল লাইট বলল—কী বললে? ও; পাইরোটেকনিক বলছ বুঝি!

রকেট বেশ রূঢ় কণ্ঠে বলল—আমি বলেছি পলিটেকনিক।

এই শুনে বেঙ্গল লাইট এতই ঘাবড়ে গেল যে সে সঙ্গে-সঙ্গে পুঁচকে পটকাটাতে দাঁত খিঁচোতে লাগল। নইলে, তার যে কিছু মূল্য রয়েছে তা বোঝানো যাবে কেমন করে?

রকেট শুরু করল—আমি বলছিলাম—কী বলছিলাম?

রোমান ক্যানডাল বলল—নিজের কথা বলছিলে।

নিশ্চয় নিশ্চয়। বেশ মনে পড়েছে আমি যখন একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এমন সময় আমাকে অসভ্যের মত বাধা দেওয়া হয়েছিল। আমি এসব আদৌ পছন্দ করি নে; কারণ, বিশ্বের মধ্যে স্পর্শকাতরতার দিক থেকে আমার জোড়া নেই।

রোমান ক্যানডালকে জিজ্ঞাসা করল ক্র্যাকার—স্পর্শকাতর কাকে বলে হে?

রোমান ক্যানডাল নীচু গলায় বলল—যে লোক নিজের পায়ে কড়া হয়েছে বলে ইচ্ছে করে অন্য লোকের পায়ের কড়া মাড়িয়ে দেয়।

এই শুনে আর একটু হলে ক্র্যাকার হো-হো হেসে উঠত। খুব সামলে নিল সে।

রকেট জিজ্ঞাসা করল—তুমি হাসছ কেন? আমি তো হাসছি নে।

ক্র্যাকার বলল—আমি সুখী বলেই হাসছি।

বেশ রাগ করেই রকেট বলল—আচ্ছা স্বার্থপর তো। সুখী হওয়ার কী অধিকার তোমার রয়েছে শুনি? অপরের কথা তোমার চিন্তা করা উচিত, অর্থাৎ, আমার কথাই তোমার চিন্তা করা উচিত। আমি সব সময়েই আমার কথা ভাবি; আমি আশা করি সবাই সেই কাজই করবে। এটা বড়ো সুন্দর গুণ। আমার মধ্যে এই গুণ অনেক পরিমাণে রয়েছে। ধর, আজ রাত্রেই আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে সেটাকে কি তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না! রাজকুমার আর রাজকুমারী কেউ সুখী হবেন না। তাঁদের বিবাহিত জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। মহারাজও এই শোক ভুলতে পারবেন না। সত্যি কথা বলতে কি নিজের এই উঁচু

মানের কথা আমি যখন ভাবি তখন আমারই চোখে জল আসে।

রোমান ক্যানডাল বলল—তুমি যদি অন্যদের আনন্দ দিতে চাও তাহলে নিজের পাউডার যাতে শুকনো থাকে সে বিষয়ে অবহিত হও।

এতক্ষণে বেঙ্গল লাইটের আগেকার অবস্থা ফিরে এসেছে। সে সমর্থনের স্বরে বলল—একশবার। এইটাই হচ্ছে কমনসেনস্।

ঘৃণার সঙ্গে রকেট বলল—তাই বটে! তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি একজন অসাধারণ আর অত্যাশ্চর্য প্রাণী। যার চিন্তা করার মতো ক্ষমতা নেই সে ছাড়া আর কারো কমনসেনস্ থাকবে কেন? কিন্তু আমার চিন্তা করার, কল্পনা করার শক্তি রয়েছে; কারণ যা রয়েছে তার কথা আমি কোনোদিনই চিন্তা করি নে।...আর শুকনো থাকার কথা যদি বল তাহলে একথা আমি বলতে পারি যে এখানে এমন কেউ নেই অনুভূতিপ্রবণতা কাকে বলে তা সে জানে। সৌভাগ্যবশত, আমি তা গ্রহ্য করি নে। আমাকে কেবল একটা জ্ঞানই সারা জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটা হচ্ছে এই যে আমি ছাড়া অন্য সবাই যে নীচুস্তরের সেটা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। তোমাদের কি হৃদয় বলে কোনো বস্তু রয়েছে! তোমরা সবাই হাসছ, আনন্দ করছ—যেন মনে হচ্ছে রাজকুমার আর রাজকুমারীর এই মাত্র বিয়ে হয়নি।

ছোটো একটা ফায়ার-বেলুন বলল—কেন নয়? আয়োজনটা তো আনন্দ করারই মতো। আমি যখন আকাশে উঠব তখন নক্ষত্রদেরও আমি এই আনন্দের কথাই তো বলব।

রকেট বলল—জীবনের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী তুচ্ছ! কিন্তু এছাড়া তোমার কাছে আর কীই বা আশা করব? তুমি শূন্যগর্ভ; ভেতরে তোমার কিছু নেই। হয়তো একদিন রাজকুমার সস্ত্রীক কোনো গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাবে। সেখানে হয়তো একটা নদী রয়েছে। নার্স হয়তো তাদের একটি মাত্র পুত্রকে নিয়ে ঘুরতে বেরোবে; তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে গাছের তলায় ঘুমোবে; আর সেই সুযোগে ছেলেটা নদীতে ডুবে মারা যাবে! হতভাগ্যেরা তাদের একমাত্র সন্তানকে হারাবে। অহো! কী দুর্দৈব! কী ভয়ঙ্কর! আমি কোনো দিনই তা ভুলতে পারব না।

রোমন ক্যানডাল বলল—কিন্তু তারা তো তাদের কোনো সন্তানকে হারায়নি।

রকেট বলল—হারিয়েছে সেকথা বলছি নে। বলছি, যদি হারায়। হারালে, তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। যারা পড়ে যাওয়া দুধের জন্যে দুঃখ করে তাদের আমি ঘৃণা করি। কিন্তু তারা তাদের একমাত্র সন্তানকে হারাতে পারে এই ভেবে আমি দুঃখিত।

বেঙ্গল লাইট চিৎকার করে বলল—নিশ্চয়। আসল কথা হচ্ছে তোমার মতো চিরদুঃখী প্রাণী আমি আর কখনো দিখিনি।

রকেট বলল—তোমার মতো অভদ্র প্রাণীও আমি আর কখনো দেখিনি। আমার মধ্যে যে বন্ধুত্বের আবেগ রয়েছে তা তুমি বুঝতে পারবে না।

রোমান ক্যানডাল দাঁত খিঁচিয়ে বলল—তুমি তো তাকে এখনো চেনই না হে।

রকেট বলল—চিনি যে সে কথা তো আমি বলিনি। চিনলে তো তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই হত না। বন্ধুদের চেনা বড়ো বিপজ্জনক।

ফায়ার বেলুন বলল—তুমি বরং নিজেকে শুকনো রাখ হে। ওইটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

রকেট বলল—ওটা নিঃসন্দেহে তোমার কাছে প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইচ্ছে হলে আমি কাঁদব তো বটেই।

এই বলেই সে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

ক্যাথারিন হুইল বলল—লোকটা সত্যিকারের রোমান্টিক। যেখানে কাঁদার কিছু নেই সেখানেও কাঁদছে।

কিন্তু রোমান ক্যানডাল আর বেঙ্গল লাইট বিরক্তির সঙ্গে বেশ চেঁচিয়েই বলল—এ একটা হামবাগ!

এরা দুজনেই অত্যন্ত বাস্তবপন্থী। যা ওরা অপছন্দ করত তাকেই হামবাগ বলে চিহ্নিত করত।

ঠিক বারোটার সময় রাজা, রাজকুমার, রাজকুমারী, সভাসদবর্গ এবং অন্যান্য সবাই বেরিয়ে এলেন আতশবাজির খেলা দেখতে। রাজা বললেন—এবার শুরু কর।

রাজার আতশবাজিকর মাথাটা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে চলে গেল। তার সঙ্গে দু'জন সহকারী। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে জ্বলন্ত টর্চ লম্বা লাঠির ডগায় বাঁধা।

সত্যই বড়ো চমৎকার—বড়ো অদ্ভুত এইসব আতশবাজির খেলা।

হুইজ!হুইজ! উঠে গেল ক্যাথারিন হুইল। ওঠার সময় বন-বন করে ঘুরতে লাগল। বুম! বুম! করতে-করতে উড়ে গেল রোমান ক্যানডাল। পুঁচকে পটকাটা চারপাশে ছরব্যর মতো নাচতে লাগল। বেঙ্গল লাইটগুলি চারপাশ লালচে করে দিল। ছোটো ছোটো নীল রং-এর আভা ছড়িয়ে ফায়ার বেলুন আকাশে উড়ে যাওয়ার সময় বিদায় জানিয়ে গেল সবাইকে। ব্যাঙ! ব্যাঙ! শব্দে ক্র্যাকাররা ফাটতে লাগল। মনে হল তাদের খুব মজা লাগছে। একমাত্র সেই অত্যাশ্চর্য রকেট ছাড়া আর সবাই বেশ সাফল্যের সঙ্গে সকলকে আনন্দ দিল। কেঁদে-কেঁদে রকেটটি এতই ভিজে গিয়েছিল যে তাকে কিছুতেই ওড়ানো গেল না। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে সেরা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে বারুদ। তার সব দরিদ্র বন্ধুবান্ধব যাদের সঙ্গে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুর মাধ্যমেই সে কথা বলতে না তারা সবাই আকাশে সোনালি ফুলের রোশনাই জ্বেলে সুন্দর ভাবে সফল হল। সভাসদেরা 'হুজা, হুজা' বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। খুদে রাজকুমারী আনন্দে হাসতে লাগলেন।

রকেট বলল—আমার ধারণা আরো কোনো জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের জন্যে ওরা আমাকে মজুত রেখেছে। নিঃসন্দেহে এর কারণটা হল তাই। এই ভেবে আগের চেয়ে সে বেশি দম্ভ অনুভব করল।

পরের দিন জায়গাটা পরিষ্কার করার জন্যে বাগানে মজুররা হাজির হল। রকেট মনে করল এরাই হচ্ছে প্রতিনিধি দল। আমি এদের বেশ ভারিক্কি চালে অভ্যর্থনা জানাব। এই ভেবে সে বাতাসে নাকটা উঁচিয়ে দিল; তারপর কটমট করে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে, মনে হল সে সিরিয়াস কিছু একটা ভাবছে। চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা তার দিকে কোনো নজরেই দিল না। তারপরে একজনের চোখ তার ওপরে পড়তেই সে বলে উঠল—এটা একেবারে বাজে। এই

বলে সেটা তুলে নিয়ে দেওয়াল টপকে পাশের খানায় ফেলে দিল সে।

বাতাসের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে সে বলল—বাজে-রকেট বাজে-রকেট? অসম্ভব! লোকে আমাকে আশ্চর্য রকেট বলে সম্বোধন করেছে। ও দুটো শব্দের অর্থ প্রায় একই।—এই বলে সে কাদার মধ্যে পড়ে গেল।

কাদার মধ্যে পড়ে সে মন্তব্য করল—জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে না তো। এটা বোধ হয় উচ্চ সমাজের জলকেলি করার জায়গা। স্বাস্থ্য উদ্ধার করার জন্যে তারা হয়তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আমার স্নায়ুগুলোও কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমারও বিশ্রামের দরকার।

তারপরে একটা বাচ্চা ব্যাঙ সাঁতরে উঠে এল। চকচক করছে তার চোখ দুটো।

ব্যাঙটা বলল—নতুন আমদানি বলে মনে হচ্ছে! যাই তোমরা বল, কাদার মতো জিনিস আর নেই। আমাকে বৃষ্টির জল আর খানা দাও। তাহলেই আমি খুশি।

রকেট বলল—'আহেম, আহেম'। তারপরেই সে কাশতে আরম্ভ করল।

চিৎকার করল ব্যাঙ—তোমার স্বরটা কী চমৎকার! ঠিক ব্যাঙের ডাকের মতো। সত্যি কথা বলতে কি ব্যাঙের ডাকের মতো মধুর সঙ্গীত পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমাদের ক্লাবে আজ সন্ধেতে যে জলসা বসবে তা তুমি শুনতে পাবে। চাষীর বাড়ির পাশের যে পুরনো ডাক-পুকুর রয়েছে সেখানে আমরা বসে থাকি; আর চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গান জুড়ে দিই। আমাদের গান এতই মধুর যে সবাই জেগে-জেগে সেই গান শোনে। সত্যি কথা বলতে কি গতকালই আমার কানে গেল চাষীর মেয়েটা বলছে আমাদের জন্যে রাত্রে তার একটুও ঘুম হয়নি। এইভাবে জনপ্রিয় হওয়াটা সত্যিই বড় সন্তোষজনক।

রকেট রেগে বলল—আহেম!আহেম!

তার বিরক্তির কারণ হচ্ছে কথা বলার একটুও সুযোগ সে পাচ্ছে না।

ব্যাঙ বলেই চলল—বড়ো মিষ্টি স্বর তোমার। আশা করি একদিন তুমি ডাক পুকুরে আসবে। আমার ছটা সুন্দরী মেয়ে রয়েছে। তাদের খুঁজতে যাচ্ছি। মিষ্টিজলের মাছটাকেই বড়ো ভয় করে। এও একটা দৈত্য বিশেষ। তাদের ধরে ধরে ব্রেকফাস্ট করতে ওর এতটুকু দ্বিধা হয় না। আচ্ছা, চললাম। আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি আমাদের আলোচনাটা বেশ ভালোই লাগল।

রকেট বলল—আলোচনাই বটে! সারাক্ষণ তো তুমিই কথা বলে গেলে। একে কি কথাবার্তা বলে?

ব্যাঙ বলল—একজনকে তো শুনতেই হবে। আমি নিজেই নিজের কথা বলতে ভালোবাসি। এতে সময় বাঁচে—তর্কের কচকচানিও শুনতে হয় না।

রকেট বলল—কিন্তু তুমি তর্ক ভালোবাসি।

ব্যাঙ সন্তুষ্ট মনে বলল—তর্কাতর্কি জিনিসটাই হচ্ছে অশালীন। কারণ ভদ্র সমাজে সকলেরই মতামত একই ধরনের। আবার বলছি বিদায়। দূরে মেয়েদের দেখতে পাচ্ছি।

এই বলে ব্যাঙ সাঁতার দিয়ে চলে গেল।

রকেট নিজের ভাবেই মাতোয়ারা হয়ে বলতে লাগল—তুমি একটি বিরক্তিকর অসভ্য জীব। যারা তোমার মতো নিজের কথাই বলে যখন অপরে আমার মতো নিজের কথা বলতে চায় তাদের আমি ঘৃণা করি। এইটাকেই আমি স্বার্থপরতা বলি। এটা আমার মতো লোকের কাছে খুব ঘৃণ্য। কারণ আমার মনটাই হচ্ছে সংবেদনশীল। আমার কাছ থেকেই তোমার শিক্ষালাভ করা উচিত...অবশ্য এসবের তুমি কিছুই জান না; কারণ তুমি একটি গেঁয়ো ভূত।

তামাটে রঙের লম্বা ঘাসের ওপরে একটা ফড়িং বসেছিল। সে বলল—তার সঙ্গে কথা বলে আর লাভ কী? সে তো চলে গিয়েছে।

রকেট বলল—তাতে ক্ষতি তারই হয়েছে। সে আমার কথা শুনল না বলেই আমি তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করতে পারি নে। নিজের সঙ্গে কথা বলতে আমি সব সময়েই ভালোবাসি। মাঝে-মাঝে অনেকক্ষণ ধরে নিজের সঙ্গেই আমি নিজে কথা বলি; আর আমি এতই বুদ্ধিমান যে মাঝে-মাঝে আমি নিজে যা বলি তার একটি বর্ণও বুঝতে পারি নে।

তাহলে নিশ্চয় তোমার দর্শনশাস্ত্রের ওপর বক্তৃতা দেওয়া উচিত—এই বলে দুটি ডানা মেলে ফড়িংটা উড়ে গেল।

রকেট বলল—কী বোকা! চলে গেল। আমি নিশ্চিত যে নিজেকে উন্নত করার এরকম সুযোগ সে খুব একটা বেশি পাবে না। মরুক গে; আমার প্রতিভা একদিন না একদিন স্বীকৃত হবেই।—এই বলে কাদার মধ্যে আর একটু ডুবে গেল সে।

অনেকক্ষণ পরে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে একটা সাদা পাতিহাঁস সেখানে এসে হাজির হল। তার পা দুটি হলদে; তার চলার বা ভাসার গতিটা বড়োই সুন্দর।

কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক! কী অদ্ভুত চেহারা গো তোমার? জন্ম থেকেই কি তোমার এইরকম চেহারা? না, কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে এইরকম হয়েছে?

রকেট বলল—তোমার কথা শুনে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে চিরকালই তুমি পাড়াগাঁয়ে বাস কর, তা না হলে, আমি কে তা তুমি বুঝতে পারতে। যাই হোক, তোমার এই অজ্ঞতাকে আমি ক্ষমা করলাম। শুনলে তুমি খুশিই হবে যে আকাশে আমি উড়ে যেতে পারি; আর নেমে আসার সময় চারপাশে ছড়িয়ে দিই সোনালি বৃষ্টির ধারা।

পাতিহাঁস বলল—ওসব কথার খুব একটা দাম আমার কাছে নেই; কারণ ওর কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি নে। তুমি যদি ষাঁড়ের মতো লাঙল চষতে পারতে, অথবা ঘোড়ার মতো গাড়ি টানতে পারতে, অথবা কুকুরের মতো ভেড়ার দল পাহারা দিতে পারতে—তাহলেও তবু একটা কথা ছিল।

বেশ রাগত কন্ঠেই রকেট বলল—বৎস, দেখতে পাচ্ছি তুমি নীচ জাতীয়া। আমার মতো প্রাণীর কতকগুলি উঁচু ধরনের গুণ রয়েছে। সেগুলিই যথেষ্ট। উৎপাদক জাতীয় কোনো জিনিসের ওপর আমার কোনো সহানুভূতি নেই; বিশেষ করে যে সব জিনিসের কথা তুমি এইমাত্র বললে। আমার ধারণা, কঠোর পরিশ্রমের আড়ালে তারাই আশ্রয় নেয় যাদের আর কিছু করার নেই।

পাতিহাঁসের কারও সঙ্গেই কোনো বিরোধ নেই। সে বড়ো শান্তিপ্রিয় জীব। সে বলল—ঠিক আছে; বিভিন্ন মানুষের রুচি বিভিন্ন। যাই হোক, আশা করি এখানেই তুমি থেকে যাচ্ছ?

রকেট বলল—না, না। আমি এখানে একটি সম্মানিত অতিথিমাত্র। সত্যি কথা বলতে কি জায়গাটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এখানে সমাজ বা নির্জনতা কোনোটাই নেই। সম্ভবত আমি রাজসভাতেই ফিরে যাব। কারণ আমি জানি বিরাট একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতেই আমার জন্ম হয়েছে।

পাতিহাঁস বলল—আমি নিজে একবার পাবলিক লাইফ-এ ঢোকার চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম সেখানে অনেক কিছু সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একবার একটা সভায় সভাপতি হয়েছিলাম। আমরা যা পছন্দ করিনে সে সব বিষয়কে নিন্দা করে সেখানে আমরা অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। তাতে কিছু লাভ হয়নি। এখন আমি গৃহকর্মে চললাম।

রকেট বলল—আমার জীবন কিন্তু জনসেবায় উৎসর্গীকৃত। আমার আত্মীয়-স্বজনরাও তাই—এমন কি তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে দরিদ্র সে-ও। আমরা প্রকাশ্যে এসে দাঁড়ালেই সকলের দৃষ্টি আমাদের ওপরে গিয়ে পড়ে। আমি অবশ্য এখনো প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়নি; হলে একখানা দারুণ আলোড়ন পড়ে যাবে। আর ঘর-সংসারের কাজ? ওর মধ্যে মাথা গলালেই বুড়িয়ে যায় মানুষ। উঁচু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে হয়।

পাতিহাঁস বলল—উঁচু আদর্শই বটে! আর এই আদর্শের জন্যে কত অনাহারেই না থাকতে হয়েছে।—এই বলে 'কোয়াক-কোয়াক'করে ডাকতে-ডাকতে সে মাঝ দরিয়ার দিকে সাঁতার কেটে বেরিয়ে গেল। রকেট প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। চেঁচাতে লাগল সে—ফিরে এস, ফিরে এস; তোমাকে আজ একটা বড়ো আদর্শের কথা শোনাব।

আর বড়ো আদর্শ! সে তখন অনেক দূরে।

রকেট তখন নিজের মনে-মনেই বলল—যাকগে। ভালোই হয়েছে। ওর মনটা যে মধ্যবিত্ত সেদিক থেকে আমি নিশ্চিত।

এই বলে সে কাদার আর একটু নীচে ডুবে গেল; ভাবতে লাগল এ-দুনিয়ায় প্রতিভার নিঃসঙ্গতার কথা। ঠিক এমনি সময় কয়েকটা সাদা ঢিলে জামা পরে, একটা কেতলি আর কিছু জ্বালানি কাঠ নিয়ে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে সেই দিকে ছুটে এল।

রকেট ভাবল—এরা বোধ হয় একদল প্রতিনিধি।

এই ভেবে নিজেকে সে সম্ভ্রান্ত করে তোলার চেষ্টা করল।

একটা ছেলে চিৎকার করে উঠল—দেখ, দেখ, এটা একটা ওলড্স্টিক। এ এখানে এল কি ক'রে বল তো?

এই বলে গর্তের ভেতর থেকে রকেটটাকে টেনে বার করল।

রকেট ভাবল—'ও-ল-ড'! অসম্ভব! ওরা নিশ্চয় বলেছে 'গো-ল-ড স্টিক'। 'গোলড' শব্দটা বড়োই প্রশংসাসূচক!

আর একটা ছেলে বলল—ওটাকে পুড়িয়ে ফেলি আয়। কেতলিটা ফুটবে ভালো।

এই কথা বলে জ্বালানি কাঠগুলো একসঙ্গে জড় করে রকেটটাকে তাদের ওপরে বসাল; তারপরে আগুন ধরিয়ে দিল।

রকেট বেশ উল্লসিত হয়ে বলল—চমৎকার, চমৎকার। যাতে সবাই আমাকে দেখতে পায় এই জন্য এরা আমাকে দিনের বেলাতেই ফাটাচ্ছে।

ছেলেরা বলল—এখন ঘুমিয়ে পড়ি আয়। ঘুম থেকে উঠে দেখবি জল গরম হয়ে গিয়েছে।

এই বলে তারা সটান ঘাসের ওপরে শুয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

রকেটটা ভিজে থাকায় শুকনো হতে একটু সময় নিল। তারপরে পুড়তে শুরু করল।

সে চিৎকার করে বলল—এখন আমি উড়ছি। আমি জানি নক্ষত্র বা চাঁদের চেয়েও উঁচুতে উঠব আমি। সত্যি কথা বলতে কি আমি এত উঁচুতে উঠব যে—

ফিজ-ফিজ-ফিজ! তারপরেই সে আকাশে উড়ে গেল।

নিজের মনেই সে চিৎকার করে উঠল—সুন্দর, সুন্দর! চিরকাল আমি এইভাবে উড়ব।

কিন্তু কেউ তাকে দেখল না।

তারপরেই সে সারা শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল।

সে চিৎকার করে উঠল—এখন আমি ফেটে যাব। সমস্ত পৃথিবীর ওপরে আগুন জ্বালিয়ে দেব আমি। এমন সাড়া জাগাব যে একটা বছর মানুষ আর কোনো কথা নিয়ে আলোচনা করবে না। আর সত্যিই সে ফাটল। ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ। বারুদ ফাটছে।

কিন্তু কেউ সেই শব্দ শুনতে পেল না। এমনকি সেই বাচ্চা ছেলেদেরও ঘুম ভাঙল না।

বাকি রইল কেবল একখানা ছড়ি। সেটা গিয়ে পড়ল একটা হাঁসের পিঠে। হাঁসটা তখন খানার ধারে ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছিল।

হাঁসটা চিৎকার করে উঠল—হা ঈশ্বর! আজ কি ছড়ি বৃষ্টি হবে?

এই বলে সে দৌড়ে জলের ওপরে নেমে গেল।

রকেটটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'আমি জানতাম, আমি একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করব।'

এই কথা বলেই সে শেষবারের মতো নিবে গেল।

যুবক রাজা
The Young Prince

রাজ-অভিষেকের আগের রাত্রি। যুবক রাজা তাঁর সুন্দর ঘরে একা বসে রয়েছেন। যুগের প্রথা অনুযায়ী সভাসদেরা তাঁকে আভূমি প্রণাম করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছেন। সেখান থেকে রাজপ্রাসাদের 'গ্রেটহল'-এ তাঁরা জমায়েত হয়েছেন—রীতি শিক্ষার বিখ্যাত অধ্যাপকের কাছ থেকে রীতি সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা শোনার জন্যে। সভাসদদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ ছিলেন সভার আদব-কায়দাটাকে তখনো যাঁরা রপ্ত করতে পারেননি এবং আমার ধারণা, যে কোনো সভাসদের কাছে এটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ।

সভাসদেরা চলে যাওয়ার ফলে বালকটির—সত্যিই বালক ছাড়া আর কিছু নন তিনি—ষোল বছরের যুবককে আর কী বলা যেতে পারে—কোনো দুঃখ হল না। একটি নরম সোফার ওপরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা এলিয়ে দিলেন তিনি। অরণ্যবাসী কোনো দেবতার মতো খুলে দিলেন তাঁর বিস্মিত দুটো চোখ আর ঠোঁট; শিকারির জালে আটকে পড়া নতুন কোনো জন্তুর মতো অবাক বিস্ময়ে তিনি তখন তাকিয়েছিলেন।

আর সত্যি কথাই তো! তিনি যখন বাঁশি হাতে নিয়ে একটি মেষপালকের যাকে তিনি নিজের বাবা বলেই জানতেন—মেষের পাল নিয়ে চরাতে বেরিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় হঠাৎ শিকারিরা তাঁকে ধরে নিয়ে আসে। শোনা যায়, একদিন একটি যুবক—অনেকের মতে বিদেশি—বাঁশি বাজিয়ে বৃদ্ধ রাজার কন্যাকে মুগ্ধ করেছিল। আবার কেউ কেউ বলে যুবকটি বিমিনি থেকে এসেছিল। পেশায় সে ছিল চিত্রকর। তার সাংসারিক অবস্থা সাধারণ হলেও, রাজকুমারী তাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন—ততটা সম্মান তার নাকি পাওয়ার কথা ছিল না। তারপরে গোপনে সে রাজকুমারীকে বিয়ে করে। এই যুবকটি তাদেরই পুত্র। তারপরে হঠাৎ একদিন গির্জার কাজ অসমাপ্ত রেখেই চিত্রকরটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। শিশুটির বয়স তখন সাত দিনও হয়নি। তার মা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় বৃদ্ধ রাজার বিশ্বস্ত একটি অনুচর তাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের নীচে একটি অপুত্রক কৃষক দম্পতির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। দুঃখে জর্জরিত হয়ে, না, তীব্র এক পেয়ালা ইতালিয়ান বিষপান করার জন্যে—খবরটা কেউ জানে না—ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর মৃত্যু হয়। যে সময়ে রাজার বিশ্বস্ত অনুচর তাঁর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে দূরে পাহাড়তলীতে কৃষক দম্পতির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে আজ একদল লোক রাজকুমারীর মৃতদেহটি নিয়ে একটি পরিত্যক্ত সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত হল। সেখানে আগে থেকে কবর একটা খোলাই ছিল। সেইখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হল। লোকমুখে শোনা যায় ওরই মধ্যে আর একটি যুবককে কবরস্থ করা হয়েছিল। যুবকটি বিদেশি—কিন্তু অপরূপ সুন্দর। তার দুটি হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা; আর বুকের ওপরে অনেকগুলি রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন।

অন্তত এই রকমই একটা কাহিনি ওই অঞ্চলে লোকের মুখে প্রচলিত ছিল; তবে তারা এই নিয়ে কোনোদিনই একটা হইচই করেনি। তারপরে এটাও নিশ্চিত বৃদ্ধ রাজা মৃত্যুশয্যায় তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। হয় নিজের পাপ কাজের জন্যে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন অথবা রাজসিংহাসন বাইরের কারও হাতে চলে যায় তা তিনি চাননি। সেইজন্যেই অনুচরদের পাঠিয়ে এই যুবকটিকে ধরে এনে পাত্রমিত্র সভাসদদের সামনে এঁকে রাজার পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তাঁকে দেখে মনে হয় রাজার স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি যে অপূর্ব একটা স্পৃহা ছিল—আর যেটা ভবিষ্যতে তাঁর ওপরে অভাবিত প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা নিয়েছিল—সেই আশঙ্কা তাঁর দেহের অণুতে-অণুতে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছিল। যারা তাঁর সঙ্গে থাকত তাদের মুখে শোনা যায় কী এক অপূর্ব আনন্দে দিশেহারা হয়ে তিনি সুসজ্জিত একটি প্রকোষ্ঠ থেকে আর এক প্রকোষ্ঠে ছুটে বেড়াতেন। অরণ্যজীবনের স্বাধীনতা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন বটে, রাজসভার অজস্র কৃত্রিমতা তাঁকে যে মাঝে-মাঝে ব্যথা দিত সেকথাও মিথ্যে নয়—কিন্তু রাজসভার দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিপুল আনন্দে তিনি প্রাসাদের মধ্যে ছোটাছুটি করতেন। এই রাজপ্রাসাদটি তাঁর কাছে নব-আবিষ্কৃত সাম্রাজ্যের মতো মনে হয়েছিল।

এই সময়ে যদিও রঙদার পোশাক পরা চাপরাশির দল তাঁর পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়াত, তবুও অনেকটা সময়ই তিনি একা থাকতেন। এই সময়েই তিনি স্বর্গীয় আনন্দ পেতেন; এ থেকে এইটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমস্ত কলা গোপনে শিক্ষা করাই প্রশস্ত; আর সমস্ত জ্ঞানের মতো সৌন্দর্যকেও নিঃসঙ্গ পূজারীরাই ভালোবাসে বেশি।

যা কিছু দুষ্প্রাপ্য, আর যা কিছু মূল্যবান সে সব জিনিসের ওপরেই নিশ্চয় তাঁর একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল। সেই সব জিনিস সংগ্রহ করার জন্যে তিনি চারপাশে লোক পাঠাতে লাগলেন। কাউকে পাঠালেন উত্তর সাগরের জেলেদের কাছে; রাজাদের কবরের তলায় যে সমস্ত অদ্ভুত—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সবুজ রঙের মূল্যবান পাথর থাকে সেগুলি তুলে আনতে কাউকে পাঠালেন ইজিপ্টে, কাউকে পাঠালেন সিল্কের কার্পেট আনতে পারস্যে, আবার চন্দন কাঠ আর সুন্দর পশমের তৈরি শাল সংগ্রহ করতে পাঠালেন ভারতবর্ষে।

কিন্তু যে পোশাকটি পরে তাঁর রাজ্যাভিষেক হবে সেইটি নিয়েই তিনি চিন্তা করছিলেন সবচেয়ে বেশি। সেই সঙ্গে ছিল রুবি দিয়ে গাঁথা মুকুট আর মুক্তোর বুটি দিয়ে তৈরি করা লম্বা রাজদণ্ডটি। খোলা চুল্লির ভেতরে যে পাইন কাঠের গুঁড়ি জ্বলছিল সেদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বেশ আরামপ্রদ সোফার ওপরে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বিশেষ করে সেদিন তিনি তাদের কথাই ভাবছিলেন। সে যুগের দেশ-বিখ্যাত চিত্রকরদের নক্সা কয়েক মাস আগেই অনুমোদনের জন্যে তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছিল; তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে নক্সা মতো কাজ শেষ করার জন্যে চিত্রকররা যেন দিনরাত্রি পরিশ্রম করে, আর এদের উপযুক্ত মণিমুক্তা আহরণের জন্যে আহরকেরা যেন সারা বিশ্বের ভাঁড়ার তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে। কল্পনায় তিনি দেখতে পেলেন রাজার সুন্দর পোশাক পরে তিনি যেন গির্জার বিরাট বেদীর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন; তাঁর সেই শিশুর ঠোঁটে হাসি উঠেছে ফুটে আর তাঁর সেই অরণ্যক দৃষ্টির ওপরে ঝলকে পড়েছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি।

একটু পরেই সোফা থেকে উঠে চিমনির গায়ে হেলান দিয়ে সেই ঘরের দিকে তাকালেন তিনি। ঘরের ভেতরে আলোর বেশি জেল্লা ছিল না। দেওয়ালগুলি মূল্যবান পর্দায় ছিল ঢাকা; তাদের ওপরে আঁকা ছিল ট্রায়াম্প অফ বিউটির ছবি। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন গির্জার

বিরাট গম্বুজটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়িগুলির ওপর দিয়ে বুদ্বুদের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুয়াশায় ঢাকা নদীর চরে প্রহরীদের টহল দেওয়ার পদধ্বনি তাঁর কানে এল। অনেক দূরে বাগানে কোথায় একটা নাইটিংগেল পাখি গান করছিল। সে-সুরও তিনি শুনতে পেলেন। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে যুঁইফুলের অস্পষ্ট একটা গন্ধ ভেসে আসছিল। তাঁর চোখ দুটি ভারী হয়ে এল; অদ্ভুত একটা আলস্য গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। গম্বুজের ঘড়ি থেকে মধ্যরাত্রি ঘোষিত হল। তিনি একটি বেল বাজালেন। চাকররা এসে কেতাদুরস্ত-ভাবে তাঁর পোশাক পরিবর্তন করল, গোলাপ-জল দিয়ে ধুইয়ে দিল তাঁর হাত, তাঁর বালিশের ওপরে ছড়িয়ে দিল ফুল। চাকররা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

তারপরেই তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন এবং এটি তাঁর নিজেরেই স্বপ্ন।

মনে হল তিনি যেন একটি নীচু লম্বা চিলেকোঠার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই ঘরের ভেতরে অনেকগুলি তাঁত চলছে। তাদরেই শব্দে গমগম করছে ঘরটা। ঝাঁঝরি-দেওয়া জানালার ভেতর দিয়ে সামান্য আলো ঢুকছে ভেতরে। সেই আলোতেই তিনি দেখতে পেলেন রোগাটে চেহারার কিছু রুগ্ন মানুষ তাঁতের ওপরে ঝুঁকে কাজ করছে। বিবর্ণ রুগ্ন কতগুলি শিশু কড়িকাঠের গায়ে বসে রয়েছে জড়োজড়ি হয়ে। তাঁতযন্ত্রের ভেতরে দিয়ে মাকুগুলো যখন তীব্রভাবে ধাক্কা দিচ্ছে, লোকগুলি সেই সব ভারী কাঠের পাটাগুলি নীচু করে সুতোগুলিকে জড়িয়ে দিচ্ছে এক সঙ্গে। তাদের মুখগুলি অনাহারে রুগ্ন; তাদের রোগা হাতগুলি কাঁপছিল; কয়েকটি অভুক্ত চেহারার মেয়েমানুষ টেবিলের ধারে বসে-বসে সেলাই করছিল। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে ঘরটা ভারাক্রান্ত। বাতাস দুর্গন্ধময়, দেওয়াল ভিজে জ্যাবজেবে, অস্বাস্থ্যকর।

যুবক রাজা একটি তাঁতির কাছে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখতে লাগলেন।

লোকটা রেগে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তুমি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন? আমাদের মনিব কি গোপনে আমাদের দিকে লক্ষ রাখতে তোমাকে পাঠিয়েছে?

তোমাদের মনিব কে?—জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

তিক্তভাবে চিৎকার করে উঠল তাঁতি—আমাদের মনিব! চেহারায় আমারই মতো দেখতে—কিন্তু তফাৎ অনেক। সে সুন্দর-সুন্দর পোশাক পরে; আর আমি পরি ছেঁড়া পোশাক। আমি না খেতে পেয়ে দুর্বল হচ্ছি—আর সে দুর্বল হচ্ছে ভূরিভোজন করে।

রাজা বললেন—এটা স্বাধীন দেশ। এখানে তুমি কারও ক্রীতদাস নও।

তাঁতিটি বলল—যুদ্ধের সময় শক্তিমানেরা দুর্বলদের ক্রীতদাস বানায়; আর শান্তির সময় দরিদ্রদের ক্রীতদাস বানায় ধনীরা। বেঁচে থাকার জন্যে কাজ করতে হয় আমাদের; আর তারা আমাদের মাইনে এত কম দেয় যে আমরা না খেয়ে মারা যাই। তাদের জন্যেই সারাদিন আমরা পরিশ্রম করি। তারা তাদের সিন্দুক ভরিয়ে তোলে সোনায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা খেতে না পেয়ে অকালেই মারা যায়। যাদের আমরা ভালোবাসি তাদের মুখ শক্ত আর নোংরা হয়ে ওঠে। আমরা আঙুল ফল মাড়াই, আর তারা খায় মদ। শস্য বুনি আমরা, ফসল তোলে তারা। আমাদের জন্যে রয়েছে শেকল—অথচ, কেউ তা লক্ষ করে না; আমরা ক্রীতদাস—যদিও সবাই বলে আমরা স্বাধীন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের সবারই কি এই অবস্থা?

তাঁতিটি বলল—সবার, সবার—যুবক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু—সকলের অবস্থাই এই এক। ব্যবসাদার আমাদের পিষে মারে; তাদের নির্দেশ আমাদের মেনে চলতে হয়। পুরোহিতরাও মালা জপ করে আমাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খায়। আমাদের অন্ধকার গলির ভেতর ক্ষুধাতুর দারিদ্র্য গুঁড়ি দিয়ে ঢোকে; পাপ আসে তারি পিছু পিছু। দুঃখের মধ্যে দিয়ে সকালে আমাদের ঘুম ভাঙে, রাত্রিতে অপমান আর লাঞ্ছনা আমাদের পাশে বসে থাকে। কিন্তু তোমার সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী? তোমাকে তো বেশ সুখী মানুষ বলেই মনে হচ্ছে।

তাঁর বেশ ভয় হল। তাঁতিটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এই পোশাকটা তোমরা তৈরি করছ কার জন্যে?

সে বলল—রাজার অভিষেকের জন্যে। এই পোশাক তিনি পরবেন। কিন্তু সে সংবাদে তোমার দরকারটা কী?

যুবক রাজা চিৎকার করে উঠলেন। সেই আর্তনাদেই ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। চেয়ে দেখলেন তিনি ঘরের ভেতরেই শুয়ে রয়েছেন; জানালা দিয়ে মধু-রঙা চাঁদ দেখা যাচ্ছে ধূলিমলিন বাতাসের ওপরে ঝুলতে।

আবার ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। আবার একটা স্বপ্ন দেখলেন।

মনে হল বিরাট একটা পালের জাহাজের নীচু পাটাতনের ওপরে তিনি শুয়ে রয়েছেন। জাহাজের দাঁড়ে বসেছিল একশটি ক্রীতদাস। তাঁর পাশে কার্পেটের ওপরে বসেছিল জাহাজের ক্যাপটেন। কালো কুচকুচ করছে তার দেহ; মাথার ওপরে তার লাল সিল্কের একটা পাগড়ি; কানে বড়ো মোটা মোটা রুপোর গোল দুল; হাতে তার একজোড়া হাতির দাঁতের দাড়িপাল্লা।

একটুকরো ন্যাকড়া ছাড়া ক্রীতদাসরা সবাই উলঙ্গ। তারা সবাই শেকল দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা। প্রচণ্ড সূর্যের আগুন তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিগ্রোরা ডেকের ওপরে ছোটাছুটি করে তাদের পিঠে কেবল চাবুক মারছে। তারা তাদের দুর্বল হাতগুলি দিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টেনে যাচ্ছে।

অবশেষে একটা উপসাগরের ধারে এসে তারা জল মাপতে শুরু করল। তাই দেখে তিনটি আরব গাধার পিঠে চড়ে সেইখানে এসে তাদের দিকে বর্শা ছুঁড়ল। ক্যাপটেন তার সেই চিত্রিত ধনুকটি তুলে নিয়ে একটি আরবের গলা লক্ষ করে তীর ছুঁড়ল। দেহটি ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে; আর দুটি আরব পালিয়ে গেল। তারপরে উটের পিঠে চড়ে সেই দিকে এল বেগুনে রঙের ঘোমটা ঢাকা একটি মেয়ে। সেই মৃতদেহটির দিকে মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তারপরে নোঙর ফেলা হল; খুলে দেওয়া হল পাল। নিগ্রোরা নীচে ছুটে গিয়ে একটা দড়ির সিঁড়ি বয়ে নিয়ে এল। তার তলায় বেশ ভারী সীসের একটা বস্তা বাঁধা। ক্যাপটেন দুটো লোহার ডাণ্ডার সঙ্গে ভালো করে বেঁধে সেটাকে জলে ফেলে দিল তারপরে নিগ্রোরা সবচেয়ে বাচ্চা ক্রীতদাসটার শেকল খুলে ধরে নিয়ে এল। তার নাক আর কান দুটো মোম দিয়ে দিল বন্ধ করে; কোমরে তার বাঁধল ভারী একটা পাথর। ছেলেটা ক্লান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হালের সামনে বসে একটা যাদুকর একঘেয়ে সুরে ঢাকের উপরে কাঠি ঠুকতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে হাঁপাতে-হাঁপাতে একটা মুক্তো হাতে নিয়ে ডুবুরি ওপরে উঠে এল। সেই মুক্তোটা ছিনিয়ে নিয়ে আবার তাকে জলের ওপরে ফেলে দিল নিগ্রোরা। এইভাবে বারবার সে উটে এল মুক্তো নিয়ে; আর বারবার তাকে জলে ঠেলে দিল নিগ্রোরা। সেই সব মুক্তো নিয়ে ওজন করতে লাগল ক্যাপ্টেন। রাজা কী যেন বলতে চাইলেন; কিন্তু পারলেন না। জিব তাঁর জড়িয়ে গেল। তারপরে শেষবারের মতো ডুবুরি উঠে এল। তার হাতে একটা মুক্তো। পূর্ণ চাঁদের মতো তার চেহারা। ওরমুজ-এর মুক্তোর চেয়েও সুন্দর। কিন্তু তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে তখন। সে ডেকের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, নাক আর কানের ভেতর থেকে ভকভক করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল, একটু ছটফট করেই সে স্থির হয়ে গেল। নিগ্রোরা তাদের কাঁধ কোঁচকাল একটু; তারপরে, তার দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রের ওপরে।

কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই ক্যাপ্টেন হাসতে-হাসতে হাত বাড়িয়ে সেই বড়ো মুক্তোটা নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে কাকে উদ্দেশ্য করে যেন মাথাটা নোয়াল। 'এটা রাজার রাজদণ্ডের জন্যে।' এই কথা বলে নোঙর তুলে ফেলতে সে নিগ্রোদের নির্দেশ দিল।

এই কথা শুনে রাজা বিরাট একটা আর্তনাদ করে জেগে উঠলেন। জানালার ভেতর দিয়ে দেখলেন প্রভাতের লম্বা ধূসর আঙুলগুলি বিবর্ণ নক্ষত্রগুলির গলা টিপে ধরেছে।

আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখলেন। এ স্বপ্নটাও দেখলেন তাঁর নিজেরে সম্বন্ধেই।

তাঁর মনে হল আবছায়া একটি বনপ্রদেশ দিয়ে তিনি হাঁটছেন। সেই বনে গাছের ডালে অদ্ভুত ফল ধরেছে, ফুটেছে সুন্দর বিষাক্ত ফুল। আর পাশ দিয়ে হিস-হিস শব্দ করে সাপ চলে যাচ্ছে;চকচকে টিয়াগুলি উড়ে গেল চিৎকার করতে-করতে; গরম কাদার ওপরে বিরাট বিরাট কচ্ছপের দল পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। গাছের ওপরে হনুমান আর ময়ূরে বোঝাই হয়ে রয়েছে।

হাঁটতে-হাঁটতে তিনি বনের শেষ প্রান্তে হাজির হলেন। সেখানে তিনি দেখলেন অসংখ্য লোক শুকনো নদীতে কাজ করছে। পিঁপড়ের মতো সার বেঁধে তারা এবড়ো-খেবড়ো তীরে উঠছে। মাটিতে বিরাট বিরাট গর্ত খুঁড়ছে; পাহাড় কাটছে বড়ো-বড়ো কুড়ল দিয়ে। অন্য সবাই বালি কাটছে। কেউ অলস হয়ে বসে নেই।

একটা গুহার অন্ধকার থেকে মৃত্যু আর লোভ লক্ষ করছিল তাদের।

মৃত্যু বলল—বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই লোকদের এক তৃতীয়াংশ আমাকে দাও। আমি চলে যাচ্ছি।

কিন্তু লোভ মাথা নেড়ে বলল—ওরা চাকর।

তোমার হাতে ওগুলি কী?

তিনটি শস্যের দানা। তাতে তোমার কী?

মৃত্যু বলল—একটা আমাকে দাও—আমার বাগানে বুনবো—মাত্র একটা দাও—আমি চলে যাচ্ছি।

লোভ বলল—কিচ্ছুই দেব না।—এই বলে সে তার পোশাকে হাতটা ঢেকে ফেলল।

মৃত্যু হেসে একটা কাপ তুলে নিল; তারপরে জলের মধ্যে সেটা দিল ডুবিয়ে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কাঁপুনি জ্বর। সেই জ্বরে জনতার ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল। এক তৃতীয়াংশ লোক মরে মাটিতে পড়ল লুটিয়ে।

এই দেখে লোভ বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে কাঁদতে লাগল; তারপরে সে বলল—তুমি আমার তিন ভাগের একভাগ চাকরকে মেরে ফেলেছ। তুমি এখান থেকে বিদেয় হও। টার্টারির পাহাড়ে যুদ্ধ বেধেছে। প্রত্যেক দলের রাজা তোমাকে ডাকছে। আফগানেরা কালো ষাঁড় মেরে যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে। সেইখানে যাও। আমার রাজত্বে তোমার কী দরকার যে তুমি এখানে অপেক্ষা করছ? চলে যাও। এখানে আর এস না।

মৃত্যু বলল—যতক্ষণ না তুমি আমাকে একটি শস্যকণা দিচ্ছ ততক্ষণ আমি যাচ্ছি নে।

লোভ মুঠি বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চিপে বলল—তোমাকে আমি কিচ্ছু দেব না।

মৃত্যু হেসে একটা কালো পাথর নিয়ে বনের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। বুনো হেমলকের বন থেকে আগুনের পোশাক পরে বেরিয়ে এল জ্বর। তারপর সে জনতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে স্পর্শ করল তাদের। যাদেরই স্পর্শ করল তারাই মারা গেল। যে পথ দিয়ে সে গেল সেই পথের সব ঘাস শুকিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

লোভ বলল—তুমি নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর। ভারতের ঘেরা-শহরে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, সমরকন্দরে কুয়োগুলি সব শুকিয়ে গিয়েছে; ইজিপ্টের ঘেরা-শহরে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, মরুভূমি থেকে উড়ে আসছে পঙ্গপালেরা। কূলগুলিকে ডুবিয়ে দিয়েছে নীল নদ। পুরোহিতরা সব ইশিস আর ওসিরিসের পুজো করছে। সেখানে যাও। তারা তোমাকে ডাকছে। আমার চাকরদের ছেড়ে দাও।

মৃত্যু বলল—না। যতক্ষণ না আমাকে একটা শস্যকণা দিচ্ছ।

আমি তোমাকে কিচ্ছুই দেব না।

মৃত্যু আবার হাসল, হেসে শিস দিল একটা। আকাশের উপর দিয়ে একটি মহিলা উড়ে গেল, তার কপালে প্লেগের নিশানা। অভুক্ত কতকগুলি শকুন তার পেছনে এল উড়তে-উড়তে। সারা অঞ্চলটা সে তার ডানায় ঢেকে দিল। মরে গেল সবাই।

চিৎকার করতে করতে লোভ বনের ভেতর দিয়ে ছুটে পালাল। মৃত্যু ছুটল তার লাল ঘোড়ার পিঠে চড়ে। ঝড়ের চেয়েও তীব্রতর তার গতি। বনের ভেতর থেকে নাক ফোলাতে-ফোলাতে ছুটে এল ড্রাগন আর শেয়ালের দল।

যুবক রাজা কাঁদতে-কাঁদতে জিজ্ঞাসা করল—এরা কারা? কী খুঁজে বেড়াচ্ছে?

তাঁর পেছনে একদল লোক দাঁড়িয়েছিল; সে বলল—রাজার মুকুটের জন্য রুবি খুঁজছে।

রাজা চলে আসতে-আসতে সাধুর মতো একজনকে দেখলেন; তাঁর হাতে একটা আয়না।

বিবর্ণ হয়ে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ রাজা?

সাধু বললেন—আয়নার ভেতরে দেখ। তাহলেই তাকে তুমি দেখতে পাবে।

রাজা আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের চেহারা দেখে চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তখন সূর্যকিরণ ঘরের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সকালে রাজপুরুষরা এসে তাঁকে অভিবাদন জানালেন; রত্নখচিত চকচকে পোশাক আর মুকুট তাঁর সামনে রেখে সেগুলি পরার জন্যে অনুরোধ করলেন। সেগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন রাজা। যতটা সুন্দর তিনি ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর সেগুলি। কিন্তু তিনি বললেন—এগুলি নিয়ে যাও—এসব আমি পরব না।

সবাই হাসল; কারণ, তারা ভাবল রাজা বোধ হয় ঠাট্টা করছেন।

কিন্তু তিনি বেশ কঠোর ভাবেই বললেন—এগুলি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও—লুকিয়ে রাখ। আজ আমার অভিষেক হলেও ওগুলি আমি পরব না। কারণ দুঃখের তাঁতে আর যন্ত্রণার সাদা হাতে তৈরি হয়েছে আমার এই পোশাক। রুবির মধ্যে রয়েছে রক্ত, মুক্তোর মধ্যে রয়েছে মৃত্যু।

এই বলে সবাইকে তিনি তিনটি স্বপ্নের কথা বললেন।

সভাসদেরা এই কথা শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—নিশ্চয় উনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। কারণ, স্বপ্নটা স্বপ্ন ছাড়া আক কী? তারা মোটেই সত্য নয়; তাদের গ্রাহ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্যে যারা পরিশ্রম করে তাদের কথা চিন্তা করে আমরা করবটা কী?

চ্যামবারলেন যুবক রাজাকে বললেন—মহারাজ, ওই সব কুচিন্তাগুলিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে এই রাজপোশাকগুলি পরুন, মাথার ওপরে চড়ান এই সোনার মুকুট। কারণ রাজার পোশাক না পরলে আপনি যে রাজা সেকথা লোকে বুঝবে কেমন করে?

তাঁর দিকে রাজা তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—তাই বুঝি? রাজার পোশাক অঙ্গে ধারণ না করলে তারা কি আমাকে রাজা বলে চিনতে পারবে না?

পারবে না মহারাজ।

আমার ধারণা ছিল এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁদের দেখতে রাজার মতো। কিন্তু তুমি যা বললে তাই হয়তো সত্যি। কিন্তু তবু আমি এই পোশাক আর মুকুট কোনোটাই পরব না। বরং যে পোশাকে আমি এই প্রাসাদে এসেছিলাম সেই পোশাকেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে রাজি রয়েছি।

এই বলে তাঁকে বিদায় দিয়ে তাঁর চেয়ে বছর খানেকের ছোটো একটি চাকরকে তাঁর কাছে রাখলেন। পরিষ্কার জলে স্নান করে তিনি তাঁর নক্সাকাটা বড়ো বাক্সটা খুললেন; বার করলেন তাঁর চামড়ার পোশাক—এই পোশাক পরেই তিনি পাহাড়ের ওপরে মেষের পাল চরাতেন।

বাচ্চা চাকরটা অবাক হয়ে তার দুটো নীল চোখ তুলে চাইল তাঁর দিকে; তারপরে হেসে বলল—মহারাজ, আমি আপনার রাজপোশাক আর রাজদণ্ড দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মুকুটটা কোথায়?

জানালার ধারে যে বুনো কাঠগোলাপ ছিল সেটা তুলে যুবক রাজা বাঁকিয়ে গোল করে মাথার ওপরে পরলেন।

এইভাবে সাজ-পোশাক করে তিনি রাজসভায় হাজির হলেন। সেখানে তাঁকে অভিবাদন জানানোর জন্যে সভাসদেরা অপেক্ষা করছিলেন।

এই পোশাকে দেখে সভাসদেরা রসিকতা করতে লাগলেন; কয়েকজন চিৎকার করে বললেন—মহারাজ, প্রজারা তাদের রাজাকে দেখতে এসেছে; আর আপনি আজ ভিক্ষুকের পোশাক পরেছেন?

কেউ কেউ বললেন—ও লোকটা আমাদের দেশের দুর্নাম করছে; আমাদের প্রভু হওয়ার যোগ্যতা ওর নেই।

কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না—ব্রোঞ্জের ফটক পেরিয়ে বাইরে এলেন তিনি; তারপরে ঘোড়ায় চড়ে গির্জার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর বাচ্চা চাকরটা তাঁর পাশে-পাশে ছুটতে লাগল।

সেই দেখে লোকেরা সব হাসতে লাগল; ঠাট্টা করে বলল—দেখ, দেখ; রাজার ভাঁড় ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। তিনি ঘোড়ার রাশ থামিয়ে বললেন—না। আমি রাজা।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বেরিয়ে এসে বলল—স্যার, ধনীদের বিলাস-বৈভব থেকেই যে দরিদ্ররা বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে তা কি আপনি জানেন না? আপনার প্রাচুর্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে; আপনারা যে পাপ করেন তাই আমাদের রুটি সংগ্রহে সাহায্য করে। প্রভুর জন্যে পরিশ্রম করা কষ্টকর; কিন্তু কষ্ট করার জন্যে, কোনো প্রভু না থাকাটা আরও কষ্টকর। আপনি কি কোনো ক্রেতাকে বলতে পারবেন—তুমি একটা কেনো, অথবা কোনো বিক্রেতাকে বলতে পারবেন—তুমি এই দামে জিনিস বিক্রি কর। আমি তা বিশ্বাস করি না। অতএব আপনি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজার পোশাক পরিধান করুন। আমাদের জীবন আর দুঃখ নিয়ে আপনার কী করার রয়েছে?

রাজা প্রশ্ন করলেন—ধনী আর দরিদ্র কি পরস্পরের ভাই নয়?

লোকটা বলল—তাই বটে। ধনী ভাই-এর নাম 'কেইন'।

যুবক রাজার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। জনতার গুঞ্জন-ধ্বনির মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। বাচ্চা চাকরটা ভয় পেয়ে তাঁর পাশ থেকে পালিয়ে গেল।

যখন তিনি গির্জার সেই বিরাট ফটকের কাছে হাজির হলেন, সৈন্যবাহিনীর লোকেরা তরোয়াল উঁচিয়ে বলল—কী চাও হেথা? রাজা ছাড়া আর কারও এ-দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নেই।

রাজার মুখ রেগে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন—আমিই রাজা।

এই বলে তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন।

মেষপালকের পোশাকে তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেখে বৃদ্ধ বিশপ অবাক হয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে তাঁর কাছে এসে বললেন—পুত্র, এটা কি রাজার পোশাক? কোন মুকুট আমি তোমার মাথায় পরাব, কোন রাজদণ্ড হাতে দেব তোমার! আজ নিশ্চয় তোমার আনন্দের দিন, দুঃখের নয়।

যুবক রাজা প্রশ্ন করলেন—দুঃখ দিয়ে যে পোশাক তৈরি হয়েছে, সুখ কি তা পরতে পারে?

এই বলে তাঁর তিনটি স্বপ্নের কথা তিনি বর্ণনা করলেন।

সমস্ত শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিশপ বললেন—পুত্র, আমি বৃদ্ধ হয়েছি; দিন আমার শেষ হয়ে আসছে। আমি জানি পৃথিবীতে অনেক অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে। পাহাড় থেকে নেমে এসে দুর্দান্ত দস্যুরা বাচ্চাদের ধরে নিয়ে মুরদের কাছে বিক্রি করে দেয়। সিংহ ওৎ পেতে বসে থাকে উটের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। জলদস্যুরা সমুদ্রোপকূলকে ধ্বংস করে জেলেদের জাহাজ পুড়িয়ে দেয়। নোনা জলায় কুষ্ঠ রোগীরা বাস করে। কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করে তারা। তাদের পাড়ায় কেউ যেতে পারে না। ভিক্ষুকরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—কুকুরদের সঙ্গে বসে তারা খায়। ওই সব কাজ না করতে তুমি কি তাদের বাধ্য করত পার? তুমি কি কুষ্ঠ রোগীদের সঙ্গে নিয়ে এক বিছানায় শুতে পার, না, ভিক্ষুকদের নিয়ে এক টেবিলে পার খেতে? সিংহ কি তোমার নির্দেস মতো কাজ করবে, না, বন্যারা পালন করবে তোমার নির্দেশ? যিনি এই দুঃখের সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তোমার চেয়েও বিজ্ঞ নন? সেই জন্যে তুমি যা করেছ তার জন্যে তোমাকে আমি প্রশংসা করছি নে। তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজপোশাক পরে এস। তোমার মাথায় আমি স্বর্ণ মুকুট পরিয়ে অভিষেক করব; তোমার হাতে দেব মুক্তাখচিত রাজদণ্ড। আর তোমার স্বপ্ন! ভুলে যাও ও-সব। এই বিশ্বের ভার অতীব বিশাল। একজনের পক্ষে তা বয়ে বেড়ানো কষ্টকর। বিশ্বের দুঃখ এত বেশি যে একজনের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব নয়।

রাজা বললেন—ঈশ্বরের স্থানে বসে আপনি এই সব কথা বলছেন?

এই কথা বলে বিশপের পাশ দিয়ে উঠে গেলেন তিনি; যে বেদীর ওপরে যীশুখৃস্টের মূর্তি রয়েছে সেইখান গিয়ে দাঁড়ালেন। দু'পাশে তাঁর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য—অদ্ভুত অদ্ভুত স্বর্ণ পাত্র, যীশুর শেষ নৈশ ভোজনের সবুজ মদে বোঝাই কার স্মরণ পাত্র—ইত্যাদি। যীশুর মূর্তির কাছে তিনি হাঁটু মুড়ে বসলেন—বিরাট-বিরাট বাতিগুলি জ্বলতে লাগল; ধূপরে ধোঁয়া পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠতে লাগল তাঁর চারপাশে। প্রার্থনার জন্যে মাথা নীচু করলেন তিনি, ধোপদুরস্ত পোশাক পরে পাদরিয়া তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

হঠাৎ বাইরে একটা গণ্ডগোল উঠল; তার সঙ্গে-সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায় তাদের তরোয়াল খুলে মাথার মুকুট নাড়িয়ে চেঁচাতে লাগল—সেই উন্মাদ লোকটা কোথায়? ভিক্ষুকের পোশাকধারী সে রাজা কোথায় গেল? সেই ছোকরা কোথায় যে আমাদের রাজত্বে কলঙ্ক লেপন করেছে? আমরা তাকে হত্যা করব। আমাদের শাসন করার যোগ্যতা তার নেই।

এই সব কথা শোনার পরেও রাজা প্রার্থনা করার জন্যে মাথা নোয়ালেন; প্রার্থনা শেষ করে উঠলেন তিনি; ঘুরে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে।

আর সেই সঙ্গে চিত্রিত জানালার ভেতর দিয়ে সূর্যের কিরণ ঝরে পড়ল তাঁর ওপরে। সেই

সূর্যকিরণমালা তাঁর দেহে এমন একটি স্বর্গীয় পোশাক পরিয়ে দিল যার কাছে তাঁর রাজকীয় পোশাক ম্লান বলে মনে হল। শুকনো ফুল আবার ফুটল; লিলি ফুল মুক্তোর চেয়ে সাদা হয়ে দেখা দিল। শুকনো কাঁটা উঠল ফুটে; নিরাভরণ গোলাপ ফুলি রুবির চেয়েও লাল হয়ে গেল।

রাজার সেই পোশাকেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। মুক্তা-মন্দিরের দ্বার গেল খুলে—এই রহস্যময় আলোর দ্যুতিতে ভরে গেল চারপাশে। ঈশ্বরের মহিমা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে—সেন্টরা-ও যেন জীবন্ত হয়ে উঠলেন। সঙ্গীতের সুর উঠল, ঢাকের শব্দ পড়ল ছড়িয়ে। ভজন গাইতে লাগল ছেলেরা।

ভয়ে আর বিস্ময়ে সবাই তাঁর কাছে নতজানু হলেন; সভাসদেরা খাপের মধ্যে তাদের তরোয়াল রাখল ঢুকিয়ে—অভিবাদন জানাল তাঁকে। বিশপের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—হাতে কাঁপতে লাগল তাঁর।

তিনি বললেন—যাকে আমি অভিষিক্ত করছি তার চেয়েও তুমি অনেক বড়ো। এই কথা বলে তিনি রাজার কাছে তাঁ মাথাটা নীচু করলেন।

দেবকুমার
The Star-Child

একদিন দুজন দরিদ্র কাঠুরিয়া বিরাট একটা পাইন বনের ভিতর দিয়ে হাঁটছিল। শীতকাল। ঠান্ডা কনকনে রাত। মাটির ওপরে গাছের পাতায় বেশ পুরু পুরু বরফ জমেছে। তাদের পথের দু'পাশে ঘন বরফের চাঁই মট-মট করে পল্লবগুলিকে ভেঙে দিচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে যখন তারা পাহাড়ি ঝর্নার কাছে এল তখন ঝর্নাটা নির্জীব হয়ে বাতাসে ঝুলছে; কারণ, বরফ-রাজ তাকে চুমু খেয়েছে। এত ঠান্ডা যে কী করবে তা তারা ভেবে পেল না।

দুটো পায়ের ভেতরে ন্যাজটা ঢুকিয়ে দিয়ে বনের মধ্যে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে নেকড়ে বাঘ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল—উঃ! আবহাওয়া বটে একখানা! সরকার এ-সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা করে না কেন?

সবুজ রঙের লিনেট পাখিরা গানের সুরে বলে—তুইট! তুইট! তুইট! পুরনো পৃথিবীটা মরে গিয়েছে। সাদা চাদরে তার মৃতদেহটাকে ওরা দিয়েছে ঢেকে।

টার্টল ডাভেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—পৃথিবীর আজ বিয়ে হবে; তাই সে সাদা পোশাক পরেছে। তাদের লাল টুকটুকে পাগুলি তুষারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা মনে করেছিল এই অবস্থায় তাদের কিছু রোমান্টিক হওয়া উচিত।

দাঁত খিঁচোল নেকড়ে বাঘ—'মূর্খ কোথাকার! আমি বলছি এই উৎপাতের জন্যে আমাদের সরকারই দায়ী। আমার কথা যদি তোরা বিশ্বাস না করিস তাহলে আমি তোদের খেয়ে ফেলব।' নেকড়ের বাস্তব বুদ্ধিটা অত্যন্ত প্রখর ছিল; কোনো একটা যুৎসই যুক্তি খাড়া করতে সে পিছপাও হত না।

কাঠঠোকরা পাখি দার্শনিক হয়েই জন্মেছে। সে বলল—আমার কথা যদি ধর তাহলে আমি ওসব অ্যাটমিক থিয়োরিতে বিশ্বাসী নই। আসল কথাটা হল কোনো জিনিস যদি কোনো একরকম হয় তাহলে সেটা সেই রকমই হবে এবং বর্তমানে সত্যিই বড়ো ঠান্ডা পড়েছে।

সত্যিই প্রচণ্ড ঠান্ডা। লম্বা ফার গাছের কোটরে বসে বাচ্চা কাঠবিড়ালিরা নিজেদের গরম রাখার জন্যে পরস্পরের নাক ঘষে দিচ্ছিল। খরগোসেরা নিজেদের গর্তের মধ্যে গুঁড়ি দিয়ে শুয়ে রইল; বাইরে তাকাতে ভরসা পেল না। সেই শীতের রাত্রিতে একমাত্র যাদের বেশ আনন্দ হল তারা হচ্ছে শিংওয়ালা ওই পেঁচারা। তারা তাদের বড়ো-বড়ো হলদে চোখ পাকাতে-পাকাতে বনের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আনন্দে ডাকাডাকি শুরু করল—টু-হুইট! টু-হুইট! কী চমৎকার আবহাওয়া!

আমাদের সেই দুটি কাঠুরে চলছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে আঙুল ঝেড়ে তারা বরফ সরাচ্ছে, আর বিরাটাকার লোহার জুতো ঠুকে বরফের চাঁই ভাঙছে। একবার তারা বরফের

খাদে পড়ে গেল; যখন ওপরে উঠল তখন তারা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। একবার তারা জমাট-বাঁধা জলায় পড়ে গেল। জ্বালানি কাঠগুলি ছিটকে পড়ল তাদের কাঁধ থেকে। আবার সেগুলি কুড়িয়ে বেশ ভালো করে কাঁধে বাঁধতে হল তাদের। একবার তারা পথ হারিয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল; কারণ তারা জানত বরফের মধ্যে যারা ঘুমিয়ে পড়ে তাদের ওপরে বরফ বড়ো নির্দয় ব্যবহার করে। কিন্তু পথিকদের দেবতা সেন্ট মার্টিনের ওপরে বিশ্বাস রেখে ঠিক রাস্তায় ফিরে এল তারা। অবশেষে তারা বনের সীমান্তে এসে হাজির হল। দূরে দেখতে পেল তাদের গ্রামে বাতি জ্বলছে। অরণ্যের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা এতই খুশি হয়ে উঠল সে তারা জোরে-জোরে হাসতে লাগল। তাদের কাছে মনে হলে পৃথিবীটা রূপালি ফুলের মতো; আর চাঁদটি হচ্ছে যেন সোনাল ফুল।

কিন্তু হাসি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করে তারা বেশ মুষড়ে পড়ল। একজনে বলল—আমরা আনন্দ করলাম কেন? জীবনটা তো হচ্ছে ধনীদের জন্যে, আমাদের মতো গরিবদের জন্যে নয়। এর চেয়ে বরং ওই বনের মধ্যে ঠান্ডায় মরে যাওয়াই আমাদের পক্ষে ভালো ছিল অথবা কোনো বন্য জন্তু যদি আমাদের খেয়ে ফেলত তাহলেও আমরা কোনো দুঃখ করতাম না।

তার সঙ্গীটি বলল—ঠিকই বলেছ। কাউকে-কাউকে অনেক জিনিস ঈশ্বর দেন; আবার কাউকে-কাউকে ঈশ্বর কিছুই দেন না। অন্যায়টাই পৃথিবীতে রমরমিয়ে বেড়াচ্ছে। দুঃখ ছাড়া সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার-ও কিছু নেই এ জগতে।

তারা দুজনেই যখন এইভাবে বিলাপ করছিল ঠিক সেই সময় ব্যাপারটা ঘটল। আকাশ থেকে একটা উজ্জ্বল আর সুন্দর নক্ষত্র পৃথিবীর বুকে নেমে এল। তারা অবাক হয়ে দেখল তাদের কাছ থেকে অনতিদূরে একঝাঁক উইলো গাছের পেছনে সেই দ্যুতিময় নক্ষত্রটা পড়ে গেল।

তারা চিৎকার করে উঠল—ওখানে একটা সোনার তাল পড়েছে। আমাদের মধ্যে যে দেখতে পাবে ওটা হবে তারই।

এই বলেই তারা ছুটতে শুরু করল। সোনার লোভ তাদের এত!

তাদের মধ্যে একজন দৌড়ে তার সঙ্গীকে টপকে উইলো গাছগুলির ওপাশে হাজির হল; সত্যিই তো সাদা বরফের ওপরে একটা সোনার জিনিস পড়ে রয়েছে। এই দেখেই সে জিনিসটার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার ওপরে হাত রাখল। সেটা সোনালি আলখাল্লায় মোড়া; সেই আলখাল্লার ওপরে তারকা চিহ্ন রয়েছে অনেগুলি। জিনিসটা সেই আলখাল্লা দিয়ে বেশ ভালো করে জড়ানো। এই দেখেই সে তার সঙ্গীকে চিৎকার করে ডাকল। সঙ্গীটি এলে তারা দুজনে পাটের পর পাট খুলতে লাগল। তারা ঠিক করেছিল ভেতরে যদি কিছু সোনা-দানা থাকে তাই তারা ভাগ করে নেবে। কিন্তু হায়রে কপাল! সেই ভাঁজ খুলে তারা না পেল কোনো সোনা, না পেল কোনো রুপো; এমন কি মূল্যবান কোনো ধাতুও দেখতে পেল না তারা। যা দেখল তা হচ্ছে একটা ছোট্ট শিশু। শিশুটা ঘুমোচ্ছে।

এই দেখে একজন আর একজনেকে বলল—কী তিক্তভাবেই না আমাদের আশার পরিসমাপ্তি হল! কিছুই লাভ হল না আমাদের। কারণ, মানুষের কাছে শিশুর দাম কী? একে এখানেই ফেলে রেখে যাই চল। আমরা গরিব লোক। আমাদের ছেলেও কম নেই, তাদের খাবার থেকে কিছুটা কেটে একে খাওয়াতে আমরা পারব না।

কিন্তু তার সঙ্গীটি বলল—উঁহু। শিশুটিকে এইভাবে মৃত্যুর মুখে ফেলে যাওয়াটা খারাপ হবে। যদিও তোমার মতোই আমিও গরিব, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে যদিও আমার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না, তবুও একে আমি বাড়িতে নিয়ে যাই। আমার স্ত্রী একে দেখবে।

এই বলে পরম যত্নে শিশুটি সে কোলে তুলে নিল, ঠান্ডার হাত থেকে তার নরম দেহটাকে বাঁচানোর জন্যে সেই আলখাল্লাটা দিয়ে বেশ ভালো করে তাকে জড়াল, তারপরে তার বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। তার এই মূর্খতা আর নরম হৃদয় দেখে তার সঙ্গীটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

তার স্ত্রী দরজা খুলে দিল। স্বামী নিরাপদে ফিরে এসেছে দেখে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে সে চুমু খেল, তার কাঁধ থেকে খুলে নিল জ্বালানি কাঠ, জুতো থেকে সরিয়ে দিল। বরফের কুচি; তারপরে ভেতরে আসতে বলল তাকে।

কিন্তু সে তার স্ত্রীকে বলল—বন থেকে আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে এনেছি। আমার ইচ্ছে তুমি এর যত্ন নেবে।

তার স্ত্রী আনন্দে বলে উঠল—কী এনেছ—দেখি, দেখি! ঘরে আমাদের অনেক কিছু জিনিসের অভাব রয়েছে।

এই কথা শুনে সে আলখাল্লাটা সরিয়ে ঘুমন্ত শিশুটিকে দেখাল।

স্ত্রী তো রেগে গরগর করে উঠল—এ কী করেছ তুমি! শিশু! আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েকেই কি কম যে আর একজনকে তাদের খাবারের ভাগ দিতে হবে! তাছাড়া, কে জানে ও আমাদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে কি না। আর ওকে মানুষই বা আমরা করব কী করে?

সে বলল—কোনো দুর্ভাগ্য আনবে না; কারণ ও একটি দেবকুমার।

এই বলে সে সেই অদ্ভুত কাহিনিটি তার কাছে বর্ণনা করল।

কিন্তু স্ত্রীকে খুশি করা গেল না। সে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল—আমাদের ছেলেমেয়েদেরই খাবার নেই; আবার পরের ছেলে এনেছে! এ-বিশ্বে আমাদের জন্যে ভাবনা করে কে? কে আমাদের খাবার দেয়?

সে বলল—চড়াই পাখিদের কথাও ঈশ্বর ভাবেন, তাদেরও খেতে দেন তিনি।

কিন্তু শীতকালে খেতে না পেয়ে সেই চড়াইরাও কি মারা যায় না? আর এখন কি সেই শীতকাল নয়?

লোকটি কোনো উত্তর দিল না; চৌকাঠ থেকে ভেতরেও ঢুকল না। বাইরে থেকে ঠান্ডা কনকনে বাতাস এসে তার স্ত্রীকে কাঁপিয়ে দিতে লাগল। কাঁপতে-কাঁপতে তার স্ত্রী বলল—তুমি কি দরজাটা বন্ধ করবে না? বাইরে থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। আমি জমে গেলাম যে।

সে জিজ্ঞাসা করল—যে বাড়িতে কঠিনহৃদয় মানুষ বাস করে সেখানে সব সময় কি ঠান্ডা কনকনে বাতাসে বয় না?

কোনো উত্তর না দিয়ে তার স্ত্রী আগুনের ধারে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে

তার দিকে চাইল। তার চোখ দুটি তখন জলে ভরে উঠেছে। এই দেখে সে চট করে ভেতরে ঢুকে এসে শিশুটিকে তার কোলে দিয়ে দিল। সে শিশুটিকে চুমু খেয়ে তার সবচেয়ে বাচ্চা ছেলেটির পাশে শুইয়ে দিল। পরের দিন সকালে কাঠুরে সোনার তৈরি সেই অদ্ভুত পোশাকটিকে তাদের বড়ো সিন্দুকটার ভেতরে রেখে দিল। শিশুটির গলায় হলদে রঙের যে হারটা ছিল তার স্ত্রী সেটাও খুলে নিয়ে সেই সিন্দুকটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

এইভাবে কাঠুরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেই দেবকুমারটি বাড়তে লাগল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্যও বাড়তে লাগল। গাঁয়ের সবাই তার সেই সুন্দর চেহারার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু সেই সৌন্দর্যই তার কাল হল। কারণ সে খুব গর্বিত, নিষ্ঠুর আর সেই সঙ্গে স্বার্থপর হয়ে উঠল। কাঠুরের আর অন্যান্যদের ছেলেমেয়েদের সে ঘৃণা করতে লাগল। তার নিজের জন্ম হয়েছে নক্ষত্রলোক থেকে আর তারা সবাই অশিক্ষিত বংশের এই কথা বলে তাদের ওপর সে প্রভুত্ব বিস্তার করল—তাদের দেখতে লাগল চাকর-বাকরের মতো। যারা দরিদ্র, অন্ধ অথবা বিকলাঙ্গ তাদের ওপরে তার কোনো মমতা ছিল না। তাদের দেখলেই সে ঢিল মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিত। ফলে, এক ডাকাত ছাড়া আর কেউ তাদের গ্রামে আসতে সাহস করত না। নিজের সৌন্দর্যে সে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে পাদরির পাতকুয়ার ধারে গিয়ে জলের ভেতরে সারাদিনই প্রায় সে নিজের মুখ দেখত, আর তারিফ করত নিজের সুন্দর মুখমণ্ডলকে।

কাঠুরে আর তার স্ত্রী এই জন্যে তাকে প্রায়ই তিরস্কার করে বলত—দুঃস্থদের সঙ্গে তুমি যেরকম ব্যবহার কর, আমরা তো তোমার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করি নে। যারা করুণার পাত্র তাদের সঙ্গে তুমি অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কর কেন?

পাদরি তাকে প্রায়ই ডেকে এনে বলতেন—মাছিও তোমার ভাই, তাদের তুমি কোনো ক্ষতি করো না। বনের পাখিদেরও স্বাধীনতা রয়েছে। স্ফূর্তির জন্যে তুমি তাদের জাল পেতে ধরো না। কানা, খোঁড়া, ছুঁচো—সবাইকেই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্বে তাদেরও একটা জায়গা রয়েছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই অনাচার করার তোমার অধিকার কী রয়েছে? এমন কি মাঠের গবাদি পশুরাও ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে।

কিন্তু কোনো উপদেশই তার কানে ঢুকল না। নিজেকে সে এতটুকুও শোধরাল না। সে আগের মতোই সকলের ওপরে প্রভুত্ব করতে লাগল। সে যখন ছুঁচোর চোখে কাঠি ঢুকিয়ে দিত, অথবা কুষ্ঠরোগীকে ঢিল ছুঁড়ে মারত, তখন তারাও হাসত। এইভাবে গ্রামের ছেলেরাও তার মতো নির্দয় হয়ে উঠল।

একদিন গ্রামের পথ দিয়ে একটি ভিক্ষুক-রমণী যাচ্ছিল। তার পোশাক ছিঁড়ে গিয়েছিল, রাস্তা দিয়ে হাঁটার ফলে পা দিয়ে তার রক্ত পড়ছিল। তার অবস্থাটা সত্যিই বড়ো খারাপ দেখাচ্ছিল। ক্লান্ত হয়ে একটি বাদাম গাছের তলায় বসে সে বিশ্রাম করছিল।

তাকে দেখে সেই দেবকুমার তার সঙ্গীদের বলল—ওই সুন্দর গাছের তলায় একটা নোংরা কদর্য চেহারার ভিখিরি বসে রয়েছে দেখ। এস, ওকে আমরা তাড়িয়ে দিই।

এই বলে দলবল নিয়ে সে সেই মেয়েটির দিকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করল; বিদ্রূপ করতে লাগল তাকে। মেয়েটি সরে গেল না; একটা ভয়ার্ত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কাঠুরে পাশেই কাঠ চিরছিল। এই দেখে সে দৌড়ে এসে তাকে বকতে লাগল—কী নিষ্ঠুর তুমি? দয়ামায়ার বাষ্পও তোমার মধ্যে নেই। এই মেয়েটি তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি।

এই শুনে দেবকুমার রেগে মাটিতে পা ঠুকে বলল—আমার কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়ার কী অধিকার তোমার রয়েছে শুনি? আমি তোমার ছেলে নই যে তোমার হুকুম মানব।

কাঠুরে বলল—সেকথা সত্যি। কিন্তু তোমাকে যখন বনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম তখন তোমাকে আমিই দয়া করেছিলাম।

সেই মেয়েটি এই কথা শুনেই চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। কাঠুরে তাকে নিজের ঘরে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেবা!যত্ন করল। মূর্ছা ভাঙার পরে সে উঠে বসল; তখন মাংস, দুধ আর খাবার দিয়ে কাঠুরে আর তার স্ত্রী তার সেবা-যত্ন করল।

কিন্তু সে কিছুই খেল না; কাঠুরেকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি বলছিলে না যে শিশুটিকে তুমি বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছ? আর সেটা কি আজ থেকে বছর দশেক আগে নয়?

কাঠুরেটি উত্তর দিল—হ্যাঁ। বনের মধ্যেই ওকে আমি কুড়িয়ে পেরেছিলাম। আর সেও প্রায় দশ বছর আগেই।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল—ওর দেহে কী কী চিহ্ন ছিল? ওর গলায় কি হলদে রঙের একটা হার ছিল না? ওর গায়ে কি সোনা দিয়ে মোড়া আর তারকা চিহ্ন দিয়ে খচিত একটা আলখাল্লা ছিল না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক—ঠিক। যা বললে ঠিক তাই।

এই বলে সে সিন্দুক থেকে বার করে এনে সেগুলি তাকে দেখাল।

সেইগুলি দেখে মেয়েটি আনন্দে কাঁদতে লাগল। বলল, ওই আমার সেই শিশু। ওকেই আমি বনের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তোমাকে অনুরোধ করছি ওকে এখনই ডেকে পাঠাও। ওরই জন্যে আজ আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সুতরাং কাঠুরে আর তার স্ত্রী সেই দেবকুমারকে ডেকে নিয়ে এসে বলল—ঘরে যাও। সেখানে তোমার মা বসে রয়েছেন দেখতে পাবে।

এই কথা শুনে আনন্দে নাচতে-নাচতে দেবকুমার ঘরে দৌড়ে এসে তাকে দেখল; তারপরে ঘৃণার সঙ্গে হাসতে-হাসতে বলল—কই, কোথায় আমার মা? কারণ, এখানে তো সেই নোংরা ভিখিরি মেয়েটা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি নে।

ভিখিরি মেয়েটি বলল—আমিই তোমার মা।

দেবকুমার রেগে চিৎকার করে উঠল—তুমি উন্মাদ। তাই একথা বলছ। তোমার মতো নোংরা ভিখিরির ছেলে আমি নই। বেরিয়ে যাও। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই নে।

না-না। তুমি আমার ছেলে। তোমাকে নিয়ে আমি বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। ডাকাতরা তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওইখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। তোমার গায়ে যে সব চিহ্ন ছিল সেগুলিও আমি চিনেছি। অনুরোধ করছি, তুমি আমার সঙ্গে এস। চল পুত্র; তোমার স্নেহের ভিখারি আমি।

কিন্তু দেবকুমারকে নড়ানো গেল না। তার মায়ের কান্নাও তার মনে কোনো করুণার উদ্রেক

করতে পারল না। ভিখারিণী যন্ত্রণায় কেবল কাঁদতে লাগল।

শেষকালে সে কথা বলল; বেশ রুক্ষ আর তিক্ত তার স্বর—যদি সত্যিই তুমি আমার মা হও তাহলে তোমার উচিত ছিল আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকা। এভাবে আমার জীবনে কলঙ্কের ছাপ দিতে আসা উচিত ছিল না তোমার। ভেবেছিলাম আমি কোনো দেবদূত—তোমার কাছে এখন যা শুনছি—কোনো ভিখারিণীর ছেলে আমি। সুতরাং তুমি এখান থেকে দূর হয়ে যাও। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই নে।

ভিখারিণী কেঁদে বলল—হায় পুত্র, চলে যাওয়ার আগে তুমি কি আমাকে একটা চুমুও খাবে না?

সে বলল—না, তুমি দেখতে বড়ো কুচ্ছিত। তোমাকে চুমু খাওয়ার চেয়ে আমি বরং সাপকে চুমু খাব, চুমু খাব পথের ধুলোকে।

সুতরাং ভিখারীণী কাঁদতে-কাঁদতে বনের দিকে চলে গেল। সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে দেখে দেবকুমার খুব খুশি হয়ে তার সঙ্গীদের কাছে খেলতে ছুটে গেল।

কিন্তু তারা তাকে বিদ্রূপ করে বলল—তুমি কটকটে ব্যাঙের মতো বিশ্রী দেখতে; সাপের মতো ঘৃণ্য। এখানে থেকে দূর হয়ে যাও। আমরা তোমার সঙ্গে খেলব না।

এই কথা শুনে দেবকুমার ভ্রূ কুঁচকে নিজের মনে বলল—এরা বলে কী? আমি পাতকুয়ার কাছে গিয়ে জলের দিকে তাকাব; পাতকুয়ার জলই বলে দেবে আমি কত সুন্দর।

এই পাতকুয়ার কাছে গিয়ে সে জলের দিকে তাকাল। হায়, হায়! তার মুখ হয়েছে কটকটে ব্যাঙের মুখের মতো; তার গায়ে গজিয়েছে সাপের গায়ের মতো আঁশ। এই দেখেই ঘাসের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে বলল—নিশ্চয়ই এটা আমার পাপের ফল। অস্বীকার করে আমি আমার মাকে তাড়িয়ে দিয়েছি! আমি দাম্ভিত; মায়ের ওপরে আমি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। যতদিন না আমি মাকে খুঁজে পাই ততদিন সারা বিশ্ব আমি ঘুরে বেড়াব; বিশ্রাম নেব না এতটুকু।

কাঠুরের বাচ্চা মেয়েটি তার কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বলল—তুমি কেঁদ না, আমাদের কাছে তুমি থাক; আমি তোমাকে ঠাট্টা করব না।

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বলল—না। মায়ের ওপরে আমি দুর্ব্যবহার করেছি। তাই তাঁকে খোঁজার জন্যে আমি সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াব। কোথাও থামব না।

এই কথা বলেই তার মাকে ডাকতে-ডাকতে সে বনের দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিলন না। সারা দিন ধরেই সে চেঁচাতে লাগল; তারপরে রাত্রি নেমে এলে সে শুকনো পাতা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু পশু-পাখিরাও তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল। কারণ তার নিষ্ঠুরতার কথা তারাও জানত। তার সঙ্গী হয়ে রইল কেবল কটকটে ব্যাঙ আর সাপের দল।

সকাল হল। গাছ থেকে কিছু তেতো ফল তুলে সে চিবোল; তারপরে ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে সে আবার বিরাট বনের ভেতর দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

একটা ছুঁচোকে সে জিজ্ঞাসা করল—তুমি তো মাটির নীচে যেতে পার। আমার মা সেখানে আছে কি না বলতে পার?

ছুঁচো বলল—তুমি আমার চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিয়েছ। আমি জানব কেমন করে?

লিনেট পাখিকে সে জিজ্ঞাসা করল—তুমি লম্বা গাছের ওপর দিয়ে উড়ে গোটা পৃথিবীকে দেখতে পাও। আমার মাকে তুমি দেখেছ?

লিনেট বলল—আমার ডানা দুটো কেটে তুমি আনন্দ করেছ। আমি উড়বো কেমন করে?

ফার গাছের কোটরে নিঃসঙ্গভাবে যে বাচ্চা কাঠবিড়ালি থাকত তাকে সে জিজ্ঞাসা করল—আমার মা কোথায়?

কাঠবিড়ালি উত্তর দিল—আমার মাকে তুমি মেরে ফেলেছ। তোমার মাকেও কি মারতে চাও?

এই কথা শুনে লজ্জায় মাথা নীচু করে দেবকুমার কাঁদতে লাগল; ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল; তারপরে সেই ভিখারিণীকে খুঁজে বার করার জন্যে বনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। তৃতীয় দিনের বনের শেষ প্রান্তে সে এসে পৌঁছল; তারপরে নেমে গেল সমতলভূমিতে। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলার সময় ছেলেমেয়েরা তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল—তার দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। কেউ তাকে মাঠে-ঘাটে রাত্রে শুতে দিল না। এমন কুৎসিত তার চেহারা হয়েছিল যে কেউ তার ওপরে একটু করুণাও দেখাল না। তিনটি বছর এইভাবে সে তার ভিখারিণী মায়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াল। কোথাও তাকে খুঁজে পেল না। মাঝে-মাঝে তার মনে হত তার মা সামনে এগিয়ে চলেছে। এই দেখে সে তার পিছু পিছু দৌড়ে যেত; কিন্তু পথের ওপরে শক্ত পাথর লেগে তার পা যেত ছিঁড়ে। কিন্তু সে তাকে ধরতে পারত না। পাশাপাশি যারা থাকত তারা অবশ্য স্বীকার করত যে ওই রকম একটি ভিখারিণীকে তারা দেখেছে কিন্তু কোথায় সেই ভিখারিণী? দুঃখে ভেঙে পড়ত সে।

একদিন একটি নদীর ধারে এক শহরের ফটকের কাছে এসে সে দাঁড়াল। শহরের চারপাশটা শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ক্লান্ত আর পায়ে ঘা হওয়া সত্ত্বেও সে শহরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু পাহারাদার সৈন্যরা তাদের তরোয়াল উঁচিয়ে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করল—শহরে তোমার কী দরকার?

সে বলল—আমার মাকে খুঁজছি। সে সম্ভবত এইখানে আছে। দয়া করে আমাকে ঢুকতে দিন।

কিন্তু তারা তাকে বিদ্রূপ করল। একজন তার কালো দাড়ি নেড়ে বলল—সত্যি কথা বলতে কি যা তোমার চেহারা না—কটকটে ব্যাঙ আর সাপও তোমাকে দেখে ভির্মি যাবে। ভাগো—ভাগো। তোমার মা এখানে নেই।

আর একজন জিজ্ঞাসা করল—তোমার মা কে?

সে বলল—আমারই মতো একজন ভিক্ষুক। আমি তার সঙ্গে বড়োই দুর্ব্যবহার করেছি। দয়া করে আমাকে ভেতরে যেতে দাও। তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে আমাকে।

তারা তো তাকে যেতে দিলই না, অধিকন্তু তাদের বর্শা দিয়ে তাকে খোঁচা দিল।

সে কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছিল এমন সময় বর্ম-পরা একটি বীরপুরুষ তাদের সামনে এসে হাজির হল। তার বর্মের ওপরে সোনার ফুল বসানো, আর শিরস্ত্রাণের ওপরে আঁকা শায়িত সিংহের একটি ছবি। সে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করল—কে ভেতরে যেতে চাইছিল?

তারা বলল—ও একটা ভিখিরি। ওকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।

সে হেসে বলল—উঁহু। ওকে আমরা এক ভাঁড় মিষ্টি মদের দামে ক্রীতদাস হিসেবে বেচে দেব।

একটা কুৎসিত বীভৎস চেহারার লোক সেই সময় ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এই কথা শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল—ওই দামে আমি ছেলেটাকে কিনব। এই বলে মদের দাম দিয়ে তাকে সে কিনে হাত ধরে শহরের ভেতরে ঢুকে গেল। শহরের অনেক রাস্তা পেরিয়ে তারা একটা ছোটো দরজার কাছে এসে থামল। একটা দেওয়ালের গায়ে দরজাটা বসানো ছিল। দেওয়ালটাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল একটা ডালিম গাছ। বুড়ো লোকটা দরজা খুলল। তারপরে দুজনে ব্রাশের তৈরি পাঁচটা সিঁড়ি পেরিয়ে একটা বাগানে এসে হাজির হল। আফিং গাছে আর পোড়া মাটির সবুজ জার-এ বোঝাই ছিল বাগানটা। সেই বুড়োটা তার পাগড়ির ভেতর থেকে একটা সিল্কের রুমাল বার করে তার চোখ দুটো বেঁধে দিল; তারপরে, তার চোখ দুটো বেঁধে তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলল। রুমালটা সরিয়ে নেওয়ার পরে সে দেখল একটা গুহার মতো জায়গায় সে এসে পড়েছে। সেখানে শিঙের একটা লন্ঠন জ্বলছে।

তখন বুড়ো লোকটা একটি পাত্রে ছাতাপড়া একটুকরো রুটি তার সামনে ধরে বলল—খাও; আর একটা কাপে কালো একটু জল দিয়ে বলল—পান কর। খাওয়া শেষ হওয়ার পরে বুড়ো লোকটা তাকে লোহার চেন দিয়ে বাঁধল; তারপরে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওই বুড়োটা ছিল লিবিয়ার একটু চতুরতম যাদুকর। যার কাছ থেকে সে যাদুবিদ্যা শিখেছিল সেই লোকটা থাকত নীল নদের ধারে একটা কবরখানার ভেতরে। পরের দিন সকালে সেই যাদুকর এল, মুখ বাঁকিয়ে বলল—এই শহরের ফটকের কাছাকাছি একটা বন রয়েছে। সেই বনে তিন তাল সোনা রয়েছে। একটা সাদা, একটা হলদে, আর একটা লাল। আজ তুমি সেই সাদা সোনার তালটা নিয়ে আসবে। আনতে না পারলে, তোমাকে একশোবার চাবুক মারা হবে। তাড়াতাড়ি যাও। সন্ধের সময় এইখানে তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।

এই বলে তার চোখে সেই সিল্কের রুমালটা বেঁধে ঘর পেরিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে দরজার বাইরে নিয়ে এসে চোখ খুলে দিয়ে বলল—যাও।

সেই দেবকুমার শহরের ফটকের কাছে এল; তারপরে যাদুকর যে-বনটার কথা তাকে বলেছিল সেই বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

বাইরে থেকে দেখতে বনটি বড়ো সুন্দর ছিল। কত পাখি গান করছিল সেখানে, কত সুগন্ধী ফুলের সমারোহ জেগেছিল চারপাশে। কিন্তু এত সৌন্দর্যও কোনো কাজে এল না তার। কারণ যে-পথ দিয়েই সে হাঁটতে লাগল সেই পথেই রাশি রাশি কাঁটা গাছ তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। তাছাড়া সেই সোনার তালটারও কোনো হদিস পেল না সে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সন্ধেবেলা ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে সে বাড়ির দিকে ফিরল। সেদিন তার কপালে কী আছে তা সে জানত।

যখন সে বনের ধারে এসে পৌঁছেছে এমন সময় পেছনে ঝোপের ভেতর থেকে কে যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। নিজের দুঃখ ভুলে গিয়ে সে দৌড়ে গেল সেইদিকে; দেখল একটা খরগোস

ব্যাধের জালে আটকা পড়ে চিৎকার করছে।

তার দয়া হল খরগোসটার উপরে। সে তাকে জাল থেকে মুক্ত করে বলল—আমি একজন ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু নই। তবু তোমাকে আমি মুক্ত করে দিলাম।

তখন খরগোস বলল—সেকথা নিশ্চয় সত্যি। প্রতিদানে তোমাকে আমি কী দেব?

দেবকুমার বলল—আমি একটা সাদা সোনার তাল খুঁজছি। কিন্তু কোথাও পাচ্ছি নে। ওটা নিয়ে না গেলে আমার মনিব আমাকে খুব মারবে।

খরগোস বলল—আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। সেটা কোথায় আর কী উদ্দেশ্যে রয়েছে তা আমি জানি।

সুতরাং দেবকুমার খরগোসের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল। সত্যিই তো! বিরাট একটা ওক গাছের কোটরে সাদা সোনার একটা ছোটো তাল রয়েছে। সেইটাকেই সে খুঁজতে এসেছিল। আনন্দে আত্মহারা সেই সোনার তালটাকে নিয়ে সে খরগোসকে বলল—তোমার যে উপকার আমি করেছি তার অনেক অনেক বেশি উপকার তুমি আমার করলে। যে দয়া তোমাকে আমি দেখিয়েছি, তুমি তার শতগুণ বেশি দয়া আমাকে দেখালে।

খরগোস বলল—উঁহু! তুমি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছ আমিও তোমার সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যবহার করেছি।—এই বলে সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। দেবকুমারও এগিয়ে গেল শহরের দিকে।

শহরের ফটকের কাছে একটা কুষ্ঠরোগী বসেছিল। ধূসর রঙের একটুকরো কাপড়ের ফালি দিয়ে তার মাথাটা ঢাকা ছিল। সেই কাপড়ের ফুটো দিয়ে তার চোখ দুটো জ্বলছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। তাকে আসতে দেখে সেই লোকটা কাঠের পাত্রের ওপরে শব্দ করে বলল—আমাকে কিছু অর্থ দাও। না খেয়ে আমি মারা যাচ্ছি। ওরা আমাকে শহরের বাইরে বার করে দিয়েছে। এমন কেউ নেই যে আমাকে একটু দয়া করে।

দেবকুমার বলল—হায়, হায়! আমার কাছে একটুকরো সোনা রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা যদি আমার মনিবের কাছে নিয়ে না যাই তাহলে সে আমাকে খুব মারবে; কারণ, আমি তার ক্রীতদাস।

কিন্তু কুষ্ঠরোগীরটা তাকে সেটা দেওয়ার জন্যে বড়োই অনুরোধ করতে লাগল। শেষকালে সে তার সেই সোনার টুকরোটা না দিয়ে পারল না।

যাদুকর তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল—তুমি সেই সাদা সোনার তালটা নিয়ে এসেছ?

দেবকুমার বলল—না।

এই শুনে যাদুকর তাকে বেদম প্রহার করতে লাগল। তারপরে একটা শূন্য খাবার থালা তার শূন্য কাপ তার সামনে রেখে বলল—খাও।

পরের দিন সকালে সেই যাদুকর এসে বলল—আজ যদি তুমি সেই হলদে সোনার টুকরোটা না আনতে পার তাহলে তোমাকে আমি চিরকাল আমার চাকর করে রাখব; আর চাবুক

খাবে তিনশটি।

দেবকুমার আবার সেই বনে ফিরে গেল; সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হলদে সোনার খোঁজে বৃথাই সে খুঁজে বেড়াল। সূর্যাস্তের সময় একটা পাথরের ওপরে বসে সে যখন কাঁদছে এমন সময় সেই বাচ্চা খরগোসটা তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

সে বলল—আমি খুঁজছি হলদে সোনার তাল। এইখানেই কোথাও সেটা লুকানো রয়েছে। সেটা নিয়ে না গেলে আমার মনিব আমাকে খুব মারবে। আমি তার কেনা চাকর কি না।

খরগোস বলল—'আমার সঙ্গে এস।' এই বলে দৌড়তে-দৌড়তে সে একটা জলাশয়ের ধারে এসে পৌঁছল। সেই জলাশয়ের তলায় হলদে সোনার তালটা ছিল।

দেবকুমার বলল—তোমাকে আমি কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি নে। এই দ্বিতীয়বার তুমি আমাকে বাঁচালে।

খরগোস বলল—ও কথা বলো না। তুমিই তো আমাকে প্রথম দয়া করেছিলে।—এই বলে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

ফটকের কাছে আবার সেই কুষ্ঠরোগীটার সঙ্গে দেখা। তাকে দেখেই সে দৌড়ে তার কাছে এগিয়ে এসে কাতর স্বরে ভিক্ষে চাইল। তার অনুরোধ এড়াতে না পেরে দেবকুমার তাকে সেই হলদে সোনার টুকরোটা দিয়ে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে এল।

শূন্য হাতে ফিরে এসেছে দেখে যাদুকর তাকে বিষম প্রহার করল; তারপরে শেকল দিয়ে তাকে বেশ ভালো করে বেঁধে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেল।

পরের দিন যাদুকর আবার এল; বলল—আজ যদি তুমি সেই লাল সোনার তালটা নিয়ে আসো তাহলে তোমাকে আমি মুক্তি দেব; যদি না আন, তাহলে তোমাকে নির্ঘাৎ খুন করে ফেলব।

আবার সে সেই বনের মধ্যে গেল। আবার সারাদিন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। আবার সন্ধের সময় একটা পাথরের ওপরে বসে কাঁদতে লাগল। তারপরে এল সেই বাচ্চা খরগোস। সব শুনে সে বলল—তোমার পেছনে যে গুহা রয়েছে তারই মধ্যে তো সেটা রয়েছে।

লাল সোনার তালটা নিয়ে সে বলল—বারবার তিনবার আমাকে তুমি বাঁচালে।

খরগোস বলল—উঁহু! তুমি আমাকে প্রথমে বাঁচিয়েছিলে যে!—এই বলেই সে ছুটে পালিয়ে গেল।

আবার সেই কুষ্ঠরোগী তার রাস্তার ওপরে গিয়ে দাঁড়াল, বলল—আমাকে ওটা দাও। না হলে আমি খিদেয় মারা যাব।

দেবকুমার বলল—তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশি। সুতরাং তুমিই এটা নাও।

সোনাটুকু সে দিয়ে দিল বটে; কিন্তু তার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল। তার কপালে যে কী রয়েছে তা সে জানত।

কিন্তু কী আশ্চর্য! শহরের ফটকের পাশ দিয়ে সে যখন এগিয়ে যেতে লাগল তখন

সেপাই-সান্ত্রীর দল মাথা নীচু করে তাকে সম্মান জানাল; চেঁচিয়ে বলল—আমাদের প্রভু কী সুন্দর দেখতে! শহরবাসীরা তার পিছু-পিছু হাঁটতে-হাঁটতে বলতে লাগল—সত্যিই এত সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে আর নেই।

দেবকুমার কাঁদতে-কাঁদতে ভাবল—নিশ্চয় ওরা আমার ঠাট্টা করছে। তাকে দেখার জন্যে এত লোকের ভিড় হল যে সে পথ হারিয়ে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে হাজির হল। রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা দরজা খুলে দিল। পুরোহিত আর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা দৌড়ে এলেন তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে; বললেন—আপনিই আমাদের প্রভু। আপনার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি। আপনিই আমাদের রাজার কুমার।

দেবকুমার বলল—আমি কোনো রাজার কুমার নই। আমি হচ্ছি ভিখারিণীর ছেলে। আমি দেখতে কুৎসিত। আপনারা আমাকে সুন্দর বলছেন কেন?

এই শুনে সেই লোকটা যার বর্মের ওপরে সোনার ফুল আঁকা ছিল, আর শিরস্ত্রাণের উপরে ছিল শায়িত সিংহের ছবি—তার ঢালটাকে দেবকুমারের মুখের সামনে তুলে ধরে বলল—প্রভু যে সুন্দর নন সেকথা কেমন করে তিনি বললেন?

দেবকুমার সেই ঢালের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে অবাক হয়ে গেল; সত্যিই তো! তার সৌন্দর্য ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে তার লাবণ্য আর সুষমা।

রাজপুরুষেরা বলল—পুরাকালের ভবিষ্যৎবাণী হচ্ছে আজকের দিনে আমাদের রাজা ফিরে আসবেন। তিনিই আমাদের দেশ শাসন করবেন। অতএব আপনি এই রাজদণ্ড আর মুকুট গ্রহণ করুন। ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করুন আমাদের দেশ।

কিন্তু সে তাদের বলল—না, না। আমি এসবের যোগ্য নই। যে মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন আমি তাঁকে অস্বীকার করেছি। যতদিন না তাঁকে আমি খুঁজে পাচ্ছি, যতদিন না তিনি আমাকে ক্ষমা করছেন ততদিন পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই। সুতরাং আমাকে যেতে দিন। ওই রাজদণ্ড আর মুকুট দিলেও আমি এখানে থাকতে পারব না।

এই কথা বলে সে রাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এই রাস্তাটাই সোজা শহর-ফটকের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই রাস্তা দিয়ে সেই ভিখারিণীটি তার দিকে এগিয়ে এলেন; আর তাঁরই পাশে সেই কুষ্ঠরোগী।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করতে-করতে সে দৌড়ে গেল তাঁর কাছে; মায়ের ক্ষতকে চুম্বন করে চোখের জলে ভিজিয়ে দিল তাঁর পা দুটি। ধুলোর মধ্যে মাথাটা রেখে বলল—মা, দম্ভে একদিন তোমাকে আমি অগ্রাহ্য করেছিলাম। সে-দম্ভ আজ আমার নেই। এখন আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

সেই ভিখারিণী কোনো উত্তর দিল না।

সে তখন সেই কুষ্ঠরোগীর সাদা পা দুটো দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বলল—তিনবার তোমাকে আমি দয়া করেছি। আমার সঙ্গে কথা বলতে তুমি নির্দেশ দাও মাকে।

কিন্তু কুষ্ঠরোগীটি একটিও কথাও বলল না।

আবার সে কাঁদতে লাগল—মা, এ দুঃখ আমি আর সহ্য করতে পারছি নে। আমাকে ক্ষমা কর। আবার আমি বনে ফিরে যাই।

এবার সেই ভিখারিণীটি তার মাথার ওপর হাত রেখে বললেন—ওঠ।

সেই কুষ্ঠরোগীটিও তার মাথার ওপরে হাত রেখে বললেন—ওঠ।

সে উঠল। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাঁরাই হচ্ছেন রাজা এবং রানি।

রানি বললেন—ইনিই তোমার পিতা। এঁকেই তুমি সাহায্য করেছিলে।

রাজা বললেন—ইনিই তোমার মা। এঁরই পা দুটি তুমি চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিলে।

তাঁরা তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন। রাজপ্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাজপোশাক পরালেন। হাতে দিলেন রাজদণ্ড; মাথায় দিলেন রাজমুকুট। ন্যায়পরায়ণতা আর সততার সঙ্গে রাজত্ব করতে লাগল সে। সেই দুষ্ট যাদুকরকে নির্বাসিত করল। সেই কাঠুরে, তার স্ত্রী আর তাদের ছেলেমেয়েদের উপঢৌকন পাঠাল প্রচুর। পশু-পাখি-মানুষ কারও ওপরে যাতে কেউ নির্দয় ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে সজাগ রইল। দেশের মধ্যে সুখ-শান্তি আর ঐশ্বর্য উথলে পড়ল।

কিন্তু জীবনে সে এত কষ্ট পেয়েছিল যে বেশি দিন সে বাঁচল না। তিন বছর পরেই সে মারা গেল। তারপর যে রাজা হল সে বেশ নির্দয়ভাবেই রাজ্য শাসন করতে লাগল।

স্পেনীয় রাজকুমারীর জন্মতিথি
The Birth day of the Infanta

রাজকুমারীর জন্মদিন। রাজকুমারীর বয়স মাত্র বারো। রাজপ্রাসাদের বাগানগুলিতে জোরাল সূর্যের আলো পড়েছে। সত্যিকারের রাজকুমারী এবং স্পেনের ইনফ্যানটা হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের মতোই বছরে তারও কেবল একদিনই জন্মতিথি পালিত হত। যাতে এই দিনটি বেশ সুন্দর ভাবে উদ্‌যাপিত হয়, সেই জন্যেই সারা দেশই আনন্দে মুখর হয় উঠতো। আর দিনটি সত্যিই বড়ো সুন্দর হয়ে উঠেছিল। লম্বা লম্বা সুন্দর টিউলিপ ফুলগুলি ডাঁটা ওপরে মাথা উঁচু করে ঘাসের বনে ওপাশ থেকে গোলাপের দিকে তাকিয়ে বলল—আমরাই বা কমতি কিসের? বেগুনে রঙের প্রজাপতি পাখায় স্বর্ণরেণু মিশিয়ে এ-ফুল থেকে ও-ফুলের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেওয়ালের ফাটল থেকে টিকটিকিরা উঁকি দিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। ডালিম ফলগুলি গরমে ফেটে পড়ায় তাদের রক্তাক্ত হৃদয়গুলি বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। চারপাশে আনন্দ আর উত্তেজনার ঢল নেমেছে। বাতাস সুগন্ধের প্রাচুর্যে উঠেছে ভারী হয়ে।

সঙ্গীদের নিয়ে বাচ্চা রাজকুমারী অলিন্দের ওপরে লুকোচুরি খেলছে। সাধারণত নিজের পদমর্যাদার উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই তাকে খেলা করতে দেওয়া হয়। ফলে তাকে একলাই খেলা করতে হয়। কিন্তু এই জন্মদিনটিই যা ব্যতিক্রম। রাজা নির্দেশ দিয়েছেন আজকের দিনে যার সঙ্গে খেলা করতে তার ভালো লাগে রাজকুমারী তাকেই নিমন্ত্রণ করতে পারবে। স্পেনদেশীয় রোগাটে শিশুদের গতির মধ্যে বেশ একটা লাবণ্য রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে লাবণ্যময়ী হচ্ছে রাজকুমারী নিজে। একটু বোঝার মতো হলেও পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা তার বেশ মনোমুগ্ধকরই ছিল। ধূসর বর্ণের সাটিনের পোশাক তার গায়ে; রুপো দিয়ে মোড়া বেশ শক্ত গোছের অন্তর্বাস সে পরেছে। সরু ফিতে দিয়ে তৈরি গোলাপ ফুলের নক্‌শা কাটা ছোটো দুটি স্লিপার তার পায়ে। হেঁটে বেড়ানোর সময় বাইরে থেকে সে দুটিকে বেশ ভালো করেই দেখা যাচ্ছে। তার বিবর্ণ মুখের ওপরে চুলের মধ্যে জ্যোতির্মণ্ডলের মতো সুন্দর সাদা গোলাপ শোভা পাচ্ছে।

রাজপ্রাসাদের একটি বাতায়ন কক্ষে বিষণ্ণ রাজা বসে রয়েছেন। এদের সবাইকে তিনি দেখছিলেন, তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ভাই অ্যারাগনের ডন পেড্রো; এই ভাইটিকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর কনফেশার গ্রানাদার গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর বসেছিলেন তাঁর পাশে। অন্যান্য দিনের চেয়ে রাজা আজ বেশি বিষণ্ণ। তাঁর শিশু কন্যাটি তার শিশুসুলভ গাম্ভীর্যে সমবেত পারিষদবর্গকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাচ্ছিল। সেই মেয়েকে দেখতে-দেখতে তিনি তখন তার মা যুবতী রানির কথা চিন্তা করছিলেন। তাঁর মনে হল মাত্র কিছুদিন হল ফ্রান্সের আনন্দোজ্জ্বল দেশ থেকে তিনি এখানকার রানি হয়ে এসেছিলেন। মেয়েটির জন্মের ছ'মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই রানিকে তিনি এতই ভালোবাসতেন যে মৃত্যুর পরে রাজা।

তাঁর মৃতদেহকে কবরস্থ করতে দেননি। একজন মুরদেশের চিকিৎসক তাঁর দেহটিকে ওষুধপত্র দিয়ে অবিকৃত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল। যাদুবিদ্যার প্রয়োগের জন্যে তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু এই কাজের জন্যে রাজা তার মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দিয়েছিলেন। বারো বছর আগে একটি বাত্যামুখর মার্চ মাসে পাদরিরা তাঁর দেহটিকে নিয়ে প্রাসাদের একটি কালো মার্বেল গির্জায় স্থাপন করেছিলেন। কালো পোশাক পরে একটি লন্ঠন হাতে নিয়ে রাজা প্রতি মাসে একবার করে সেখানে গিয়ে সেই দেহটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে 'আমার রানি, আমার রানি,' বলে তাকে ডাকতেন। স্পেনে মানুষের প্রতিটি কাজ করার পেছনে একটা শালীন রীতি রয়েছে—এমন কি রাজার শোকেরও একটা সীমা সেখানে নির্ধারিত রয়েছে—সেই রীতি ভঙ্গ করে মৃতদেহের মণিমুক্তার গয়নাপরা বিবর্ণ হাতটা নিজের হাতে ধরে চিৎকার করে কাঁদতেন; ঠান্ডা রঙকরা গালে চুমু খেতেন উন্মাদের মতো।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে ফঁতেনব্লু দুর্গে রানিকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন। রানির বয়স তখন আরো কম। সেদিনকার রানির মূর্তিটি আবার তাঁর চোখের ওপরে ভেসে উঠল। সেইদিন ফরাসি সম্রাটের সামনে তাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়। ফিরে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন পীতবর্ণ-চুলের ছোটো একটি আংটি, সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন গাড়ি থেকে নামার পরে বালিকা বধূ তাঁর হাতে যে চুম্বন করেছিলেন সেই স্মৃতি দেশের সীমান্তবর্তী ছোটো একটি নগর বার্গোতে খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের বিয়ে হয়েছিল; তারপরে বিরাট শোভাযাত্রা করে ফিরে এসেছিলেন মাদ্রিদে। লা অ্যাটোচা গির্জায় ধর্মীয় প্রার্থনা সভা বসেছিল; এবং তারপরেই প্রায় শ'তিনেক কাফেরকে, তাদের মধ্যে ইংরাজদের সংখ্যাও অনেক ছিল, সৈন্যবাহিনির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল পুড়িয়ে মারার জন্যে।

সত্যি কথা বলতে কি রাজা তাঁকে উন্মাদের মতো ভালোবাসতেন। নতুন বিশ্বের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে ইংলন্ডের সঙ্গে তখন তাঁর দেশের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তাঁর সেই উন্মাদ প্রেমের জন্যে তাঁর দেশের সুষ্ঠু যুদ্ধ পরিচালনাও ব্যাহত হয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি তাঁকে চোখের আড়াল করতেন না। এরই ফলে অনেকের ধারণা জরুরি রাজকার্যেও তিনি অবহেলা করতেন। ভোগবাসনা মানুষকে যে ভয়ঙ্কর রকমের অন্ধ করে দেয় তারই জন্যে তিনি দেখতে পাননি যে রানিকে তুষ্ট করার জন্যে তিনি যে বিরাট আয়োজন করেছিলেন তারই ফলে রানি একটি অদ্ভুত অসুখের কবলস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রানির মৃত্যুর পরে কিছুটা সময় তাঁর চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছিল। একবার মনে হয়েছিল সিংহাসন পরিত্যাগ করে তিনি গ্রানাদার গির্জায় গিয়ে বাকি জীবনটা পারলৌকিক চিন্তায় কাটিয়ে দেবেন; কিন্তু শিশু কন্যাটিকে তিনি তাঁর নির্দয় ভাই-এর হাতে রেখে যেতে ভয় পেলেন। কারণ, স্পেনে তাঁর ভাই-এর মতো নিষ্ঠুর আর কেউ ছিল না এবং অনেকের ধারণা রানি যখন তাঁর দুর্গ অ্যারাগনে গিয়েছিলেন তখন এই লোকটিই তাঁকে একজোড়া বিষাক্ত দস্তানা উপহার দিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। এর পরে রাজা রাজ্যের মধ্যে পরের তিনটি বছর শোক পালন করার নির্দেশনামা জারি করেছিলেন। তার পরেও আর একটি বিয়ে করার জন্যে কোনো মন্ত্রীই তাঁকে রাজি করাতে সক্ষম হননি। একবার সম্রাট তাঁর ভাইঝি বোহেমিয়ার সুন্দরী আর্ক ডাচেসের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু বোহেমিয়ার রাষ্ট্রদূতদের ডেকে তিনি বলে দিলেন—তোমাদের সম্রাটকে জানিয়ে দিয়ো যে স্পেনের রাজা দুঃখকেই তাঁর পত্নী হিসাবে বরণ করেছেন; এবং যদিও সৌন্দর্যের তুলনায় দুঃখ অনেক বেশি বন্ধ্যা রমণী তথাপি সৌন্দর্যের চেয়ে দুঃখকেই তিনি বেশি ভালোবাসেন। তাঁর এবম্বিধ উত্তরের জন্যে অচিরাৎ তাঁকে নেদারল্যান্ড-এর প্রদেশগুলি খেসারৎ দিতে হয়েছিল; বোহেমিয়ার সম্রাটের উসকানিতে রিফর্মড চার্চের কিছু গোঁড়া নেতা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তাঁর ছোটো মেয়েটিকে প্রাসাদের অলিন্দে খেলা করতে দেখে আগুনে

উচ্ছ্বাস ভরা আর রানির হঠাৎ মৃত্যুতে যে মহাশোকের তরঙ্গ তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখ ভরা সেই মেয়েটির মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে—সেই হাসি, হাসার সময় সেইভাবে ঠোঁট বাঁকানো, সেইভাবে ঘাড় নাড়ানো,—সব সব, কিন্তু শিশুদের চিৎকার তাঁর কান দুটো ব্যথিত করতে লাগল; মেঘমুক্ত নির্মল সূর্যের আলো তাঁর বেদনাকে ব্যঙ্গ করতে লাগল—এবং একটা অদ্ভুত বিশ্রী গন্ধ—শব সংরক্ষণ করার জন্যে চিকিৎসকেরা সাধারণত যে ধরনের গন্ধদ্রব্য ব্যহগার করে থাকে—সেই অস্বস্তিকর একটা গন্ধ—সত্যি? না, মতিভ্রম তাঁর?—পরিচ্ছন্ন প্রভাত-হাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলল। হাত দুটোর মধ্যে মুখটাকে তিনি ঢেকে দিলেন। তারপরে রাজকুমারী আবার যখন মুখ তুলল তখন পর্দা পড়ে গিয়েছে—রাজা সেখান থেকে চলে গিয়েছেন।

রাজকুমারী একটু মনোক্ষুণ্ণ হল। বিরক্তিতে কাঁধটা কোঁচকাল! আজ তার জন্মদিন। এদিনটা তিনি এখানে থাকতে পারতেন। নিরর্থক সরকারি কাজগুলির দাম তাঁর কাছে এতই বেশি? অথবা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন বিমর্ষ ঘরটিতে সব সময়েই বাতি জ্বলছে, আর যে ঘরে তাকে যেতে দেওয়া হয় না সেইখানেই তিনি গিয়েছেন। কী বোকা, কী বোকা! এই উজ্জ্বল আলো ছেড়ে, এই আনন্দ ছেড়ে কেউ আবার সেই অন্ধকার ঘরে যায়! তা ছাড়া শিঙা বাজছে। এখনই ষাঁড়ের লড়াই শুরু হবে। এদিক থেকে তার কাকা আর গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর অনেক বেশি বিজ্ঞ। তাঁরা অলিন্দের ওপরে এসে তাকে উৎসাগিত করেছেন। সুতরাং সুন্দরম মাথায় ঝাঁকানি দিতে দিতে ডন পেড্রোর হাত ধরে সে লম্বা তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাগানের শেষ প্রান্তে লাল সিল্ক দিয়ে তৈরি এই তাঁবু। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাও তাদের পিছু পিছু এগিয়ে গেল। যার নাম সবচেয়ে লম্বা সেই চলল তাদের আগে। নামের দৈর্ঘ্যর মাপে নিজেদের শ্রেণিকে সাজিয়ে নিল তারা।

অভিজাত সম্প্রদায়ের একদল ছেলে তার সঙ্গে দেখা করল। তাদের ভেতরে ছিল তিয়েরা-নেভার যুবক কাউন্ট। বয়স তার চোদ্দর কাছাকাছি। অভিজাত সম্প্রদায়ের লাবণ্য আর পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে এগিয়ে এসে সে রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা জানাল; তারপরে মাঠে যেখানে হাতির দাঁতের উঁচু চেয়ার বসানো রয়েছে সেইখানে তাকে নিয়ে গেল।

ষাঁড়ের লড়াই যা হল তা সত্যিই অপরূপ! রাজকুমারীর মনে হল পার্মার ডিউক তার বাবার সঙ্গে যখন দেখা করতে এসেছিলেন তখন যে সত্যিকার ষাঁড়ের লড়াই সে দেখেছিল এ লড়াই তার চেয়েও সুন্দর। কয়েকটি বালক বেশ ভালোভাবে সাজানো খেলার ঘোড়ার চারপাশে লম্বা বর্শা নিয়ে ঘোড়ার মতো পা তুলে-তুলে লাফাতে লাগল। আর কয়েকজন পায়ে হেঁটে তাদের লাল আলখাল্লা ষাঁড়ের সামনে দোলাতে শুরু করল। আর সেই ষাঁড় যখন তেড়ে এল তখন তারা বেড়ার এপাশে লাফিয়ে পালিয়ে এল। আর ষাঁড়টাকে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন সত্যিকারের একটা ষাঁড়। আসলে সেটা কিন্তু চাঁচ, দরমা, আর কঞ্চি দিয়ে তৈরি ছিল; তার ওপরে চাপা দেওয়া ছিল লম্বা একটা চামড়া। মাঝে-মাঝে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে বেড়ানোর তাল কষছিল। এভাবে ছোটার কথা সত্যিকার কোনো জীবন্ত ষাঁড়-ও স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। আর যুদ্ধও সে কম করল না। ছেলেরা সব গাছের ডালে লাল শালু ওড়াতে-ওড়াতে ব্র্যাভো ব্র্যাভো বলে চেঁচাতে লাগল। মনে হল তারা যেন সত্যিকার বয়স্ক মানুষ। বহুক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল। এরই মধ্যে অনেকগুলি খেলার ঘোড়া শিংয়ের গুঁতো খেয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। শেষকালে বিষম রণের পরে তিয়েরা-নেভার কাউন্ট সেই ষাঁড়টাকে হাঁটু মুড়ে বসাল, তারপরে রাজকুমারীর কাছ থেকে চরম আঘাত হানার নির্দেশ পেয়ে সে তার কাঠের তরোয়ালটা ষাঁড়ের ঘাড়ে এমন জোরে ঢুকিয়ে দিল যে ষাঁড়ের মাথাটা আলাদা হয়ে গেল; আর তার বেতর থেকে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এল মাদ্রিদের ফরাসি রাষ্ট্রদূতের

পুত্র মঁসিয়ে দ্য লোরেঁ।

যুদ্ধক্ষেত্র পরিস্কার করার পালা এবার। জমকালো হলদে আর কালো পোশাক পরা দুজন মুরদেশীয় চাকর সেই খেলার মৃত ঘোড়াগুলির দেহ বেশ গম্ভীরভাবে বয়ে নিয়ে গেল বাইরে। তারপরে একটু বিরতি। এরই মধ্যে ফরাসি যাদুকর দড়ির ওপরে হেঁটে বেড়ালো; ইতালির মুখোশ অভিনীত হল। তারা এত সুন্দর আর স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করল যে, পালার শেষে রাজকুমারীর চোখ দুটো জলে ভর্তি হয়ে গেল। এমন কি কয়েকটা ছেলেও দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলো; তাদের কান্না থামানোর জন্যে শেষ পর্যন্ত তাদের মেঠাই খেতে দিতে হল। আর গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর-ও এত অভিভূত হয়ে পড়লেন যে শেষ পর্যন্ত ডন পেড্রোকে তিনি বলতে বাধ্য হলেন—এই সব অভিনেতারা যদিও কাঠ আর রঙিন মোম দিয়ে তৈরি হয়েছে, আর যন্ত্রের সাহায্যে এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করছে তবু এরা যে এত স্বাভাবিকভাবে এদের সুখ-দুঃখ প্রকাশ করছে এ দেখে সত্যিই তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

তারপর এল আফ্রিকান যাদুকর। সঙ্গে নিয়ে এল একটা চ্যাপ্টা ঝুড়ি। লাল কাপড় দিয়ে সেটা ঢাকা। বাক্সটাকে জমির মাঝখানে রেখে পাগড়ির ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শরের পাইপ বার করে বাজাতে শুরু করল। কয়ের মুহূর্তের মধ্যেই কাপড়টা সরতে শুরু করল, বাঁশির সুরটা জোরাল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দুটো সবুজ আর সোনালি রঙের সাপ তাদের গোঁজের মতো মাথাগুলি বার করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল; তারপরে বাঁশির তালে-তালে জলের মধ্যে লতার মতো এদিকে-ওদিকে দুলতে লাগল। তাদের সেই চিত্রিত ফণা আর লকলকে জিব দেখে শিশুরা বেশ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই যাদুকর যখন বালির ভেতর থেকে ফুটফুটে একটা কমলালেবুর গাছ তৈরি করে তাতে ফুল ফোটাল আর ফল ধরার তখন তারা বেশ খুশি হয়ে উঠল। তারপরে যাদুকর মার্কুই দ্য লা টোরে-র বাচ্চা মেয়ের পাখাটা নিয়ে তা থেকে একটা নীল পাখি তৈরি করে ফেলল। সেই পাখিটা তাঁবুর চারপাশে ঘুরে-ঘুরে গান গাইতে লাগল। তাই দেখে শিশুদের আনন্দ আর ধরে না। নুয়েস্ত্রা সেনোরা দল পিলারের গির্জা থেকে কতগুলি নাচিয়ে বালক এসেছিল। তাদের দ্বৈত নাচ বড়োই সুন্দর হয়েছিল। এই নাচ প্রতি বছর মে মাসে ভার্জিনের বেদীর কাছে দেখানো হয়, কিন্তু রাজকুমারী আগে কোনো দিনই সে-নাচ দেখেনি। একজন উন্মাদ পাদরি, অনেকের মতে ইংলন্ডের রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে, একবার অ্যাসটুরিয়াস-এর যুবরাজকে খাম জোড়ার সঙ্গে বিষাক্ত গঁদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেই থেকে স্পেনের রাজবংশের কেউ স্যারাগোসার বিরাট গির্জায় ঢোকেনি। এই নাচের নাম ছিল 'আওয়ার লেডিস ড্যান্স'। রাজকুমারী লোকমুখে ওই নামটাই কেবল শুনেছিল। এই নাচ সত্যিই বড়ো সুন্দর দেখতে। এই নাচ দেখে রাজকুমারী এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে প্রতিদানে 'আওয়ার লেডি অফ পিলারের' কাছে বেশ বড়ো একটা মোমের বাতি পাঠাতে কৃতসংকল্প হয়েছিল।

এগিয়ে এল একদল সুন্দর চেহারার ইজিপশিয়ান—যাযাবরদের তখন সবাই ইজিপশিয়ান বলেই চিহ্নিত করত। গোল হয়ে পায়ের উপরে পা তুলে দিয়ে বসে তারা তাদের তারের যন্ত্র তুলে নিল। খাদের সুর উঠল; আর সেই সুরের তালে-তালে দেহগুলিও তাদের দুলতে লাগল। ডন পেড্রোকে দেখেই তারা ভেংচি কাটল; আবার কেউ কেউ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল; কারণ কয়েকদিন আগেই এই পেড্রো ডাকিনীবিদ্যার অজুহাতে ওদের দুজনকে খোলা বাজারে ফাঁসি দিয়েছিল। কিন্তু ফুটফুটে রাজকুমারী তার পাখার ওপরে ঝুঁকে যখন তার নীল চোখ দুটি দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল তখন তারা বেশ খুশিই হল; কারণ তারা বুঝেছিল এমন নিষ্পাপ সুন্দর মুখ কারও ওপরে কোনোদিন নির্দয় হতে পারে না। তারপরেই হঠাৎ তারা এমনভাবে চিৎকার করে উঠল যে শিশুরা তো ঘাবড়ে গেলই, এমনকি ডন পেড্রো পর্যন্ত চমকে

উঠে তার কোমরের ছোরাটাকে শক্ত করে ধরলো। সেই গায়করা তখন উন্মত্তের মতো মাঠের মধ্যে নাচানাচি আর জোরাল সুরের তালে-তালে তাদের মাতৃভাষায় বিকৃত সুরে প্রেমের গান গাইতে লাগল। তারপরেই তারা সবাই মাটির ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল; মনে হল তারা সব মরে গিয়েছে। মৃদু বাজনার তালে-তালে তাদের দেহের মৃদু স্পন্দনগুলি কেবল দেখা গেল। তারপরে তারা সবাই দল বেঁধে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই কটা রঙের লোমশ একটা ভালুককে চেন দিয়ে বেঁধে তারা টানতে-টানতে নিয়ে এল। তার কাঁধের উপরে কয়েকটা 'বারবারি' বাঁদর, পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভালুকটা মাথার ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াল; আর বাঁদরগুলি তাদের মনিব দুটি জিপেসি ছেলের সঙ্গে নানারকম খেলা দেখাতে লাগল। ছোটো ছোটো তরোয়াল নিয়ে তারা খেলা করল, বন্দুক ছুঁড়ল, আর রাজার সত্যিকার সৈন্যবাহিনীর মতো রীতিমতো কুচকাওয়াজ করল। এক কথায় জিপেসিদের খেলা সত্যিই বড়ো মনোরম হয়েছিল।

কিন্তু প্রভাতকালীন সমস্ত খেলার মধ্যে বাচ্চা বামনের নাচটাই বোধ হয় সেরা হয়েছিল। বামনটা যখন তার বাঁকানো পা দুটোর ওপরে ভর দিয়ে আর তার বিরাট বিকৃত মাথাটাকে এপাশে-ওপাশে দোলাতে-দোলাতে খেলার মাঠে নামল তখন বাচ্চারা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল; আর খুদে রাজকুমারীও এত হাসতে শুরু করল যে শেষ পর্যন্ত ক্যামেরারাকে বলতে বাধ্য হতে হল যে সমগোত্রীয়দের কাছে রাজকুমারীর কান্নার নজির স্পেনের ইতিহাসে থাকলেও, যারা নিচুস্তরের মানুষ তাদের কাছে সত্যিকার রাজকুমারীর হাসির নজির আজ পর্যন্ত নেই। কিন্তু বামনের খেলার সত্যিকার কোনো জবাব নেই। এমন কি যে স্প্যানিশ রাজদরবারে সব সময়েই পরিশীলিত বীভৎসতার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল সেখানেও এই জাতীয় অদ্ভুত খুদে দৈত্যকে আর কোনোদিন দেখা যায়নি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে এইটাই তার প্রথম খেলা। মাত্র একদিন আগে একে আবিষ্কার করা হয়েছিল। তখন সে বনের মধ্যে বিপুল বেগে ছুটে বেড়াচ্ছিল। স্পেনের দুজন নোব্‌ল শিকারের জমকালো পোশাক পরে সেই বনে গিয়েছিল শিকার করতে। রাজকুমারীকে অবাক করে দেওয়ার জন্যে তারাই তাকে ধরে এনেছিল। তার দরিদ্র বাবাও এইকম অপদার্থ কুৎসিত ছেলেকে বিদায় করে বেঁচেছিল। বোধহয় সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে তার এই অদ্ভুত বিকলাঙ্গের কথা সে নিজেও জানত না। সত্যি কথা বলতে কি এই খেলা দেখিয়ে সে নিজেও বেশ আনন্দ পেয়েছিল। শিশুরা যখন হাসছিল, সেও তখন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসছিল। প্রতিটি খেলার শেষে সে তাদের দিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিল। মনে হয়েছিল সে যেন ওদেরই একজন। প্রকৃতি যে অপরকে হাসানোর জন্যে খামখেয়ালির বশে তাকে বিকৃতাঙ্গ করে সৃষ্টি করেছিল সেকথা সে ভাবতেও পারেনি। আর রাজকুমারী তো একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। সেও রাজকুমারীর দিক থেকে তার চোখ দুটো সরাতে পারেনি। তার মনে হয়েছিল কেবল রাজকুমারীর জন্যেই সে নাচবে। রাজকুমারীও শেষকালে কিছুটা রসিকতা আর কিছুটা ক্যামেরারাকে বিরক্ত করার জন্যে তার চুল থেকে একটা গোলাপ খুলে মিষ্টি হেসে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। বামনও সব জিনিসটা বেশ আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করল। গোলাপ ফুলটাকে বিকৃত ঠোঁটের উপরে চেপে একটা হাত সে নিজের বুকের ওপরে রাখল। আনন্দে তার মুখের ওপরে বিকৃত হাসি ফুটে উঠল। চোখ দুটো চকচক করতে লাগল তার।

বামন খেলা শেষ করে ছুটে বেরিয়ে গেল মাঠ থেকে। রাজকুমারী মুষড়ে পড়ে তার কাকাকে বলল—এখনই আবার ওকে খেলা দেখাতে বলুন। কিন্তু ক্যামেরারা তাকে বুঝিয়ে বলল যে, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। এখন রাজকুমারীর প্রাসাদে ফেরা উচিত। সেখানে তার জন্মদিন মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করার জন্যে বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছে; তার নিজের হাতে সই করা সত্যিকার 'জন্মদিনের কেক' তৈরি করা হয়েছে। এই সব শুনে রাজকুমারী পরিপূর্ণ

মর্যাদার সঙ্গে উঠে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল; কিন্তু যাওয়ার আগে নির্দেশ দিয়ে গেল যে মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির পরে আবার সেই বামনকে খেলা দেখাতে হবে। যাওয়ার আগে টিয়েরা-নেভার কাউন্টকেও তার অপূর্ব অভ্যর্থনার জন্যে সে ধন্যবাদ জানাল। তার পিছুপিছু ছেলেমেয়েরাও ফিরে গেল—ঠিক যেভাবে তারা পরপর এসেছিল ঠিক সেইভাবেই ফিরল তারা।

খুদে বামন যখন শুনল রাজকুমারীর বিশেষ ইচ্ছাতেই আবার তাকে তার কাছে নাচতে হবে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। দৌড়ে বাগানের মধ্যে বেরিয়ে গেল সে। সেইখানে সেই সাদা গোলাপটা নিয়ে হাস্যকর একটা আনন্দে চুমু খেতে লাগল। তার আনন্দ বাইরে প্রকাশ করতে লাগল একটা বিকৃত অঙ্গভঙ্গির ভেতর দিয়ে।

দৈত্যের মতো তাকে বাগানে ঘুরে বেড়াতে দেখে ফুলেরা ভীষণ বিরক্ত হল।

টিউলিপ ফুলেরা বলল—লোকটা এতই কুৎসিত যে আমরা যেখানে থাকি সেখানে ওকে খেলা করতে দেওয়া উচিত নয়।

লাল টকটকে লিলিরা তো চটে লাল; তারা বেশ উষ্মার সঙ্গে বলল—আফিঙের জল খেয়ে লোকটার হাজার বছর ঘুমানো উচিত।

কান্নার সুরে ক্যাকটাস বলল—লোকটা একেবারে মূর্তিমান আতঙ্ক—যাকে বলে একেবারে অষ্টবক্র। আর ওর মাথাটা কী বিরাট দেখেছ? ওই দুটো খুদে পায়ের ওপরে অত বড়ো মাথাটা কী বেখাপ্পাই না দেখাচ্ছে! ওকে দেখেই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। ও যদি আমার কাছে আসে তাহলে ও গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে এমন ফুটিয়ে দেব না!

সাদা গোলাপ-গাছটা বলল—সত্যি বলতে কি ও আমার সেরা ফুলটা নিয়ে নিয়েছে। আজ সকালে রাজকুমারীকে আমি ওটা নিজেই দিয়েছিলাম তাঁর জন্মদিনের উপহার হিসাবে। ও তাঁর কাছ থেকে ফুলটা চুরি করে নিয়েছে। এই বলেই সে চিৎকার করে উঠল—চোর!চোর!

চরিত্রের দিক থেকে লাল জিরেনিয়াম ফুলগুলি সাধারণত বেশ নম্র। ফুলের জগতে তার অনেক দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তারাও তাকে দেখে বিরক্তিতে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। ভায়লেট ফুলেরা বেশ নম্রভাবেই মন্তব্য করল: লোকটা খুবই সাদাসিধে; মনে, সাদাসিধে না হয়ে ও পারে না। তবু তারা বেশ বিজ্ঞভাবেই বলল যে ওটাই ওর সত্যিকারের ত্রুটি; এবং রোগটাকে সারানো যায় না বলে মানুষকে প্রশংসা কেন করা হবে সে বিষয়ে তারা বেশ যুৎসই একটা যুক্তি খুঁজে পেল না। এমন কি তারা একথা বলতেও দ্বিধা করল না যে ওই খুদে বামনটা তার কুৎসিত রূপটাকে নিয়ে বড়ো বেশিই বাড়াবাড়ি করছে; তার উচিত ছিল কিছুটা দুঃখ করা; অন্তত কিছুটা বিষণ্ণ হওয়া। তা না করে হতভাগাটা বিপুল আনন্দে লাফালাফি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

ওদের মধ্যে সূর্য-ঘড়িটাই বোধ হয় সবচেয়ে বিশিষ্ট বস্তু। সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর মতো মানুষকেও সে সময় বলে দিতে পেরেছিল। ওই খুদে বামনের চেহারা তাকেও কেমন যেন ঘাবড়ে দিয়েছিল। ফলে ছায়ার আঙুল দিয়ে পুরো দুটি মিনিট সময় নির্ধারণ করতে সে ভুলে গিয়েছিল। রেলিঙের ধারে দুধের মতো সাদা যে ময়ূরটা রোদ পোয়াচ্ছিল তাকে লক্ষ করে তাই সে না বলে পারল না—সবাই জানে রাজার ছেলে রাজাই; আর কয়লা কুড়ানির ছেলে কয়লা কুড়ানিই। এর ব্যাতিক্রম কিছু রয়েছে এটা চিন্তা করাই হাস্যকর। এই মন্তব্যের সঙ্গে

ময়ূরও একমত; তাই সে চিৎকার করে বলল—নিশ্চয়, নিশ্চয়। তার সেই কাংস ক্রেংকার ধ্বনি শুনে ঠান্ডা ঝরনার জলে যে সমস্ত সোনালি মাছ-এর দল জলকেলি করছিল তারা হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠে জলের ওপরে মাথা তুলে বিরাট-বিরাট পাথরের মূর্তিগুলিকে জিজ্ঞাসা করল—পৃথিবীকে কী ঘটছে বল তো? এত হইচই কেন?

যাই হোক, পাখিরা কিন্তু তাকে বেশ পছন্দ করত। বনের ঝরা পাতার পেছনে-পেছনে বনপরীরদের মতো ছুটতে তারা তাকে দেখেছে; অথবা প্রাচীন ওক গাছের কোটরে গুঁড়ি দিয়ে শুয়ে কাঠবিড়ালির সঙ্গে ভাগ করে সে বাদাম খাচ্ছে এ-দৃশ্যও অনেকবার তাদের চোখে পড়েছে। ও যে একটু কুৎসিত তার জন্যে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। এমন কি অমন যে নাইটিংগেল পাখি যার মিষ্টি গান শোনার জন্যে মাঝে-মাঝে কমলালেবুর ঝোপের মধ্যে চাঁদও ঝুঁকে পড়ে, সেই বা কী এমন আহা-মরি দেখতে! তা ছাড়া, মনটাও ওর বড়ো উদার। কড়া শীতের দিনগুলিতে যখন বনের মধ্যে বেরি ফল দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে, মাটি লোহার মতো শক্ত বরফে ভরে যায়, এমন কি খাবারের সন্ধানে বুনো ভালুকগুলো পর্যন্ত শহরের দরজায় এসে উপস্থিত হয়—সেই সময়েও ও একবারও তাদের কথা ভোলেনি; নিজের সামান্য খাবার তাদের ভাগ করে দিয়েছে।

সেই জন্যে তারা তার চারপাশে ঘুরে-ঘুরে উড়তে লাগল; ওড়ার সময় তাদের পাখা দিয়ে তার গলাটা স্পর্শ করে গেল। এই দেখে বামন খুব খুশি। সে তাদের সেই সাদা গোলাপটা দেখিয়ে বলতে লাগল—দেখ, দেখ। এটা আমাকে রাজকুমারী উপহার দিয়েছে। কারণ, রাজকুমারী তাকে ভালোবাসে।

তার কথার বিন্দুবিসর্গ তারা বুঝতে পারল না, কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। তারা ঘাড়গুলিকে একদিকে ঘুরিয়ে বিজ্ঞের মতো বসে রইল। কোনো কিছু বোঝার ওইটাই একমাত্র প্রশস্ততম আর সহজতম পথ।

এমন কি টিকটিকিগুলিও তাকে বেশ পছন্দ করত। কারণ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে যখন ঘাসের ওপরে গড়াগড়ি দিত তখন তারা তার গায়ের ওপরে লাফালাফি করত। তারা বলাবলি করত—অবশ্য টিকটিকির মতো সুন্দর প্রাণী সবাই হতে পারে না—সেকথা চিন্তা করাও বাতুলতা। আর যদিও বলতে বেশ অদ্ভুত-ই লাগছে তবু একথা সত্যি যে লোকে ওকে যতটা কুৎসিত মনে করে ও ততটা কুৎসিত নয়। শুধু চোখ দুটো তোমার বন্ধ করে রাখ; ওর দিকে তাকিয়ো না। তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চরিত্রের দিক থেকে টিকটিকিরা প্রথম শ্রেণির দার্শনিক। যখন করার কিছু না থাকে, অথবা বৃষ্টির দিনে যখন বাইরে বেরোনো যায় না তখন তারা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চুপচাপ বসে থেকে চিন্তা করে যায়।

ওদের চালচলন আর ব্যবহারে ফুলেরা বড়োই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল—রাতদিন এই রকম ফস-ফস করে, হইচই করে উড়ে বেড়ানোর ফলটা কী বিষময় দেখ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আমাদের মতো চিরকাল একই জায়গায় বসে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে অথবা ফড়িং-এর পেছনে ঘাসের ভেতর দিয়ে দৌড়ে বেড়াতে কেউ কি আমাদের কখনো দেখেছে? হাওয়া পরিবর্তনের প্রয়োজন বুঝলে আমরা বাগানের মালিকে সংবাদ পাঠাই। সে অন্য বিছানায় আমাদের বয়ে নিয়ে যায়। আমরা যে সম্ভ্রান্ত শ্রেণির এটা থেকেই তা প্রমাণিত হয় এবং তাই হওয়া উচিত। কিন্তু পাখপক্ষী আর টিকটিকি-গিরগিটিদের বিশ্রাম করার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি পাখিদের স্থায়ী কোনো ঘরবাড়িও নেই। তারা জিপেসিদের মতোই ভবঘুরে। তাদের ঠিক সেই ভাবেই দেখা উচিত।

এই বলেই উদ্ধত ভঙ্গিতে নাক উঁচিয়ে দিল তারা। কিছুক্ষণ পরে বামন যখন ঘাস থেকে উঠে প্রাসাদের অলিন্দের দিকে এগিয়ে গেল তখন তারা খুব খুশি হয়ে উঠল। তারা বলল—যাবজ্জীবন ঘরের মধ্যে ওকে বন্দী করে রাখা উচিত। পিঠের ওপরে কুঁজ আর বাঁকা পাগুলির দিকে ওর একবার তাকিয়ে দেখ—রামশ্চন্দ্র, রামশ্চন্দ্র।

কিন্তু বামনটি এত সব কথার কিছুই জানতে পারল না। পাখি আর টিকটিকিদের সে খুবই ভালোবাসত। তার কাছে ফুলগুলি ছিল বিশ্বের অপরূপ সুন্দর—অবশ্য এক রাজকুমারী ছাড়া। সে তাকে সেই সুন্দর লাল গোলাপটি দিয়েছে এবং সে তাকে ভালোবাসে। এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা। রাজকুমারীর কাছে ফিরে গেলে কতই না খুশি হত সে। ডান হাতের ওপরে তাকে বসিয়ে রাজকুমারী তার দিকে চেয়ে হাসত। সে তাহলে রাজকুমারীকে তার খেলার সঙ্গী করে নিতে পারত, অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা শেখাতে পারত তাকে। কারণ এর আগে যদিও সে কোনোদিন প্রাসাদে আসেনি তাহলেও সে অনেক বিস্ময়কর কাজ করতে জানে। ফড়িংরা যাতে গান করতে পারে সেই জন্যে শরগাছ দিয়ে সে বেশ ছোটো ছোটো খাঁচা তৈরি করতে পারে। তৈরি করতে পারে তললা বাঁশের বাঁশি। সে প্রতিটি পাখিরই ডাক জানে; আর নানা জায়গা থেকে নানা পাখির স্বর নকল করে তাদের ডাকতে পারে। ঋতুর পরিবর্তনে অরণ্যভূমিতে যে সব বিভিন্ন নাচ শুরু হয় তার সব কাটাই তার মুখস্থ। বুনো পায়রা কোথায় বাসা বাঁধে তাও তার অজানা নয়। একবার একটা ব্যাধ দুটো পায়রাকে জাল পেতে ধরে নিয়ে গেল। তাদের বাচ্চাগুলোর কী দুর্দশা! সে তাদের নিয়ে এসে একটা বাসা তৈরি করে দিল। তারা বেশ পোষ মেনে গিয়েছিল। প্রতিদিন সকালে তারা তার হাত থেকে খাবার খেয়ে যেত। রাজকুমারীরও ভালো লাগবে তাদের। ভালো লাগবে কাঁটার মতো লম্বা ঠোঁটওয়ালা জে পাখিদের, বন্য শুয়োর আর বিজ্ঞ মন্থরগতি কচ্ছপদের যারা বনের মধ্যে ঘাড় দুলিয়ে-দুলিয়ে হাঁটে আর কচি-কচি পাতা ঠুকরে-ঠুকরে খায়। নিশ্চয়, বনের মধ্যে গিয়ে তার সঙ্গে খেলতে তাকে হবেই। সে তাকে তার ছোট্ট বিছানার একপাশে শুতে দেবে। যাতে কোনো বন্য জানোয়ার তার বিছানার কাছে আসতে না পারে সেই জন্যে সারারাত জেগে সে পাহারা দেবে। সকাল হলে সে তাকে জাগাবে; তারপর সারাদিন দুজনে তারা বনের মধ্যে নেচে নেচে বেড়াবে। মাঝে মাঝে সাদা খচ্চরের উপরে চড়ে পাদরি বই পড়তে পড়তে সেদিকে আসবে, আর আসবে জমকালো পোশাক পরা শিকারির দল। মদ তৈরি করার সময় আঙুর ফলের ব্যবসাদাররা আসবে; হাত-পা তাদের লাল রঙে মাখা; কাঁধের ওপরে ভিস্তি, সেই ভিস্তি থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়িয়ে পড়বে মদের ফোঁটা। বনবাসীরা বনের মধ্যে চারকোল পোড়াবে; ডাকাতরা গুহা থেকে বেরিয়ে তাদের সব লুটপাট করে নিয়ে যাবে। সত্যি সত্যিই বনের মধ্যে দেখার অনেক জিনিস রয়েছে। সেই সব দেখে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন সে তাকে জলার ধারে নিয়ে যাবে। যদিও সে লম্বা নয় তবুও যে সে শক্তিমান একথা সে জানে। লাল বেরির হার গড়িয়ে দেবে সে। আজ রাজকুমারী তার পোশাকের ওপরে যে সাদা বেরির হার পরেছিল তারই মতো সুন্দর দেখাবে লাল বেরি। সে সবও যখন রাজকুমারীর আর ভালো লাগবে না তখন সে তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু রাজকুমারী বর্তমানে কোথায়? সাদা গোলাপকে জিজ্ঞাসা করল। সে কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। সারা প্রাসাদটাই যেন ঘুমোচ্ছে। এমন কি যে সব জানালা খোলা ছিল তাদের ওপরেও ঝুলছিল বেশ মোটা পর্দা। ভেতরে ঢোকার একটা কিছু রাস্তা বার করার জন্যে সে প্রাসাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবশেষে সে দেখতে পাল ছোটো একটা খিড়কির দরজা খোলা রয়েছে। ঢুকতেই সে চমৎকার বেশ বড়ো একটা ঘরের ভেতরে হাজির হল। তার ভয় হল ঘরটা বনের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। কারণ দেওয়ালে তার নকশা-কাটা; আর মেঝেটাও রঙিন পাথর দিয়ে মাজা। একরকম জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সেগুলি গাঁথা। কিন্তু খুদে

রাজকুমারী সেখানে নেই। রয়েছে কেবল উঁচু বেদীর ওপরে কয়েকটি মূর্তি। বিষণ্ণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে আর অদ্ভুত রকমের হাসি হেসে তারা তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

ওই ঘরেরই শেষ প্রান্তে আর একখানা ঘর; নকশা করা কালো ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে সেখানে। রাজকুমারী কি ওরই পেছনে লুকিয়ে রয়েছে? অন্তত চেষ্টা করে দেখতে দোষটা কী? এই বলে সে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। পর্দাটাকে টেনে সরিয়ে দিল একপাশে। না, ওখানে কেউ নেই। রয়েছে একখানা ঘর। সেটা আগের ঘরের চেয়েও সুন্দর। আগে এই ঘরটা ব্যবহার করতেন জাঁলিফো। সবাই তাঁকে পাগলা রাজা বলে ডাকত। শিকার করতে তিনি এতই ভালোবাসতেন যে ঘুমোতে-ঘুমোতেও তিনি চিৎকার করে উঠতেন। এখন এটা মন্ত্রণাকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অবাক চোখে আমাদের খুদে বামনটি চারপাশে তাকাতে লাগল। আর এগোতে তার সাহস হল না। কিন্তু সেই সুন্দরী রাজকুমারীর কথা ভেবে তার বুকে বল এল। সে তো কেবল তাকেই চায়। সে যে তাকে কত ভালোবাসে সেই কথাটাই তো সে তাকে জানাতে চায়। সম্ভবত রাজকুমারী তার পাশের ঘরেই রয়েছে।

সেই নরম মোটা কার্পেটি পেরিয়ে সে ছুটে গেল সামনে; দরজা খুলল, না! সেখানেও সে নেই। ঘর খালি। সেখানে রয়েছে কেবল একটা সিংহাসন। এখানে আগে রাজা বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা জানাতেন। এখন আর বেশি রাষ্ট্রদূত আসে না। তাই রাজা এখানে পরিচিতদের দর্শন দেন। ইংলন্ডের রানির সঙ্গে স্পেনের যুবরাজের বিয়ের সম্বন্ধ করতে এই ঘরেই অনেক বছর আগে একদন ইংলন্ড থেকে দূত এসেছিল। নানা ঐশ্বর্য আর রত্নময় স্মৃতির চিহ্ন দিয়ে এই ঘরটি সাজানো। কিন্তু খুদে বামনটির এসব দিকে বিশেষ লক্ষ বা আকর্ষণ ছিল না। সে চেয়েছিল তাঁবুতে রাজকুমারী যাওয়ার আগে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে এবং নাচের শেষে তার সঙ্গে বনে চলে যাওয়ার কথা বলতে। প্রাসাদে বাতাস বড়ো ভারী; কিন্তু অরণ্যে হাওয়া মুক্ত। প্রভাতের সোনালি রোদ সারা বনের ওপরে সোনার রঙে রাঙিয়ে দেয়। নিশ্চয়। তার সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে নিয়ে যাবেই। এই ভেবেই তার মুখের ওপরে হাসি ফুটে উঠল। পরের ঘরে সে ঢুকে গেল।

এতক্ষণ যতগুলি ঘর সে দেখেছে তাদের মধ্যে এই ঘরটিই সবচেয়ে সুন্দর আর উজ্জ্বল। নানা বর্ণে চিত্রিত দেওয়াল। আসবাবপত্রগুলি ভারী-ভারী রুপোর তৈরি। বিরাট-বিরাট দুটো চুল্লির মাঝখানে বিরাট পর্দা ঝুলছে। সেই পর্দার ওপরে টিয়া আর ময়ূরের ছবি। মেঝেটা সমুদ্রের মতো সবুজ ওনিক্স পাথর দিয়ে মোড়া। সেই চকচকে মেঝেটা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। হঠাৎ সে লক্ষ করল ঘরে সে একা নেই। দরজার সামনে যে ছায়া পড়েছে তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে বেঁটে চেহারার একটা লোক তাকে লক্ষ করছে। তার বুকটা দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল; তার ঠোঁটের ভেতর থেকে আনন্দের ধ্বনি ফুটে বেরোল। সে রোদের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট লক্ষ করল সেই মূর্তিটাও বেরিয়ে এসেছে।

রাজকুমারী! না, না। এ একটা রাক্ষস। এরকম কিম্ভূতকিমাকার দৈত্য জীবনে সে আর কোনোদিন দেখেনি। অন্য সব মানুষের মতো তার দেহ পুষ্ট নয়; তার পিঠের ওপরে বিরাট একটা কুঁজ; তার পাগুলো বাঁকা; মাথার ওপরে বিরাট বিসদৃশ মাথা; আর টিকিতে একঝাঁক কালো চুল। তাই দেখে আমাদের বামনটি বিতৃষ্ণায় তার ভুরু কোঁচকাল; দৈত্যটাও তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল তার। সে হাসল, তাই দেখে মূর্তিটা হাসল। সে দু'পাশে হাত দুটো ছড়িয়ে দিল। সেই দৈত্যটাও অনুকরণ করল তাকে। সে মুখ ভেঙাল, দৈত্যটাও তাকে ঠিক একই ভাবে মুখ ভেঙাল। সে তার দিকে এগিয়ে গেল, দৈত্যটাও এগিয়ে এল তার দিকে।

বামনটি যে কটা পা এগোল, দৈত্যটাও গুণে-গুণে সেই কটা পাই এগোল। সে থামল; দৈত্যটাও থেমে গেল। আনন্দে চিৎকার করে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরার জন্যে সে হাত বাড়াল। দৈত্যটাও তার হাতটা ধরল। একেবারে ঠান্ডা কনকনে হাত। ভয় পেয়ে সে তার হাতটা সরিয়ে নিল, দৈত্যটাও সরিয়ে নিল তার হাত। সে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু শক্ত আর মসৃণ একটা জিনিস তাকে বাধা দিল। দৈত্যের মুখটা একেবারে তার মুখের ওপরে এসে পড়েছে। ভয়ে সে কাঁপতে লাগল। চোখের ওপর থেকে হাতে করে সে তার চুলগুলি সরিয়ে দিল। দৈত্যটাও তাকে অনুকরণ করল। সে দৈত্যটাকে থাপ্পড় মারল, দৈত্যটাও থাপ্পড় মারল তাকে। সে পিছু হটে এল—দৈত্যটাও পিছিয়ে গেল।

কী ওঠা? এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে ঘরের চারপাশে তাকাল। কী অদ্ভুত ব্যাপার! সেই অদৃশ্য পরিচ্ছন্ন জলস্তম্ভের মধ্যে ঘরের প্রতিটি জিনিসই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। হ্যাঁ; প্রতিটি জিনিসেরই প্রতিফলন পড়েছে—প্রতিটি জিনিসেরই।

এটা কী তাহলে প্রতিধ্বনি? একবার পাহাড়ি উপত্যকায় সে এই প্রতিধ্বনিকে ডেকেছিল—প্রতিধ্বনি তার প্রতিটি কথারই উত্তর দিয়েছিল। মানুষের স্বরের মতো তার দেহটাকেও কি সে ব্যঙ্গ করতে পারে? এটা কি তাহলে—?

সে চমকে উঠল। বুকের ওপর থেকে শ্বেত গোলাপটা তুলে নিয়ে চুমু খেল। দৈত্যটারও নিজের একটা গোলাপ ছিল। পাপড়িতে-পাপড়িতে একেবারে এক। সেও সেই রকম চুমু খেল, আর বীভৎস অঙ্গভঙ্গি সহকারে ফুলটাকে সে নিজের বুকের ওপরে চেপে ধরল।

সত্যটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যের একটা বিরাট আর্তনাদ করে সে মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়ে ফোঁপাতে লাগল। তাহলে সে নিজেই এই রকম বীভৎস আর বিকলাঙ্গ? তার পিঠের ওপরেই কুঁজ রয়েছে; দেখতে সেই কিম্ভূতকিমাকার! সে নিজেই তাহলে দৈত্য; আর তাকে দেখেই তাহলে ছেলেমেয়েরা ওইরকম হাসছিল। আর সেই রাজকুমারী! সে মনে করেছিল রাজকুমারী তাকে ভালোবাসে; কিন্তু সে-ও তো তাহলে তাকে ব্যঙ্গ করেই হাসছিল। তার সেই বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে রসিকতা করছিল! তারা তাকে বনেই রেখে এল না কেন? বনে তো কোনো আয়না নেই। তার বাবা তাকে মেরে না ফেলে তাকে এইভাবে বিক্রি করে দিল কেন? তার চোখ দুটো গরম জলে ভরে উঠল। শ্বেত গোলাপটিকে সে ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে, দৈত্যটাও ঠিক সেই রকম পাপড়িগুলো একটা একটা করে ছিঁড়ে মেঝের ওপরে ছড়িয়ে দিল। পাছে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে আহত, পশুর মতো ছায়ার দিকে গুঁড়ি দিয়ে সে এগিয়ে গেল, তারপরে ফোঁপাতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে দলবল নিয়ে রাজকুমারী সেইখানে এসে হাজির হল। তারা দেখল সেই কুৎসিত খুদে বামনটি মেঝেতে শুয়ে খুব জোরে জোরে আর বিস্ময়কর ভাবে মেঝের ওপর ক্রমাগত ঘুষি মেরে চলেছে। এই দেখে তারা সব আনন্দে হো-হো কর হেসে উঠল। তারপরে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখতে লাগল।

রাজকুমারী বলল—কী হাসির নাচ দেখ! কিন্তু ওর অভিনয় আরো হাসির। ওকে দেখলে ঠিক মনে হবে ও যেন একটা পাপেট; তবে ঠিক পাপেট-এর মতো স্বাভাবিক নয়।

এই বলে তার সেই পাখাটা হাওয়া খাওয়ার ভঙ্গিতে নাড়িয়ে সে হাততালি দিল।

কিন্তু সেই খুদে বামনটি ওপরের দিকে তার মুখ আর তুলল না। তার ফোঁপানি ধীরে ধীরে মৃদু

থেকে মৃদুতর হয়ে এল। তারপরে সে একটা অদ্ভুত রকম মুখব্যাদান করে নিজের দেহটাকে হাত দিয়ে জাপটে ধরল; আবার সে পড়ে গেল; তারপরে সব চুপচাপ।

একটু থেমেই চিৎকার করে উঠল রাজকুমারী—বহুত আচ্ছা। কিন্তু এখন তো তোমাকে নাচতে হবে।

শিশুরা চিৎকার করে সমর্থন জানাল তাকে—হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওঠ; নাচবে চল। কারণ বারবারি বাঁদরের মতোই তুমি চতুর এবং বেশি হাস্যকর।

কিন্তু কোনো উত্তর এল না খুদে বামনটির কাছ থেকে।

রাগে গরগর করেত-করতে রাজকুমারী মাটিতে পা ঠুকতে লাগল। এমন সময় চ্যামবারলেনের সঙ্গে মেকসিকো থেকে আসা নতুন সংবাদ পড়তে-পড়তে তার কাকা অলিন্দের উপর পায়চারি করছিল। সেইখানেই স্পেনের 'হোলি অফিস' সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজকুমারী তার কাকাকে ডেকে বলল—আমার এই আমুদে বামনটা রাগ করে ঘুমোচ্ছে। আপনি ওকে তুলে দিয়ে আমার জন্যে নাচতে বলুন।

তারা নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি করল। তারপরে ঝুঁকে পড়ে তাঁর কারুশিল্প খচিত দস্তানা দিয়ে ডন পেড্রো তার গালে বিরাট একটা চড় কষিয়ে দিলেন—ওঠ; বেটা ওঠ। স্পেনের আর ইনডিস-এর রাজকুমারী তোর নাচ দেখতে চান। তোকে নাচতে হবে, বীভৎস জানোয়ার।

কিন্তু খুদে বামনটির কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ডন পেড্রো ক্লান্তভাবে বললেন—চাবুক মাস্টারকে সংবাদ দিতে হবে।' এই বলে তিনি অলিন্দের দিকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু চ্যামবারলেনকে বেশ গম্ভীর দেখা গেল। সে বামনটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসল এবং তার বুকের উপরে হাতটা রাখল। কয়েক মুহূর্ত পরে কাঁধটা কুঁচকে সে দাঁড়িয়ে উঠে রাজকুমারীর সামনে মাথাটা একটু নুইয়ে বলল—আমার সুন্দরী রাজকুমারী, আপনার এই আমুদে বামনটি আর কোনোদিনই নাচবে না। রাজাকে হাসানোর মতো সে যে এতটা কুৎসিত হয়ে জন্মেছে এইটাই খুব দুঃখের কথা।

হাসতে-হাসতে রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু ও আর নাচবে না কেন?

কারণ, তার হৃদয়টা ভেঙে গিয়েছে—উত্তর দিল চ্যামবারলেন।

এই শুনে রাজকুমারী ভ্রূকুটি করল; তার সেই গোলাপের পাপড়ির মতো ওষ্ঠ-যুগল ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে বলল—যার হৃদয় আছে ভবিষ্যতে সে যেন আমার সঙ্গে খেলতে না আসে।

এই বলেই সে দৌড়ে বাগানের দিকে চলে গেল।

ধীবর আর তার আত্মা
The Fisherman and his soul

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যুবক ধীবরটি সমুদ্রে বেরিয়ে গিয়ে জাল, ফেলত। উপকূলভাগ থেকে বাতাস বইলে তার জালে কোনো মাছই পড়ত না; পড়লেও, তা সামান্য। কারণ সে-বাতাস ঠাণ্ডা, ঝড়ো। ঢেউগুলো ফুলে ফেঁপে সেই বাতাসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু সমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে যখন বাতাস বইত তখনই মাছের দল ঝাঁক বেঁধে দূর-দূরান্ত থেকে এসে তার জালের মধ্যে ঢুকত। সেই সব মাছ বাজারে নিয়ে গিয়ে সে বিক্রি করত।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়েই একভাবে সে সমুদ্রে ভাসত; একদিন জালটা এত ভারী হয়ে উঠল যে সে কিছুতেই সেটাকে টেনে নৌকোর ওপরে তুলতে পারল না। নিজের মনে হেসে সে বলল—নিশ্চয় জালে অনেক মাছ পড়েছে। অথবা, কোনো সামুদ্রিক দৈত্য ধরা পড়েছে যাকে দেখে মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, বা, এমন কোনো বীভৎস ভয়ঙ্কর প্রাণী ধরা পড়েছে যাকে আমাদের মহিমময়ী মহারানি পেলে খুশি হবেন। এই বলে সে প্রাণপণ শক্তিতে জালে টান দিল। ধীরে ধীরে জালের ফতনাগুলে ভেসে উঠল; তারও বেশ কিছু পরে জালটা নৌকোর ধারে উঠে এল।

কিন্তু জালে না রয়েছে মাছ, আর না রয়েছে কোনো সামুদ্রিক দৈত্য। রয়েছে ঘুমন্ত খুদে একটি জল-অপ্সরী। তার চুলগুলি ভেজা সোনার পশমের মতো—এক একটি চুল যেন কাচের গ্লাসে রাখা সোনার সুতো। তার দেহটা হাতির দাঁতের মতো সাদা; তার ল্যাজটা রুপো আর মুক্তো দিয়ে তৈরি। সমুদ্রের সবুজ আগাছাগুলি তার দেহটিকে বেষ্টন করে রয়েছে। তার কান দুটি সামুদ্রিক ঝিনুকের মতো; প্রবালের মতো রাঙা তার দুটি ঠোঁট। শীতল ঢেউগুলি তার নিরুত্তাপ কুচযুগলের ওপরে গড়িয়ে পড়ছে; তার চোখের পাতায় নুন পড়ে চিকচিক করছে।

অপ্সরীটি এত সুন্দরী যে যুবক জেলেটি তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। হাত দুটো বাড়িয়ে জালটাকে সে তার কাছে টেনে নিল; তারপরে ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে। তাকে স্পর্শ করতেই সি-গালের মতো সে চমকে উঠে চিৎকার করে জেগে উঠল; তারপরে ফিকে লাল পদ্মরাগ মণির মতো চোখ দিয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। পালিয়ে যাওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল সে; কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই তাকে ছেড়ে দিল না। জোর করে জাপটে ধরে রাখল।

ছেলেটির আলিঙ্গণ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো আশা নেই বুঝতে পেরে অপ্সরীটি কাঁদতে কাঁদতে বলল—দোহাই তোমার; আমাকে ছেড়ে দাও; কারণ নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ রাজার আমিই একমাত্র সন্তান।

কিন্তু ছেলেটি বলল—একটিমাত্র শর্তে তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি। সেটি হচ্ছে এই যে

যখনই আমি তোমাকে ডাকব তখনই তোমাকে আমার কাছে এসে গান গাইতে হবে। সেই গান শুনে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে হাজির হবে। তাহলেই আমার জাল মাছে বোঝাই হয়ে যাবে।

অপ্সরীটি কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমি যদি তোমার কথামতো কাজ করব বলে প্রতিজ্ঞা করি তাহলেই কি তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে?

নিশ্চয় ছেড়ে দেব।

জল-অপ্সরীটি প্রতিজ্ঞা করতেই সে তার বাহুবন্ধন শিথিল করল। একটা অদ্ভুত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অপ্সরীটি জলের মধ্যে ডুবে গেল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যুবকটি সমুদ্রের বুকে গিয়ে অপ্সরীকে ডাকত; আর অপ্সরীটি জল থেকে উঠে এসে তাকে গান শোনাত। সেই গান শুনে শুশুকের দল তার চারপাশে ভেসে বেড়াত আর বন্য সি-গালের দল তার মাথার ওপরে চক্রাকারে বেড়াত উড়ে। কারণ তার গানগুলি বড়ো সুন্দর। এক গুহা থেকে আর এক গুহায় যারা মেষ চরিয়ে বেড়ায় সেই সব উপকূলবর্তী যাযাবরদের গান সে গাইত; লম্বা সবুজ দাড়িওয়ালা লোমশবপু ট্রিটনদের গান সে গাইত, সবুজ পাথর দিয়ে তৈরি রাজপ্রাসাদ, যার ছাদ হচ্ছে লাল পাথরের—তার গান সে গাইত। সে গান গাইত সমুদ্রের বাগানের—যেখানে সারাদিন প্রবালের ঢেউ খেলা করে, রূপালি পাখির মতো মাছেরা দৌড়ে বেড়ায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত—যার পাহাড়ের গায়ে এক ধরনের সাদা ফুল ফুটে থাকে—হলদে বালির আলে যেখানে ফুটে থাকে পিঙ্ক ফুল। যে সব তিমিরা উত্তর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে তাদের গান গাইত—যাদের গান না শোনার জন্যে নাবিকরা নিজেদের কানের বিবর মোম দিয়ে বন্ধ করে রাখত—কারণ তাদের গান একবার কানে ঢুকলেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হত—সেই সব সাইরেনদের গান সে গাইত। তাছাড়া গাইত বিরাট বিরাট জাহাজের গান, মারম্যানদের গান, যারা সাদা ফেনার বিছানায় শুয়ে থাকে আর নাবিকদের অভ্যর্থনা করার জন্যে নিজেদের হাত বাড়িয়ে দেয়—সেই সব জল-অপ্সরীদের গান সে গাইত। এই গান শুনে মাছের ঝাঁক দৌড়ে আসত সেইখানে। আর জেলের ছেলেটি জাল বোঝাই করে মাছ ধরত। মাছ ধরা শেষ হলে অপ্সরী আবার সমুদ্রে ডুবে যেত।

কিন্তু তবু যুবকটি তার দেহ স্পর্শ করতে পারে এতটা কাছে কোনোদিনই সে আসত না। যুবকটি অনুনয়-বিনয় করলেও না। ধরার চেষ্টা করলেই সীল মাছের মতো সে জলের তলায় ডুবে যেত, আর সেদিন উঠত না। কিন্তু সে তাকে নিত্য গান শোনাত। সে-গানে যুবকটি মুগ্ধ হয়ে যেত। অনেকদিন মাছ ধরতেও সে ভুলে যেত।

একদিন সন্ধ্যার সময় যুবকটি তাকে বলল—অপ্সরী, জল-অপ্সরী; তোমাকে আমি ভালোবাসি। আমাকে বিয়ে কর তুমি।

কিন্তু জল-অপ্সরী মাথা নেড়ে বলল—তা হয় না। তোমার আত্মা হচ্ছে মানুষের। যদি তুমি তোমার ওই আত্মাটিকে সরিয়ে দিতে পার তাহলেই আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারি।

এই শুনে যুবকটি নিজের মনে-মনেই বলল—আত্মাটা আমার কী কাজে লাগছে! আমি ওকে দেখতেও পাই নে, ছুঁতেও পারি নে। সুতরাং আমি ওকে পরিত্যাগ করব। তাহলেই আমার জীবন আনন্দে ভরে উঠবে।

এই রকম চিন্তা করার সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দে তার বুকটা ভরে উঠল; সে হাতটা বাড়িয়ে বলল—আত্মাকে আমি পরিত্যাগ করব। তুমি হবে আমার বৌ, আমি তোমার বর। তারপরে সমুদ্রের অতলে আমরা দুজনে বাসা বাঁধবো। তুমি যা বলবে তাই আমি করব তাহলে আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

খুশি হয়ে জল-অপ্সরী নিজের হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে ফেলল।

যুবকটি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু আত্মাটাকে আমি বিদায় দেব কেমন করে? বলে দাও—আমি তাই করব।

অপ্সরীটি বলল—তা আমি জানি নে। সমুদ্রে যারা বাস করে তাদের কোনো আত্মা নেই।

এই বলে তার দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে সে জলের মধ্যে ডুবে গেল।

পরের দিন খুব সকালে—সূর্য তখনো পাহাড় উঁচিয়ে খুব বেশিদূর একটা ওঠেনি, ধীবর যুবকটি পাদরির বাড়িতে হাজির হয়ে দরজায় ধাক্কা দিল।

গির্জার নতুন কর্মচারীটি বেড়ার ফাঁক থেকে তাকিয়ে দেখল, তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে সে দরজা খুলে দিয়ে বলল—এস। যুবক ধীবরটি ভেতরে ঢুকে গেল; সুগন্ধ নলখাগড়া পাতা ছিল মেঝেতে। পাদরি তখন প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। সেইখানে হাঁটু মুড়ে বসে পাদরিকে সম্বোধন করে ধীবরটি বলল—পিতা, আমি একটি জলচর প্রাণীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে আমার এই আত্মা। বলুন দেখি, কেমন করে আমি আমার এই আত্মাটাকে বিদায় করে দিতে পারি। কারণ, সত্যি কথা বলতে কি একে আমার প্রয়োজনটাই বা কী? এর দামই বা আমার কাছে কতটুকু? আমি একে দেখতেও পাই নে, একে স্পর্শও করতে পারি নে। আমি একে চিনিও না।

এই কথা শুনে পাদরিটি বুক চাপড়িয়ে বললেন—হায়, হায়! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ, না, কোনো বিষাক্ত ওষুধ খেয়েছ? আত্মাই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যাতে আমরা খুব ভালো আর সৎভাবে ব্যবহার করতে পারি সেই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর এটি আমাদের দিয়েছেন। বিশ্বের সমস্ত সোনা-দানা একসঙ্গে জড়ো করলেও এর সমমূল্যের হয় না। সেই জন্যে বলছি, ওকথা তুমি আর মনেও স্থান দিয়ো না। একথা ভাবাও পাপ; সে-পাপের কোনো ক্ষমা নেই। আর জলচর প্রাণীদের কথা যদি বল তাহলে বলতে হয় তারা সবাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যারা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তারাও অধঃপাতে গিয়েছে। তারা হচ্ছে মাটির পশু; ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান তাদের নেই। ঈশ্বর তাদের জন্যে মৃত্যু বরণ করেননি।

পাদরির এবম্বিধ বাক্য শুনে যুবক ধীবরটির চোখ দুটি জলে ভরে উঠল; তারপরে সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—পিতা, বনদেবতারা খুশি মনে বনে বাস করে; গন্ধর্বরা সোনার বীণা নিয়ে পাথরের ওপরে বসে থাকে। তাদের দিনগুলি ফুলের মতো মিষ্টি। তোমাকে অনুরোধ করছি আমাকে তুমি তাদের মতো করে দাও। যে আত্মা আমার ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাকে পুষে রেখে আমার লাভ কী?

ভুরু দুটো কুঁচকে পাদরি চিৎকার করে বললেন—দেহজ ভালোবাসা নোংরা আর ঈশ্বর যে সব পেগান দেবতাদের তাঁর বিশ্বে ঘুরে বেড়াতে দেন তারাও কদর্য। অরণ্যবাসী গন্ধর্বরা নিপাত যাক; নিপাত যাক জল-অপ্সরীর দল। রাত্রিতে আমি তাদের গান শুনেছি। তারা আমাকে ভুলিয়ে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আমার জানালায় ঠকঠক করে শব্দ করে তারা

হাসে। তাদের সেই বিপজ্জনক আনন্দের কাহিনি তারা আমার কানে-কানে বলে যায়। তারা আমাকে প্রলুব্ধ করে; আমি যখন প্রার্থনা করি তখন তারা আমাকে ভেংচি কাটে। আমি তোমাকে বলছি স্বর্গ না নরক—কোথাও তাদের কোনো স্থান হবে না; কোথাও তারা ঈশ্বরের স্তব করবে না।

যুবক ধীবরের কেঁদে বলল—পিতা, তুমি কী বলছ তা তুমি জান না। আমার জালে এবার আমি একটি রাজকন্যাকে বন্দী করেছি। সকাল বেলার নক্ষত্রের চেয়েও সে সুন্দরী, চাঁদের চেয়েও সাদা তার দেহের রঙ। তারই জন্যে আত্মাকে আমি বিসর্জন দেব; তারই জন্যে স্বর্গকে আমি পরিত্যাগ করব। সুতরাং আমি যা চাচ্ছি তাই আমাকে দাও; আমি শান্তিতে ফিরে যাই।

পাদরি চিৎকার করে বললেন—দূর হও, দূর হও। তোমার প্রণয়িণীকে ঈশ্বর পরিত্যাগ করেছেন। তোমাকেও ঈশ্বর পরিত্যাগ করবেন।

গভীর দুঃখে মাথাটি নিচু করে যুবকটি বাজারের দিকে এগিয়ে গেল।

ব্যবসাদারেরা তাকে আসতে দেখে নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করল; তারপরে তার নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—কী বিক্রি করবে হে?

সে বলল—বিক্রি করব আমার আত্মা। এটাকে নিয়ে আমি বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমরা এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নাও। কারণ, আমি একে দেখতেও পাই নে, স্পর্শও করতে পারি নে; এটা কী তাও আমি জানি নে। এটা আমার কোন কাজে লাগবে?

ব্যবসাদারেরা তাকে ব্যঙ্গ করে বলল—তোমার আত্মা মানুষের কোন কম্মে লাগবে? এক টুকরো রুপোর দামও ওর নেই। তোমার দেহটাকে বিক্রি করে দাও। আমরা তোমাকে ক্রীতদাস করব। কিন্তু আত্মার কথাটি বলো না। ওর কোনো দাম নেই আমাদের কাছে।

যুবক মনে-মনে বলল—কী অদ্ভুত জিনিস! পাদরি বললেন আত্মার দাম বিশ্বের সমস্ত সোনা একসঙ্গে করলে যা হয় তাই। ব্যবসাদাররা বলছে ওর দাম কানাকড়িও নয়।

এই বলে সে বাজার ছাড়িয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে দাঁড়াল; তারপরে কী করবে ভাবতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার একটি বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। বন্ধুটি তাকে এক-ডাইনির কথা বলেছিল। উপকূলের ওপরে একটা গুহায় সে বাস করত। আত্মাকে বিসর্জন দেওয়ার জন্যে সে এতই অস্থির হয়ে উঠেছিল যে সেই কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সেইদিকে ছুটল। তার পেছনে-পেছনে ধুলোর ঝড় বইতে লাগল। হাত কুটকুটানি থেকে যুবতী ডাইনিটি বুঝতে পারল সে আসছে। বুঝে, সে একটু হেসে তার লাল চুলগুলিকে এলিয়ে দিল। এইভাবে এলো চুলে সে তার গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। তার হাতে ছিল একগোছা ফুটন্ত হেমলক।

ধীবর যুবকটি যখন হাঁপাতে হাঁপাতে খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে তার সামনে এসে নতজানু হয়ে বসল তখন ডাইনিটি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল—কী চাও তুমি—কী চাও? ঝড়ের সময়ে জালে মাছ ধরতে চাও? আমার শরের ছোটো একটা বাঁশি রয়েছে। সেটা বাজালেই মুলেটরা ভাসতে-ভাসতে সব উপকূলের ধারে এসে হাজির হয়। কিন্তু তার জন্যে হে সুন্দর যুবক, তোমাকে কিছু দিতে হবে। তোমার কী চাই—তোমার কী চাই? প্রচণ্ড বাত্যায় জাহাজকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাও যাতে সমস্ত মণিমুক্তা উপকূলে ভেসে আসবে? তাও তুমি পাবে। কিন্তু তার জন্যে কিছু দিতে হবে তোমাকে। আমার কাছে একটা ফুল রয়েছে। সেটা এই

উপত্যকারই এমন একটা অংশে জন্মায় যেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তার বুকে একটা তারার চিহ্ন রয়েছে। এর রস হচ্ছে দুধের মতো সাদা। তারই একটা ফোঁটা যদি তুমি রানির দাম্ভিক ঠোঁটের ওপরে একবার বুলিয়ে দিতে পার তাহলে সে তোমার পিছু পিছু সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তার জন্যে কিছু দিতে হবে তোমাকে। কিছু দিতে হবে। একটা ব্যাঙকে পিষে আমি কাদা করে দিতে পারি। সেইটাকে গোলাতে পারি একটা মরা লোকের হাত দিয়ে। ঘুমন্ত শত্রুর ওপরে সেটা যদি ছিটিয়ে দাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সাপ হয়ে যাবে। তার মা-ই তখন তাকে মেরে ফেলবে। একটা চাকা দিয়ে চাঁদকে আমি স্বর্গ থেকে টেনে আনতে পারি। একটা স্ফটিক পাত্রের মধ্যে দেখাতে পারি মৃত্যুকে। কী চাও বল। তোমাকে আমি তাই দেব। কিন্তু প্রতিদানে কিছু দিতে হবে তোমাকে।

যুবক ধীবর বলল—আমি চাই সামান্য; কিন্তু পাদরি রেগে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমাকে বিদ্রূপ করেছে ব্যবসাদাররা। যদিও মানুষে তোমাকে ডাইনি বলে, তবু সেই জন্যেই আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি প্রতিদানে যা চাও তাই আমি দেব।

তার সামনে এগিয়ে এসে ডাইনিটি জিজ্ঞাসা করল—কী চাও বল।

আত্মাটিকে আমি বিদায় দিতে চাই।

ডাইনির মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। কেঁপে উঠল তার শরীর। নীল চাদরে সে তার মুখটা ঢেকে ফেলল। তারপরে বিড়বিড় করে বলল—সুন্দর যুবক, ওটা বড়ো ভয়ানক জিনিস।

যুবকটি তার তামাটে চুলগুলিকে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে বলল—আত্মাটা আমার কাছে কিছু নয়। আমি তাকে দেখতেও পাইনে, স্পর্শও করতে পারি নে। আমি তাকে চিনিও না।

সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ডাইনি বলল—যদি তোমাকে আমি বলে দিই তাহলে আমাকে তুমি কী দেবে?

সে বলল—পাঁচটা সোনার মোহর। সেই সঙ্গে দেব জাল, আমার বাড়ি, আর যে নৌকো ভাসিয়ে আমি মাছ ধরতে যাই সেই নৌকো। শুধু পথটা আমাকে দেখিয়ে দাও; আমার যা কিছু রয়েছে সব তোমাকে দিয়ে দেব।

বিদ্রূপ করে হেসে ডাইনিটি বলল—শরৎকালের পাতাকে আমি সোনায় পরিণত করতে পারি। ইচ্ছে হলে, বিবর্ণ চাঁদের আলোকে আমি রুপোর স্রোতে পরিণত করতে পারি। আমার মনিব বিশ্বের সমস্ত রাজাদের চেয়ে ধনী।

তাহলে, কী চাই তোমার?

আমার সঙ্গে নাচতে হবে।

মাত্র এই? অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল যুবকটি।

ও ছাড়া আর কিছু নয়—এই বলে ডাইনিটি মিষ্টি করে হাসল।

যুবকটি বলল—তাহলে সূর্যাস্তের পরে কোনো গোপন জায়গায় আমরা দুজনে নাচব। নাচের শেষে আমি যা জানতে চাই তুমি আমাকে তাই বলে দেবে।

ডাইনিটি ঘাড় নেড়ে বলল—পূর্ণিমার রাতে, পূর্ণিমার রাতে।

এই কথা বলে চারপাশে একবার উঁকি দিয়ে কান পেতে কী যেন শুনতে লাগল সে। একটা নীল পাখি চিৎকার করতে-করতে তার বাসা থেকে বেরিয়ে উড়ে গেল। মোটা ঘাসের বনে তিনটে ডোরা-কাটা পাখি খস খস করতে করতে শিস দিয়ে পরস্পরকে ডাকতে লাগল। আর শোনা গেল উপলখণ্ডের ওপরে ঢেউ-এর গড়িয়ে পরার শব্দ। এগুলি ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না কোথাও।

ডাইনিটি ফিসফিস করে বলল—আজ রাত্রিতে পাহাড়ের ওপরে নিশ্চয় তুমি আসবে। আজ হচ্ছে স্যাবাথ। তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

একটু চমকে উঠে সে জিজ্ঞাসা করল—কার কথা বলছ?

ডাইনিটি বলল—স্ শুনে লাভ নেই তোমার, আজ রাত্রিতে যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে হর্নবিম গাছের ডালের নীচে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি। যদি কোনো কালো কুকুর তোমার দিকে দৌড়ে আসে তাহলে উইলো গাছের একটা লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করো। তাহলেই সে পালিয়ে যাবে। যদি কোনো পেঁচা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়—তার কথার কোনো উত্তর দিয়ো না। আকাশে পূর্ণ চাঁদ উঠলেই আমি তোমার কাছে আসব। তারপরে আমরা দুজনে ঘাসের ওপরে নাচব।

সে জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে তো?

ছাগলের খুরে দিব্যি দিয়ে বলছি, দেব।

যুবকটিই তার মাথা থেকে টুপিটা একটু তুলল; তারপরে মাথাটা একটু নুইয়ে খুশি মনে ফিরে গেল।

যতদূর দেখা যায় ডাইনিটি তাকে দেখল; তারপরে গুহার ভিতরে গিয়ে আয়নায় নিজেরে মুখ দেখল; চারকোল পুড়িয়ে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে কী যেন দেখল; তারপরে মুষ্টিবদ্ধ করে বলল—জল-অপ্সরীর মতোই আমি সুন্দরী। ও আমারই হওয়া উচিত ছিল।

এবং সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে সে পাহাড়ের ওপরে উঠে হর্নবিম গাছের নীচে অপেক্ষা করতে লাগল। মধ্য রাত্রিতে ডাইনিরা বাদুড়ের মতো উড়তে-উড়তে সেখানে হাজির হল। ঘাসের ওপরে নেমে তারা বলাবলি করতে লাগল—এ যে নতুন লোক দেখছি! শেষকালে বাতাসে লাল চুল উড়িয়ে এল সেই যুবতী ডাইনি। তাকে দেখেই অন্য ডাইনিরা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল—তিনি কোথায়—তিনি?

ডাইনিটি একটু হেসে হর্নবিম গাছের তলায় দৌড়ে গিয়ে ধীবরটির হাতে ধরে ঘাসের ওপরে টেনে নিয়ে এল। তারপরে তারা নাচতে শুরু করল। দুজনে তারা ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। ঠিক এমন সময় মনে হল কে যেন ঘোড়ায় চেপে দ্রুতবেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কোনো ঘোড়াই তার চোখে পড়ল না। কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল সে।

ডাইনি বলল—'জোরে, জোরে; আরো জোরে'। এই বলে ধীবরটির গলাটা সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। তার তপ্তশ্বাস যুবকটির গালের ওপরে এসে পড়ল। 'আরও জোরে, আরও জোরে'—চিৎকার করে উঠল ডাইনি। মনে হল, পৃথিবীটা তাদের তলায় বনবন করে ঘুরছে।

যুবকটির কেমন যেন ভয় লাগল। তার মনে হল কোনো অমঙ্গল যেন তাকে লক্ষ করছে। তারপরে তার মনে হল পাথরের ছায়ার নীচে একটা লোক বসে রয়েছে। এর আগে তাকে সে দেখেনি। লোকটার গায়ে কালো ভেলভেটের পোশাক। তার মুখটা অদ্ভুত রকমের বিবর্ণ; কিন্তু তার ঠোঁট দুটি লাল ফুলের মতো গর্বিত। তাকে বেশ ক্লান্ত মনে হল; মনে হল যেন অন্যমনস্কভাবে একটা ছোরার বাঁট নিয়ে সে খেলা করছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো যুবক ধীবরটি তাকে লক্ষ করল। তারপরে চারটি চোখের মিলন হল। ডাইনিটির হাসির শব্দ সে শুনতে পেল। সে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বনবন করে ঘুরোতে লাগল। বনের ভেতরে হঠাৎ একটা কুকুর ডেকে উঠল। নাচিয়েরা সব থেমে গেল। তারপরে জোড়া-জোড়া তারা সেই লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে তার হাতে চুমু খেল। কিন্তু লোকটির ঠোঁট দুটো ব্যঙ্গের হাসিতে বেঁকে গেল। সে কেবল যুবক ধীবরটির দিকে তাকিয়ে রইল।

ডাইনিটি তাকে ফিসফিস করে বলল—এস আমরা ওঁকে পুজো কার।

হাত ধরে তাকে সে এই লোকটির কাছে নিয়ে গেল; কিন্তু কাছাকাছি আসতেই কী জানি কেন ধীবরটি ক্রুশের ভঙ্গিতে তার বুকের ওপরে হাত দুটো রাখল; আর ঈশ্বরের নাম করল।

যুবকটির এরকম ব্যবহার দেখেই ডাইনিরা বাজপাখির মতো চিৎকার করতে করতে উড়ে পালাল; যে বিবর্ণ মুখটা এতক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ করছিল সেটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠতে লাগল, তারপরে সে বনের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে তার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

লাল চুল-ওয়ালী সেই ডাইনিটিও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল; কিন্তু ধীবরটি শক্ত করে তার কব্জিটা ধরে রইল। সে চিৎকার করে বলল—আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও; কারণ, তুমি এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করেছ যা তোমার উচ্চারণ করা উচিত হয়নি; এমন একটি চিহ্ন দেখিয়েছ যার দিকে তাকানো উচিত নয় আমাদের।

ধীবরটি বলল—ওসব ছাড়। সেই গোপন কথাটা না বলা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।

ডাইনির ঘেসো-সবুজ রঙের চোখ দুটো জলে করুণ হয়ে উঠল; বলল—ওটা বাদ দিয়ে তোমার যা ইচ্ছা তাই চাও।

ধীবরটি হেসে তার মুঠো আরও শক্ত করে ধরে রইল।

তার হাতে থেকে নিস্তার নেই বুঝতে পেরে ডাইনি অনুনয় করে বলল—সমুদ্রের মেয়ের মতোই নিশ্চয় আমি সুন্দরী, আর তারই মতো শান্ত।

কিন্তু ধীবরটি তাকে একটা ঝাঁকনি দিয়ে বলল—হয় বল; না হয়তো তোমাকে আমি খুন করে ফেলব।

এই কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ডাইনি বলল—তবে তাই হোক। তোমার আত্মা তোমার নিজস্ব। আমার নয়। ওকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।

এই বলে কোমরবন্ধনী থেকে ছোটো একটা ছুরি বার করে সে যুবকটির হাতে দিল।

অবাক হয়ে যুবকটি জিজ্ঞাসা করল—এ দিয়ে আমি কী করব?

একটু চুপ করে রইল ডাইনি; ভয়ার্ত হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। তারপরে কপালের উপর থকে চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বলল—মানুষ যেটাকে দেহের ছায়া বলে মনে করে সেটা দেহের ছায়া নয়—সেটা হল আত্মার ছায়া। চাঁদের দিকে পেছন করে সমুদ্রের উপকূলে দাঁড়াও। পায়ের চারপাশে তোমার যে ছায়াটাকে দেখতে পাবে সেটা কেটে ফেলবে। তারপরে তোমার আত্মাকে নির্দেশ দেবে তোমাকে ছেড়ে যেতে। তখনই তোমার আত্মা তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

সত্যি?

সত্যি। তোমাকে এটা হয়তো আমার বলা উচিত হয়নি।

এই বলে কাঁদতে-কাঁদতে সে তার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল।

ধীবরটি তাকে ঘাসের ওপরে ফেলে রেখে ছুরিটা তার কোমরে বেঁধে পাহাড় থেকে নেমে এল।

এবং তার ভেতরে যে আত্মাটা ছিল সে তাকে ডেকে বলল—শোন। আমি এতদিন তোমার সঙ্গে বাস করেছি—দাসত্ব করেছি তোমার। এখন আমাকে তুমি বিসর্জন দিয়ো না। আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।

যুবকটি হেসে বলল—তা তুমি করনি। কিন্তু তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। বিরাট বিশ্ব—এখানে স্বর্গ আর নরক দুই-ই রয়েছে। যেখানে ইচ্ছে তুমি চলে যাও। আর আমাকে বিরক্ত করো না। কারণ, আমার প্রেয়সী আমাকে ডাকছে।

আত্মা বলল—যদি একান্তই আমাকে বিদায় দাও তাহলে অন্তত হৃদয়টাকেও দাও। এই পৃথিবী বড়োই নিষ্ঠুর। সুতরাং হৃদয়টাকেও নিয়ে যেতে দাও আমাকে।

যুবকটি হেসে মাথা নেড়ে বলল—হৃদয়টাই যদি তোমাকে দিলাম তাহলে প্রেয়সীকে আমি কী দেব? ওটা আমার প্রেমিকার। অতএব চলে যাও। আর দেরি করো না।

প্রেমে কি আমারও প্রয়োজন নেই?

চলে যাও, চলে যাও। তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই।

এই বলে ছুরিটা নিয়ে সে পায়ের ছায়াটা কেটে ফেলে ছুরিটা আবার কোমরে গুঁজে রাখল। চলে যাও, চলে যাও। তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নেই।

আত্মাটি বলল—না, আবার আমাদের দেখা হবে।

যুবকটি জিজ্ঞাসা করল—কী করে? তুমি নিশ্চয় সমুদ্রের তলায় আমার সঙ্গে যাবে না?

বছরে একবার এইখানে এসে আমি তোমাকে ডাকব। হয়তো, আমাকে তোমার প্রয়োজন হতে পারে।

যুবকটি বলল—তোমাকে আমার আবার কী প্রয়োজন হবে বুঝতে পারছি নে, তবে তুমি যখন

আসতে চাইছ তখন এস।

এই বলে সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট্রিটনরা তাদের শিঙে ফুঁকল। সেই খুদে জলঅপ্সরীটি সমুদ্রের জলে ভেসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল; তার দুটি হাতে যুবকের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুমু খেল।

আর সেই নির্জন সমুদ্রতীরে আত্মাটি নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখল। যখন তারা জলের তলায় ডুবে গেল তখনই সে কাঁদতে-কাঁদতে জলাভূমির ওপর দিয়ে চলতে লাগল।

এক বছর পরে সেইখানে ফিরে এসে আত্মাটি তাকে ডাকল। সমুদ্র থেকে উঠে যুবকটি জিজ্ঞাসা করল—ডাকছ কেন?

আমার কাছে এস। আমি কী অদ্ভুত জিনিস দেখেছি সেই সব কথাই তোমাকে বলব।

কাছে এস অগভীর জলে হেলান দিয়ে বসে ধীবরটি তার কথা শুনতে লাগল।

আত্মাটি বলল—তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে মুখ করে আমি হাঁটতে লাগলাম। বিশ্বের যা কিছু বিজ্ঞতা সবই এই পূর্বদিক থেকে এসেছে। ছ'দিন হাঁটার পরে সপ্তম দিন সকালে আমি একটা পাহাড়ের কাছে এসে হাজির হলাম। এই দেশটা হচ্ছে তাতারদের। রোদের ঝাঁঝ এড়ানোর জন্যে আমি একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। শুকনো মাটি, একেবারে রোদে পুড়ে গিয়েছে। মাছির মতো গুঁড়ি দিয়ে মানুষরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে।

দুপুরের সময় দেখলাম সমতলভূমি থেকে লাল ধুলো উঠে আকাশ ছেয়ে দিয়েছে। এই দেখেই তাতাররা তাদের চিত্রিত ধনুক নিয়ে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল। মেয়েরা চিৎকার করতে করতে গাড়ির পেছনে নিজেদের লুকিয়ে ফেলল।

সন্ধ্যার দিকে তাতাররা ফিরে এল; কিন্তু তাদের মধ্যে পাঁচজনকে দেখা গেল না। যারা ফিরে এল তাদের মধ্যেও কম লোক আহত হয়নি। তারা সেই গাড়িগুলোকে ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। তিনটে শেয়াল গর্ত থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে একবার দেখেই উলটো দিকে চলে গেল।

চাঁদ উঠলে দেখলাম সমতলভূমির ওপরে তাঁবুর কাছে আলো জ্বলছে। এই দেখে আমি সেই দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম কার্পেটের ওপরে একদল বণিক বসে রয়েছে। পেছনে বাঁধা রয়েছে উটের দল; আর তাদের নিগ্রো চাকররা তাদের জন্যে তাঁবু খাটাচ্ছে।

তাদের কাছে হাজির হতে বণিকদের নেতা তরোয়াল খুলে জিজ্ঞাসা করল—কী চাই?

বললাম—আমি আমার দেশের একজন রাজপুত্র। তাতাররা আমাকে ধরে এনে ক্রীতদাস করে রাখবে ভেবেছিল, আমি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি।

আমার কথা শুনে লোকটা হেসে আমাকে পাঁচটা কাটা মুণ্ডু দেখাল। মুণ্ডুগুলো পাঁচটা লম্বা বাঁশের মাথার ওপরে গাঁথা ছিল। লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করল—ঈশ্বরের অবতার কে? আমি বললাম—মহম্মদ।

এই কথা শুনে মাথাটা নুইয়ে সে হাত ধরে আমাকে তার পাশে বসাল। কাঠের পাত্রে একটা

নিগ্রো ক্রীতদাস আমার জন্যে ঘোড়ার দুধ এনে দিল; আর এনে দিল সেদ্ধকরা একটুকরো মেড়ার মাংস।

সকাল হতে আমাদের যাত্রা শুরু হল। দলপতির পাশে-পাশে লাল-চুলো একটা উটের পিঠে চড়ে আমি চলতে লাগলাম। আমাদের সামনে বর্শা নিয়ে ছুটতে লাগল একটা লোক। আমাদের দু'পাশে চলল সৈন্য। পেছনে চলল খচ্চরের দল পণ্য নিয়ে।

তাতারদের দেশ ছেড়ে আমরা আর একটা দেশে হাজির হলাম। সেখানকার লোকেরা চন্দ্রকে অভিসম্পাত দেয়। আমরা গ্রাইফোনসদের দেখলাম। সাদা পাহাড়ের ওপরে বসে তারা তাদের ধনরত্ন পাহারা দিচ্ছিল। পাছে নিঃশ্বাসের হাওয়ার বরফ ঝরে পড়ে এই ভয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে হাঁটছিলাম। উপত্যকা দিয়ে যাওয়ার সময় গাছের কোটর থেকে পিগমিরা আমাদের দিকে তীর ছুঁড়ল; রাত্রিতে বন্য মানুষেরা জয়ঢাক পিটতে লাগল। বাঁদরদের টাওয়ারে এসে আমরা তাদের ফল খেতে দিলাম। ফলে, তারা আমাদের কোনো অনিষ্ট করল না। সাপেদের টাওয়ারে এসে তামার পাত্রে তাদের দুধ খেতে দিলাম। তারা আমাদের পথ ছেড়ে দিল।

প্রতিটি শহরের রাজা আমাদের ওপরে কর বসাল; কিন্তু আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিল না। দেওয়ালের ওপাশ থেকে কিছু রুটি আর অন্যান্য খাবার ছুঁড়ে দিল। গ্রামবাসীরা আমাদের আসতে দেখে পাতকুয়োর জলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে সব পাহাড়ের ওপরে পালিয়ে গেল। আমরা ম্যাগভি-দের সঙ্গে লড়াই করলাম। এরা বুড়ো হয়ে জন্মায়; তারপর ছোটো হয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে। শেষকালে মারা যাওয়ার সময় শিশু হয়ে যায়। লড়াই করলাম ল্যাকট্রইদের সঙ্গে। বাঘেদের সন্তান বলে নিজেদের জাহির করে তারা। আমাদের লড়াই করতে হল অরেনটিসদের সঙ্গে। মৃতদেহকে এরা গাছের ওপরে কবর দেয়; নিজেরা থাকে গুহার অন্ধকারে। এই সব লড়াই-এ আমাদের দলের এক তৃতীয়াংশ মারা গেল; আর এক তৃতীয়াংশ মারা গেল অভাবে। বাকি যারা রইল তারা আমার বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করত লাগল যে তাদের এই সব দুর্ভাগ্যের জন্যে আমিই দায়ী। পাথরের নীচে থেকে শিং-ওয়ালা একটি বিষাক্ত সাপ বার করে ছোবল খেলাম তার। তারা যখন দেখল সাপের ছোবল খেয়েও আমাদের কিছু হল না তখন তারা ভয় পেয়ে গেল

চতুর্থ মাসে আমরা হাজির হলাম ইলেল শহরে। তখন রাত্রি, আকাশে ফিকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। গাছ থেকে ডালিম পেড়ে তারই রস খেলাম আমরা। তারপরে আমাদেরই কার্পেট বিছিয়ে সকালের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সকাল হলে শহরের ফটকে ধাক্কা দিলাম আমরা, ফটকের দরজা ছিল লাল ব্রোঞ্জ-এর; তার গায়ে আঁক ছিল সামুদ্রিক আর পাখা-ওয়ালা ড্রাগনদের ছবি। প্রাচীরের ওপর থেকে সশস্ত্র প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করল—কী চাই তোমাদের? আমাদের মধ্যে যে দোভাষী ছিল সে বলল—সিরিয়া থেকে আমরা অনেক পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছি। আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা জামিন রেখে বলল—দুপুরের দিকে দরজা খোলা হবে। তোমরা ওখানে অপেক্ষা কর।

দুপুরের দিকে দরজা খোলা হল। শহরের ভেতরে আমরা ঢুকে গেলাম। চারপাশ থেকে লোক এসে আমাদের দেখতে লাগল। একজন ঘোষক আমাদের আগমনবার্তা জানিয়ে জানিয়ে এগিয়ে গেল আমরা বাজারে এসে দাঁড়ালাম, আর নিগ্রোরা বাক্সপ্যাঁটরা খুলে জিনিসপত্র সব দেখাতে লাগল।

প্রথম দিন পাদরিয়া এসে আমাদের সঙ্গে দরকষাকষি করল। দ্বিতীয় দিন এলো অভিজাত

সম্প্রদায়ের লোকেরা তৃতীয় দিনে হাজির হল মিস্ত্রি আর ক্রীতদাসের দল। বিদেশ থেকে বণিকরা এলে এই রীতিতেই ওখানকার মানুষেরা তাদের সঙ্গে সওদা করত।

প্রায় পনেরোটি দিন এইভাবে আমাদের কেটে গেল। তারপরে শুক্লপক্ষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত হয় আমি শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতে আমি একটা বাগানে এসে হাজির হলাম। সেখানে ওদের দেবতা বাস করেন। বেগুনে পোশাক পরে পাদরীরা সবুজ গাছের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কালো মার্বেল পাথরের একটি জায়গার ওপরে একটা গোলাপের মতো লাল বাড়ি। সেখানেই দেবতারা থাকেন। মণি-মুক্তা দিয়ে খচিত তার দরজা; নানা চিত্রে শোভিত তার দেওয়াল। মন্দিরের সামনে পরিষ্কার ঝকঝকে একটি জলাশয়। তার পাশে আমি শুয়ে রইলাম। আমার বিবর্ণ আঙুলগুলি দিয়ে চওড়া-চওড়া পাতাগুলিকে ধরলাম। একটি পাদরি আমার দিকে এগিয়ে এসে পেছনে দাঁড়ালেন। তাঁর পায়ে চটি-জুতো। একটা পাটি জুতো সাপের নরম চামড়া দিয়ে তৈরি, আর এক পাটি জুতো তৈরি পাখির পালক দিয়ে।

একটু পরে আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কী চাই তোমার?

আমি বললাম—দেবতাকে দেখতে চাই।

তাঁর সেই তেবচা ছোটো চোখে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে তিনি বললেন—দেবতা শিকার করছেন।

বললাম—কোন বনে শিকার করছেন বলুন; আমি তাঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে শিকার করব।

লম্বা নখ দিয়ে তাঁর ঢিলে পোশাকটা চেঁছে তিনি বললেন—দেবতা ঘুমোচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোন সোফায় ঘুমোচ্ছেন বলুন। আমি তাকে ঘুমোতে দেখব।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন—দেবতা এখন ভোজনাগারে খাচ্ছেন।

বললাম—মদ যদি মিষ্টি হয় তাহলে তাঁর সঙ্গে আমি মদ খাব। তেতো হলেও পিছিয়ে আসব না।

বিস্ময়ে তিনি মাথাটা নীচু করে আমাকে হাত ধরে তুললেন; তারপরে মন্দিরে নিয়ে গেলেন আমাকে।

প্রথম ঘরে দেখলাম একটা সিংহাসনের ওপরে একটি মূর্তি বসানো রয়েছে। সিংহাসনটি মূল্যবান ধাতুতে তৈরি। তার চারপাশটা প্রাচ্যদেশীয় মুক্তা দিয়ে খচিত। মূর্তিটার চেহারা একটা মানুষের মতো। তার কপালে একটা রুবি বসানো; তার চুল থেকে দাবনা পর্যন্ত তেলে জ্যাব জ্যাব করছে। নতুন জবাই করা একটা ছাগল শিশুর রক্ত তার পায়ে।

পাদরিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই কি দেবতা?

পাদরি বললেন—এই দেবতা।

আমি চিৎকার করে বললাম—আমাকে দেবতা দেখাও। তা না হলে আমি তোমাকে খুন করব। এই বলে আমি তাঁর হাত ধরলাম। সঙ্গে-সঙ্গে তার হাতটা শুকিয়ে গেল।

পাদরি অনুনয় করে বলল—ঈশ্বর তাঁর সেবককে নিয়োগ করুন এবং আমি তাকে ঈশ্বর দেখাব।

এই শুনে আমি তাঁর হাতের ওপরে নিঃশ্বাস ফেললাম। তাঁর হাতটা সঙ্গে-সঙ্গে সেরে উঠল। কাঁপতে-কাঁপতে তিনি আমাকে দ্বিতীয় কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি আর একটি মূর্তি দেখলাম। সেই মূর্তিটিও বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত।

দেবতা কোথায়?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ইনিই দেবতা।

সত্যিকার দেবতা আমাকে দেখাও; না হলে, আমি তোমাকে হত্যা করব। এই বলে আমি তাঁর চোখ দুটি স্পর্শ করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন।

পাদরি আমাকে অনুনয় করে বললেন—ঈশ্বর তাঁর সেবককে নিরোগ করুন, তাহলেই আমি তোমাকে ঈশ্বর দেখাব।

তাঁর চোখের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতেই তিনি আবার তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

তিনি আমাকে তৃতীয় প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে কোনো মূর্তি নেই; রয়েছে পাথরের বেদীর ওপরে একটা আয়নামাত্র।

দেবতা কোথায়?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

তিনি বললেন—দেবতা বলে কিছু নেই। রয়েছে মাত্র এই আয়না; এটাকে বলা হয় বিজ্ঞতার আয়না। এর মধ্যে থেকে স্বর্গ আর মর্ত্যের প্রতিটি জিনিস প্রতিফলিত হয়। অনেক আয়নাই এখানে রয়েছে; কিন্তু সেগুলি সবই ওই বিভিন্ন মতবাদের আয়না। যাদের এই আয়নাটি রয়েছে তারা সব কিছুই জানতে পারে। সেই জন্যে এটি আমাদের ঈশ্বর। আমরা সবাই একে পুজো করি।

আয়নার দিকে তাকিয়েই বুঝলাম পাদরিটি সত্যি কথাই বলেছেন। তারপরে আমি একটা অদ্ভুত কাজ করলাম; কিন্তু সে কথা থাক। এখান থেকে একদিনের দূরত্ব একটি জায়গায় আমি সেটিকে লুকিয়ে রেখে এসেছি। আমাকে যদি তোমার ভেতরে ঢুকতে দিয়ে তোমাকে সেবা করার সুযোগ দাও তাহলে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানী মানুষদের চেয়েও তুমি বেশি বিজ্ঞ হতে পারবে। সেই আয়নাটি হবে তোমার সম্পত্তি। সুতরাং তোমার ভেতরে আমাকে প্রবেশ করতে দাও।

কিন্তু যুবক ধীবরটি হেসে বলল—জ্ঞানের চেয়ে প্রেম মহত্তর এবং খুদে জল-অপ্সরী আমাকে ভালোবাসে।

আত্মাটি বলল—না, না—ওকথা বলো না। জ্ঞানের চেয়ে ভালো জিনিস আর কিছু নেই।

ধীবরটি বলল—প্রেম মহত্তর। এই বলে সে জলে ডুবে গেল। কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে গেল আত্মা।

দ্বিতীয় বছরের শেষে আত্মাটি আবার সেইখানে ফিরে এসে তাকে ডাকল। সমুদ্রের তলা থেকে মুখ তুলে ধীবরটি জিজ্ঞাসা করল—আমাকে ডাকছ কেন?

আত্মাটি বলল—আমার কাছে এস। আমি যে সব অদ্ভুত জিনিস দেখেছি সেসব কাহিনি তোমাকে আমি বলব।

সুতরাং সে অগভীর জলে উঠে এসে কাহিনি শোনার জন্যে হাতের ওপরে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বসল।

আত্মাটি বলে গেল—তোমার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে আমি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলাম। ওই দক্ষিণ দেশ থেকে সমস্ত কিছু মূল্যবান জিনিস দেশ-বিদেশে যায়। যে রাস্তাটা আশতার শহরে দিকে এগিয়ে গিয়েছে আর যার ওপর দিয়ে নানান তীর্থযাত্রী আসা-যাওয়া করে সেই রাস্তা ধরে ছ'দিন আমি হাঁটলাম। সাত দিনের দিন চোখ তুলে দেখলাম উপত্যকার ওপরে একটা শহরের কাছে এসে পৌঁচেছি।

সেই শহরের দরজা নটা। প্রতিটি দরজার সামনে একটা ব্রোঞ্জ-এর ঘোড়া দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের ওপর থেকে বেদুইনের দল শহরের দিকে এগিয়ে এলেই তারা চিৎকার করে ওঠে। তামা দিয়ে দেওয়ালগুলি মোড়া; ছাদের ওপরে দস্তা ঢালা। প্রত্যেক গম্বুজের ওপরে একজন করে তীরন্দাজ ধনুক হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

আমি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই প্রহরীরা আমাকে বাধা দিল। আমি কে জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম আমি একজন দরবেশ। আমি মক্কায় যাচ্ছি। সেখানে সবুজ কাপড়ে মোড়া কোরান রয়েছে। দেবদূতেরা রুপোর অক্ষরে তার ওপরে নক্সা এঁকেছে। এই শুনে অবাক হয়ে তারা আমাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল।

শহরের ভেতরে বাজার। তোমার আমার সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। সরু সরু রাস্তার ওপরে সেখানে প্রজাপতির মতো খুদে-খুদে কাগজের লন্ঠন জ্বলছে। দোকানের সামনে সিল্কের কার্পেটের ওপরে বণিকরা বসে রয়েছে। তাদের দড়িগুলো কালো সূচলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারত মহাসাগর থেকে আমদানি করা সুগন্ধী আতর বিক্রি করে। কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে দাঁড়ালে তারা জ্বলন্ত ধুনোচুরের ওপরে কিছু সুগন্ধ মশলা ঢেলে দিয়ে বাতাসটাকে মাতোয়ারা করে তোলে। বাজারে নানান লোক নানান জিনিস বিক্রি করছে। কেউ বিক্রি করছে রুপোর ব্রেসলেট, কেউ বিক্রি করছে মুক্তাখচিত দস্তার অ্যানকলেট, কেউ বা আবার বিক্রি করছে সোনার পাতের মধ্যে আঁকা বাঘের থাবা, কেউ চিতাবাঘের থাবা। চায়ের দোকানের ভেতর থেকে গিটার বাজানোর শব্দ আসছে; আর আফিঙখোরেরা তাদের সাদা সাদা হাস মুখ নিয়ে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি আমার সঙ্গে তোমার থাকা উচিত ছিল। কাঁধের ওপরে চামড়ার কালো ভিস্তি নিয়ে কেউ মদ বিক্রি করার জন্যে ভিড় ঠেলে ঠেলে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। অধিকাংশ মদের ব্যবসাদাররাই বিক্রি করছিল মধুর মতো মিষ্টি স্কিরাজ-এর মদ। বাজারে ফলওয়ালারা কত রকমের ফলই না নিয়ে বসেছিল বিক্রি করার জন্যে! একবার একটা হাতি আমার চোখে পড়ল। তার শুঁড়টা সিঁদুর আর হলুদে চিত্রিত। কানের ওপরে লাল সিল্কের দড়ি জড়ানো। হাতিটা একটা দোকানের উলটো দিকে দাঁড়িয়ে কমলালেবু খেতে লাগল। তাই দেখে হাসতে লাগল দোকানদার। তারা যে কী অদ্ভুত ধরনের মানুষ সেকথা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আনন্দ হলে তারা কোনো পাখি-বিক্রির দোকানে গিয়ে খাঁচাসুদ্ধ পাখি কিনে আনে; তারপরে তাকে খাঁচা খুলে আকাশে উড়িয়ে দেয়। এতে তাদের আনন্দ আরো বেশি হয়। দুঃখ হলে যাতে, তাদের দুঃখ না কমে সেই জন্যে নিজেদের তারা কাঁটাগাছের চাবুক মারে।

একদিন সন্ধেবেলা দেখলাম কয়েকজন নিগ্রো একটা ভারী পালকি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রঙ করা বাঁশ দিয়ে সেটা তৈরি; এর ডাণ্ডাগুলির মাথায় সীসের ময়ূর বসানো। জানালার ওপরে টাঙানো সূক্ষ্ম মসলিনের পর্দা। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি সিরকাসিয়েন মহিলা বিবর্ণমুখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। আমাকে দেখে নিগ্রোরা দাঁত খিঁচোল। কিন্তু আমার এতই কৌতূহল হয়েছিল যে আমি তাদের দাঁত খিঁচোনিকে গ্রাহ্য করলাম না।

তারপরে তারা একটা সাদা চৌকো ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। এ ঘরে কোনো জানালা ছিল না; ছিল কবরের ভেতরে ঢোকার মতো একটা ফুটো। সেইখানে পালকিটা নামিয়ে একটা তামার হাতুড়ি দিয়ে বার-তিনেক তারা মাটি ঠুকল। একজন আর্মেনিয়ান তাদের দেখে দরজা খুলে একটা কার্পেট বিছিয়ে দিল। মহিলাটি বাইরে বেরিয়ে এল। ভেতরে ঢোকার সময় আমার দিকে তাকিয়ে সে আবার একটু হাসল। এত বিবর্ণ মুখ জীবনে আর কখনো আমি দেখিনি।

চাঁদ উঠলে আমি আবার সেখানে গেলাম; সেই বাড়িটা খুঁজলাম; কিন্তু কোনো বাড়ি চোখে পড়ল না। তখনই আমি বুঝতে পারলাম মেয়েটি কে, আর কেনই বা সে আমাকে দেখে হেসেছিল।

সত্যিই বলছি আমার সঙ্গে তোমার থাকা উচিত ছিল। অমাবস্যার দিন ওখানে যে ভোজের উৎসবর হয় সেইদিন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যুবক রাজকুমার প্রার্থনা করার জন্যে মসজিদে ঢুকলেন। সূর্যোদয়ের সময় রুপোর পোশাক পরে তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন; সন্ধের সময় সোনার পোশাক পরে আবার তিনি ফিরে এলেন। জনতা তাঁর সামনে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে নিজেদের মুখ ঢাকল, আমি কিন্তু তা করলাম না। একটা খেজুরের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাকে দেখে সম্রাট তাঁর চিত্রিত ভুরু দুটি তুলে থেমে গেলেন। আমি তবু দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁকে সেলাম জানালাম না। আমার এই দুঃসাহসে সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল; আমাকে পালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দিল। তাদরে দিকে গ্রাহ্য না করে আমি কতগুলি ঘৃণ্য দেবতার স্টলে গিয়ে বিক্রেতাদের সঙ্গে বসে রইলাম। আমি কী করছই তা শুনে তাদের প্রত্যেকেই একটা দেবমূর্তি আমার হাতে দিয়ে তাদের কাছ থেকে সরে যেতে তারা আমাকে অনুরোধ জানাল।

সেইদিন রাত্রিতে ডালিম গাছে ভরা একটি রাস্তার ওপরে চা-এর দোকানে জাজিমের ওপরে আমি শুয়েছিলাম। এমন সময়ে সম্রাটের রক্ষীরা ঘরে ঢুকে আমাকে প্রাসাদে নিয়ে গেল। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ঘরের দরজা তারা বন্ধ করে শেকল এঁটে দিল। ভেতরে বিরাট একটা দরবার। তার চারপাশে বিরাট-বিরাট থামের ওপরে খিলান বসানো। দেওয়ালগুলি স্ফটিক পাথর দিয়ে তৈরি—মাঝে মাঝে নীল আর সবুজ টালি বসানো। এ রকম জায়গা এর আগে আমি কোনোদিন দেখিনি। দরবার দিয়ে যাওয়ার সময় ঘোমটায় ঢাকা দুটি মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে অভিসম্পাত দিল। প্রহরীরা দ্রুত হাঁটতে লাগল। তাদের বর্শার বাঁটগুলো মসৃণ মেঝের ওপরে লেগে শব্দ করতে লাগল। হাতির দাঁতের একটা দরজা খুলে তারা ভেতরে এল। দেখলাম আমি একটি জলসিক্ত বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এর ছাদ হচ্ছে সাতটা। একটা বাগান থেকে নাইটিংগেল পাখির গান শোনা যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রহরীদের দলপতি সবাইকে সরিয়ে দিতেই তারা সব প্রাসাদের দিকে ফিরে গেল। বাগানের শেষে একটা তাঁবু ছিল। তাদের বিদায় করে দলপতি আমাকে সেই তাঁবুর দিকে যাওয়ার জন্যে ইশারা করল। নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপরে ভারী পর্দা সরিয়ে

ভেতরে ঢুকে গেলাম। যুবক সম্রাট রঙ করা সিংহের চামড়ায় ঢাকা একটা সোফার ওপরে শুয়েছিলেন। তাঁর পেছনে সীসের পাগড়ি চাপিয়ে একজন নুবিয়ার ক্রীতদাস দাঁড়িয়েছিল। তার দু-ফাঁককরা কানের ওপরে দুটো বেশ ভারী মাকড়ি ঝুলছিল। সোফার পাশে ছিল একটা টেবিল। সেই টেবিলের ওপরে ছিল ইস্পাতের তৈরি বিরাট একখানা তরোয়াল।

আমাকে দেখে সম্রাট ভ্রুকুটি করে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার নাম কী? তুমি কি জান না আমি এখানকার সম্রাট?' কিন্তু আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

তিনি তখন সেই তরোয়ালটার দিকে আঙুল বাড়ালেন। এই দেখ সেই ক্রীতদাসটি সেটাকে তুলে নিয়ে ভীষণ জোরে আমাকে আঘাত করল। হুইস-হুইস শব্দে তরোয়ালের মুখটা আমার ভেতর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। কিন্তু আমার কোনো ক্ষতি করল না। এই দেখে লোকটা মেঝের ওপরে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। যখন সে উঠল তখন তার দাঁতে দাঁত বসে গিয়েছে; সোফার পেছনে ভয়ে সে লুকিয়ে পড়ল। এই দেখে দাঁড়িয়ে উঠলনে সম্রাট; ঘরের একপাশে কয়েকটা অস্ত্র দাঁড় করানো ছিল। সেখান থেকে একটা বর্শা তুলে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সেটা আমি ধরে ফেলে দু-আধখানা করে ফেললাম। তিনি একটা তীর ছুঁড়লেন; কিন্তু আমি হাত দুটো আকাশে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে তীরটাও মাঝখানে থেমে গেল। তখন তিনি কোমরবন্ধনী থেকে একটা ছোরা বার করে সেই ক্রীতদাসটির গলায় নলি কেটে দিলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল তাঁর অপমানের কথা যদি সে বাইরে প্রকাশ করে দেয়। লোকটা কাটা সাপের মতো মেঝের ওপর ন্যাকপ্যাক করতে লাগল; মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সাদা গ্যাঁজলা।

সে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট আমার দিকে ঘুরে তাকালেন; তাঁর কপালের ওপরে তখন বড়ো-বড়ো ফোঁটার ঘাম জমে উঠেছিল। ছোটো একটা রুমাল দিয়ে সেই ঘাম মুছে তিনি আমাকে বললেন—আপনি কি নবী, না, ঈশ্বরের পুত্র যে আপনাকে আমি আঘাত করতে পারলাম না? আপনাকে অনুরোধ করছি আজ রাত্রিতেই আমার শহর ছেড়ে আপনি চলে যান। কারণ, যতক্ষণ আপনি এখানে থাকবেন ততক্ষণ আমি আর এখানে রাজত্ব করতে পারব না।

এই কথা শুনে আমি বললাম—তোমার ধনরত্নের অর্ধেক পেলে আমি চলে যেতে রাজি আছি।

সম্রাট আমার হাত ধরে বাগানে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা ঘর রয়েছে। সেই ঘরে শক্ত লাল পাথরের আটটা দেওয়াল। সম্রাট একটা দেওয়ালের গায়ে হাত দিতেই সেটো সরে গেল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। সিঁড়ির তখন অনেকগুলো টর্চ একসঙ্গে জ্বলছিল। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না কী অদ্ভুত সেই জায়গাটা! হীরে, মুক্তো, মণি, জহরৎ, পান্না, চুনি, দামি-দামি পাথরে একেবারে বোঝাই।

সম্রাট বললেন—এই আমার ধনরত্ন। এর অর্ধেক আপনার। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আমি আপনাকে উট দেব, উট চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক দেব। আপনি আপনার অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে আজ রাত্রেই এই শহর ছেড়ে চলে যান। পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন আমার লোকজন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু আজ রাত্রিতেই আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমার শহরে এমন একজন রয়েছেন যাঁকে আমি হত্যা করতে পারি নে এই কথাটা আমার পিতা সূর্যদেব জানতে পারুন তা আমি চাই নে।

বললাম—সোনা, রুপো, মূল্যবান সমস্ত পাথর যা এখানে রয়েছে তা সব তোমার। কিছুই

আমার চাই নে। শুধু ওই ছোটো আংটিটা আমাকে দাও, ওই যেটো তুমি পরে আছ। তাহলেই আমি চলে যাব।

সম্রাট ভ্রূকুটি করে বললেন—এটা তো সীসের আংটি। এর কোনো দাম নেই। তার চেয়ে আপনি বরং আমার অর্ধেক ধনরত্ন নিয়ে যান।

উঁহু! ওটা ছাড়া আর কিছুই আমি নেব না। ওতে কী লেখা রয়েছে আর কী জন্যে লেখা রয়েছে তা আমি জানি।

সম্রাট কাঁপতে-কাঁপতে বললেন—আমার অর্ধেক ধনরত্ন নিয়ে যান।

সেই শুনে আমি একটা অদ্ভুত কাজ করলাম। কিন্তু সেকথা থাক। আমি একটা গুহায় সেটা লুকিয়ে রেখে এসেছি। ওটা হচ্ছে অর্থের আংটি। জায়গাটা এখান থেকে একদিনের যাত্রাপথ। এই আংটি যার হাতে থাকবে বিশ্বের সমস্ত ধন হবে তার। তুমি আমার সঙ্গে এসে সেটি গ্রহণ কর। বিশ্বের সম্পদ তোমার করায়ত্ত হবে।

কিন্তু যুবক ধীবরটি হেসে বলল—অর্থের চেয়ে প্রেম অনেক বড়ো; এবং খুদে জল-অপ্সরীটি আমাকে ভালোবাসে। এই বলে সে সমুদ্রে ডুবে গেল। কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে গেল আত্মা।

তৃতীয় বছরে শেষ হওয়ার পরে আত্মাটি আবার সমুদ্রোপকূলে ফিরে এসে ধীবরকে ডাকাল। ধীবর উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল—আমাকে ডাকছ কেন?

আত্মাটি বলল—আমার কাছে এস। আমি কত অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। সে সব কথা তোমাকে আমি বলব। ধীবরটি অগভীর জলে এসে তার কাহিনি শোনার জন্যে হাতের ওপরে মাথাটা রেখে হেলান দিয়ে বসল।

আত্মাটি বলে গেল—আমি একটি শহরের কথা জানি, সেখানে নদীর ধারে একটা সরাইখানা রয়েছে। নাবিকরা সেখানে বসে দুটি বিপরীত-রঙা মদ্য পান করছিল, খাচ্ছিল বার্লির রুটি—আর ভিনিগার মেশানো ছোটো-ছোটো নোনা মাছ। তাদের পাশেই আমি বসেছিলাম। আমরা বসে-বসে স্ফূর্তি করছি এমন সময় একটি বৃদ্ধ এসে হাজির হল। তার হাতে একটি চামড়ার কার্পেট, আর দুটো অম্বরের শিং-ওয়ালা একটা বাঁশি। কাছে এসে সে কার্পেটটি বিছিয়ে সেই বাঁশির তারে পাখির একটা পালক দিয়ে আঘাত করল। সেই শব্দ শুনে ঘোমটায় মুখ ঢেকে একটি বালিকা দৌড়ে এসে আমাদের সামনে নাচতে শুরু করল। তার পা দুটি ছিল অনাবৃত। ছোটো-ছোটো সাদা পায়রার মতো সে দুটি ঘুরতে লাগল। এমন অপরূপ নাচ জীবনে আর কোনো দিনই আমি দেখিনি। যে শহরে মেয়েটি নাচে সেটি এখান থেকে একদিনের হাঁটাপথ মাত্র।

তার আত্মার কথা শুনে ধীবরের মনে হল তার প্রেমিকা অপ্সরীটির পা নেই। সে নাচতে পারে না। তাই হঠাৎ সেই নাচ দেখার প্রবল একটা ইচ্ছে হল তার; সে নিজের মনে মনে বলল—মাত্র একদিনের পথ। আমি আবার আমার প্রেমিকার কাছে ফিরে আসতে পারব। এই ভেবে একটু হেসে সে উপকূলের দিকে জল কেটে-কেটে এগিয়ে আসতে লাগল। শুকনো জায়গায় এসে একটু হেসে সে আত্মার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। আনন্দে চিৎকার করে তাকে স্পর্শ করার জন্যে তার দিকে দৌড়ে গেল আত্মা; তারপরে তার ভেতরে ঢুকে গেল। যুবক ধীবরটি দেখতে পেল বালির ওপরে তার দেহের ছায়াটি লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে; আর সেইটিই হচ্ছে তার আত্মার দেহ।

আত্মাটি বলল—আর অপেক্ষা করে লাভ কি? চল, আমরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাই। কারণ সমুদ্রের দেবতারা বড়োই হিংসুটে: তাদের আজ্ঞা পালন করার জন্যে দৈত্যেরা দৌড়ে আসে।

সুতরাং তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, চাঁদের আলোতে তারা সারারাত হাঁটল; সূর্যের আলোতে হাঁটল সারাটা দিন; তারপর সন্ধের সময় তারা সেই শহরে এসে হাজির হল।

যুবক ধীবরটি জিজ্ঞাসা করল—এই শহরেই কি সেই মেয়েটি নাচে?

তার আত্মাটি বলল—এটা নয়! আর একটা। যাই হোক; চল, ভেতরে যাই।

সুতরাং তারা ভেতরে ঢুকল। রাস্তার দু'পাশে জহুরিদের দোকান। তারা দেখল দোকানের ওপরে একটা সুন্দর রুপোর কাপ বসানো রয়েছে। তার আত্মা বলল—ওই কাপটা নিয়ে লুকিয়ে ফেল।

সে কাপটা নিয়ে পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

শহর থেকে এক লিগের মতো দূরে গিয়ে ভ্রূকুটি করে কাপটা দূরে ছুঁড়ে দিল; তারপরে আত্মাকে বলল—তুমি আমাকে কাপটা নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে বললে কেন? কারণ, একাজ করা অন্যায়—তাই না?

আত্মা বলল—শান্ত হও, শান্ত হও।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় তারা আর একটি শহরে এসে পৌঁছল। সে জিজ্ঞাসা করল—এই শহরেই কি সেই মেয়েটি নাচে?

তার আত্মা বলল—এই শহরে নয়। অন্য শহরে। তা হোক, চল, ভেতরে যাই।

সুতরাং তারা শহরে ঢুকল। চপ্পলের দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা দেখল এক কলসি জলের পাশে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আত্মা তাকে বলল—এই ছেলেটাকে মার।

সে ছেলেটিকে এমন মার মারল যে ছেলেটি কাঁদতে লাগল। ছেলেটিকে মেরেই তারা তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শহর থেকে এক লিগের মতো পথ গিয়ে যুবক ধীবরটি চটে গিয়ে বলল—তুমি আমাকে ছেলেটিকে মারতে বললে কেন? এটা অন্যায় কাজ তা তুমি জান না?

কিন্তু আত্মাটি বলল—শান্ত হও, শান্ত হও।

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাকালে তারা একটি শহরে এসে উপস্থিত হল। যুবকটি জিজ্ঞাসা করল—এটা কি সেই শহর?

আত্মা বলল—মনে হচ্ছে যেন। চল, ভেতরে যাই।

সুতরাং তারা ভেতরে ঢুকে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু কোথাও সে কোনো নদী বা নদীর ধারে কোনো সরাইখানা দেখতে পেল না। শহরের লোকেরা তার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল। ভয় পেয়ে সে আত্মাকে বলল—চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই; কারণ সাদা

পা যার সে-মেয়েটি এখানে নাচে না।

কিন্তু আত্মা বলল—না, আমরা এখানে অপেক্ষা করি এস। কারণ রাত অন্ধকার। রাস্তার ওপরে ডাকাতরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুতরাং বাজারে সে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে, মাথার ওপরে উঁচু টুপি চাপিয়ে একজন বণিক সেইদিকে এল। তাতারীয় পোশাক তার গায়ে। বণিক তাকে বলল—তুমি এই বাজারে বসে রয়েছে কেন? দোকান বন্ধ রয়েছে না?

যুবক ধীবর বলল—এই শহরে কোনো সরাইখানা দেখছি নে; অথবা, এমন কোনো আত্মীয়-স্বজন এখানে নেই যার বাড়িতে আমরা আশ্রয় পেতে পারি।

বণিকটি বলল—আমরা সবাই সকলের আত্মীয় নই কী? ঈশ্বরই কি আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেননি? সুতরাং আমার সঙ্গে এস; কারণ, আমার একটি অতিথি-নিবাস রয়েছে।

ধীবর উঠে দাঁড়াল; বণিকের পিছুপিছু তার বাড়িতে এসে হাজির হল। ঘরে ঢোকার পরে বণিক তাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করল, তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এনে দিল পাকা তরমুজ। খেতে দিল একথালা ভাত আর একতাল সেদ্ধ মাংস।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বণিকটি তাকে অতিথি-নিবাসে নিয়ে গেল; তারপরে তাদের ঘুমিয়ে পড়তে বলল। ধীবরটি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁঠার লোমের কার্পেটে শুয়ে পড়ল। তারপরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হতে তখন ঘণ্টা তিনেক বাকি, বলতে গেলে তখনো রাত্রি রয়েছে। আত্মা তাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল—ওঠ; বণিক যে ঘরে শুয়ে রয়েছে সেই ঘরে গিয়ে তাকে হত্যা কর। তারপরে তার ধনরত্ন নিয়ে নাও। কারণ, ওটার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের।

যুবক ধীবরটি উঠে গুঁড়ি দিয়ে বণিকের ঘরে হাজির হল। বণিকের পায়ের দিকে একটা বাঁকানো তরোয়াল পড়ে ছিল। হাত বাড়িয়ে সে তরোয়ালটা তুলে নিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে বণিকটি জেগে উঠে বলল—উপকারের প্রতিদানে তুমি আমার এই অপকার করছ? তোমাকে যে দয়া আমি দেখিয়েছি তার পুরস্কার হিসাবে তুমি আমার রক্তপাত করছ?

আত্মা তাকে বলল—তুমি ওকে আঘাত কর।

যুবক ধীবর বণিককে আঘাত করতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপরে ধীবরটি তার নটা সোনার থলি নিয়ে চটপট বেরিয়ে এল তার বাড়ি থেকে। তখন সকাল হয়েছে।

শহর থেকে তারা এক লিগের মতো দূরে গিয়েছে এমন সময় যুবক ধীবরটি নিজের বুক চাপড়ে বলল—বণিককে আঘাত করে তার সোনা নিতে তুমি আমাকে বললেন কেন? নিশ্চয় তুমি আমার দুর্গ্রহ।

কিন্তু আত্মা বলল—শান্ত হও, শান্ত হও।

যুবক ধীবর চিৎকার করে বলল—না, আমি শান্ত হব না। তুমি আমাকে দিয়ে যা করালে সেসব কাজ করে নিজের ওপরে আমার ঘৃণা হচ্ছে। তোমাকেও আমি ঘৃণা করি। তুমি

আমাকে এই সব কাজ করাতে বাধ্য করলে কেন তা বলতে আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।

তার উত্তরে আত্মা বলল—যখন তুমি আমাকে বিদায় দিলে তখন হৃদয়টা আমাকে তুমি দাওনি। সেই জন্যেই এই সব কাজ করতে আমার ভালো লাগছে।

যুবক ধীবর গজগজ করল—কী বলছ তুমি?

আত্মা উত্তর দিল—তুমিই তা ভালো জান। তুমি যে আমাকে হৃদয় দাওনি সেকথা কি তুমি ভুলে গিয়েছ? সুতরাং আমার কথা ভেবে তুমি অশান্তি ভোগ করো না। শান্ত হও। কারণ এমন কোনো যন্ত্রণা নেই যা তুমি বিসর্জন দিতে পার না, এমন কোনো আনন্দ নেই যা তুমি পাবে না।

এই সব কথা শুনে কাঁপতে-কাঁপতে সে আত্মাকে বলল—উঁহু। তুমি দুর্গ্রহ। তুমি আমাকে আমার ভালোবাসাকে ভুলতে বাধ্য করেছ। আমাকে প্রলুব্ধ করেছ। পাপের পথে পা দিতে আমাকে প্ররোচিত করেছ।

আত্মা বলল—আমাকে যখন তুমি পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন যে তুমি আমাকে হৃদয় দাওনি সেকথা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এস, অন্য এক শহরে আমরা যাই—সেখানে গিয়ে আনন্দ করি। আমাদের হাতে এখন ন'থলে সোনা রয়েছে।

কিন্তু যুবক ধীবর সেই ন'থলে সোনা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। তারপরে চিৎকার করে বলল—না, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। তোমার সঙ্গে আর আমি কোথাও যাব না। তোমাকে আগে একবার আমি যেমন বিতাড়িত করেছিলাম এখনো সেইরকম তাড়িয়ে দিচ্ছি। কারণ তুমি আমার কোনো মঙ্গল করনি।

তবু আত্মা তার কাছ থেকে সরে গেল না বা তার কথায় কান দিল না, তাকে বলল—ডাইনি তোমার ওপরে যে মোহ বিস্তার করেছিল তার মূল্য এখন আর কিছু নেই। কারণ, আমাকে তুমি পরিত্যাগও করতে পারবে না; তোমাকেও আমি ছেড়ে যাব না। মানুষ জীবনে একবার মাত্র তার আত্মাকে বিসর্জন দিতে পারে; কিন্তু সেই আত্মাকে যখন সে ফিরে পায় তখন সারা জীবনই তাকে তার ধরে রাখতে হয়। শাস্তি বা পুরস্কার যাই বল এইটিই তার প্রাপ্য।

যুবক ধীবরটি এই কথা শুনে বিবর্ণ হয়ে গেল; সে হাত দুটো মুঠো করে চেঁচিয়ে বলল—ডাইনি ঝুটা। সে আমাকে একথা বলেনি কেন?

আত্মা বলল—না, ডাইনি তার দেবতাকে পূজা করে। তাঁর প্রতি সে অবিশ্বাসিনী নয়, তাঁকেই সে চিরকাল সেবা করবে।

যুবক ধীবরটি যখন বুঝতে পারল যে আত্মাকে আর সে বর্জন করতে পারবে না, আর সেই আত্মা তার মঙ্গলের প্রতীক নয়, এবং সে তার সঙ্গে চিরকাল থাকবে তখন সে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে ভীষণভাবে কাঁদতে লাগল।

সকাল হলে যুবক ধীবর উঠে তার আত্মাকে বলল—যাতে তোমার নির্দেশ পালন করতে না হয় সেই জন্যে আমার হাত দুটো বেঁধে ফেলব; যাতে তোমার কথা মুখে উচ্চারণ করতে না হয় সেইজন্যে ঠোঁট দুটো আমি বন্ধ করে রাখব। যেখানে অপ্সরী থাকে, যে আমাকে ভালোবাসে, আমি সেইখানেই ফিরে যাব। আমি কী অন্যায় করেছি, আর তুমি আমার কী

ক্ষতি করেছ সে-সব কথা তাকে আম বলব।

আত্মা তাকে প্রলুব্ধ করে বলল—তোমার প্রেয়সী কে যে তুমি তার কাছে ফিরে যাবে? তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হচ্ছে এই পৃথিবী। এখানে স্যামারিস নর্তকীরা রয়েছে; তারা পাখি আর পশুদের মতো নাচতে পারে। তাদের পাগুলি রঙ দিয়ে চিত্রিত; হাতে তাদের ছোটো-ছোটো তামার ঘণ্টা। নাচতে-নাচতে তারা হাসে; তাদের হাসি জলের হাসির মতো পরিচ্ছন্ন। আমার সঙ্গে এস; আমি তাদের দেখাব। যেটা পান করতে ভালো লাগে তার মধ্যে কি বিষ মেশানো থাকে? পাপ করেছ বলে চেঁচাচ্ছো কেন? বাজে চিন্তায় কষ্ট না পেয়ে আমার সঙ্গে আর একটি শহরে চল। কাছেই একটা ছোট্ট শহর রয়েছে। সেখানে টিউলিপ গাছের বাগান রয়েছে। এখানে অনেক ময়ূর রয়েছে। তাদের বুকগুলি সব নীল, সেখানে যে মেয়েটি তাদের খাওয়ায় সে মাঝে-মাঝে হাতের ওপরে নাচে; কখনো বা পায়ের ওপরে। তার নাকটি চড়াই পাখির ডানার মতো। নাচতে নাচতে সে হাসে; নাচার সময় তার নূপুরগুলি রুপোর ঘণ্টার মতো শব্দ করে। সুতরাং বাজে চিন্তা করে নিজেকে কষ্ট না দিয়ে আমার সঙ্গে সেই শহরে চল।

কিন্তু যুবকটি তার আত্মাকে কিছু না বলে ঠোঁট দুটি বন্ধ করে চোখ বুজে রইল। একটা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধল তার দুটো হাত, যেখান থেকে এসেছিল সেইদিকে ফিরে গেল। তার আত্মা তাকে যতোই প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করুক না কেন সে কোনো উত্তর দিল না। সে তাকে দিয়ে যত অন্যায় কাজ করানোর চেষ্টাই করুক না কেন সেদিকে সে কোনো ভ্রূক্ষেপই করল না। এমনি তার প্রেম।

সমুদ্রের তীরে গিয়ে সে হাতের দড়ি খুলে দিল, ঠোঁট দুটো খুলল; তারপরে জল-অপ্সরীকে ডাকল। সারাদিন ধরেই তাক ডাকল সে; কিন্তু জল-অপ্সরী তার ডাকে সাড়া দিল না।

তখন আত্মা তাকে বিদ্রূপ করে বলল—এখন বুঝতে পারছ প্রেয়সীর কাছ থেকে কোনো আনন্দ পাওয়ারই সম্ভাবনা তোমার নেই। মৃত্যুর সময় ভাঙা কলসির ভেতরে যে মানুষ জল ঢালে তোমার অবস্থা সেই রকমই। তোমার যা রয়েছে তাই তুমি বিলিয়ে দিচ্ছ; প্রতিদানে কিছুই পাচ্ছ না তুমি। আনন্দের উপত্যকা কোথায় রয়েছে তা আমি জানি; সেখানে কী রয়েছে তাও আমার অজানা নয়। তাই আমার সঙ্গে আসাই তোমার ভালো।

কিন্তু যুবকটি কোনো উত্তর দিল না; পাহাড়ের ওপরে কঞ্চির একটা ঘর তৈরি করে সেখানে সে বছর খানেক বাস করল। প্রতিটি দিন সকাল, দুপুর আর রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই সে জল-অপ্সরীকে ডাকত। তবু সাগর থেকে উঠে কোনোদিনই সে তাকে দেখা দিল না। তার আত্মা প্রতিদিনই খারাপ কাজ করার জন্যে তাকে প্রলুব্ধ করতে লাগল, কিন্তু তাকে প্রলুব্ধ করতে পারল না।

বছর খানেক পরে আত্মা ভাবল আমাকে প্রভুকে খারাপ কাজ করার জন্যে আমি প্রলুব্ধ করেছি; কিন্তু আমার চেয়ে তার প্রেমের শক্তি বেশি। আমি এখন তাকে ভালো কাজ করার জন্যে প্রলুব্ধ করব। তাহলে হয়তো সে আমার সঙ্গে আসে পারে।

এই ভেবে সে যুবক ধীবরকে বলল—বিশ্বে যত আনন্দ রয়েছে সে সব কথা আমি তোমাকে বলেছি। তুমি সেসব কথায় কান দাওনি। এখন জগতের দুঃখের কথা আমাকে বলতে দাও। তাহলে হয়তো তুমি তা শুনবে। কারণ সত্যি কথা বলতে কি যন্ত্রণাই হচ্ছে বিশ্বের সম্রাট। এমন কেউ নেই যে সে হাত থেকে বাঁচতে পারে। কারও-কারও পরার পোশাক নেই, কারও নেই

খাবার। এমন অনেক বিধবা রয়েছে যারা রক্তাক্ত হৃদয়ে বেঁচে রয়েছে; এমন অনেক পতিহীনা রয়েছে যারা ছিন্ন পোশাকে বসে থাকে; রাজপথের ওপর দিয়ে ভিক্ষুকরা ঘুরে বেড়ায়; তাদরে টাকার থলি শূন্য। শহরের পথে-পথে দুর্ভিক্ষ ঘুর বেড়ায়; প্লেগ বসে রয়েছে তাদের ঘরের দরজায়। এস; এদের দুঃখ আমর দূর করি। এখানে প্রেমিকাকে ডেকে ডেকে তুমি বৃথা সময় নষ্ট করছ কেন? দেখতেই পাচ্ছ তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না অপ্সরী। তাছাড়া, প্রেমের দামই বা কী?

কিন্তু যুবক ধীবর কোনো উত্তর দিল না। তার প্রেমের শক্তি এতই বেশি। চব্বিশ ঘণ্টাই সে তার প্রেয়সীকে ডাকতে লাগল—সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা। কিছু অপ্সরীর দেখা সে পেল না। কোথাও সে তাকে দেখতে পেল না।

দ্বিতীয় বছর এইভাবে শেষ হওয়ার পরে একদিন রাত্রিতে নির্জনে আত্মা তাকে বলল—শোন; তোমাকে আমি অন্যায় কাজ করার জন্যে প্রলুব্ধ করেছি, প্রলুব্ধ করেছি ভালো কাজ করার জন্যে। কিন্তু দেখছি, আমার চেয়ে প্রেমর শক্তিই তোমার কাছে অনেক বেশি। তাই তোমাকে আর আমি প্রলুব্ধ করব না। অনুরোধ করছি, আমাকে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে দাও। আগের মতোই তোমার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাই।

যুবক ধীবর বলল—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কারণ হৃদয়হীন হয়ে তুমি যখন বিশ্বে ঘুরে বেড়িয়েছিলে তখন নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পেয়েছিলে।

আত্মা চিৎকার করে বলল—হায়, হায়! তোমার হৃদয় প্রেমে এমনই ভরাট হয়ে রয়েছে যে ঢোকার কোনো পথই যে আমি পাচ্ছি নে।

সে এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্র থেকে বিরাট একটা আর্তনাদ উঠল। সমুদ্রের কোনো অধিবাসী মারা গেলে মানুষ এইরকম আর্তনাদ শুনতে পায়। এই শুনে যুবক ধীবর লাফিয়ে উঠল; তার কঞ্চির ঘর ছেড়ে দৌড়ে নেমে এল নীচে। কালো-কালো ঢেউগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ল তীরের ওপরে। সঙ্গে নিয়ে এল বরফের চেয়ে সাদা একটি বস্তু। দেখে মনে হবে, তীরের ওপরে আছড়ে-পড়া সমুদ্র তরঙ্গ। তরঙ্গের ওপরে ফুলের মতো সেটা যেন আছাড় খেয়ে পড়ল। তাকে তরঙ্গ-শিশুরা তুলে নিল সমুদ্রের কাছ থেকে; তাদের কাছ থেকে তাকে তুলে নিল ফেনারা। শেষ পর্যন্ত তাকে তুলে নিল উপকূলে তারপরে দেখা গেল ধীবরের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে জল-অপ্সরীর দেহটি—জল-অপ্সরীর মৃতদেহ।

যন্ত্রণায় পাগল হয়ে সে তার পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার রক্তাক্ত ঠান্ডা ঠোঁটের ওপরে চুমু খেতে লাগল, তার সেই ভিজে সোনালি চুলগুলির ভেতরে আঙুল বোলাতে লাগল, বালির ওপরে লুটিয়ে পড়ে আনন্দ উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে সে কাঁদতে লাগল, দু'হাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরল তাকে। তার ঠোঁট দুটি ঠান্ডা; তবুও সে তাকে চুম্বন করতে লাগল। তার চুলের স্বাদ লোনা। তবু একটা তিক্ত আনন্দে সে তাকে চুম্বন করল।

সেই মৃতদেহের কাছে সে তার পাপের স্বীকারক্তি করল। তিক্ত, তিক্ত তার আনন্দ; তার যন্ত্রণা একটি অদ্ভুত মাদকতায় উঠল ভরে।

কালো সাগর ক্রমশ তার কাছে এগিয়ে এল। কুষ্ঠরোগীর মতো সাদা ফেনা করতে লাগল বিলাপ। ফেনার সাদা নখ দিয়ে সমুদ্র আঁচড়ে ধরল উপকূলকে। সমুদ্র সম্রাটের প্রাসাদ থেকে আবার বিলাপ ধ্বনি উঠল।

আত্মা বলল—পালাও, পালাও, সমুদ্র এগিয়ে আসছে। আর দেরি করলে ও তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। পালাও, পালাও। তোমার মহৎ প্রেমের জন্যে, ভয় হচ্ছে, আমার প্রবেশের পথ হৃদয় তোমার রুদ্ধ করে দিয়েছে। নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যাও। নতুন জগতে নিশ্চয় তুমি আমাকে হৃদয়হীন অবস্থায় তাড়িয়ে দিতে চাও না।

কিন্তু যুবক ধীবর তার আত্মার আবেদনে সাড়া দিল না, সে অপ্সরীকে সম্বোধন করে বলল—জ্ঞানের চেয়ে প্রেম মহত্তর; সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান, নর্তকীর পায়ের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আগুনে তাকে ধ্বংস করতে পারে না, জল পারে না তাকে নিঃশেষে পান করতে। প্রভাতে তোমাকে আমি ডেকেছিলাম। সেই ডাক শুনে তুমি এসেছিলে। চাঁদ তোমার নাম ডাকতে শুনেছিল; কিন্তু সে-ডাকে তুমি সাড়া দাওনি। কারণ অন্যায় কাজ করার জন্যে আমি তোমাকে ছেড়ে এসেছিলাম। এবং নিজের ক্ষতি করে আমি বিশ্বময় ঘুরে বেড়িয়েছি। তবু তোমার প্রেম আমার হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে ছিল। যদিও আমি ভালো আর মন্দ দুই-ই দেখেছি, তবু কেউ তোমার প্রেম থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এখন তুমি মারা গিয়েছ। আমিও নিশ্চয় তোমার সঙ্গেই মারা যাব।

আত্মা তাকে নিরাপদে সরে যেতে অনুরোধ করলেও সে তার কথায় কর্ণপাত করল না। তার ভালোবাসা এতই বিরাট ছিল। সমুদ্র ধীরে-ধীরে কাছে আসতে লাগল; তার ঢেউ দিয়ে তাকে গ্রাস করতে চাইল। যখন সে বুঝতে পারল তার সময় শেষ হয়ে আসছে তখন সে উন্মাদের মতো অপ্সরীকে চুমি খেতে লাগল; সেই দুঃখে ভেঙে যেতে লাগল তার হৃদয়টা। প্রেমের প্রাচুর্যে তার হৃদয়টা ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেল আত্মা—ভেতরে ঢুকে আগের মতোই ধীবরের সঙ্গে আবার এক হয়ে গেল। সমুদ্র এসে তার তরঙ্গ দিয়ে ঢেকে দিল তাকে।

প্রভাতে সমুদ্রকে আশীর্বাদ করার জন্যে পাদরি এসে হাজির হলেন, কারণ, সমুদ্র বেশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাঁর সঙ্গে এলেন সন্ন্যাসী আর গায়করা; আর এলো বাতিধারী কয়েকজন—আর এলো বিরাট একট দল। সমুদ্রের তীরে এসে দেখলেন যুবক ধীবরটি সমুদ্রের জলে ডুবে মরে রয়েছে; তাঁর হাত দুটি জড়িয়ে রয়েছে মৃত জল-অপ্সরীর দেহটিকে। ভ্রূকুটি করে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন; তারপরে বললেন—এই সমুদ্র বা এই সমুদ্রের কোনো কিছুকেই আমি আশীর্বাদ করব না। সমুদ্রের বাসিন্দারা সব অভিশপ্ত, আর অভিশপ্ত তারা যারা এদের সঙ্গে মেলামেশা করে আর সেই লোকটি যে তার ভালোবাসার জন্যে ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিল, এবং সেই ঈশ্বরের বিচারেই যে তার প্রণয়িনীর পাশে নিহত অবস্থায় পড়ে রয়ছে। তার দেহ আর তার প্রণয়িনীর দেহ এখান থেকে তুলে নিয়ে ফুলারাস-এর মাঠের এক কোণে কবর দাও। তাদের ওপরে কোনো চিহ্ন বা স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে না। ওখানে কাদের কবর দেওয়া হয়েছে সেকথা কেউ যেন জানতে না পারে। কারণ বেঁচে থাকতেও তারা অভিশপ্ত ছিল, মৃত্যুতেও তারা তাই।

তিনি যা বললেন লোকেরা তাই করল। ফুলারাস-এর মাঠের এক কোণে যেখানে কোন শাকসব্জি জন্মাতো না, তারা গভীর গর্ত খুঁড়ে সেই মৃতদেহ দুটিকে শুইয়ে দিল।

তৃতীয় বছর শেষ হলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনে পাদরি গির্জায় গেলেন। ঈশ্বরের ক্ষত দেখানোর জন্যে সেখানে তিনি উপস্থিত হলেন। অনেক লোকও জমায়েত হয়েছিল সেখানে। ঈশ্বরের ক্রোধের সম্বন্ধে তাদের তিনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পোশাক পরে, তিনি গির্জায় ঢুকেলেন, বেদীর সামনে নোয়ালেন তাঁর

মাথা। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল বেদীর ওপরে অদ্ভুত কতগুলি ফুল ছড়ানো রয়েছে। দেখতে সেগুলি কেবল অদ্ভুত-ই নয়—সৌন্দর্যও তাদের বড়ো অদ্ভুত। সেই সৌন্দর্য তাঁকে অস্থির করে তুলল। তাদের গন্ধ তাঁর নাকে ঢুকল। কারণটা বুঝতে পারলেন না বটে, কিন্তু তাঁর বেশ ভালো লাগল। গির্জার দরজা খুলে রঙিন চিঠির কাগজটা বার করলেন; তারপরে কাপড়ের মধ্যে সেটিকে জড়িয়ে ঈশ্বরের ক্রোধের কথা সমবেত জনতাকে বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু সাদা ফুলগুলির সৌন্দর্য তাঁকে অস্থির করে তুলল। কিন্তু সে সব কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না; যা বেরোল তা হচ্ছে প্রেমময় ঈশ্বরের কথা।

সেই কথা শোনার পরে সবাই অশ্রু বিসর্জন করল। গির্জার যে সব কর্মচারী কবর খোঁড়ার কাজ করে তাদের কাছে তিনি গেলেন। চোক দুটোতে তখন তাঁর জল ছাপিয়ে উঠেছে। নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা এসে তাঁর ধর্মীয় পোশাকগুলি খুলে দিল। তিনি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পোশাক-খোলার পর্ব শেষ হলে তিনি তাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দেবীর ওপরে যে ফুলগুলি ছড়ানো রয়েছে ওগুলি কী ফুল? কোথা থেকেই বা ওগুলি তোমরা সংগ্রহ করেছ?

তারা বলল—ফুলগুলি কী তা আমরা জানি নে; কিন্তু ওগুলি এসেছে ফুলারাস-এর মাঠ থেকে।

এই কথা শুনে পাদরি কেঁপে উঠলেন; নিজের ঘরে গিয়ে প্রার্থনায় বসলেন।

পরের দিন প্রত্যুষে, সঙ্গীদের নিয়ে তিনি সমুদ্রের তীরে এসে হাজির হলেন; সমুদ্রকে আশীর্বাদ করলেন; সেই সঙ্গে আশীর্বাদ করলেন সমুদ্রে যারা বাস করে তাদেরও। রোমক বনদেবতা, বনের মধ্যে যে সব ছোটো-ছোটো প্রাণি নেচে-নেচে বেড়ায় তাদের আশীর্বাদ করলেন—ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীদের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করলেন তিনি। জনতার মন আনন্দে ভরে উঠল। তারপর থেকে ফুলারাস-এর মাঠে আর কোনোদিন কোনো ফুল ফোটেনি; আগের মতোই জায়গাটা অনুর্বর রয়ে গেল। সামুদ্রিক প্রাণীরা আগের মতো সেই উপকূলে আর এল না—তারা অন্য উপকূলে চলে গেল।

লর্ড আর্থার সেভাইল-এর অপরাধ
Lord Arthur Savile's crime

ইস্টারের আগে লেডি উইনডারমিয়ারের এইটাই হচ্ছে শেষ ভোজের আয়োজন। বেনটিঙ্ক হাউস-এ এইসব আসরের সাধারণত যত অতিথি আসেন এবারে এসেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। সরকারি তকমা এঁটে আর জাঁকজমক পোশাক পরে এসেছেন দু'জন কেবিনেট মন্ত্রী। সব সুন্দরী মহিলাই তাঁদের সেরা পোশাক পরেছেন। আর পিকচার গ্যালারির শেষ প্রান্তে প্রিনসেস সোফিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চার্লসবুহীর রাজকুমারী তিনি। দেখতে বেশ মোটা ভারী তাতার রমণীর মতো। ছোটো ছোটো কালো চোখ; তিনি বেশ জোরে জোরে বিকৃত উচ্চারণে ফরাসী ভাষায় কথা বলছিলেন। তাঁকে লক্ষ করে যাই বলা হোক না কেন তাই শুনে তিনি অশালীন ভাবে হাসছিলেন। কত বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষেরই না সমাবেশ হয়েছিল এখানে। শৌখিন পোশাক পরে পিয়ারসরা অমায়িকভাবে উগ্রপন্থী র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে গল্প করছিলেন, জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারকরা প্রথিতযশা নাস্তিকদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে বসেছিলেন, নিয়মনিষ্ঠ রুচিশীলা মহিলা পাদরির দল বেশ স্বাস্থ্যবতী নর্তকীদের সঙ্গে ঢলাঢলি করছিলেন। কলাবিদের বেশ ধরে কয়েকজন রয়্যাল অ্যাকাডেমিসিয়েনরা সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়েছিলেন। শোনা যায় একসময় খাবার ঘর প্রথম শ্রেণির জিনিয়াসে একেবারে গিজগিজ করত। সত্যি কথা বলতে লেড উইনজারমিয়ারের এটি হচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট ভোজসেভা। প্রিনসেস প্রায় রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত সেখানে ছিলেন।

তিনি প্রস্থান করার পরেই লেডি উইনডারমিয়ার পিকচার গ্যালারিতে ফিরে এলেন। সেইখানে একজন বিদগ্ধ রাজনৈতিক অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিত হাঙ্গেরি থেকে আগত সূক্ষ্ম চারুকলার সমঝদারের কাছে সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বেশ সমারোহের সঙ্গেই করছিলেন। তাঁর সেই বিদগ্ধ আলোচনা শুনে চারুকলার সমঝদার বিষম বিতৃষ্ণায় তাঁর নাসিকা আর ভুরুযুগল কুঞ্চিত করছিলেন। এই দেখে অর্থনীতিবিশারদ পেইসলের ডাচেসের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। ডাচেসের গলার রঙ হাতির দাঁতের মতো সাদা; আমাকে-ভুলো-না গোছের সুন্দর নীল চোখ, আর এক গোছা সোনালি কেশের স্তবক। সব জড়িয়ে তাঁর দেহ-সৌষ্ঠভটি বড়োই মনোরম দেখাচ্ছিল। তাঁর মুখের ওপরে যুগপৎ একজন সাধুর শান্ত সমাহিত মুখভঙ্গিমার সঙ্গে পাপীর মুখের আকর্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার প্রশস্ত ক্ষেত্র বলে মনে হয়েছিল তাঁকে। প্রথম জীবনে একটি মূল্যবান সত্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সেটি হচ্ছে এই যে অস্থিরচিত্ততার মতো নিরপরাধ জিনিস আর কিছুই নেই এবং অজস্র হঠকারী উচ্ছৃংখল আচরণের মাধ্যমে, যাদের অর্ধেকগুলিই নিরপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছিল, ব্যক্তিত্ব অর্জনের সমস্ত সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তিনি

একবারের বেশি স্বামী পরিবর্তন করেছিলেন; সত্যি কথা বলতে কি দেব্রেত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তিনটি বিয়ের। কিন্তু প্রেমিককে তিনি কোনোদিনই বর্জন করেননি। ফলে, তাঁর কলঙ্কের কথা সমাজ আর এখন আলোচনা করে না। মাত্র চল্লিশ বছর তাঁর বয়স, কোনো সন্তান নেই তাঁর। রয়েছে কেবকল আনন্দ করার অসম্ভব মাদকতা। যৌবনকে বজায় রাখার এইটিই হল প্রধান উপায়।

হঠাৎ তিনি ঘরের চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলেন; তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার 'চিরোম্যানটিস্ট' কোথায়?

হঠাৎ চমকে ডাচেস চিৎকার করে উঠলেন—তোমার কী, গ্ল্যাডিস?

আমর 'চিরম্যানটিস্ট', ডাচেস। বর্তমানে ওঁকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি নে।

ডাচেস বুঝতে পারলেন আসল শব্দটা হল 'চিরোপোডিস্ট' (যে চিকিৎসক পা, পায়ের নখ, কড়া ইত্যাদির চিকিৎসা করে); বুঝতে পেরেই বললেন—না গ্ল্যাডিস; তুমি একটি অদ্বিতীয়া।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—প্রতিটি সপ্তাহে দু'বার করে নিয়মিত ভাবে তিনি আমার হাত দেখে যান, এবং তিনি নিজেই এবিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলী।

ডাচেস নিজের মনে-মনেই বললেন—হা ঈশ্বর! লোকটা চিরোপোডিস্ট ছাড়া আর কিছু নয়। কী ভয়ঙ্কর! আশা করি, লোকটি বিদেশি। তাহলে, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।

আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেব।

ডাচেস প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—আলাপ! তুমি নিশ্চয় বলতে চাও না যে তিনি এখানেই রয়েছেন।এই বলে তিনি কচ্ছপের খোলার ছোটো পাখা আর 'লেস' দেওয়া শালটা নেওয়ার জন্যে চারপাশে একবার তাকালেন। মনে হল, তিনি এখনই ওখান থেকে চলে যাবেন।

'নিশ্চয়। তিনি তো এখানেই রয়েছেন'—বললেন লেডিউইনডারমিয়ার।—তাঁকে বাদ দিয়ে পার্টি দেওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারিনি। তিনি বলেন আমার হাতটা নাকি একেবারে আধ্যাত্মিক, আর আমার বুড়ো আঙুলটা যদি আর একটু ছোটো হত তাহলে আমি একবার পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে সোজা মঠে চলে যেতাম।

বেশ কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ডাচেস বললেন—তাই বুঝি! মনে হচ্ছে তিনি ভাগ্য গণনা করেন তাই, না?

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—এবং দুর্ভাগ্যও; অনেক অনেক দুর্ভাগ্য। ধরুন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আগামী বছর জল আর স্থল দু'জায়গাতেই আমার বিপদ ঘটতে পারে। তাই আমি ঠিক করেছি ওই সময়টা আমি বেলুনে বাস করব; আর প্রতিদিন একটা বাক্স করে আমার ডিনার নিয়ে যাবা এ-সব কথা আমার বুড়ো আঙুলে লেখা রয়েছে। হাতের চেটোতেও থাকতে পারে। ঠিক কোথায় লেখা রয়েছে তা আমার মনে নেই।

বল কী গ্ল্যাডিস? এতে ঈশ্বরও প্রলুব্ধ হবেন যে দেখছি।

প্রিয় ডাচেস, এর মধ্যে ঈশ্বর নিশ্চয় প্রলোভনকে এড়াতে পারবেন। আমার বিশ্বাস

প্রত্যেকেরই মাসে অন্তত একবার করে হাত দেখানো উচিত। কী তার করা উচিত নয় সেটা তাহলে সে বুঝতে পারবে। তবে তা জেনেও মানুষ সব কাজই করে। কিন্তু আগে থাকতে বিপদের সঙ্কেত পাওয়াটা খুবই মনোরম। এখন কেউ যদি গিয়ে মিঃ পডগারসকে এক্ষুনি এখানে ডেকে না আনেন তাহলে আমাকেই যেতে হবে।

একটি দীর্ঘকায় সুন্দর যুবক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। শুনতে-শুনতে একটু হাসছিলেনও। তিনি বললেন—আমি যাচ্ছি, লেডি উইনডারমিয়ার।

ধন্যবাদ, লর্ড আর্থার। কিন্তু ভয় হচ্ছে আপনি হয়তো তাঁকে চিনতে পারবেন না।

তিনি যদি আপনার মতোই অনবদ্য হন তাহলে চিনতে অবশ্য আমার ভুল হবে না। কেমন দেখতে বলুন তো। আমি এখন তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আসছি।

মানে, চিরোম্যানটিস্টের মতো আদৌ তিনি দেখতে নন। অর্থাৎ, তিনি অদ্ভুত চেহারার মানুষ নন, অথবা, রোমান্টিকও মনে হবে না তাঁকে। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা তাঁর, বেশ রসিক—মাথায় টাক; চোখে সোনার পাতে মোড়া চশমা। অনেকটা গৃহচিকিৎসক আর গ্রামের উকিলের মাঝামাঝি চেহারা তাঁর। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত; কিন্তু তার জন্যে আমি দায়ী নই, মানুষরা সত্যিকার বড়োই বিরক্তিকর। আবার যাঁরা পিয়ানো বাজান তাঁদের সকলের চেহারা কবিদের মতো। আর আমার পরিচিত সব কবিরাই পিয়ানো বাজিয়েদের মতো দেখতে। আমার বেশ মনে রয়েছে গত বছর আমি একজন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকারীকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। লোকটি সব সময় সাঁজোয়ার কোট পরত; তার শার্টের ভেতরে লুকানো থাকত একটা ছোরা। আপনি কি জানেন লোকটি যখন আসত তখন তাকে একটি চমৎকার বৃদ্ধ পাদরি বলে মনে হত; আর সারা সন্ধেটাই রসিকতা করে তিনি আসর জমিয়ে রাখতেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমি খুবই নিরাশ হয়েছিলাম। আমি যখন তাকে ও সাঁজোয়ার কোটের কথা জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি কী বললেন জানেন? কেবল হেসে বললেন ইংলন্ডে ঠান্ডা এত বেশি যে ওই কোট এখানে পরা যায় না। আরে, ঐ তো মিঃ পডগারস, পেইসলের ডাচেসের হাতটা দেখতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। ডাচেস, তোমার দস্তানাগুলো খুলে ফেল। না, না—বাঁ হাত নয়; না, না—বাঁ হাত নয়; ডান হাত।

ভিজে 'কিড' দস্তানা আস্তে-আস্তে খুলে ডাচেস বললেন—প্রিয় গ্ল্যাডিস, না না—ঠিক হচ্ছে না...

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—দুনিয়াটাই এমনি। এখানে কিছুই কৌতূহলোদ্দীপক নয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে পরিচয় আমাকে করিয়ে দিতে হবে। ডাচেস, ইনি হচ্ছেন, আমার প্রিয় চিরোম্যানটিস্টি, মিঃ পডগারস; ইনি হচ্ছেন পেইসলের ডাচেস। আপনি যদি বলেন ওঁর হাতে যে চাঁদের পাহাড় রয়েছে সেটা আমর চেয়ে বড়ো তাহলে আর কোনোদিনই আমি আপনাকে বিশ্বাস করব না।

ডাচেস গম্ভীরভাবেই বললেন—আমার হাতে নিশ্চয় ওসব কোনো বস্তু নেই।

তাঁর ছোট চ্যাপ্টা চতুর্ভুজ আঙুলগুলি দিয়ে ডাচেসের মোটা ছোটো হাতের দিকে তাকিয়ে মিঃ পডগারস বললেন—ডাচেস সত্যি কথাই বলেছেন। চাঁদের পাহাড় এখনও বেড়ে ওঠেনি; কিন্তু জীবনের রেখাটি সত্যিই বড়ো ভালো। দয়া করে কব্জিটা একটু বাঁকান। ধন্যবাদ। তিনটি রেখা আপনার হাতে এড়োএড়ি হয়ে রয়েছে। আপনি অনেক দিন বেশ সুখেই বাঁচবেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা—মোটামুটি; বুদ্ধির রেখাটা খুব একটা মারাত্মক রকমের নয়, হৃদয়রেখা—

লেডি উইনডারমিয়ার একটু চেঁচিয়েই বললেন—এবারে কিন্তু সাবধান।

মিঃ পডগারস মাথাটা নুইয়ে বললেন—ডাচেস যদি বিচক্ষণ হতেন সেকথা বলতে আমি খুব খুশিই হতাম; কিন্তু একথা বলতে আমি খুবই দুঃখিত যে ওঁর হাতের ওপরে যেসব চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি তা থেকে বোঝা যাচ্ছে উনি হৃদয়বতী মহিলা; এবং ওঁর কর্তব্যজ্ঞান বড়ো টনটনে।

বেশ সন্তুষ্ট হয়ে ডাচেস বললেন—অনুগ্রহ করে বলে যান মিঃ পডগারস।

মিঃ পডগারস বললেন—ডাচেস, মিতব্যয়িতার কোনো লক্ষণ আপনার হাতে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

এই কথা শুনে লেডি উইনডারমিয়ার হেসে কুটি-কুটি হয়ে গেলেন।

ডাচেস সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—মিতব্যয়িতা বড়ো ভালো জিনিস। আমি যখন পেইসলকে বিয়ে করেছিলাম তখন তার সাতটি দুর্গ ছিল; বাস করার মতো বাড়ি ছিল না একটাও।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—এখন তাঁর বারোটা বাড়ি রয়েছে; একটাও দুর্গ নেই।

ডাচেস বললেন—আসল কথাটা কী জান? আমি চাই—

শেষ করলেন মিঃ পডগারস—সুখ, আর চান প্রতিটি ঘরে আধুনিক সাজসজ্জা এবং প্রতিটি শোওয়ার ঘরে গরম জল। আপনি ঠিকই বলেছেন। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যই একমাত্র জিনিস বর্তমান সভ্যতা আমাদের যা দিতে পারে।

ডাচেসের চরিত্রের সম্বন্ধে আপনি চমৎকার বলেছেন, মিঃ পডগারস। এবার আপনি লেড ফ্লোরার হাত দেখে বলুন।

হাস্যমানা গৃহস্বামিনীর ইঙ্গিতে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন একটি দীর্ঘাঙ্গিনী বালিকা। তাঁর চুলগুলি স্কটল্যান্ডের বালির মতো কটা, চওড়া কাঁধ। জড়-ভরতের মতো সামনের দিকে এগিয়ে এসে তিনি তাঁর ছুঁচোল আঙুলগুলি বাড়িয়ে দিলেন।

মিঃ পডগারস বললেন—আপনি তো দেখছি পিয়ানো বাজিয়ে, চমৎকার পিয়ানো বাজান আপনি। কিন্তু গায়িকা আপনি নন। খুব সংযত, অতিরিক্ত ন্যায়বাদিনী; আর জীবদের ওপরে আপনার স্নেহ অগাধ।

লেডি উইনডারমিয়ারের দিকে তাকিয়ে ডাচেস বললেন—খাঁটি কথা; একেবারে খাঁটি কথা! ম্যাক্রোসকিতে ফ্লোরার দু'ডজন নেড়ি কুত্তা রয়েছে; ওর বাবা রাজি হলেও ওদের বাড়িটাকে একটি পশ্বাগারে পরিণত করে ফেলত।

লেডি উইনডারমিয়ার হেসে বললেন—প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমার বাড়িটা যা হয়। তবে নেড়ি কুত্তার চেয়ে আমি বেশি পছন্দ করি সিংহকে।

খুব আড়ম্বরের সঙ্গে মিঃ পডগারস মাথাটা নুইয়ে বললেন—লেডি উইনডারমিয়ার, আপনার

একটি ভুল হচ্ছে—

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—যদি কোনো মহিলা তার ভুলগুলিকে মনোরম করে তুলতে না পারে তা হলে সে নিছক নারী ছাড়া আর কিছু নয়। আরও কয়েকজনের হাত আপনাকে আজ দেখতে হবে। স্যার টমাস, আপনি হাত দেখান।

সাদা ওয়েস্ট কোটপরা একটি শান্ত চেহারার বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এস তাঁর পুরুষ্ট লম্বা তৃতীয় আঙুলটি বাড়িয়ে দিলেন।

আপনার চরিত্রটি দুঃসাহসিক। অতীত আপনি চারবার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করেছেন। আর একবার করবেন। আপনার জাহাজ তিনবার দুর্ঘটনায় পড়েছিল। না, দু'বার। কিন্তু ভবিষ্যতে আর একবার দুর্ঘটনায় পড়ার সম্ভবনা রয়েছে। আপনি খুব শক্ত কন্‌জারভেটিভ, সময়ের জ্ঞান আপনার টনটনে; আর অদ্ভুতদ-অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ করার দিকে ঝোঁক রয়েছে আপনার। ষোল থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে আপনার একবার কঠিন অসুখ করেছিল। তিরিশ বছর বয়সে আপনি অনেক সম্পত্তি পেয়েছিলেন। বিড়াল আর র‍্যাডিকেলদের ওপরে আপনার বিতৃষ্ণা অগাধ।

স্যার টমাস বললেন—অদ্ভুত, অদ্ভুত! আপনি আমার স্ত্রীর হাতটাও দেখুন।

স্যার টমাসের হাতটা নিজের হাতের ওপরে রেখে তিনি বললেন—আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রীর। খুশি হয়েই দেখব।

লেডি মার্ভেলের চেহারাটি বিষণ্ণ; কটা চুল, চোখ দুটো ভাবপ্রবণ। তাঁর অতীত আর ভবিষ্যৎ প্রকাশ হয়ে পড়ুক তা তিনি ঠিক চাচ্ছিলেন না। লেডি উইনডারমিয়ার যাই চান, রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতও তাঁর দস্তানা খুলতে রাজি হলেন না। সত্যি কথা বলতে কি অনেকেই এই অদ্ভুত হাসির খুদে লোকটির মুখোমুখি পড়তে রাজি হচ্ছিলেন না। তারপরে তিনি যখন লেডি ফারমোরকে মুখের ওপরে বলে দিলেন যে সঙ্গীতের ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই তখনই সবাই বুঝতে পারলেন এক খোশ গল্প ছাড়া হাত দেখা ব্যাপারটাকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

লেডি ফারমোরের দুর্ভাগ্যজনক কাহিনি লর্ড আর্থার সেভাইল জানতেন না। তিনি বিরাট একটি কৌতূহল নিয়ে মিঃ পডগারস-এর দিক তাকিয়ে রইলেন। নিজের হাতটা দেখানোর খুব ইচ্ছা হল তাঁর। কিন্তু হাত দেখাতে তাঁর বেশ লজ্জা হচ্ছিল। লেডি উইনডারমিয়ার যেখানে বসেছিলেন সেইখানে গিয়ে একটু মিষ্টি হেসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:হাত দেখালে কি মিঃ পডগারস কিছু মনে করবেন?

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—নিশ্চয় না। সেইজন্যেই তো তিনি এখানে এসেছেন। লর্ড আর্থার, আমার সমস্ত সিংহই সিংহের মত খেলা করেন; যখনই আমি বলব তখনই তাঁরা সার্কাসের ঘেরাটোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু আপনাকে আমি প্রথমেই সাবধান করে দিচ্ছি যে সব কথা আমি সাইবিলকে বলে দেব। আগামী কাল সে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আসবে, সেই সঙ্গে 'বোনেট' (মহিলাদের মস্তকাবরণ) নিয়ে কিছুউ আলোচনাও করবে আমার সঙ্গে। যদ মিঃ পডগারস আপনার সম্বন্ধে এমন কিছু কথা বলেন—এই ধরুন, আপনার হয়তো বাতের লক্ষণ রয়েছে, আপনার মেজাজটা বেশ রুক্ষ, অথবা, আপনার একটা স্ত্রী 'বেয়েসওয়াটারে' থাকে—তাহলে সেসব কথা নিশ্চয় আমি তাকে জানিয়ে দেব।

একটু হেসে লর্ড আর্থার মাথা নেড়ে বললেন—ওকে আমার ভয় নেই। দুজনেই আমরা দুজনকে ভালভাবে চিনি।

তাই বুঝি! একথা শুনে আমি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হচ্ছি। কারণ, বিয়ের আসল কথাই হচ্ছে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস। না, না, বিবাহের সততাকে আমি অবিশ্বাস করছি নে; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এই কথা বললাম। দুটোর মধ্যে ফারাক অবশ্য বিশেষ কিছু একটা নেই। মিঃ পডগারস, লর্ড আর্থার সেভাইল তাঁর হাত দুটি দেখানোর জন্যে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। লনডনের সবচেয়ে সুন্দরী একট যুবতীর সঙ্গে ওঁর যে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছে সেকথা আপনি যেন বলবেন না; কারণ মাসখানেক আগে 'মর্নিং পোস্ট' কাগজেই সে-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

জেডবার্জের মার্কুইস-পত্নী চিৎকার করে বললেন—প্রিয় লেডি উইনডারমিয়ার, মিঃ পডগারসকে এখানে আর একটু থাকতে বলুন। তিনি এইমাত্র বললেন যে আমি একজন অভিনেত্রী হব, কথাটা শুনে আমার বড়ো কৌতূহল হয়েছে।

লেড জেডবার্জ, মিঃ পডগারস যদি ওই কথা বলে থাকেন তাহলে তাঁকে আমি নিশ্চয় সরিয়ে নেব। মিঃ পডগারস, আপনি এখানে লর্ড আর্থারের হাতটা দেখুন তো?

লেড জেডবার্জ একটু নড়ে-চড়ে বললেন—স্টেজে নামাটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত, দর্শকবৃন্দের একজন হতে পারি।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—অবশ্যই আমরা সবাই দর্শকবৃন্দের অংশ হতে যাচ্ছি। এখন মিঃ পডগারস আসুন; এঁর সম্বন্ধে কিছু ভালো কথা বলুন; ইনি আমার বিশেষ অনুগৃহীত।

কিন্তু মিঃ পডগারস লর্ড আর্থারের হাত দেখেই কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন। মনে হল, তিনি যেন শিউরে উঠলেন। তাঁর লোমশ ভ্রুযুগল কুঁচকে উঠল। কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হল তাঁকে। তারপরে কয়েকটি মোটা মোটা ঘামের ফোঁটা জমে উঠল তাঁর কপালের উপরে।

লর্ড আর্থারও তাঁর এই পরিবর্তন লক্ষ করলেন। জীবনে এই প্রথম বোধ হয় তিনি একটু ভয় পেলেন। একবার মনে হয়েছিল ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবেন তিনি; কিন্তু তারপরেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি ভাবলেন ভবিষ্যৎ যত ভয়ঙ্করই হোক অনিশ্চয়তার মধ্যে না থেকে বরং তা আগে থাকতে জানাই ভালো।

তিনি বললেন মিঃ পডগারস, আমি অপেক্ষা করছি।

অস্থিরভাবে লেডি উইনডারমিয়ার-ও বললেন—আমরা সবাই অপেক্ষা করে রয়েছি।

কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

হঠাৎ তিনি আর্থারের ডান হাতটা ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাতটা তুলে নিলেন। তারপরে সেই হাতটা চোখের একেবারে সামনে তুলে এনে গভীরভাব দেখতে লাগলেন। এক মুহূর্তের জন্যে তাঁর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল; কিন্তু তারপরে নিজেকে সামলে নিয়ে লেডি উইনডারমিয়ারের দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে হেসে বললেন—হাত তো ভালোই; অর্থাৎ মনোমুগ্ধকর যুবকের হাত যেমন হওয়া উচিত।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—সে তো বটেই। সে তো বটেই। কিন্তু উনি কি মনোমুগ্ধকর স্বামী হতে পারবেন? সেইটাই আমি সেইটাই আমি জানতে চাই।

লেডে জেডবার্জ আস্তে-আস্তে বললেন—আমার মনে হয় না কোনো স্বামীরই বেশিমাত্রায় আকর্ষণী শক্তি থাকা উচিত। থাকলে, সেটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—বৎসে, স্বামীদের কোনোদিনই স্ত্রীকে আকর্ষণ করার শক্তি থাকে না। কিন্তু আমি চাই খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে। মানুষের আগ্রহ-ই তো খুঁটিনাটি জানার। লর্ড আর্থারের ভবিষ্যৎটা কী রকম তাই বলুন।

কয়েক মাসের মধ্যেই লর্ড আর্থার সমুদ্রযাত্রা করবেন—

নিশ্চয়। হনিমুনে যাবে বইকি।

এবং একটি আত্মীয়কে হারাবেন।

করুণ সুরে লেডি জেডবার্জ বললেন—আশা করি সেই আত্মীয়টি বোন নয়। একটি বিরক্তির ভঙ্গিতে মিঃ পডগারস বললেন—নিশ্চয় না। একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—কথাটা শুনে আমি বেশ হতাশ হলাম। আগামী কাল সাইবিলকে বলার মতো কিছুই রইল না আমার। আজকাল দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে কেউ বিশেষ ব্যস্ত নয়। অনেকদিন আগেই ওটা চলনের বাইরে চলে গিয়েছে। যাই হোক, সাইবিলের সিল্কের কালো একটা ঘোমটা রাখা উচিত। এখন খেতে যাই চলুন। মনে হচ্ছে, ওরা সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। কিছু গরম 'সুপ' ছাড়া আর কিছুই পড়ে নেই আমাদের জন্যে। একসময় ফ্র্যাঙ্কোয় বড়ো সুন্দর 'সুপ' তৈরি করতে পারত; কিন্তু অধুনা রাজনীতি নিয়ে সে এতই উত্তেজিত হয়ে থাকে যে 'সুপের' দিকে নজর রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। জেনারেল বোলাঙ্গার কথা বলাটা কমালেই আমি খুশি হতাম। ডাচেস, তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

দরজার দিকে এগিয়ে ডাচেস বললেন—না, না। খুবই ভালো লাগল। সবচেয়ে ভালো লাগল 'চিরোপোডিস্ট', অর্থাৎ, 'চিরোম্যানিস্ট'কে। ফ্লোরা, আমার কচ্ছপের খোলা দিয়ে তৈরি হাতপাখাটা কোথায় থাকতে পারে বল তো? ওঃ, ধন্যবাদ, স্যার টমাস। আমার লেস দেওয়া শালটা কোথায় ফ্লোরা? ওঃ, ধন্যবাদ স্যার টমাস।

এই বলে সেই সম্মানিতা প্রাণীটি কোনোরকমে শেষ পর্যন্ত নিচে নেমে এলেন। আসার পথে দু'বারের বেশি তিনি সেন্ট-এর শিশিটা হারাননি—এটাই সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে।

সারা সময়টা লর্ড আর্থার আগুনে চুল্লির পাশে সমানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সারা সত্তার ওপরে তাঁর কেমন যেন একটা আতঙ্কের ছায়া পড়েছিল। কোন জাতীয় দুর্ভাগ্য তাঁর আসতে পারে সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি। তাঁর বোন লর্ড প্লিমডেলের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন। মুক্তা আর ব্রোকেড-এ তাঁকে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছিল। লেডি উইনডারমিয়ার যখন তাঁকে তাঁর পিছু পিছু আসার কথা বললেন তখন সেকথাও তাঁর কানে ঢুকল বলে মনে হল না। সাইবিল মার্টনের কথাই তিনি তখন ভাবছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু ঘটতে পারে এই কথাই ভেবেই তিনি বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর চোখ দুটি জলে ভিজে আসছিল যেন। এতদিন পর্যন্ত একটানা সুখ আর

প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি জীবন কাটিয়ে এসেছেন। দুঃখের বিন্দুবিসর্গও তিনি জানতেন না। এই প্রথম তিনি রহস্যময় ভবিষ্যতের ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। অনাগত দুর্ভাগ্যের একট ভয়ঙ্কর কালো ছায়া ধীরে ধীরে তাঁর রৌদ্রজ্বল যৌবনের সামনে এসে দাঁড়াল।

সমস্ত জিনিসটাই তাঁর কাছে কেমন যেন একটা অর্থহীন ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। তাঁর হাতে এমন কী লেখা থাকতে পারে যা পড়ার ক্ষমতা তাঁর নিজের নেই; যা অন্য লোকে বুঝতে পারে—সেই ভয়ঙ্কর গোপন পাপ অথবা অপরাধের রক্তাক্ত অদৃশ্য চিহ্নটি কী? এ থেকে কি মুক্তি নেই মানুষের? সেই অদৃশ্য ক্ষমতা নিজের ইচ্ছেমতো আমাদের জন্যে যা সাজিয়ে রেখেছেন তাকে ওলোট-পালোট করার মতো বুদ্ধি আর শক্তি কি আমাদের নেই? সমস্ত ব্যাপারটার বিরুদ্ধেই তাঁর জ্ঞান আর বুদ্ধি বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তবু তাঁর মনে হল অনাগত এটি দুর্ভাগ্য তাঁর সামনে ঝুলছে; আর সেই দুর্ভাগ্যেই তাঁর মনের ওপরে একটি নিদারুণ চাপ সৃষ্টি করেছে। সে-চাপটিকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না। মঞ্চের অভিনেতাদের কপাল ভালো। তাঁর হাসুন আর কাঁদুন, দুঃখ করুন বা আনন্দই করুন—ট্র্যাজেডি অথবা কমেডি—কিসে অভিনয় করবেন সেটা তাঁরা নিজেরাই ঠিক করে নেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে সমস্তটাই আলাদা। অধিকাংশ নর-নারীকেই এমন সব অভিনয় করতে হয় যা করার দক্ষতা তাদের থাকে না। সমস্ত পৃথিবীটাই একটা রঙ্গমঞ্চ; কিন্তু অভিনয়ের পালা এখানে বড়ো বিসদৃশ।

হঠাৎ মিঃ পডগারস ঘরে ঢুকলেন। লর্ড আর্থারকে দেখেই একটু চমকে উঠলেন তিনি, তাঁর সেই স্থূল মুখের ওপরে একটা হলদে আভা নেমে এল। দুজনে চোখাচোখি হল। মুহূর্তের জন্যে কেউ কোনো কথা বললেন না।

শেষকালে মিঃ পডগারস বললেন—ডাচেস তাঁর একট দস্তানা এখানে ফেলে গিয়েছেন। সেইটা আমাকে তিনি নিয়ে যেতে বললেন। এইতো; সোফার ওপরে পড়ে রয়েছে। নমস্কার।

মিঃ পডগারস, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি। আমি চাই আপনি তার সোজা উত্তর দেবেন।

অন্য সময়, লর্ড আর্থার। ডাচেস বড়োই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। আমাকে এখনই যেতে হবে।

না। ডাচেসের কোনো তাড়া নেই।

একটু বিষণ্ন হাসি হেসে মিঃ পডগারস বললেন—মহিলাদের বসিয়ে রাখা উচিত নয়। ওঁরা স্বভাবতই তাতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।

লর্ড আর্থারের সুন্দর ঠোঁট দুটি একটা অশিষ্ট ব্যঙ্গে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে হতভাগিনী ডাচেসের দাম তাঁর কাছে সামান্য বলেই মনে হল। তিনি মিঃ পডগারস-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলেন।

আমার হাতে কী দেখলেন সত্যি করে বলুন। আমার তা জানতেই হবে। আমি শিশু নই।

সোনার পাত দিয়ে চশমার পেছনে মিঃ পডগারস-এর চোখ দুটি মিটমিট করে উঠল। এক পা থেকে আর এক পায়ের ওপরে তিনি অস্থিরভাবে সরে দাঁড়ালেন।

আমি আপনাকে যা বলেছি তার চেয়ে যে আপনার হাতে আমি বেশ কিছু দেখেছি এইরকম

একটা ধারণা আপনার হল কেন, লর্ড আর্থার?

আমি তা জানি। আমি চাই সেই কথাটা আপনি আমাকে বলবেন। তার জন্যে আমি আপনাকে একশ পাউন্ড-এর একটা চেক দেব—আপনার পারিশ্রমিক হিসাবে।

সেই সবুজ চোখ দুটি একবার চকচক করেই আবার ঝিমিয়ে পড়ল। আস্তে করে তিনি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন—গিনি?

নিশ্চয়। কালই আপনাকে একটা চেক পাঠিয়ে দেব। আপনার ক্লাবের নাম কী?

আমার কোনো ক্লাব নেই—অর্থাৎ বর্তনামে আমার ঠিকানা হচ্ছে—, কিন্তু আমার একখানা কার্ড আপনাকে দিচ্ছি।

এই বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ছোট্ট একটা অভিবাদন জানিয়ে তিনি সেটা লর্ড আর্থারের হাতে দিলেন। কার্ডের ওপরে লেখা ছিল—মিঃ সেপটিমাস আর পডগারস—হস্ত-পরীক্ষক—১০৩০ ওয়েস্ট মুন স্ট্রিট।

যান্ত্রিকভাবে ফিস ফিস করে বললেন—আমার সময় হচ্ছে দশটা থেকে চারটে। পরিবারের জন্যে ফিস আমার কিছু কম হয়।

বিবর্ণ মুখে নিজের হাতটাকে প্রসারিত করে লর্ড আর্থার বললেন—তাডাতাড়ি করুন।

ভয়ে-ভয়ে চারপাশে একবার তাকিয়ে মিঃ পডগারস ভারী পর্দাটাকে টেনে দিয়ে বললেন—একটু সময় লাগবে, লর্ড আর্থার। আপনি বরং বসুন।

সেই মসৃণ মেঝের ওপরে রেগে পা ঠুকে লর্ড আর্থার বললেন—তাড়াতাড়ি স্যার।

মিঃ পডগারস হাসলেন; তারপরে বুকপকেট থেকে ছোটো একটা ম্যাগনফাইং গ্লাস বার করে সেটাকে ভালো করে রুমাল দিয়ে মুছে তিনি বললেন—আমি প্রস্তুত।

২

মিনিট দশেক পরে বেনটিঙ্ক হাউস থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলেন লর্ড আর্থার সেভাইল। প্রচণ্ড আতংকে তাঁর মুখ তখন থমথম করছে। দুঃখে বিভ্রান্ত হয়েছে তাঁর দুটি চোখ। দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার সময় কোনো কিছু দেখলেন না, কারও কথা শুনলেন না তিনি। ঠাণ্ডা কনকন করছে রাত্রি; তীক্ষ্ণ বাতাসে পার্কের গ্যাসের আলোগুলি মিটমিটি করছে। কিন্তু তাঁর হাত দুটি মনে হচ্ছিল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে; কপালটা পুড়ছে আগুনে। মাতালের মতো টলতে টলতে তিনি চলতে লাগলেন। একটি পুলিশম্যান তাঁর দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল। খিলানের তলা থেকে একটি ভিক্ষুক ভিক্ষে চাইবার চেষ্টা করে থেমে গেল। তার মনে হল, তার চেয়েও দুঃখী তিনি। একবার একটা বাতির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের হাত দুটো দেখলেন। তাঁর মনে হল তাঁর হাতে যে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে তা তিনি দেখতে পাবেন। তাঁর কম্পমন ঠোঁট দুটি থেকে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

হত্যা! এই চিহ্নই গণৎকার তাঁর হাতের মধ্যে দেখেছেন। সেই হত্যার ধ্বনি আকাশে-বাতাসে পথে-প্রান্তরে সর্বত্র ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তাগুলি সেই শব্দ মুখরিত হয়ে উঠেছে। বাড়ির ছাদ থেকে তারা যেন তাঁকে ব্যঙ্গ করছে।

প্রথমে তিনি একটি পার্কে এলেন। এর শান্ত গম্ভীর পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করত। ভিজে ধাতুর বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে নিজেকে তিনি ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন। বৃক্ষদের মুখর স্তব্ধতার দিকে রইলেন কান পেতে। বার বার তিনি বিড় বিড় করে উচ্চারণ করতে লাগলেন—হত্যা, হত্যা! মনে হল ঐ শব্দটা বার বার উচ্চারণ করলেই হয়তো তাঁর তীব্রতা কমে যাবে। নিজের শব্দেই তিনি চমকে উঠতে লাগলেন। মনে হল নিঃসঙ্গ পথচারীদের থামিয়ে তাদের কাছে সব তিনি খুলে বলবেন।

অক্সফোর্ড স্ট্রিটে ছাড়িয়ে তিনি নোংরা গলির মধ্যে ঢুকলেন। রঙ করা মুখে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়। পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতে দেখে তারা তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল। একটা অন্ধকার উঠোনের উপর থেকে মারামারি আর গালাগালির শব্দ ভেসে এল। সেই দুঃস্থ-দারিদ্র্য দেখে তাঁর মনে কৃপার সঞ্চার হল। এই যে পাপ আর দারিদ্র্যের সন্তান—এরাও কি সেই ভাগ্যের হাতে বাঁধা?

কিন্তু তবু রহস্য নয়; যা তাঁকে আঘাত করল সেটা হচ্ছে দুঃখের কমেডি—যার সত্যিই কোন প্রয়োজনীয়তা নেই—যার অর্থ বলতে কোনো কিছু নেই। সবটাই যেন অদ্ভুত, কিম্ভুতকিমাকার। সামঞ্জস্য বা সমতা বলতে কোথাও যেন কিছু নেই এর। বাস্তব আর দিনের আলোতে আমরা যে ভুয়ো রঙিন আশার ছবি দেখি—এ দুয়ের মাঝখানে কোনো মিল তাঁর চোখে পড়ল না। তিনি এখনো যুবক।

এইভাবে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি মেরিলিবোন গির্জার কাছে হাজির হলেন। সেই নির্জন পথটিকে দেখে তাঁর মনে হল পালিশকরা রুপোর সুতোর মতো; মাঝে-মাঝে ছায়ারা এসে কেবল তার ছন্দটিকে ব্যাহত করছে। অনেক দূরে গ্যাসের বাতিগুলি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বাইরে ছোটো একটি ঘরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সহিস তার ভেতরে ঘুমোচ্ছে। এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে—মন হচ্ছিল কেউ যেন তাঁর পিছু নিয়েছে—তাড়াতাড়ি তিনি পোর্টল্যান্ড প্লেসের দিকে এগোতে লাগলেন। রিচ স্ট্রিটের কোণে তিনি দেখলেন দুটি লোক দেওয়ালের ওপরে আঁটা একটা বিজ্ঞাপন পড়ছে। বিজ্ঞাপনে ছিল, যে লোক একটি হত্যাকারীর সন্ধান দিতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। লোকটির বয়স তিরিশ থেকে

চল্লিশের মধ্যে তার মাথার ওপরে সুঁচলো একটা টুপি, পরনে চেকের ট্রাউজার, গায়ে কালো কোট, ডান গালে একটা দাগ। বিজ্ঞাপনটা বার বার পড়লেন তিনি। সেই হতভাগ্য লোকটি ধরা পড়বে কি না এবং সে যে কতটা সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই কথা ভেবে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। একদিন হয়তো লনডনের দেওয়ালে-দেওয়ালে তাঁর নামের এইরকম বিজ্ঞাপন বেরোবে। তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্যেও পুরস্কার ঘোষিত হবে এইভাবে। এই ভেবে তিনি আরো ভয় পেয়ে অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন।

কোথায় যে যাচ্ছেন সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা তার ছিল না। মনে হল অনেক পথে-বিপথে ঘুরছিলেন তিনি। শেষকালে ভোরের দিকে পিকাডেল সার্কাসে হাজির হলেন তিনি। বাড়ির পথে যখন তিনি বেলগ্রেভ স্কোয়ারের দিকে এগোচ্ছিলেন এমন সময় দেখলেন কনভেন্ট গার্ডেন-এর দিকে সব্জির গাড়ি চলেছে। সাদা পোশাক-পরা পসারীদের দল ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারছে আর নিজেদের মধ্যে খুশমেজাজে গল্প করছে। কী জানি কেন তিনি অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে গেলেন। ঊষার কোমল সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটা কারুণ্য রয়েছে যাকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই সব দেহাত রুক্ষ বেপরোয় রহস্যপ্রিয় লোকগুলি নিয়ে কী অদ্ভুত লনডনকেই না তিনি দেখলেন। এই লনডন রাত্রির পাপ থেকে মুক্ত, দিনের ধোঁয়ায় কলঙ্কিত নয়। এ লনডন পরিত্যক্ত কবরখানার শহর নয়। এর চাকচিক্য আর লজ্জা, এর ভীষণ আনন্দের উচ্ছ্বাস আর ভয়ঙ্কর ক্ষুধার ব্যভিচার, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যারা এখানে টগবগ করে ফুটছে তাদের সঙ্গে এদের যে কোনো স্পষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে সেকথা ভেবেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। সম্ভবত এটা তাদের কাছে ফল বিক্রি করার বাজার ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে তারা আসে, বেচাকেনা করে। বিশ্রাম করে কিছুক্ষণ, তারপরে আবার যে যার জায়গায় ফিরে যায়। তাঁর মনে হল, তারা প্রকৃতির কোলেই বাস করে; আর প্রকৃতিই তাদের মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। তাদের দেখে তাঁর হিংসে হতে লাগল।

বেলগ্রেভ স্কোয়ারে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন সকাল হয়েছে। একটা মৃদু রক্তাভা ছড়িয়ে পড়েছে চারাপাশে। বাগানে পাখিরা শুরু করেছে কিচমিচ করতে।

৩

লর্ড আর্থারের যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা বারোটা। দুপুরের রোদে ভরে উঠেছে চারপাশ। ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বাড়ির নীচে যে পার্কে সেখানে সাদা প্রজাপতির মতো কয়েকটি শিশু ছুটাছুটি করছে। ফুটপাথে অনেক লোক; তারা পার্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সব। জীবন যে এত সুন্দর তা তিনি আগে জানতেন না। জীবনের সব কিছু অমঙ্গল তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল।

তাঁর চাকর এল একটা ট্রেতে করে এক কাপ চকোলেট নিয়ে সেটা পান করে তিনি স্নানের ঘরে ঢুকলেন। বেশ ভালো করে স্নান করলেন। মনে হল তাঁর সমস্ত লজ্জাকর স্মৃতি যেন ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গিয়েছে। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে তাঁর মন শান্তিতে ভরে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর যে চমৎকার শারীরিক অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে তিনি খুশিই হয়েছিলেন। যাদের স্বভাব সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির জাল দিয়ে তৈরি তাদের প্রায় এইরকমই হয়। প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস তাদের যেমন পবিত্র করে, তেমনি আবার কখনো-কখনো তাকে পুড়িয়েও মারে।

প্রাতঃরাশ শেষ করে তিনি একটি ডিভানের ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরালেন; কুলুঙ্গির ওপরে সাইবিল মার্টনের বেশ বড়ো একটি ফটোগ্রাফ বসানো ছিল। লেডি নোয়েল-এর নাচের আসরেই তাঁকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন। ছোটো খুদে মাথাটি তাঁর একদিকে একটু হেলে পড়েছে; মনে হচ্ছে সেই শর গাছের মতো সরু গলাটি তাঁর মাথার বোঝা যেন আর বইতে পারছে না। ঠোঁট দুটি সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে।মনে হবে, এই দুটি ঠোঁট মিষ্টি গান গাইবার জন্যেই যেন বিধাতা পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনূঢ়া কৈশোরের সমস্ত পেলব শুচিতা তাঁর সেই স্বপ্নালু চোখ দুটির মধ্যে থেকে যেন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে।

সেই ছবিটির দিকে তাকিয়ে লর্ড আর্থারের মনটা করুণায় টনটন করে উঠল। এই করুণার উৎস হচ্ছে তাঁর ভালোবাসা। তাঁর মাথার ওপরে আসন্ন হত্যার অভিশাপ ঝুলছে। এ অবস্থা সাইবিলকে বিয়ে করার অর্থই হচ্ছে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। সেই বিশ্বাসঘাতকতা জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতার চেয়েও জঘন্য। তাঁর হস্তলিপির সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎবাণীকে সফল করার জন্যে যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর তলব আসেত পারে। সেই কাজ যতক্ষণ না সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তাঁদের জীবনে কী সুখ আসতে পারে? সুতরাং যেমন করেই হোক এ-বিয়ে বন্ধ করতেই হবে। সেদিক থেকে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা নেই, যদিও মেয়েটিকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন এবং মেয়েটির সামান্য স্পর্শ তাঁর শরীরে আনন্দ আর উত্তেজনার ঢল বইয়ে দিত তবু তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে আগে হত্যা না করে কিছুতেই তিনি তাঁকে বিয়ে করতে পারেন না। একবার সেই কাজটা সুসম্পন্ন হলেই তিনি গির্জায় গিয়ে সাইবিলকে বিয়ে করতে পারবেন। তখন আর তাঁকে কর্তব্যকর্ম শেষ না করার অপরাধে জর্জরিত হতে হবে না। একবার সেই কাজটা শেষ হলেই তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরতে পারবেন। তার জন্যে সাইবিলকে কোনো দিন লজ্জায় মাথা নীচু করে হবে না। তাই হত্যাটাই তাঁকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। যতটা তাড়াতাড় করা যায় ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল।

তাঁর অবস্থায় অনেকেই কর্তব্যের খাড়াই পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা না করে দ্বিধা বা অপেক্ষা করত। কিন্তু আর্থারের চরিত্র সে-ধাতুতে গড়া ছিল না। নীতিটা ছিল তাঁর সকলের ওপরে। বিশ্বের যা কিছু সৎ আর উন্নত সাইবিল তাঁর কাছে ছিলেন সেইরকম। যে কাজটা করার জন্যে ভাগ্য তাঁকে নিযুক্ত করেছিল সেই কাজটার কথা চিন্তা করতেই তাঁর মনট বিতৃষ্ণায় কেমন যেন

সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্যে। তাঁর হৃদয় তাঁকে বলল—এটা কোনো অপরাধ নয়, আত্মদান। তাঁর মস্তিষ্ক তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল যে এ ছাড়া অন্য কোন পথ তাঁর কাছে খোলা নেই, তাঁর কাছে একটি পথই খোলা ছিল—হয় তাঁকে নিজের জন্যে বাঁচতে হবে; আর না হয়, বাঁচতে হবে পরের জন্য। এবং যদিও কাজটি তাঁর কাছে নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর তবু তিনি প্রেমের অসম্মান করে স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিলেন না। আজ হোক আর কাল হোক, এ-জাতীয় সমস্যায় আমাদের সবাইকে একদিন না একদিন পড়তে হয়; তবে আর্থারের জীবনে সেই সমস্যাটা করার সময় পায়নি। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি অলস স্বপ্নালু ছিলেন না; থাকলে, হ্যামলেটের মতোই তিনি আরব্ধ কর্ম সম্পাদন করার জন্যে দ্বিধা বা সংশয় প্রকাশ করতেন। যা অনেকেরই থাকে না—তাঁর সেইটি ছিল। সেটি হচ্ছে 'কমনসেনস'।

গত রাত্রিতে উন্মত্তের মতো ভ্রমণের কথা বিরক্তই হলেন। যে কাজ তাঁকে করতেই হবে তা নিয়ে এতটা দুর্ভাবনার কারণ কী রয়েছে? কারণ, তিনি জানতেন হত্যার জন্যে চাই একটি মানুষ আর একজন পাদরি। কিন্তু জিনিয়াস না হওয়ার ফলে তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। তবু একটি দেবাদিষ্ট মহান কর্তব্য তাঁর সামনে থাকার পরে নিজেকে অজাশত্রু ভেবে তিনি কোনোরকম আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন না। সেইজন্যে একটা কাগজের ওপরে বন্ধু আর আত্মীয়-ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত একটা নামই তিনি সাব্যস্ত করলেন। তাঁর নাম হচ্ছে লেডি ক্লিমেনটিনা বিক্যাম্প। বৃদ্ধাটিকে কার্জন স্ট্রিটে। সম্বন্ধটা ছিল তাঁর মায়ের দিক থেকে। সবাই তাঁকে লেডি ক্লেম বলে ডাকত। আর্থার নিজেও তাঁকে বেশ ভালোবাসতেন। তাছাড়া, লর্ড বাগরির সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার ফলে তাঁকে হত্যা করে আর্থারের যে কিছু আর্থিক সুবিধে হত তা নয়। সত্যি কথা বলতে কি বিষয়টা নিয়ে যতই ভাবতে লাগলেন ততই তাঁর মনে হল হত্যা করার পক্ষে লেডি ক্লেমই একমাত্র মানুষ। দেরি করলে পাছে সাইবিলের ওপরে অবিচার করা হয় এই আশংকায় তিনি অনতিবিলম্বে সমস্ত পরিকল্পনা পাকা করে ফেললেন।

তার আগেও একটা কাজ ছিল তাঁর। সেটি হচ্ছে গণৎকারকে তাঁর কথামতো টাকা পাঠানো। মিঃ সেপটিমাস পডগারস-এর নামে ১০৫ পাউন্ডের একটা চেক লিখে সেটিকে তিনি একটা খামে মুড়লেন; তারপরে ওয়েস্ট মুন স্ট্রিটে চাকরের হাত দিয়ে সেটি পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে গাড়ি ঠিক করার জন্যে আস্তাবলে টেলিফোন করে তিনি পোশাক পরার জন্যে উঠে গেলেন। যাওয়ার সময় সাইবিলের ফটোর দিকে তাকিয়ে শপথ নিলেন যে তাঁর কপালে যাই থাকুক তিনি যে তাঁর জন্যে কী করছেন সেকথা তাঁকে তিনি কোনোদিনই জানতে দেবেন না; সমস্ত জিনিসটাকেই আত্মদান হিসেবে তিনি নিজের হৃদয়ের মণি-কোঠায় লুকিয়ে রাখবেন।

বাকিংহাম যাওয়ার পথে ফুলের দোকান থেকে এক ঝুড়ি নারসিসি ফুল কিনে তিনি সাইবিলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন; তারপরে হাজির হয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। চাকরকে বললেন বিষবিজ্ঞানের ওপরে একটা বই আনতে। তিনি স্থির করে ফেললেন এই কষ্টকর আর কঠিন কাজে বিষ প্রয়োগই প্রশস্ত উপায়। পলপ্রয়োগে হত্যা করাটা তাঁর কাছে কেমন যেন ঘৃণ্য বলে মনে হল। তাছাড়া জনসাধারণ জানতে পারে এমনভাবে কোনো কাজই তিনি করতে রাজি হলেন না। হত্যাকারীদের নামের তালিকার পাশে নোংরা খবরের কাগজে তাঁর নামটাও ছাপা হবে এটা ভাবতেও তাঁর মনটা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তাছাড়া, সাইবিলের বাবা-মাও হচ্ছেন সেই পুরনো আমলের। তাঁর নামে যদি হত্যাকারীর কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে তাহলে হয়তো এই বিয়েতে তাঁরাও আপত্তি করে বসবেন। যদিও একথা সত্যি যে কেন তিনি এই হত্যা করেছেন তার ইতিহাস আনুপূর্বিক জানলে সবাই তাঁকে প্রশংসাই করবে। সব দিক ভেবে সেই জন্যে বিষকেই তিনি নির্বাচন করলেন। এইটাই সবচেয়ে নিরাপদ, শান্ত আর নিশ্চিত উপায়। মরার সময় মানুষ যেরকম যন্ত্রণা আ

বেদনাদায়ক ক্রিয়াকলাপ দেখায়, এই বিষক্রিয়ায় মরণোন্মুখ মানুষের দেহে সে রকম কোনো বিকার দেখা যায় না। অধিকাংশ ইংরেজদের মতো এই দৃশ্য দেখতে তিনিও চান না।

কিন্তু বিষবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর কোনো জ্ঞানই ছিল না। যে চাকরটিকে তিনি বিষের বই আনতে বলেছিলেন তার জ্ঞানও ছিল সেই রকমই অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং তাঁকেই ঘুরে ঘুরে দেখতে হল। দু'চারটে বই-ও তিনি ওলটালেন; কিন্তু সেগুলি এমন ভাবে আর ভাষায় লেখা যে তাদের কোনো অর্থই তিনি উদ্ধার করতে পারলেন না। তাঁর দুঃখ হল যে অক্সফোর্ডে পড়ার সময় ক্লাসিকগুলি তিনি মন দিয়ে পড়েননি। ঘাঁটতে-ঘাঁটতে হঠাৎ তিনি একটি বই পেয়ে গেলেন। বইটি আর্কস্কিন সাহেবের লেখা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে তিনি হঠাৎ একটি ওষুধের নাম দেখতে পেলেন—ওষুধটির নাম হচ্ছে অ্যাকোনিটিন—তার গুণাবলী পরিষ্কার ঝরঝরে ইংরিজিতে লেখা। পড়তে লাগলেন তিনি। এই বিষটির ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত, বলা যায় একেবারে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। এই বিষে কোনো যন্ত্রণা নেই। জিলেটিনের সঙ্গে খেলে স্যার ম্যাথুর মতে খুব একটা খারাপ নয়। জামার হাতায় নামটা আর কতটা পরিমাণ খেলে মানুষ মরতো পারে সেইটা লিখে নিয়ে তিনি জেমস স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে বেশ একটা বড়ো ওষুধের দোকান ছিল। তার নাম হচ্ছে পেসল অ্যান্ড হামবী। ধনী অভিজাত খদ্দেরদের মিঃ পেসল নিজেই অভ্যর্থনা করতেন। লর্ড আর্থারের কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে বললেন ওই ওষুধ তিনি কী জন্যে চাইছেন, আর তার জন্যে চাই ডাক্তারের সার্টিফিকেট। আর্থার বললেন তাঁর বিরাট সে তাঁর কোচোয়ানকে কামড়ে দিয়েছে। তাকে মারার জন্যেই তাঁর ওই বিষ দরকার। কথাটা শুনে ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে ওষুধটা দিয়ে দিলেন।

লর্ড আর্থার ক্যাপসুলটিকে একটা ছোট্ট রুপোর কৌটোতে ঢুকিয়ে 'পেসল আর হামবী' কোম্পানির বিশ্রী কৌটোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; তারপরে, লেডি ক্লেমেনটিনার বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধা মহিলাটির ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠলেন: দুষ্টু ছেলে কোথাকার! এতদিন আমাকে দেখতে আসনি কেন?

লর্ড আর্থার হেসে বললেন—প্রিয় লেডি ক্লেম; এতটুকু সময় পাইনি।

অর্থাৎ, সারা দিনই বুঝি তুমি সাইবিল মার্টনের সঙ্গে কেনাকাটা করার জন্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর রাতদিন আবোল-তাবোল বকছো? বিয়ে নিয়ে মানুষ এত হইচই করে কেন তা বাপু আমার মাথায় ঢোকে না। আমাদের দিনে প্রকাশ্যে বা ঘরের ভেতরে এই রকম প্রেমালাপ করার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।

লেডি ক্লেম, আপনি নিশ্চিন্ত হন, গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সাইবিলের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমার বিশ্বাস সে এখন দর্জিদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

তাই বুঝি আমার মতো কুৎসিত বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা করবার সময় হল তোমার? পুরুষ মানুষেরা কেন যে সময় থেকে সাবধান হয় না তাই আমি অবাক হয়ে ভাবি। এই আমার কথাই ধর। আমার জন্যে পুরুষরা কত বোকামিই না করেছিল। কিন্তু আজ সেই আমি বেতো রোগীতে পরিণত হয়েছি; আমার দাঁত সব বাঁধানো; মেজাজটা তিরিক্ষি; প্রিয় লেডি জ্যানসেন যদি আমার রদ্দি ফরাসি উপন্যাস না পাঠাতেন তাহলে আমার দিন যে কী করে কাটত তা এক ঈশ্বরই জানেন। এক ফি নেওয়া ছাড়া ডাক্তাররা কোনো কাজের নয়। আমার

হৃদয়ের জ্বালাটাও তারা সারাতে পারে না।

লর্ড আর্থর বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন—সেই অসুখ সারানোর জন্যে আমি একটা ওষুধ নিয়ে এসেছি। ওষুধটা খুব ভালো। অ্যামেরিকাতেই এটা বেরিয়েছে।

অ্যামেরিকার ওষুধ ভালো নয় আর্থার। না, না—মোটেই ভালো নয়। সম্প্রতি আমি কয়েকটা অ্যামেরিকান নভেল পড়লাম—যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই।

কিন্তু এ ওষুধটা যাচ্ছেতাই নয়, লেডি ক্লেম—আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলছি এটা একেবারে ধন্বন্তরি। আপনাকে আজকেই পরীক্ষা করতে হবে—প্রতিজ্ঞা করুন।

এই বলে পকেট থেকে ছোটো বাক্সটা বার করে আর্থার তাঁর হাতে দিলেন।

বাঃ, বাক্সটি তো বড়ো চমৎকার, আর্থার! সত্যি কি এটা উপহার? বাঃ—বাঃ! এইটি বুঝি সেই অদ্ভুত ওষুধ? আরে, দেখতে যে চিনির মেঠাই-এর মতো! আমি এখনই খাব।

তাঁর হাতটা ধরে লর্ড আর্থার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন প্রায়—হা ঈশ্বর! না-না; লেডি ক্লেম—ও কাজটা মোটেই করবেন না। এটা হচ্ছে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ। বুকে যন্ত্রণা শুরু না হলে এই ওষুধটা যদি খান তাহলে আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বুকে যন্ত্রণা হলে তবেই এটা খাবেন। এর আশ্চর্য ফল দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

সেই স্বচ্ছ ক্যাপসুলটি লেডি ক্লেম আলোর দিকে তুলে ধরে দেখলেন।

ক্যাপসুলের ভেতরে জলীয় অ্যাকোনিটিন টল-টল করছিল। তাই দেখে তিনি বললেন—এখনই আমার খেতে ইচ্ছে করছে। এটি যে সুস্বাদু সে দিক থেকে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আসল কথাটা কী জান? ডাক্তারদের আমি ঘৃণা করি; কিন্তু ওষুধ আমি বড়ো ভালোবাসি। যাই হোক, বুকে যন্ত্রণা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

লর্ড আর্থার আগ্রহভরেই জিজ্ঞাসা করলেন—কবে নাগাদ হতে পারে মনে হচ্ছে? তাড়াতাড়ি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে?

আশা করি, এক সপ্তাহের আগে নয়। গতকাল সকালেই ওটাকে নিয়ে বেশ ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলাম। কিন্তু কখন যে দেখা দেবে কেউ তা জানে না।

লেডি ক্লেম, তাহলে এ মাসের শেষ নাগাদ নিশ্চয় একবার আসব—না, কী বলেন?

আমারও সেইরকমই ভয় হচ্ছে যেন। সত্যিই আর্থার, আজ তোমাকে বড়ো সহানুভূতিশীল দেখাচ্ছে! সাইবিল সত্যিই তোমার বড়ো উপকার করেছে। এখন আমাকে উঠতে হচ্ছে বাপু। যাদের সঙ্গে আমার আজ ডিনার খাওয়ার কথা তারা বড়ো অরসিক। অপরের কলঙ্ক নিয়ে তারা আলোচনা করে না। আমি জানি এখন যদি একটু না ঘুমিয়ে নিই তাহলে ডিনারের সময় জেগে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। এখন এস আর্থার। সাইবিলকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো। অ্যামেরিকান এই ওষুধটির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

চলে আসার জন্যে দাঁড়িয়ে লর্ড আর্থার বললেন—তাহলে এটা খেতে ভুলবেন না, কেমন?

না, না,—নিশ্চয় না। আমার কথা যে তোমার মনে রয়েছে তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। এই

ওষুধ আরো দরকার হলে তোমাকে আমি লিখে জানাব।

খুব আশ্বস্ত হয়ে বেশ খুশ মেজাজে লর্ড আর্থার বেরিয়ে এলেন।

সেই রাত্রিতেই সাইবিলের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি তাঁকে জানালেন এমন একটি ভয়ঙ্কর জটিলতার মধ্যে তিনি জড়িয়ে যা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসাটা তাঁর যে কেবল সম্মানের দিক থেকেই হানিকর হবে, তা-ই নয়, কর্তব্যের দিক থেকেও ত্রুটি রয়ে যাবে। সেই জন্যে যত দিন না এই সমস্যার একটা সমাধান তিনি করতে পারছেন ততদিন বিয়েটা তিনি পিছিয়ে দিচ্ছেন। এই বিয়ের ব্যাপারে সাইবিলের মনে যাতে কোনো সন্দেহ না জন্মায় সেই জন্যে তিনি তাঁকে অনেক বোঝালেন। সবই ঠিক হয়ে যাবে, তবে দরকার একটু ধৈর্যের।

সাইবিলও খুব খুশি হল। একবার আর্থারের মনে হল কাপুরুষের মতো লেডি ক্লেমকে সেই ওষুধ খাওয়ার কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েই তিনি বিয়ের ব্যাপারে এগিয়ে যাবেন, একবার তিনি পডগারস-এর কথা মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলেন; কিন্তু বিবেক আর কর্তব্য শীঘ্রই তাঁর ফিরে এল এবং কাঁদতে-কাঁদতে সাইবিল তাঁর বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেও, স্বীয় প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হলেন না তিনি। কয়েকটি মাসের আনন্দের জন্যে অমন সুন্দর একটি জীবনকে ধ্বংস করাটা অন্যায় হবে বলেই মনে হল তাঁর।

তিনি অনেক সান্ত্বনা দিলেন সাইবিলকে। সাইবিল-ও তাঁকে কম সান্ত্বনা দিল না। এইভাবে মাঝরাতে পর্যন্ত কাটিয়ে ভোরের দিকে তিনি ভেনিস যাত্রা করলেন। বিয়েটা স্থগিত রাখা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় সে-সম্বন্ধে একটা পুরুষোচিত চিঠি লিখে তিনি মিঃ মার্টনকে পাঠিয়ে দিলেন।

৪

তাঁর ভাই, লর্ড সার্বিটোন তাঁর ছোটো জাহাজে করে কর্ফু থেকে তখন ভেনিসে এসে পৌচেছেন। সেইখানেই তিনি উঠলেন। দুটি যুবক দিন পনেরো সেখানে বেশ আনন্দের সঙ্গেই কাটালেন। তবু লর্ড আর্থার কেমন যেন আনন্দ পাচ্ছিলেন না। প্রতিদিনই টাইমস পত্রিকার শোকবার্তা জ্ঞাপক অংশটি তিনি পড়তে লাগলেন। প্রতিদিনই তিনি আশা করেছিলেন ওইখানে লেডি ক্লেমেন্টিনার মৃত্যুর সংবাদ পাবেন। কিন্তু প্রতিদিনই হতাশ হচ্ছিলেন। তাঁর ভয় হল হয়তো তাঁর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। যখন তিনি সেই ওষুধটা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন তখন যে তিনি তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন একথা ভেবেই তাঁর বেশ অনুশোচনা হচ্ছিল।

দিন পনেরো কাটানোর পরেই লর্ড সার্বিটোনের ভেনিস আর ভালো লাগল না। তিনি ঠিক করলেন র‍্যাভেলার উপকূল তিনি বন-মুরগি শিকার করে বেড়াবেন। লর্ড আর্থার প্রথমে তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। মাসের পনেরো তারিখে যাত্রা করলেন তাঁরা। কয়েক দিন বেশ আনন্দেই কাটালেন কিন্তু হঠাৎ বাইশ তারিখে লেডি ক্লেমেন্টিনার কথা ভেবে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। ভাই-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ভেনিসে ট্রেনে চেপে ফিরে এলেন।

হোটেলে ঢুকতেই হোটেলের মালিক একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে এগিয়ে এল। লর্ড আর্থার টেলিগ্রামটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেখলেন তাঁর পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। সতেরোই রাত্রিতে লেডি ক্লেমেন্টিনা হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

প্রথমেই যাঁর কথা তাঁর মনে হল তিনি হচ্ছেন সাইবিল। তিনি তাঁকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলেন যে এখনই তিনি লন্ডনে ফিরে আসছেন। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছানোর জন্যে নির্দেশ দিলেন চাকরকে। তারপরে হোটেলে ফিরে এসেই দেখলেন তিনটি চিঠি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। একটি এসেছে সাইবিলের কাছ থেকে। চিঠিটিতে রয়েছে সহানুভূতি আর শোক প্রকাশ। দ্বিতীয়টি এসেছে মায়ের কাছ থেকে। তৃতীয়টি এসেচে লেডি ক্লেমেন্টিনার সলিসিটরের কাছ থেকে। চিঠিটি পড়ে বোঝা গেল ভদ্রমহিলা সেদিন ডাচেসের সঙ্গে ডিনার খেয়েছেন। তাঁকে সেদিন বেশ প্রফুল্লই দেখা যায়; কিন্তু বুকে ব্যথা লাগছে এই বলে একটু তাড়াতাড়িই তিনি বাড়ি ফিরে যান। পরের দিন সকালে বিছানার ওপরে মৃত অবস্থায় তাঁকে দেখা যায়। মনে হচ্ছে মৃত্যুর সময় কোনো যন্ত্রণাই তিনি ভোগ করেননি। স্যার ম্যাথু রিডকে তখনই ডেকে পাঠানো হয়। তবে তখন আর করার কিছু ছিল না। বাইশ তারিখে বিক্যাম্প ক্যালকোটিতে তাঁকে কবরস্থ করা হবে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি একটি উইল করেছেন। সেই উইলে তিনি আর্থারকে তাঁর কার্জন স্ট্রিটের বাড়ি—আসবাবপত্র, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, ছবি—সবই দিয়ে গিয়েছেন। কেবল ছোটো ছোটো কতগুলি ছবি দিয়েছেন তাঁর বোনকে; আর পদ্মরাগমণির হারটা দিয়ে গিয়েছেন সাইবিলকে। সম্পত্তির মূল্য এমন কিছু বেশি ছিল না। তবে সম্ভব হলে লর্ড আর্থার যাতে অনতিবিলম্বে ফিরে আসেন সেই জন্যে সলিসিটর মিঃ স্যালফিলড বিশেষ উদ্বিগ্ন রয়েছেন। কারণ অনেকগুলি পাওনাদারদের টাকা মেটাতে হবে; আর লেডি ক্লেমেন্টিনা কোনোদিনই বিশেষ হিসাবপত্র রাখতেন না।

লেডি ক্লেমেন্টিনা যে তাঁকে মনে রেখেছেন এই কথা ভেবে তিনি বেশ অভিভূত হয়েই পড়লেন। তাঁর মনে হল এই মৃত্যুর জন্যে মিঃ পডগারসকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কিন্তু সাইবিলের ওপরে ভালোবাসা তাঁর অন্য সব অনুভূতিগুলিকে ছাপিয়ে গেল এবং তিনি যে তাঁর কর্তব্য করেছেন এই ভেবে তিনি একটা শান্তি আর আত্মপ্রসাদত লাভ করলেন। তিনি

যখন চারিংক্রশে হাজির হলেন তখন তাঁকে বেশ খুশি-খুশি দেখা গেল।

মার্টনরা তাঁকে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানালেন। সাইবিল তাঁকে প্রতিজ্ঞা করালেন যে তার কিছুই তাঁদের বিয়েতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। সাতই জুন বিয়ের দিন ঠিক হল। হঠাৎ তাঁর মনে হল জীবনটা বড়ো সুন্দর, বড়ো উজ্জ্বল। পুরনো আনন্দ আবার ফিরে এল তাঁর জীবনে।

এরই মধ্যে একদিন সলিসিটর আর সাইবিলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কার্জন স্ট্রিটের বাড়িতে হাজির হলেন। তারপরে সেখানে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলেন। ঠিক এমনি সময় সাইবিল আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন।

মুখ তুলে হেসে লর্ড আর্থার জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কী সাইবিল!

সাইবিল বলল—আর্থার, এই ছোটো চকোলেটের বাক্সটা কী সুন্দর দেখ। এটা আমাকে দাও। আমি জানি আশি বছর বয়স হওয়ার আগে পদ্মরাগমণি আমাকে মানাবে না।

এটা সেই বাক্স যার ভেতরে অ্যাকোনিটিন ছিল।

চমকে উঠলেন লর্ড আর্থার। গালের ওপরে লজ্জার সামান্য একটা আভাও দেখা গেল। এসব কথা তিনি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন, আর যার জন্যে তিনি সেই ভয়ঙ্কর অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছিলেন—এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে—সেই সাইবিল-ই সেই কথাটা তাঁকে প্রথণ স্মরণ করিয়ে দিল।

বেশ তো, নাও না। লেডি ক্লেমকে আমিই এটা দিয়েছিলাম।

ধন্যবাদ আর্থার। চিনির মেঠাইটাও নিই? লেডি ক্লেম যে মিষ্টি এত ভালোবাসতেন তা আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল তিনি একটু বেশি মাত্রায় বুদ্ধিজীবিনী ছিলেন।

হঠাৎ কেমন ভয়ঙ্কর রকমের বিবর্ণ হয়ে গেলেন লর্ড আর্থার; কী বললে—চিনির মেঠাই?

হ্যাঁ, এর ভেতরে একটা রয়েছে দেখছি। বেশ পুরনো বলেই মনে হচ্ছে। এটা খাবার এতটুকু ইচ্ছেও অবশ্য আমার নেই। তোমার কী হল, আর্থার? অত ফ্যাকাশে হয়ে গেলে কেন?

দৌড়ে গিয়ে লর্ড আর্থার বাক্সটা তুলে নিলেন। তার ভেতরে বিষভরা সেই ক্যাপসুল। সেটাকে তিনি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে হতাশভাবে চিৎকার করে সোফার ওপরে বসে পড়লেন।

৫

বিয়েটা দ্বিতীয়বার স্থগিত হওয়ার ফলে মিঃ মার্টন খুবই দুঃখিত হলেন। লেডি জুলিয়া মেয়ের বিয়েকে উপলক্ষ করে নিজের জন্যে পোশাক তৈরি করতে দিয়েছিলেন। বিয়েটা সাময়িকভাবে বন্ধ হল দেখে এ-বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্যে মেয়েরে তিনি অনেক বোঝালেন। সাইবিল মাকে ভালোবাসতেন সত্যি কথা; কিন্তু আর্থারের কাছেই তিনি তাঁর জীবন-যৌবন সমর্পণ করেছিলেন। সুতরাং মায়ের প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন না। আর লর্ড আর্থার! দিন কয়েক এই অভাবনীয় কাণ্ডে তাঁর স্নায়ুগুলি একেবারে বিকল হয়ে গেল। তারপরেই কিন্তু তাঁর অদ্ভুত কমনসেনস অথবা বাস্তব জ্ঞানটি ফিরে এল। এবং কী করতে হবে সেদিক থেকে কোনোরকম সন্দেহ রইল না তাঁর, বিষ ব্যর্থ হওয়ায় এখন তাঁকে ডিনামাইট অথবা অন্য কোনো বিস্ফোরক বস্তুর সাহায্য নিতে হবে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তিনি আবার তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আর পরিচিত-পরিচিতাদের তালিকা নিয়ে বসলেন। অনেক চিন্তা-গবেষণার পরে ঠিক করলেন যে তাঁর কাকা চিচেস্টারের ডিনকেই তিনি উড়িয়ে দেবেন। এই ডিনটি ছিলেন সত্যিকারের পণ্ডিত আর সংস্কৃতিবান পুরুষ। ঘড়ি জিনিসটাকে বড়ো ভালোবাসতেন তিনি। ঘড়ি সংগ্রহ করার একটা শখ ছিল তাঁর। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কত রকমেরই না টাইম-পিস তাঁর ছিল! আর্থার ভাবলেন ওই শখই বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করার অভূতপূর্ব সুযোগ তাঁকে এনে দিয়েছে। কিন্তু বিপদ হল এই জাতীয় বিস্ফোরক কোথায় পাওয়া যায় তা তিনি জানেন না। একবার ভাবলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু সে বাসনা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হল; কারণ তিনি জানতেন যে বিস্ফোরণ ঘটার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বিস্ফোরক দ্রব্যের গতিবিধি সম্বন্ধে তারা কিছুই জানতে পারে না; ঘটার পরেও যা জানতে পারে তাও এমন কিছু নয়।

হঠাৎ বন্ধু রুবালোফের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন এই যবুকটির সঙ্গে লেডি উইনডারমিয়ারের বাড়িতে শীতকালে তাঁর আলাপ হয়েছিল। গুজব, কাউন্ট রুবালোফ সম্প্রতি ছুতোর মিস্ত্রি হিসাবে বাস করছিলেন সেই সময়কার কাগজপত্র পরীক্ষা জন্যেই তিনি নাকি এখানে রয়েছেন, কিন্তু অনেকেরই বিশ্বাস রুবালোফ নিহিলিস্টদের একটি এজেন্ট। রাশিয়ার রাস্ট্রদূতাবাস যে তাঁর লন্ডনে অবস্থিতিটাকে ভালো চোখে দেখবে না এবিষয়ে আর সন্দেহ কী! লর্ড আর্থার-এর মনে হল এবিষয়ে রুবালোফ-ই তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন; এই ভেবে তিনি একদিন সকালে তাঁর বাসা ব্লুমসবারিতে হাজির হলেন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে।

লর্ড আর্থার তাঁর সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা বিবৃত করলেন। তাই শুনে কাউন্ট রুবালোফ বললেন—'তাহলে আপনি রাজনীতিতেই নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন?' কিন্তু হাঁকডাক করে কোনো কিছু করার পক্ষপাতী। লর্ড আর্থার কোনোদিনই ছিলেন না। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে সামাজিক কোনো প্রশ্ন নিয়ে সম্প্রতি তিনি বিব্রত নন। তিনি বিস্ফোরক দ্রব্য চান নিছক সাংসারিক একটি সমস্যার সমাধান করতে; আর এই সমস্যা সমাধানে উপকার একমাত্র তাঁর নিজেরেই হবে; আর কারও নয়।

কয়েকটি মুহূর্ত কাউন্ট রুবালোফ তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন; কিন্তু তাঁকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে ছোটো একটা কাগজে ঠিকানা লিখে তলায় সই করলেন, তারপরে, টেবিলের এক পাশ থেকে সেটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন; বললেন—প্রিয় বন্ধু, এই ঠিকানাটা জোগাড়

করার জন্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অনেক অর্থ খরচ করবে।

লর্ড আর্থার হেসে বললেন—এ-ঠিকানা কিছুতেই তারা পাবে না।

এই বলে পরম হৃদ্যতার সঙ্গে যুবক রাশিয়ানটির করমর্দন করে তিনি প্রায় দৌড়ে নীচে নেমে এলেন; তারপরে কাগজটি পরীক্ষা করে কোচোয়ানকে সোহো স্কোয়ারের দিকে গাড়ি চালাতে বললেন।

সোহো স্কোয়ারের এসে কোচোয়ানকে বিদায় দিয়ে গ্রীক স্ট্রিটের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি একটি জায়গায় এসে হাজির হলেন। জায়গাটির নাম বেইলির কোর্ট। এইখানে একটা খিলানের ভেতর দিয়ে যেখানে তিনি এসে পৌঁছলেন সেখানে একটা ফ্রেঞ্চ লনড্রি ছিল। এই লনড্রির পাশ ধরে ঘরের পর ঘরের উঠোনে অসংখ্য পোশাক তারের ওপরে ঝোলানো ছিল। দেখলেই মনে হবে ওটা একটা ধোপাদের পাড়া। তিনি সোজা হেঁটে গিয়ে ওই লাইনের একেবারে শেষ প্রান্তে উপস্থিত হলেন; তারপরে ছোটো সবুজ রঙের একটা ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। টোকা দেওয়ার পরেই আশপাশের জানালা থেকে কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তারও কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল, একটি রুক্ষ চেহারার বিদেশি বিকৃত ইংরেজ ভাষায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—'কাকে চাই?' লর্ড আর্থার কাউন্ট রুবালোফের চিরকুটটা তার হাতে দিলেন। চিরকুটটার ওপরে চোখ বুলিয়েই লোকটি তার মাথাটা নীচু করে তাঁকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। একতলার একটি বিশ্রী ঘরে আর্থার গিয়ে বসলেন। অনতিবিলম্বে হার উইনকেলকফ নামে, ওই নামে লন্ডনে তিনি পরিচিত, একটি লোক ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর ঘাড়টা মদে ভেজা একটা রুমাল দিয়ে জড়ানো; বাঁ হাতে একটা ফ্রক।

লর্ড আর্থার তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—কাউন্ট রুবালোফ আপনাকে দেওয়ার জন্যে আমাকে একটি পরিচয়পত্র দিয়েছেন। বিশেষ একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে আমি এখানে এসেছি। আমার নাম স্মিথ—রবার্ট স্মিথ। একটা বিস্ফোরক ঘড়ি জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি।

সেই ভদ্রবেশী জার্মানটি হেসে বললেন—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুশি হয়েছি। অত ভয় পাবেন না। সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাই আমার কর্তব্য। একদিন সন্ধ্যায় লেডি উইনডারমিয়ারের বাড়িতে আপনাকে আমি দেখেছি। আশা করি, হার লেডিশিপ বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। আমার সঙ্গে একটু ব্রেকফাস্ট খাবেন কি? আমাদের খাবার বড়ো চমৎকার; আর আমার বন্ধুরা দয়া করে বলেন, আমার এখানে যে উৎকৃষ্ট ধরনের রাইন মদ পাওয়া যায় সেরকম বস্তু জার্মান এমব্যাসিতেও দুষ্প্রাপ্য।

ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝতে পারার আগেই আর্থারকে নিয়ে তিনি পেছনের ঘরে বসালেন।

তারপরেই উৎকৃষ্ট খাবার আর বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনাতে আর্থার জমে গেলেন।

হার উইনকেলকফ বললেন—আজকাল রপ্তানির দিক থেকে বিস্ফোরক ঘড়িগুলি বিশেষ কাজের নয়। কাস্টমস-এর হাত থেকে কোনোরকমে ছাড়ান যদি বা পেল তো পড়ল ট্রেনের খপ্পরে। ট্রেন সারভিস আজকাল এমনি অখদ্যে হয়ে উঠেছে যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার আগেই ওগুলি ফেটে যায়। যদি অবশ্য বাড়িতে ব্যবহার করার জন্যে ওরকম কোনো ঘড়ির দরকার আপনার হয় তাহলে আপনাকে আমি একটা সুন্দর জিনিস দিতে পারি এবং আমি নিশ্চিত যে তার ফল পেয়ে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। কার জন্যে এ-জিনিসটা আপনার দরকার তা কি আমি জানতে পারি? যদি পুলিশ অথবা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত কার-ও জন্যে দরকার হয় তাহলে আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এবিষয়ে আপনাকে আমি কোনোরকম সাহায্য করতে পারব না। ইংরাজ গোয়েন্দারাই আমাদের সত্যিকারের বড়ো বন্ধু। আমি সব সময়ে লক্ষ করেছি তাদের মূর্খতার ওপরে আস্থা রেখে আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। তাদের বিনাশ করার জন্যে আপনাকে আমি কোনো সাহায্য করতে পারব না।

লর্ড আর্থার বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত হোন—এর সঙ্গে পুলিশের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যি কথা বলতে কি চিচেস্টারের ডিন-এর জন্যেই ঘড়িটা আমার দরকার।

তাই বুঝি! ধর্মের প্রতি আপনার এত আনুগত্য রয়েছে তা তো আমি জানতাম না! আজকাল যুব সম্প্রদায়ের ভেতরে এ-জিনিসটা সাধারণত দেখা যায় না।

একটু লজ্জা পেয়ে লর্ড আর্থার বললেন—আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন, হার উইনকেলকফ। সত্যি কথা বলতে কি, ধর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই কম।

এটা তাহলে একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার?

একেবারে।

হার উইনকেলকফ তাঁর কাঁধটিকে কুঁচকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন; তারপরে ফিরে এলেন ছোটো পেনির মাপের একটা ডিনামাইট কেক আর সুন্দর একটা ফরাসি ঘড়ি নিয়ে।

বস্তু দুটি দেখেই লর্ড আর্থারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বেশ আনন্দের সঙ্গেই বললেন—এই রকম একটা জিনিসই আমার চাই। এখন বলুন কেমন করে এটা ফাটবে।

নিজের আবিষ্কারের দিকে গর্বের সঙ্গে তাকিয়ে হার উইনকেলকফ বললেন—ওইখানেই আমার রহস্য। কখন আপনি বিস্ফোরণ ঘটাতে চান বলুন। আমি জিনিসটাকে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক করে দেব।

ধরুন মঙ্গলবার, আজই যদি দিতে পারেন—

অসম্ভব। মস্কোতে বন্ধুদের জন্যে আমার হাতে কিছু জরুরি কাজ রয়েছে। কাল পাঠাতে পারি।

লর্ড আর্থার বিনীতভাবে বললেন—তাহলেই চলবে—কাল রাত্রি অথবা মঙ্গলবার সকালে পেলেও বিশেষ কোনো অসুবিধে হবে না। শুক্রবার দুপুরের দিকে এই বিস্ফোরণ ঘটানো চাই। ডিন শুক্রবার দুপুরে বাড়িতেই থাকেন।

শুক্রবার, দুপুর—হার উইনকেলকফ কাগজে সময়টা টুকে নিলেন।

উঠে পড়ে আর্থার জিজ্ঞাসা করলেন—কত দিতে হবে আমাকে?

লর্ড আর্থার, জিনিসটা এত সামান্য যে বেশি কিছু নিতে আমি চাই নে। ডিনামাইটের দাম সাড়ে সাত শিলিং; ঘড়িটার দাম সাড়ে তিন পাউন্ড আর গাড়িভাড়া হচ্ছে পাঁচ শিলিং। কাউন্ট রুবালোফের কোনো বন্ধুর উপকার করতে পারলেই আমি কৃতার্থ।

আপনার পারিশ্রমিক?

ও কিছু নয়, কিছু নয়। অর্থের জন্যে আমি কাজ করি নে; করি, দক্ষতার জন্যে।

দাম মিটিয়ে দিয়ে লর্ড আর্থার সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

পরের দুটি দিন বিরাট একটা উত্তেজনার ভেতর দিয়ে কেটে গেল তাঁর। শুক্রবার বেলা বারোটার সময় সংবাদ আহরণ করার জন্যে তিনি বাকিংহামে হাজির হলেন। সারাটা বিকাল ভাবলেশহীন 'হল-পোর্টার' সংবাদের পর সংবাদ ছড়িয়ে গেল। নানা অঞ্চলের ঘোড়-দৌড়-এর খবর, বিবাহ-বিচ্ছেদের খবরল, আবহাওয়ার খবর, হাউস-অফ-কমনসে সারা রাত ধরে যে সব তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, সেই সব বিরক্তিকর সংবাদ, ফাটকা বাজারে যে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে সেই সব টুকরো টুকরো কাহিনি। চারটে সময় নানান কাগজের সান্ধ্য সংস্করণগুলি একটার পর একটা আসতে লাগল। 'পল মল' এল, 'সেন্ট জেমস' এল, 'গ্লোব' এল, এল 'ইকো'। কোনো কাগজেই চিচেস্টারের কোনো সংবাদ নেই। লর্ড আর্থার ভাবলেন—প্রচেষ্টাটি নিশ্চয় তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। এটা তাঁর কাছে বিরাট একটি আঘাত হয়ে দেখা দিল। বেশ ঘাবড়িয়ে গেলেন তিনি। পরের দিন তিনি হার উইনকেলকফের সঙ্গে দেখা করলেন। বিস্ফোরণ ঘটেনি, সংবাদ পেয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিনা মূল্যে তাঁকে আর একটা ওই জাতীয় ঘড়ি দিতে চাইলেন; অথবা, কেনা দামে চাইলেন কয়েকটি নাইট্রো-গ্লিসিরিন বোমা বিক্রি করতে। কিন্তু বিস্ফোরক দ্রব্যের ওপরে আর তাঁর আস্থা নেই। হার উইনকেল অবশ্য বললেন এই ভেজালের যুগে ডিনামাইটের বারুদেও ভেজাল ঢুকেছে। এদিক থেকে তিনি নিরুপায়। জার্মান ভদ্রলোকটি অবশ্য মনে করেন যন্ত্রপাতি কিছুটা বিগড়ে গেলেও এক সময় না এক সময় ওটি ফাটবেই। এইরকম একটা আশা প্রকাশ করে তিনি একটি উদাহরণ দিলেন। একবার ওদেসার সামরিক গভর্নরের কাছে একটি ব্যারোমিটার পাঠানো হয়। কথা ছিল দশ দিনের মধ্যে সেটি ফাটবে। কিন্তু আগামী তিন মাসের মধ্যেও সেটি ফাটেনি। তারপরে যখন ফাটল তারই ছ'সপ্তাহ আগে গভর্নর শহরের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেই বিস্ফোরণ মারা গেল তাঁর একটি পরিচারিকা। বেচারার দেহটা একেবারে দলা পাকিয়ে গেল। এই থেকেই বোঝা যায় এই সব বিস্ফোরক দ্রব্যের সময়জ্ঞান না থাকলেও বড়োই শক্তিশালী। এই কাহিনি শুনে লর্ড আর্থার কিছুটা সান্ত্বনা যে পেলেন না তা নয়; কিন্তু দু'দিন পরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ডাচেস যখন তাঁকে একখানি চিঠি দেখালেন তখনই তিনি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন। চিঠিটা সেইমাত্র 'ডিনারি' থেকে তিনি পেয়েছিলেন।

ডাচেস বললেন—জেন বড়ো সুন্দর চিঠি লেখে। এটা তোমার শেষকালে পড়া উচিত। মুডি আমাকে যে সব উপন্যাস পাঠায় এটি তাদেরই মতো সুখপাঠ্য।

চিঠিটা মায়ের হাত থেকে নিয়ে লর্ড আর্থার পড়তে লাগলেন—

দি ডিনারি, চিচেস্টার,

২৭শে মে

প্রিয় কাকিমা,

ডোরকাস সোসাইটির জন্যে তুমি যে ফ্ল্যানেল পাঠিয়েছ তার জন্যে ধন্যবাদ; আর সেই সঙ্গে ডোরাকাটা সুতোর কাপড়ের জন্যে। আমি তোমার সঙ্গে একমত যে সুন্দর-সুন্দর পোশাক পরার ইচ্ছে হওয়াটা ওদের উচিত নয়। কিন্তু আজকাল সবাই এত র‍্যাডিকেল আর অধার্মিক হয়ে পড়েছে যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরাটা যে তাদের পক্ষে উচিত নয় সেকথা তাদের কিছুতেই বোঝানো যাবে না। কী দুর্দিনই যে আসছে তা আমি বুঝতে পারছি নে। ধর্মসভায় বাবা বারবারই বলেছেন আমরা অবিশ্বাসের যুগে বাস করছি।

গত বৃহস্পতিবার বাবার কোনো একজন অজ্ঞাত গুণমুগ্ধ ব্যক্তি বাবাকে একটি ঘড়ি পাঠিয়েছেন। ঘড়িটা পেয়ে আমাদের যে কী আনন্দ হয়েছিল তোমাক কী বলব! একটা কাঠের বাক্সের ভেতরে প্যাক করা ছিল ঘড়িটা। প্রেরক ঘড়িটা পাঠানোর খরচ নিজেই দিয়ে দিয়েছিলেন। 'যথেচ্ছাচারিতাই কি স্বাধীনতা'—এর ওপরে বাবা একটি ধর্মসভায় একবার একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। বাবার ধারণা ঘড়ি-প্রেরকটি বাবার সেই বাণী শুনেছিলেন। ঘড়ির ওপরে ছিল একটি মহিলার প্রতিকৃতি। তার মাথায় ছিল একটা টুপি। বাবা বলেন ওটি হচ্ছে স্বাধীনতার প্রতীক। জিনিসটা দেখতে আমার কাছে বেশ ভালো লাগেনি; কিন্তু বাবা বলেন—ওটা হচ্ছে ঐতিহাসিক। বাবার কথায় আমারও তাই মনে হয়েছিল। পার্কার বাক্সটাকে খুলল। বাবা লাইব্রেরির কুলুঙ্গিতে ঘড়িটা রেখে দিলেন। শুক্রবার দিন সকালে আমরা সবাই বসে রয়েছি। বারোটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে একটা ফুস-ফুস শব্দ হল; প্রতিমূর্তিটার পায়ের তলা থেকে কিছুটা ধোঁয়া বেরোল; আর স্বাধীনতার দেবী পড়ে গেল নীচে; পড়ে গিয়ে নাকটা ভাঙল তার। ম্যারিয়া তো ভয়ে অস্থির; কিন্তু ব্যাপার দেখে জেমস আর আমি তো হেসে কুটি-কুটি এমন কি বাবাও মুখ টিপে হেসে ফেললেন। পরীক্ষা করার পরে আমরা বুঝতে পারলাম আসলে ওটা একটা অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি। ও ভেতরে কিছু বারুদ আর ছোটো হাতুড়িটার নীচে একটা টুপি বসিয়ে যদি ঘড়ির কাঁটাটাকে ঠিক জায়গায় ঘুরিয়ে দাও তাহলে ঠিক সেই সময় সেটা ফেটে যাবে। ওই রকম শব্দ করে বলেই বাবা ওটাকে লাইব্রেরি ঘরে রাখতে চাইলেন না। তাই রেজি তাকে স্কুল ঘরে রেখে এল। সেখানেও কেবল ফুস-ফুস, ফর-ফর করে শব্দ করছে। তোমার কি মনে হয় বিয়ের উপহার হিসাবে ওই রকম একটা ঘড়ি দিলে আর্থার খুশি হবে! লন্ডনে আজকাল এই সব জিনিসের চলনই বেশি। বাবা বলেন এরাই মানুষের মঙ্গল করবে; কারণ এ থেকেই বোঝা যায় যে স্বাধীনতার পরমায়ু বেশি দিনের নয়; ও মরে যেতে বাধ্য। তা ছাড়া স্বাধীনতা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ফরাসি বিপ্লব থেকে। কী ভয়ঙ্কর!

জেন পারসি।

চিঠিটা পড়ে আর্থার এতই গম্ভীর আর থমথমে হয়ে গেলেন যে ডাচেস তো হেসেই খুন। প্রিয় আর্থার, আর কোনোদিনই কোনো যুবতীর চিঠি তোমাকে আমি পড়তে দেব না। কিন্তু ঘড়িটার সম্বন্ধে কী বলব বল তো? আমার নিজেরেই ওইরকম একটা ঘড়ি পেতে ইচ্ছে করছে।

একটা বিষণ্ন হাসি হেসে আর্থার বললেন—ওসব কিছু নয়। এই বলে মাকে চুমু খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ওপরে উঠেই একটা সোফার ওফরে তিনি ঢলে পড়লেন। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। এই

হত্যা করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করেছেন; কিন্তু দু-দুবারই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন; আর সেই ব্যর্থতার জন্যে তিনি নিজে এতটুকু দায়ী নন। কর্তব্য করার চেষ্টা তিনি করেছেন; কিন্তু মনে হচ্ছে ভাগ্য তাঁর সঙ্গে বারবার প্রতারণা করেছে। কী করবেন তিনি? এই বিয়ে ভেঙে দেবেন? সাইবিলের যে কষ্ট হবে সেটা ঠিক; কিন্তু তাতে তাঁর মতো উন্নত চরিত্রের অবনতি ঘটবে না এতটুকু। আর তাঁর কথা? তিনিও কষ্ট পাবেন সত্যি কথা। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? সব সময়েই তো যুদ্ধ হচ্ছে। তাতে মানুষ মারা যেতে পারে। এমন কোনো কারণ ঘটতে পারে যার জন্যে মানুষকে জীবন দান করতে হয়। জীবনে তাঁর কোনো আনন্দ নেই বলেই মৃত্যুতেও তাঁর কোনো ভয় নেই। ভাগ্যই তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করুক। তাকে সাহায্য করার জন্যে তিনি একটুও চেষ্টা করবন না।

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় পোশাক পরে তিনি ক্লাবে গেলেন। একদল যুবকের সঙ্গে সার্বিটান সেখানে বসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই তাঁর ডিনার খাওয়ার কথা ছিল। তাঁদের সেই হালকা আলোচনা তাঁর ভালো লাগল না। কফি আসার সঙ্গে-সঙ্গে একটা জরুরি কাজের অছিলায় তিনি ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার সময় ক্লাবের বেয়ারা তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠি এসেছিল হার উইনকেলকফের কাছ থেকে। তাঁর কাছে একটা বিস্ফোরক ছাতা রয়েছে। সেই ছাতা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। এটাই হচ্ছে সর্বশেষ আবিষ্কার—সম্প্রতি জেনেভা থেকে আমদানি হয়েছে। সেই ছাতাটা দেখার জন্যে আর্থারকে তিনি পরের দিন সকালে তাঁর বাসায় আসতে অনুরোধ করেছিলেন। চিঠিটাকে তিনি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। আর কোনো পরীক্ষা করবেন না বলে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারপরে টেমস নদীর বাঁধের ওপরে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে রইলেন নদীর ধারে। ছোটো-ছোটো মেঘের ভেতর দিয়ে চাঁদ উঁকি দিতে লাগল; বড়ো-বড়ো নৌকোগুলি নদীর তীব্র স্রোতের ওপরে পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরতে লাগল। পোলের ওপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে ট্রেন চলার সময় রেলের সঙ্কেত সবুজ থেকে লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ওয়েস্টমিনিস্টারের দীর্ঘ গম্বুজ থেকে রাত বারোটার ঘন্টা বাজল। সেই উচ্চনিনাদী শব্দের তালে-তালে রাত্রিটা কাঁপতে লাগল যেন। তারপরে রেল স্টেশনের আলো গেল নিবে। জ্বালা রইল বুবির মতো একটি মাত্র আলো। শহর ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসতে লাগল।

রাত্রি প্রায় দুটোর সময় তিনি উঠলেন। হাঁটতে লাগলেন ব্ল্যাকফ্রায়ার্স এর দিকে। কত অপার্থিব, কত স্বপ্নময়ই না সব দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে নদীর উলটো দিকে বাড়িগুলি সব অন্ধকার দিয়ে তৈরি হয়েছে। দেখলে মনে হবে রুপো আর ছায়া দিয়েই বিশ্বটা তৈরি হয়েছে। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাসের মধ্যে সেন্ট পলের উঁচু গম্বুজটাকে একটা বুদবুদের মতো মনে হল।

ক্লিয়োপেট্রার নিড্‌ল-এ এসে পৌঁছতেই তিনি দেখতে পেলেন একটা লোক কার্নিশের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। কাছাকাছি আসতেই লোকটি ওপর দিকে তাকাল। সেই সময় গ্যাসের আলোটা তার মুখের ওপরে গিয়ে পড়ল।

লোকটি আর কেউ নন, মিঃ পডগারস, সেই গণৎকার। সেই থ্যাবড়া, থলথলে মুখ, সোনা দিয়ে বাঁধানো চশমা, রুগ্ন হাসি, আর কামার্ত মুখের চেহারা। দেখে অন্য লোক বলে ভুল হওয়ার উপায় নেই কারও।

লর্ড আর্থার দাঁড়িয়ে পড়লেন। মগজের মধ্যে একটা চমৎকার চিন্তা খেলে গেল তাঁর। নিঃশব্দে তিনি তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপরে ঝটিতি তাঁর পা দুটো ধরে সোজা তিনি তাঁকে টেমস নদীর জলে ফেলে দিলেন। একটা গালাগালির শব্দ শোনা গেল; তারপরেই শোনা গেল ঝপাং করে একটা জিনিস জলে পড়ার শব্দ। তারপরেই সব চুপচাপ। অস্থিরচিত্তে লর্ড আর্থার

সেই দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু গণৎকারের আর কিছুই দেখা গেল না। শুধু তাঁর উঁচু টুপিটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল নদীর জলে নাচতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তাও গেল তালিয়ে। মিঃ পডগারস-এর কোনো চিহ্ন আর দেখা গেল না। একবার মনে হল তাঁর বিকৃত দেহটা পোলের সিঁড়িটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে; কিন্তু তারপরেই মন হল ওটা ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়। আকাশে চাঁদ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়াটাও মিলিয়ে গেল। ভাগ্যের বিধান কী ছিল এবার তিনি তা যেন বুঝত পারলেন। একটা বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপরেই সাইবিলের নামটা তাঁর ঠোঁটের ডগায় এসে উপস্থিত হল।

পরের কটা দিন আশা আর ভয়ের আবর্তে তিনি পাক খেতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হত এই বুঝি মিঃ পডগারস তাঁর ঘরে এসে হাজির হল। কিন্তু অন্য সময় তাঁর মনে হত—না; ভাগ্য কি তাঁর ওপরে এত নির্দয় হতে পারে? দু'দুবার তিনি গণৎকারের বাড়ির সামনে গেলেন; কিন্তু কিছুতেই বেল বাজাতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ভয়ে সেকথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারছিলেন না।

অবশেষে সংবাদ এল। চা খাওয়ার পরে ক্লাবের ধূমপান করার ঘরে তিনি বসেছিলেন এমন সময় বেয়ারা কয়েকটি কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ নিয়ে হাজির হল। সেন্ট জেমস কাগজটা তুলে নিয়ে তিনি চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটা বেশ বড়ো অক্ষরে ছাপা বিশেষ একটি সংবাদ তাঁর চোখে পড়ল।

"গণৎকারের আত্মহত্যা"

উত্তেজনায় কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি পড়তে লাগলেন। সংবাদটি হচ্ছে—

গতকাল সকালে সাতটার সময় মিঃ সেপটিমাস আর. পডগারস—বিখ্যাত হস্তপরীক্ষক-এর মৃতদেহ গ্রীনউইচ উপকূলে পাওয়া গিয়েছে, শ্যিপ হোটেলের ঠিক সামনেই। হতভাগ্য ভদ্রলোককে কয়েকদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গণৎকারদের সমাজে তাঁর জন্যে বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছিল। মনে হচ্ছে সাময়িক মস্তিষ্ক বিকারের ঝোঁকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। হয়তো, অতিরিক্ত পরিশ্রমই এর জন্যে দায়ী। করোনাররাও এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। মিঃ পডগারস সম্প্রতি 'মানুষের হাত'—এই বিষয়ে একটি বিশদ পুস্তক রচনার কাজ শেষ করেছেন। সেটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। হলে, একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে চারপাশে। মৃত ব্যক্তির বয়স ছিল পঁয়ষট্টি বছর। তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই বলেই আমাদের মনে হয়।

কাগজটা হাতে নিয়ে লর্ড আর্থার ক্লাব থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। তারপরেই সোজা পার্ক লেন। জানালা থেকে সাইবিল তাঁকে দেখলেন। দেখেই তাঁর মনে হল নিশ্চয় কোনো শুভ সংবাদ রয়েছে। তাড়াতাড়ি নেমে এলেন তিনি। আর্থারের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বুঝলেন—হ্যাঁ, সংবাদটা শুভই।

লর্ড আর্থার বললেন—প্রিয় সাইবিল, কালকেই আমরা বিয়ে করব।

চোখের জলে হাসতে হাসতে সাইবিল বললেন—বোকা ছেলে! এখনো কেক তৈরি করার জন্যে বায়না দেওয়া হয়নি যে।

৬

তিন সপ্তাহ পরে বিয়ে হল তাঁদের। এই উপলক্ষে সেন্ট পিটার গির্জায় চটপটে আধুনিক যুবক-যুবতীর বেশ ভালোই সমাবেশ হয়েছিল। চিচেস্টারের ডিন গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন। এরকম সুন্দর পাত্র-পাত্রী ও অঞ্চলে আর কখনো যে দেখা যায়নি সে বিষয়ে সবাই একমত। সাইবিলের জন্যে লর্ড আর্থার যে কষ্ট করেছেন সেকথা একবারও তাঁর মনে হল না। আর নারী তার শ্রেষ্ঠ জিনিস পুরুষকে যা দিতে পারে—সেবা, যত্ন আর ভালোবাসা—সাইবিল যে-সবই আর্থারকে দিয়েছিলেন। তাঁদের জীবনে বাস্তবের সংঘাতে রোমান্স চূর্ণ হয়নি। চিরকালই তাঁদের যৌবন অটুট ছিল।

কয়েক বছর পরের কথা। তখন তাঁদের সুন্দর দুটি সন্তান জন্মেছে। লেডি উইনডারমিয়ার একদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন অ্যালটন প্রয়োরিতে। জায়গাটা বড়ো সুন্দর। ডিউক যৌতুক হিসাবে এই জায়গাটা তাঁর পুত্রকে দান করেছিলেন। একদিন বিকালে বাগানের একটা লাইম গাছের তলায় লেডি উইনডারমিয়ার লেডি আর্থারের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটি গোলাপ বাগানের ভেতরে খেলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ সাইবিলের হাতটা ধরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি সুখী হয়েছ, সাইবিল?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি সুখী হননি?

সুখী হওয়ার মতো আমার সময় নেই, সাইবিল। আমার সঙ্গে যে লোকটি সকলের শেষে পরিচিত হয় তাকেই আমার ভালো লাগে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার পরেই আর তাকে আমার ভালো লাগে না।

সিংহেরা আর আপনাকে আনন্দ দেয় না?

উঁহু! সবাই ওই একটা ঋতুর খদ্দের। তাছাড়া, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে খারাপ ব্যাবহার করতে শুরু করবে। সেই বিশ্রী পডগারসকে মনে রয়েছে তোমার? একটা প্রতারক—ভয়ঙ্কর রকমের প্রতারক। অবশ্য তাও আমি কিছু মনে করিনি। অনেকবার তাকে আমি টাকা ধারও দিয়েছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করল। এইটাই অসহ্য। তারই জন্যে 'চিরোম্যানসি' শাস্ত্রটাকে আমি ঘৃণা করি। এখন আমি টেলিপ্যাথি পড়ছি। ওটা সুন্দর জিনিস।

লেডি উইনডারমিয়ার, চিরোম্যানসির বিরুদ্ধে আপনি কিছু বলবেন না। আর্থার ওর বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলতে দেবে না। এক কথা ও বিষয়ে সে খুবই সিরিয়াস।

সে যে এটা বিশ্বাস করে এটা নিশ্চয় তুমি আমাকে বলতে চাও না?

ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ওই তো এসে গিয়েছে।

একগোছা বেগনে গোলাপ ফুল নিয়ে আর্থার দুটি নৃত্যরত শিশুদের সঙ্গে হাজির হলেন।

লেডি উইনডারমিয়ার জিজ্ঞাসা করলেন—আর্থার, তুমি নিশ্চয় 'চিরোম্যানসি' বিশ্বাস করো না?

নিশ্চয় করি—হাসলেন আর্থার।

কেন কর?

কারণ, আমার আনন্দ ওরই ওপরে নির্ভর করে। ওরই জন্যে আমি সাইবিলকে পেয়েছি।

লেডি উইনডারমিয়ার বললেন—এরকম অর্থহীন কথা জীবনে আমি শুনিনি।

ক্যানটারভিলে ভূত
The Canterville Ghost

অ্যামেরিকান মিনিস্টার মিঃ হিরাম বি. ওটিস 'ক্যানটারভিলে চেস' বাড়িটি কিনে যে নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছেন এই কথাটা ঘরে-পরে সবাই তাঁকে বলেছিল। কারণ বাড়িটি যে ভূতুড়ে সেবিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। এমন কি ন্যায়নিষ্ঠ লর্ড ক্যানটারভিলে নিজেও মিঃ ওটিস তাঁর সঙ্গে দরদস্তুর করতে এলে, তাঁরে এ-বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

লর্ড ক্যানটারভিলে বললেন—আমরা নিজেরাই ওই বাড়িটা বাসের উপযুক্ত বলে মনে করিনি। একবার আমার বিধবা পিতামহী বোলটনের ডাচেস ডিনারের জন্যে পোশাক পালটাচ্ছিলেন; এমন সময় দুটি কঙ্কাল হাত এসে তাঁর কাঁধের ওপরে পড়ে। এই দেখেই ভয়ে তিনি মূর্চ্ছা যান। আরো একটা কথা আপনাকে আমার বলা দরকার, মিঃ ওটিস, আমাদের সংসারের অনেকেই ওই ভূতটাকে দেখেছে; এমন কি স্থানীয় গির্জার রেকটার এবং কেম্ব্রিজের কিংস কলেজের ফেলো রেভা, আগস্টাস ড্যামপিয়রও বাদ যাননি। ডাচেসের সেই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার পর থেকে আমাদের ছোকরা চাকরদের কেউ আর আমাদের সঙ্গে ওই বাড়িতে থাকতে রাজি হয়নি; আর রাত্রিতে বারান্দা আর লাইব্রেরির দিক থেকে যে সমস্ত অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ আসত সেই সব শব্দ শোনার পরে লেডি ক্যানটারভাইলের রাত্রে ঘুম হত না।

মিনিস্টারটি উত্তর দিলেন—মি লর্ড, আসবাবপত্র আর ভূত দুজনকেই বাড়ির সঙ্গে দাম নিয়ে আমি কিনে নেব। আমি যে-দেশ থেকে আসছি সেটা হচ্ছে আধুনিক। সেখানে টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়। আজকাল ছোকরারা পুরনো পৃথিবীটাকে লাল রঙে চিত্র-বিচিত্র করে আর সেরা অভিনেত্রী আর নর্তকীদের তুলে নিয়ে গিয়ে বাহাবো লুটছে। আমার ধারণা ইওরোপে ভূত বলে যদি কোনো পদার্থ থেকেই থাকে তাহলে অতি শীঘ্রই আমরা তার জন্যে জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় যাদুঘরের ব্যবস্থা করে দেব আর নয়তো রাস্তায় নিয়ে খেলা দেখাব।

লর্ড ক্যানটারভিলে একটু হেসে বললেন—আমার বিশ্বাস ভূত রয়েছে; যদিও সে আপনাদের অতি উদ্‌যোগী সংগঠকদের প্রস্তাব হয়তো নাকচ করে দিয়েছে। তিনশো বছর ধরে ও এখানে বাস করছে—১৫৪৮সাল থেকেই একরকম বলতে পারেন—এবং আমাদের সংসারে কারও মৃত্যুর আগেই সব সময়ে ও দেখা দিয়েছে।

লর্ড ক্যানটারভিলে, কারও মৃত্যুর আগে বাড়ির ডাক্তারও তো আসেন। কিন্তু স্যার, ভূত বলে কোনো বস্তু নেই। আমার ধারণা ব্রিটিশ অভিজাত সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্যে প্রকৃতি তার কর্তব্যকর্মি অবহেলা করবে না।

মিঃ ওটিসের শেষ মন্তব্যটি অনুধাবন করতে না পেরে লর্ড ক্যানটারভিলে বললেন—অ্যামেরিকাতে আপনারা খুব স্বাভাবিক অবস্থায় দিন কাটান; আর বাড়িতে আপনি যদি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন তাহলে আমার অবশ্য বলার কিছু নেই। কেবল মনে রাখবেন এ-বিষয়ে আপনাকে আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছি।

সপ্তাহ খানেকের ভেতরেই বাড়ি কেনার কাজ শেষ হয়ে গেল; মাসের শেষ নাগাদ মিনিস্টার আর তাঁর সংসারের সবাই সেই বাড়িতে উঠে এলেন। মিসেস ওটিস এখন মধ্যবয়স্কা রমণী, চোখ দুটি আর চেহারা বড়োই সুন্দর। ইনি ছিলেন প্রাক-বিবাহিতা জীবনে ওয়েস্ট তিপ্পান্নতম স্ট্রিটের নিউ ইয়র্কের প্রখ্যাতা নর্তকী মিস লুক্রেসিয়া আর টাপান। দেশ ছাড়ার পরে অনেক আমেরিকান মহিলাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে যায়—এক কথায় তাঁরা হয়ে পড়েন চিররুগ্ন; তাঁরা মনে করেন এইটাই বুঝি ইওরোপীয় শালীনতা। কিন্তু মিসেস ওটিস সে ভু ল করেননি। তাঁর স্বাস্থ্যটি বড়ো চমৎকার ছিল। জৈবে প্রেরণায় তিনি ছিলেন উদ্দাম। সত্যি কথা বলতে কি অনেক দিন থেকেই তিনি ছিলেন ইংরাজ রমণী। আজকাল এক ভাষা ছাড়া আমেরিকার সঙ্গে আমাদের যে অদ্ভুত একটা মিল রয়েছে তিনি ছিলেন তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। জাতীয়তাবাদের উৎসাহে বাপ-মা তাঁদের বড়ো ছেলের নাম দিয়েছিলেন ওয়াশিংটন। এর জন্যে অনুশোচনা তাঁরা কম করেননি। ছেলেটির চুলগুলি বড়ো চমৎকার—দেখতে মোটামুটি ভালোই। পরপর তিনটি বছর নিউপোর্ট ক্যাসিনোতে জার্মানদের হারিয়ে আমেরিকান কূটনীতিতে সে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। এমন কি লন্ডনেও বেশ ভালো নাচিয়ে হিসাবে সে বেশ নাম করেছিল। মিস ভার্জিনিয়ার বয়স পনেরো—চঞ্চলা, হরিণ শিশুর মতো সুন্দর; দুটি বড়ো-বড়ো নীল চোখ—স্বাধীন আর বেপরোয়া। শক্তির দিক থেকেও একেবারে রণদুর্মদা। একবার টাট্টু ঘোড়ার ওপরে চেপে সে বৃদ্ধ লর্ড বিলটনের সঙ্গে দু'দুবার পার্কের চারপাশে দৌড়ে অ্যাকিলিসের প্রতিমূর্তির ঠিক সামনে হারিয়ে দিয়েছিল। এই দেখে চেশায়ারের যুবক ডিউক আনন্দে এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে সে সেখানেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব করে। ফলে তার অভিভাবকেরা সেই রাত্রিতেই তাকে ইটনে পাঠিয়ে দেন। ডিউক কাঁদতে-কাঁদতে চলে যায় ইটনে। ভার্জিনিয়ার পরে দুটি যমজ ছেলে হয়। তারা সব সময় বনবন করে ঘুরত বলে তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'দি স্টারস আর স্ট্রাইপস,' বড়ো সুন্দর ছেলে দুটি। একমাত্র মিঃ ওটিস ছাড়া সেই পরিবারের ওরাই ছিল একমাত্র রিপাবলিকান।

ক্যানটারভিলে চেস সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন অ্যাসকেট থেকে সাত মাইল দূরে। মিঃ ওটিস একটা খোলা গাড়ির জন্যে টেলিগ্রাফ করেছিলেন। সবাই বেশ স্ফূর্তি করে হইচই করতে-করতে গাড়িতে উঠে বসলেন। জুলাই মাসের একটি সুন্দর সন্ধ্যা—পাইন বনের গন্ধে বাতাস একেবারে মাতোয়ারা। মাঝে-মাঝে বুনো পায়রার ডাক শোনা যাচ্ছিল। বীচ গাছের ভেতর দিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল বাচ্চা বাচ্চা কাঠবিড়ালেরা। ক্যানটারভিলে চেস-এর রাস্তায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। নেমে এল বাতাসে একটা থমথমে ভাব। মাথার ওপর দিয়ে একদল দাঁড়কাক নিঃশব্দে উড়ে গেল। বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই কয়েকটা বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ল।

একটি বৃদ্ধা মহিলা সিঁড়ির ওপরে নেমে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। পরিধানে তাঁর

কালো সিল্কের একটি পরিচ্ছন্ন পোশাক, মাথায় সাদা টুপি, আর গায়ে সাদা এপ্রোন। ইনি হচ্ছেন গৃহকর্ত্রী মিসেস উমনে। লেডি ক্যানটারভিলের অনুরোধ তাঁকেই মিসেস ওটিস তাঁর পূর্ব পদে বহাল রাখতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁর পিছু পিছু তাঁরা সবাই সুন্দর টিউডর যুগের হলঘর পেরিয়ে লাইব্রেরি ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরটা হচ্ছে লম্বা, নীচু, কালো ওক গাছের প্যানেল দেওয়া ঘর। এখানেই চা-এর বন্দোবস্ত হয়েছিল। জামা খুলে তাঁরা সবাই বসে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। মিসেস উমনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে করতে লাগলেন তদারকি।

হঠাৎ মিসেস ওটিস লক্ষ করলেন ফায়ার প্লেসের পাশে মেঝের ওপরে হালকা ধরনের একটা লাল দাগ পড়ে রয়েছে। এর অর্থটা কী বুঝতে না পেরে তিনি মিসেস উমনেকে বললেন—ওখানে সম্ভবত কোনো রঙ পড়েছে।

মিসেস উমনে নীচু স্বরে বললেন—হ্যাঁ, মাদাম। ওখানে রক্তের ছিটে পড়েছে।

মিসেস ওটিস চিৎকার করে উঠলেন—কী বিপদ! বসার ঘরে ওরকম রক্তের দাগ আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি নে। এখনই ওটা মুছে ফেলতে হবে।

বৃদ্ধাটা হেসে আগের মতোই রহস্যজনক স্বরে বললেন—ওটা হচ্ছে লেডি এলিনোর দ্য ক্যানটারভিলের রক্ত। ১৫৭৫ সালে ঠিক এই জায়গাতেই স্বামী স্যার সাইমন দ্য ক্যানটারভিলে তাঁকে হত্যা করেছিলেন। স্যার সাইমন তারপরে নটি বছর বেঁচেছিলেন। তার পরেই একদিন রহস্যজনকভাবে হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁর দেহটিকে আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁরই প্রেতাত্মা এখন-ও এই বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদেশি পর্যটক এবং আরো অনেক এই রক্তচিহ্নটিকে খুবই প্রশংসা করেছেন; আর ওটিকে আজ পর্যন্ত মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

ওয়াশিংটন ওটিস চিৎকার করে বলল—যত সব আবোল-তাবোলের কথা! পিনকারটার চ্যাম্পিয়ন স্টেন রিমোভার এবং প্যারাগন ডিটারজেন্ট লাগালেই ও-রঙ উঠে যাবে।

সেই ভয়ার্ত গৃহকর্ত্রী কিছু বলার আগেই সে হাঁটু মুড়ে বসে কালো কসমেটিক-এর মতো একটা চিটচিটে বস্তু দিয়ে মেঝেটা ঘষতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই দাগ উঠে গেল।

বিজয়গর্বে সে চেঁচিয়ে উঠল—'আমি জানতাম এতেই কাজ হবে।' কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল, সেই থমথমে ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল—আর ভীষণ একটা বজ্রাঘাত তাঁদের সকলের আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। মিসেস উমনে তো সেই শব্দে ভির্মি গেলেন।

অ্যামেরিকান মিনিস্টার শান্তভাবে বললেন—'সত্যিই কি ভয়ঙ্কর আবহাওয়া!' এই বলে তিনি লম্বা একটা চুরুট ধরালেন।—আমার ধারণা, এই পুরনো অঞ্চলটির লোকসংখ্যা এতই বেশি হয়ে গিয়েছে যে প্রত্যেকে ভালো আবহাওয়া পাচ্ছে না। আমি সব সময়েই বলে এসেছি এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে এদেশ থেকে জনতাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

মিসেস ওটিস বললেন—প্রিয় হিরাম, যে মহিলা মূর্চ্ছা যান তাঁকে নিয়ে আমরা কী করব?

ভাঙা জিনিসপত্রের মতো ব্যবহার কর—তাহলে আর উনি মূর্চ্ছা যাবেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস উমনের জ্ঞান ফিরে এল। তিনি যে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি কঠোরভাবে মিঃ ওটিসকে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে এই সংসারের ওপরে বিষম একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

তিনি বললেন—নিজের চোখে আমি অনেক জিনিস দেখেছি, স্যার। সেই সব দেখে যে কোনো ক্রিশ্চানের শরীরেই রোমাঞ্চ জেগে উঠবে। এখানে যে সব ভয়ঙ্কর জিনিস ঘটেছে সেই সব দেখে রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি নে।

মিঃ ওটিস এবং তাঁর স্ত্রী অবশ্য সেই সৎ মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে ভূতটূতকে তাঁরা ভয় করেন না। তাঁর নতুন মনিব-পত্নীর ওপরে ঈশ্বরে আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা করে আর সেই সঙ্গে মাইনে বাড়ানোর ব্যবস্থা করে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সারা রাত্রি ধরেই ভীষণ ঝড় চলল; কিন্তু বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেনি। পরের দিন সকালে কিন্তু মেঝের ওপরে আবার সেই রক্তের দাগটা দেখা গেল। ব্রেকফাস্টের সময় সবাই নীচে নেমে এসে ব্যাপারটা লক্ষ করল। ওয়াশিংটন বলল—'আমার মনে হচ্ছে এর জন্যে প্যারাগন ডিটারজেন্টের দোষ নেই। এটা আমি আনেক পরীক্ষা করেছি। এর জন্যে নিশ্চয় ওই ভূতটাই দায়ী।' আবার সে ঘষে-ঘষে রক্তের দাগটা মুছে ফেলল; কিন্তু পরের দিন সকালে আবার সেই একই ব্যাপার ঘটল। যদিও লাইব্রেরি ঘরে যথারীতি তালা দেওয়া ছিল, তৃতীয় দিন সকালেও সেই রক্তের দাগ দেখা দিল। এই দেখে সবাই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল। মিঃ ওটিস ভাবলেন ভূত নেই এ-বিষয়ে তাঁর ধারণা কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছিল। মিসেস ওটিস মনে করলেন প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের দলে তিনি নাম লেকাবেন। অপরাধের সঙ্গে জড়িত রক্তচিহ্নের স্থায়িত্ব নিয়ে মেসার্স মেয়ারস আর পডমোর কোম্পানিকে দীর্ঘ একটি চিঠি লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। ওয়াশিংটন। সেই রাত্রিতেই রাত্রিতেই ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ চিরদিনের জন্যে দূর হল।

সারাটা দিনই যেমন রোদ উঠেছিল তেমনি ছিল গরম, শীতল। সন্ধ্যায় সবাই মোটরে চড়ে বেড়াত গেয়েছিল। রাত্রি ন'টার আগে কেউ ফেরেনি সেদিন। ফিরেই সামান্য আহার করেছিল সবাই। সেদিন ভূত নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। সুতরাং ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করার প্রাথমিক কোনো শর্তও সেদিন ছিল না। মিঃ ওটিসের কাছে আমি শুনেছিলাম সেদিন তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন ধরনের, বিশেষ করে অবস্থাপন্ন আমেরিকানরা যে সব বিষয় নিয়ে সাধারণত আলোচনা করে—যেমন, অভিনেত্রী হিসাবে সারা বার্নদোতের চেয়ে মিস ফ্যানি ড্যাভোনপোর্টের শ্রেষ্ঠতা, এমন কি অবস্থাপন্ন ইংরাজদের বাড়িতে সবুজ শস্য, বাকহুইট কেক, দুধে সেদ্ধ ভুট্টাচূর্ণের দুষ্প্রাপ্যতা; পৃথিবীর আত্মাকে বাঁচানোর জন্যে বোস্টন বন্দরের প্রয়োজনীয়তা, রেল-ভ্রমণে গাঁটরি পরীক্ষা করার সুবিধা, লন্ডনের বিরক্তিকর উচ্চারণের তুলনায় নিউ ইয়র্কের উচ্চারণের মিষ্টতা ইত্যাদি। অতি-প্রাকৃত ঘটনার সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই সেদিন হয়নি; এমন কি গল্পচ্ছলে স্যার সাইমন দ্য ক্যাটারভাইলের নাম উচ্চারণও কেউ করেননি। রাত্রি এগারোটার সময় সবাই শুয়ে পড়লেন এবং সাড়ে এগারোটার মধ্যেই ঘরের আলো সব নিবে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘরের বাইরে বারান্দায় ওপরে একটা অদ্ভুত শব্দে মিঃ ওটিসের ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা শুনে মনে হল ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির শব্দ। আরো মনে হল শব্দটা ক্রমশ তাঁর ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিছানা থেকে উঠে দেশলাই জ্বালিয়ে সময়টা দেখে নিলেন। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় একটা বেজেছে। বেশ শান্তভাবেই নিজের নাড়িটা দেখে নিলেন। না; এতটুকু বেচাল হয়নি

নাড়ি। সেই অদ্ভুত শব্দটা তখনো হচ্ছিল। তিনি বেশ স্পষ্টই শুনতে পেলেন কেউ যেন পা ঠুকে ঠুকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। চটি পরে তিনি তাঁর 'ড্রেসিং কেস' থেকে লম্বাটে একটা ফাইল বার করে দরজাটা খুললেন। ম্লান চাঁদের আলোতে তিনি দেখলেন তাঁরই সামনে ভয়ঙ্কর চেহারার একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখ দুটো জলন্ত কয়লার মতো জ্বলছে। জটার মতো লম্বা ধূসর চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার কাঁধের ওপরে। তার পরিধানে প্রাচীন কালের পোশাক; সেগুলি যেমন নোংরা, তেমনি ছেঁড়া। তার হাতের কব্জি আর পায়ের গাঁট থেকে বেশ ভারী আর মরচে-পড়া শেকল ঝুলছে।

মিঃ ওটিস বললেন—প্রিয় মহাশয়, ওই শেকলগুলিতে তেল দেওয়ার জন্যে বাধ্য হয়েই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর সেই জন্যেই 'তামানি রাইসিং সান লিউব্রিকেটর'-এর একটা ছোটো শিশি আমি এনেছি। একবার লাগালেই কাজ হবে এতে। এর গুণ কত সে সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র-ও এর গায়ে সাঁটা রয়েছে। শোওয়ার ঘরের বাতির কাছে এটা আমি রাখছি। প্রয়োজন হলে এই জাতীয় আরো তেল আমি আপনাকে আনন্দের সঙ্গেই সরবরাহ করব।

এই বলে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী মহোদয় মার্বেল টেবিলের ওপরে শিশিটি রেখে দরজা বন্ধ করে শোওয়ার জন্যে প্রস্থান করলেন।

স্বাভাবিক একটা ঘৃণা আর বিরক্তিতে ক্যানটারভাইলের ভূত এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে সেই পালিশকরা মেঝের ওপরে সজোরে শিশিটাকে আছাড় দিয়ে শুকনো আর্তনাদ করতে করতে আর ভৌতিক সবুজ একটা আলো ছড়াতে ছড়াতে ভূতটি বারান্দা দিয়ে পালিয়ে গেল। ঠিক যখন সে ওক কাঠের বিরাট সিঁড়িটার ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এমন সময় একটা দরজা হাট হয়ে খুলে গেল; দুটি খুদে সাদা পোশাক-পরা মূর্তির আবির্ভাব হল। আর সেই সঙ্গে একটা লম্বা বলিশ তার মাথার ওপর দিয়ে হুইশ-হুইশ শব্দে করে উড়ে গেল। নষ্ট করার মতো সময় আর না থাকায় ভূতটি ঝটিতি চতুর্থ ডাইমেনশনের সাহায্যে কাঠের তক্তার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরে শান্ত হল বাড়িটি।

বাড়িটা বাঁ দিকে ছোটো একটা গোপন কক্ষে ঢুকে চাঁদের রশ্মির পিঠে হেলান দিয়ে বসে সহজভাবে সে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। সেইখানে বসেই নিজের অবস্থাটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করল সে। বিগত তিনশো বছরের গৌরবোজ্জ্বল এবং নিবরচ্ছিন্ন জীবনে এইভাবে অপমানিত সে আর কোনোদিন হয়নি। বিধবা ডাচেসের কথা তার মনে পড়ল। লেস আর মুক্তা হাতে নিয়ে যখন তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময় ভয় দেখিয়ে সে তাঁকে জ্ঞান হারাতে বাধ্য করেছিল। একটা খালি ঘরের পর্দা তুলে সে স্রেফ ভেংচি কেটে যে চারটি পরিচারিকাকে উন্মাদ করে তুলেছিল তাদের কথা মনে হল তার। মনে হল স্থানীয় গির্জার রেকটরের কথা। একদিন বেশি রাত্রি করে লাইব্রেরি থেকে তিনি যখন ফিরছিলেন এমন সময় সে তাঁর বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে ভদ্রলোক স্যার উইলিয়ম গাল-এর চিকিৎসাধীনে ছিলেন। বলতে গেলে স্নায়ু-বৈকল্যেই তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মাদান করেন। মনে পড়ে গেল বৃদ্ধা মাদাম দ্য ট্রিমোলিক-এর কথা। ভদ্রমহিলা একদিন প্রত্যুষে উঠে দেখেন আগুনের ধারে একটি আরাম কেদারায় বসে একটি কংকাল তাঁর নিজের ডায়েরি পড়ছে। এর ফলে তিনি ছ'সপ্তাহ মানসিক রোগে বিছানায় পড়ে ছিলেন। সেরে উঠে তিনি গির্জার চলে গেলেন। তারপর থেকে কুখ্যাত নাস্তিক মঁসিয়ে দ্য ভলতেয়রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা তার মনে পড়ে গেল যেদিন গলার ভেতরে মুক্তার মালা ঢুকিয়ে অসৎচরিত্র লর্ড ক্যানটারভিলেকে দমবন্ধ অবস্থায় তার ড্রেসিং রুমে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মৃত্যুর ঠিক আগে সে স্বীকার করেছিল যে তাসের ভেলকি দেখিয়ে

চার্লস জেমস ফক্সকে সে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ঠকিয়েছিল; আর ভূতই যে তাকে ওই মালাটা গিলতে বাধ্য করেছিল সেকথাও স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি সে। সেই সব বিরাট বিরাট কৃতিত্বের কথা মনে পড়ে গেল তার। মনে পড়ল বাটলারের কথা। জানালার কপাটের ওপরে সবুজ একটা হাতকে ঠুক ঠুক করতে দেখে বেচারা নিজেকেই নিজে গুলি করে হত্যা করল। সেই সুন্দরী লেডি স্টাটফিল্ডের কথাও সে ভুলতে পারল না। তাঁর সেই শ্বেতকণ্ঠের ওপরে পাঁচটা আঙুলের দাগ চিপে বসে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল সেই ক্ষত ঢাকার জন্যে তিনি সব সময় কালো ভেলভেটের বন্ধনী গলার ওপরে জড়িয়ে রাখতেন। তারপরে একদিন তিনি পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করলেন। সত্যিকার কলাবিদের আত্মম্ভরিতার উৎসাহে সে তার জীবনের কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায় গুলি নিয়ে আলোচনা করল। এইসব কৃতিত্ব দেখানোর পরে কোথা থেকে হতভাগা একটা আমেরিকান এসে তাকে 'রাইসিং সান লিউব্রিকেটর' দিতে চায়! তার মাথা লক্ষ করে বালিশ ছুঁড়ে দেয়! অহো ভাগ্যম! অসহ্য, অসহ্য! তাছাড়া, কোনো ভুত যে নশ্বর মানুষের কাছে এইভাবে অপমানিত হয়েছে এর নজির ভূতদের ইতিহাসে আর কোথাও নেই। সেই জন্যে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ তাকে করতেই হবে। আর সেই চিন্তাতেই সারা দিনটাই সে মশগুল হয়ে বসে রইল।

পরের দিন সকালে ওটিসরা ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে ভূতের বিষয়ে কিছু আলোচনা করলেন। তাঁর উপহার ভূতটি গ্রহণ করেনি এটা দেখে যুক্তরাষ্ট্রের মিনিস্টার স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন—ভূতের শীরীরিক কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা আমার নেই, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ভূতটি এখানে বাস করছে সেই কথা ভেবে এটা বলতে আমি বাধ্য যে তাকে লক্ষ করে বালিশ ছোঁড়াটা ভদ্রতাসূচক হয়নি।

যথার্থ মন্তব্য; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এই কথা শুনে দুটি যমজ ভাই একেবারে হো-হো-করে হেসে উঠল।

মিঃ ওটিস বলে গেলেন—অন্য পক্ষে 'রাইসিং সান লিউব্রিকেটর' নিতে ওর যদি সত্যিই কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ওর শেকলগুলি আমাদের খুলে নিতে হবে। কারণ ঘরের বাইরে এই ধরনের শব্দ হলে রাত্রিতে ঘুমের ব্যাঘাত হতে বাধ্য।

সপ্তাহের বাকি কটা দিন অবশ্য তাঁরা নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটিয়েছেন। ভূতটি কোনোরকম অদ্ভুত কাজ করার চেষ্টা করেনি। লাইব্রেরির মেঝেতে সেই রক্তের দাগটাই কেবল প্রতিদিন দেখা যাচ্ছিল—আর সেইটাই সকলকে বেশ উত্তেজিত করে রেখেছিল। ব্যাপারটা সত্যিই বড়ো অদ্ভুত। মিসেস ওটিস নিজে প্রতিদিন রাত্রিতে ওই ঘরটা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিতেন; সেই সঙ্গে খুব শক্ত করে বন্ধ করা হত জানালাগুলি। অবাক হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে রঙটা বহুরূপী। কোনো কোনো দিন সকালে ওটা ফিকে (প্রায় ভারতীয়) লাল, কোনো কোনো দিন সিঁদুরের মতো, কোনো কোনো দিল বা বেগনে। হঠাৎ একদিন প্রার্থনা থেকে ফিরে এসে তাঁরা দেখেন রঙটা হয়েছে উজ্জ্বল পান্নার মতো সবুজ। রঙের এই দ্রুত পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বেশ আমোদ পেতেন; আর এর আসল চরিত্রটা যে কী তাই নিয়ে বাজি ধরতেন তারা দ্বিধা করতেন না। এঁদের মধ্যে একমাত্র ভার্জিনিয়াই ওঁদের তর্ক-আলোচনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত। এই রক্তের দাগ দেখে বেশ কষ্ট হত তার। যে সকালে রক্তটা পান্নার মতো সবুজ হয়ে দাঁড়াল সেদিনই আর একটু হলে সে প্রায় কেঁদেই ফেলত।

রবিবার রাত্রিতে ভূতটির দ্বিতীয় আবির্ভাব হল। সবাই শুয়ে পড়ার একটু পরেই হঠাৎ হলঘরের মধ্যে কিছু একটা ভেঙে পড়ে যোয়ার শব্দ হল। সেই ভীষণ শব্দে সবাই বেশ ভয়

পেয়ে গেলেন। সবাই দৌড়ে নীচে নেমে এসে দেখলেন একটা জায়গায় কতকগুলি পুরনো বর্ম ঝোলানো ছিল, সেগুলি স্থানচ্যুত হয়ে শান—বাঁধানো মেঝের ওপরে পড়ে গিয়েছে। আর উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে রয়েছে ক্যানটারভিলে ভূত। বসে-বসে হাঁটু দুটো সে ঘষছে; আর ভীষণ যন্ত্রণায় বিকৃত করছে তার মুখ। যমজ ভাই দুটি তাদের খেলার বন্দুক সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ভূতের মাথা লক্ষ করে অভ্রান্তভাবে তারা দুটো ছররা ছুঁড়ল; আর ক্যালিফোরনিয়ান ভদ্রতা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী রিভলভার উঁচিয়ে ভূতটিকে মাথার ওপরে হাত দুটো তুলতে নির্দেশ দিলেন। রাগে বিকট একটা চিৎকার করে ভূতটি লাফিয়ে উঠল; তারপরে ধোঁয়ার মতো সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাওয়ার সময় ওয়াশিংটন ওটিসের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে গেল। একেবারে থামল সিঁড়ির উপরে গিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে তার বিখ্যাত দৈত্যসুলভ হাসিটি হাসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। কয়েকবারই সে দেখেছে এই হাসিটি তার বড়োই কাজে লেগেছে। শোনা যায় এই দানবীয় হাসি শুনে একরাত্রিতেই লর্ড বেকারের অমন ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। আর মাস শেষ হওয়ার আগেই লেডি ক্যানটারভাইলের ফরাসি গভর্নেসরা চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই ভেবে সেই দানবীয় হাসিটি সে হাসল; পুরনো বাড়ির খিলানে সেই ভয়ঙ্কর হাসিটি উন্মত্ত কলরবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; কিন্তু সেই প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই সামনের একটা দরজা খুলে গেল; আর ফিকে নীল একটা ড্রেসিং গাউন পরে বেরিয়ে এলেন মিসেস ওটিস; বললেন—আমার ধারণা আপনার শরীরটা ভালো নেই। সেই জন্যে আমি এক বোতল ডাক্তার দোবেল-এর তৈরি মিকচার নিয়ে এসেছি। যদি বদহজম হয়ে থাকে তাহলে এতে আপনার যথেষ্ট উপকার হবে।

এই শুনে রাগে গরগর করতে-করতে ভূতটি তাঁর দিকে ক্যাট-ক্যাট করে তাকিয়ে রইল; তারপরে ঠিক করল একটা বড়ো কালো কুকুরের বেশ ধরবে সে। এই কাজে তার দক্ষতা সত্যিই ছিল অগাধ। কিন্তু সেই সময় তার দিকে এগিয়ে আসার পদশব্দ পেয়েই সে তার সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা কার্যকরী করবে কিনা ভাবতে লাগল। সুতরাং সে ঈষৎ অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়েই সন্তুষ্ট হল; তারপরে গভীর একটা কবরখানার আর্তনাদ করেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় যমজ দুটি ভাই কাছে এসে পড়ল।

নিজের ঘরে এসে সে একেবারে ভেঙে পড়ল। একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল তার মনের মধ্যে। যমজ ভাই দুটির অসভ্যতা, আর মিসেস ওটিসের জঘন্য বস্তুবাদ স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে বড়োই বিরক্তিকর মনে হল। কিন্তু যেটা তার কাছে বিষম কষ্টদায়ক হল সেটা হচ্ছে এই যে সে বর্মটাকে পরতে পারল না। সে ভেবেছিল ভূত বর্ম পরে বসে রয়েছে এই দৃশ্য দেখে আধুনিক আমেরিকানেরও তাক লেগে যাওয়ার কথা। এর পেছনে অন্য কোনো সুবোধ্য কারণ না থাকলেও, তাদের জাতীয় কবি লঙ ফেলোর সম্ভ্রমের জন্যেই তার চমকে যাওয়া উচিত ছিল। ক্যানটারভিলেরা যখন শহরে যেতেন তখন সারাদিনের মধ্যে একটি ক্লান্ত ঘণ্টা সে নিজেও লঙ ফেলোর কবিতার বই-এর পাতা অনেকবার উলটিয়েছে। কেনিলওয়ার্থ টুর্নামেন্টে সে নিজে এই বর্মটি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই পরেছে; আর তাই দেখে অনূঢ়া রানি নিজেই তার কত প্রশংসা করেছেন। তবু আজ যখন সে সেই বর্মটি পরতে গেল তখন তার বিষম ভার বইতে না পেরে মেঝের ওপরে সে হুড়মুড় করে পড়ে গেল, পড়ে যাওয়ার ফলে তার ডান হাতের আঙুলের গাঁটগুলি ক্ষতবিক্ষত হল; হাঁটুর ওপরে বসে যন্ত্রণায় সে কুকুরের মতো চিৎকার করে উঠল।

এর পরে কয়েকটা দিন সে ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে উঠল। সেই রক্তাক্ত দাগটিকে যথাস্থানে বসিয়ে দেওয়া ছাড়া নিজের ঘর থেকে সে বাইরে প্রায় বেরোল না বললেই হয়। যাই হোক, খুব

সাবধানে থাকার ফলে সে সুস্থ হয়ে উঠল; সুস্থ হয়েই যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী আর তাঁর পরিবারবর্গকে শায়েস্তা করার জন্যে সে তৃতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হল। তার পুনরাবির্ভাবের দিন ঠিক করল শুক্রবার,১৭ই অগস্ট। সেদিনের বেশির ভাগ সময়টাই সে তার পোশাক রাখার আলমারিটা ঘাঁটল। অনেক ঘেঁটেঘুঁটে সে একটা লাল পালক দেওয়া খোলসের তৈরি টুপি বার করল; সেই সঙ্গে বার করল মরচে-পড়া একটা ছোরা। সন্ধের দিকে ভয়ঙ্কর ঝড়ের সঙ্গে শুরু হল বৃষ্টি। এত জোরে বাতাস বইতে লাগল যে পুরনো বাড়ির জানালা-দরজাগুলো সব খটাখট করে শব্দ করতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি এই রকম একটা আবহাওয়াকেই সে পছন্দ করতে বেশি। তার পরিকল্পনাটা হচ্ছে এইরমক—। ওয়াশিংটন ওটিসের ঘরে সে নিঃশব্দে প্রবেশ করবে। বিছানার কাছে পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে সে বিড় বিড় করে কথা বলবে; তারপর মৃদু একটা সঙ্গীতের সুরের তালে-তালে নিজের গলার মধ্যে তিনবার ছোরটা বসিয়ে দেবে। ওয়াশিংটন ওটিস-ই 'পিঙ্কারটনের প্যারাগন ডিটারজেন্ট' দিয়ে বারবার সেই রক্তের দাগটা মুছে দিচ্ছে। এই জন্যে তারই ওপরে তার রাগটা ছিল বেশি। সেই বেপরোয়া আর মূর্খ যুবকটিকে ভয়ে একেবারে উত্থানশক্তিরহিত করে দিয়ে সে ঢুকে যাবে সেই ঘরে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী আর তাঁর স্ত্রী ঘুমোচ্ছেন। মিসেস ওটিসের কপালের ওপরে তার চিটচিটে হাতটা রেখে কবরখানার ভয়ঙ্কর গোপন রহস্যের কথা ফিসফিস করে মিঃ ওটিসের কানের কাছে আওড়াবে। ভার্জিনিয়া মেয়েটার ব্যাপারে সে এখনই কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেনি। মেয়েটি বেশ শান্তশিষ্ট। এখনো পর্যন্ত সে তাকে কোনো আপমান করেনি। ওয়ার্ডোবের ভেতর থেকে কয়েকটা শূন্যগর্ভ আওয়াজও তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। তাতেও যদি তার ঘুম না ভাঙে তাহলে সে কাচের জানালাটা বাগিয়ে ধরে একটু আঁচড়াবে। আর ওই যমজ ভাই দুটো, তাদের সে বেশ একটু শিক্ষা দেবেই। প্রথমেই অবশ্য সে তাদের বুকের ওপরে গিয়ে বসবে। তাদের মনে হবে দুঃস্বপ্ন দেখে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। তারপরে তাদের বিছানা কাছাকাছি বলেই, সে সবুজ বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে মৃতদেহের মতো তাদের দুটি বিছানার মাঝখানে দাঁড়াবে; এতেই তারা ভয়ে জমে যাবে। শেষকালে, বিছানার চাদর দুটো তুলে সাদা ব্লিচ করা হাড় আর ঘূর্ণায়মান চোখ বার করে সে ঘরময় হামাগুড়ি দেবে।'ডাম্ব দ্যানিয়েল' অথবা 'সুইসাইড স্কেলিটনের' অভিনেতার মতো দেখতে হবে তাকে। এই চরিত্রে অনেকবারই সে উন্নতধরনের পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। 'মার্টিন দ্য ম্যানিয়্যাক' অথবা 'দ্য মাস্কড মিস্ট্রি'-তে যে বিখ্যাত চরিত্রটি সে অভিনয় করেছিল এই অভিনয়টি মোটামুটি তারই কাছাকাছি যাবে।

সাড়ে দশটার সময় সবাই শুতে গেল। সে শব্দ সে শুনতে পেল। যমজ ভাই দুটোর উন্মত্ত চিৎকারে কিছুক্ষণ সে একটু অস্থিরতার মধ্যে রইল। তার মনে হল, স্কুলের ছাত্রদের মতো ছেলে দুটো ঘুমানোর আগে হালকা হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছে। কিন্তু সওয়া এগারোটার সব শান্ত হয়ে এল। বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। কাচের জানালার পাশে পেঁচারা পাখার শব্দ করল; পুরানো ইউ গাছের ওপর থেকে চিৎকার করে উঠল দাঁড়কাকের দল;আর হারিয়ে যাওয়া আত্মার মতো আর্তনাদ করতে-করতে বাতাস ছোটাছুটি করতে লাগল চারপাশে। কিন্তু নির্বিকারভাবে ওটিসের পরিবার ঘুমের বিভোর। তাদের কপালে যে কী লেখা রয়েছে সে কথা তারা ভাবতেও পারল না। ঝড়-জলের শব্দ ছাপিয়ে মন্ত্রীমহোদয়ের নাসিকাগর্জন তার কানে এসে ঢুকল। তার সেই নিষ্ঠুর বলিরেখায় ভরা মুখের ওপরে কদর্য একটা হাসি ফুটিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল চুপি চুপি। মেঘের ভেতরে চাঁদ লুকিয়ে পড়ল; যে বিরাট 'ওরিয়েল' জানালার পাশে তার আর তার নিহত স্ত্রীর অস্ত্রগুলির নক্সা সোনার রঙে খোদাই করা ছিল সেখান দিয়ে সে পেরিয়ে এল। অমঙ্গল ছায়ার মতো সে এগোতে লাগল। মনে হল অন্ধকারও তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ সঙ্কুচিত করছে। একবার মনে হল কার যেন ডাক শুনতে পাচ্ছে সে। মনে হতে সে থেমে গেল। না, ওটা হচ্ছে কুকুরের ডাক। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত

অদ্ভুত অদ্ভুত অভিসম্পাতের শব্দ ফিসফিস করে আওড়াতে আওড়াতে সে এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রির বাতাসের বুকে সেই মরচ-পড়া ছোরটা লাগল দোলাতে। অবশেষে যে বারান্দা দিয়ে হতভাগ্য ওয়াশিংটনের ঘরে ঢোকা যায় সেই বারান্দায় হাজির হল সে। মুহূর্তের জন্যে একটু দাঁড়াল। বাতাসে তার সাদা চুলগুলোকে ওলট-পালট করিয়ে দিয়ে সেই কদর্য মৃত লোকটার ভয়ঙ্করতা আরো বাড়িয়ে দিল। তারপরে সওয়া বারোটার ঘণ্টা বাজল। সে বুঝতে পারল এবার সময় হয়েছে। মনের আনন্দে একটা চুক-চুক শব্দ করে সে কোণের দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু মুখটা ঘোরানোর সঙ্গে-সঙ্গে একটা করুণ ভয়ার্ত চিৎকার করে সে থমকে দাঁড়াল, তারপরে সাদা ফ্যাকাশে মুখটা তার লম্বা হাড়ের দুটো হাত দিয়ে ঢেকে দিল। ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর অশরীরী মূর্তি। চুপচাপ খোদাই করা মূর্তির মতো—উন্মাদের স্বপ্নের মতো ভয়াল। তার মাথাটা ন্যাড়া, বার্নিশ করা। তার মুখটা গোল, মোটা আর সাদা। মনে হল, একটা শাশ্বত ভ্রূকুটির ভেতর দিয়ে ভয়াল একটা অট্টহাসি ফেটে-ফেটে পড়ছে। মুখটা যেন একটা আগুনে চুল্লি। অতিকায় দৈত্যের মতো চেহারার ওপরে তারই পরিধেয়ের মতো বিশ্রী ভয়াল একটা পোশাক ঝুলছে। তার বুকের ওপরে একটা প্রাচীরপত্র সাঁটা। তার ওপরে প্রাচীন অক্ষরে কী যেন অদ্ভুত একটা লেখা। মনে হল ওর ওপরে লেখা রয়েছে কারও লজ্জার কাহিনি, কোনো উদ্দাম পাপের কাহিনি, কোনো পাপের ইতিহাস; তার ডান হাতে উঁচু করে ধরা রয়েছে চকচকে ইস্পাতের একটা কুকরি

এর আগে কোনো ভূত না দেখার ফলে সে স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারপরে সেই ভয়ঙ্কর ভৌতিক প্রাণীটির দিকে তাড়াতাড়ি আর একবার তাকিয়ে নিয়েই সে তার ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল; পালানোর সময় তার লম্বা চাদরটা ফেলে গেল বারান্দার ওপরে; আর মরচে-পড়া ছোরাটা পড়ে গেল মন্ত্রীমশায়ের জুতোর ভেতরে। পরের দিন সকালে বাটলার সেটা কুড়িয়ে পায়। একবার নিজের নির্জন ঘরে হাজির হয়েই সে ঘরের বিছানার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল; তারপরে কাপড়ের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল নিজের মুখ। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে সেই সাহসী ক্যানটারভিলে ভূতটি তার স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরিয়ে নিয়ে এল। তারপরে ঠিক করল সকাল হলেই সে নেমে গিয়ে দ্বিতীয় ভূতটির সঙ্গে কথা বলবে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক ভোর হয়-হয় এই রকম সময় সে সেই জায়গায় ফিরে গেল। ভাবল, একজন ভূতের চেয়ে দুজন ভূতের শক্তি অনেক বেশি; দুজনে মিলে তারা ওই যমজ ভাই দুটিকে অনায়াসেই কায়দা করতে পারবে। যথাস্থানে হাজির হয়ে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার চোখে পড়ল। ছায়া-মূর্তিটির নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে; কারণ তার সেই শূন্য চক্ষুকোটরে সেই লাল জ্যোতি আর নেই, সেই চকচকে কুকরিটা পড়ে গিয়েছে তার হাত থেকে; আর অসহায় ভাবে দেওয়ালের গায়ে সে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনোরকমে। দৌড়ে গিয়ে হাত দুটো দিয়ে সে তাকে ধরল; সভয়ে দেখল ধরার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা ঘাড় থেকে বিচ্যুত হয়ে মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়ল; দেহটার কোমর গেল ভেঙে। সে দেখল দু-সুতোর তৈরি একটা সাদা বিছানার চাদরকে সে জড়িয়ে ধরেছে। এই আদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে সে তাড়াতাড়ি সেই বিজ্ঞাপনটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে প্রভাতের আলোয় পড়তে লাগল। বাপরে, বাপ! বিশ্বের এই একটিমাত্র ভূত ছাড়া আর সব ভূতই মেকী! অতএব সাবধান। ঠকবেন না। ক্যানটারভিলে ভূত তো রেগে কাঁই। আর সব ভূত মেকী। বিদ্যুতের মতো সব ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তার সঙ্গে ফাজলামি করা হয়েছে, তাকে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে, প্রতারণা করা হয়েছে তার সঙ্গে। বৃদ্ধ ক্যানটারভাইলের চোখে তার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এল। ফোকলা মাড়ি দুটো চিপে ধরল সে। শীর্ণ হাত দুটো আকাশের দিকে উঁচিয়ে প্রাচীনতম যুগের রীতি অনুসারে চমৎকার বাক্‌বিন্যাসের ভিত্তিতে সে প্রতিজ্ঞা করল—মোরগ যখন আনন্দের সঙ্গে দু'বার ডাকবে তখনই রক্তাক্ত কাজ সংগঠিত হবে; নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তখনই মৃত্যু গুটি গুটি বেরিয়ে যাবে

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে।

এই ভয়ঙ্কর শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে লাল টালির ছাদ দেওয়া দূরের কোনো বাড়ি থেকে মোরগ ডেকে উঠল। একটা তিক্ত দীর্ঘ চাপা হাসি হেসে সে অপেক্ষা করতে লাগল। আধঘণ্টা ধরে সে অপেক্ষা করল; কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে, মোরগটা আর ডাকল না। অবশেষে সাড়ে সাতটার সময় বাড়ির চাকরানিরা এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর সেখানে অপেক্ষা করতে পারল না। ব্যর্থ আশা আর ব্যর্থ উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে ভাবতে কোনোরকমে সে তার ঘের ফিরে এল। সেখানে গিয়ে প্রাচীন বীরত্বের ওপরে লেখা কয়েকটা বই ঘেঁটে সে দেখল। এই বইগুলি তার খুব প্রিয় ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যখন সে ওই জাতীয় কোনো প্রতিজ্ঞা করেছে তখনই মোরগ নিয়ম করে দু'বার ডেকেছে। সে রেগে গজগজ করতে করতে বলল—দুষ্টু মোরগটা জাহান্নামে যাক। আমার সেদিন থাকলে আমার সেই শক্ত বর্শাটা নিয়ে ব্যাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন চিৎকার করাতাম যে মনে হত ব্যাটা মরণ আর্তনাদ করছে।

পরের দিন ভূতটি বেশ দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বিগত চারটি সপ্তাহে ভয়ঙ্কর উত্তেজনার ফল ফলতে শুরু করল। একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল তার স্নায়ুগুলি। সামান্য একটু শব্দেই সে চমকে উঠতে লাগল। পাঁচটি দিন সে ঘরের মধ্যে বসে রইল; তারপরে ঠিক করল লাইব্রেরি ঘরের মেঝেতে আর সে সেই রক্তচিহ্নটি বসিয়ে আসবে না। ওটিস-এর পরিবারবর্গ ওটা যদি পছন্দ না করে স্পষ্টতই ও-জিনিসটি না দেখার অধিকার তাদের রয়েছে। মনে হয় ওরা নীচু বাস্তব স্তরের মানুষ। ইন্দ্রিয়জ ঘটনার যে একটা সাংকেতিক মূল্য রয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করতে ওরা অক্ষম। সপ্তাহে একবার আবির্ভাব হওয়া আর মাসের প্রতি প্রথম আর তৃতীয় শুক্রবার জানালার পাশে গিয়ে মুখ ভেঙালোই তার প্রধান কাজ। সে বুঝতে পারল না এই কর্তব্যে সে অবহেলা করবে কেমন করে? কথাটা সত্যি যে তার জীবনটা বড়ো নোংরা ছিল; কিন্তু আবার অন্য দিক থেকে যাকিছু অতি প্রাকৃতের সঙ্গে জড়িত তাদের সম্বন্ধে তার বিবেকটা ছিল বড়ো সজাগ। সেই জন্যে পরের তিনটি শনিবার যথারীতি সে বারান্দায় বেরিয়েছিল; কিন্তু কেউ তাকে দেখতে অথবা তার পায়ের শব্দ শুনতে যা পায় সে বিষয়ে সে খুব সতর্ক ছিল। এই উদ্দেশ্যে সে বুট খুলে ফেলল, ঘুণ-ধরা কাঠের তক্তার উপরে খুব আস্তে আস্তে হাঁটল, বেশ বড়ো কালো একটা ভেলভেটের আলখাল্লায় নিজেকে রাখল ঢেকে, আর শেকলগুলোকে মসৃণ করার জন্যে, যদিও এটা করতে তার খুবই কষ্ট হয়েছিল, তবুও সে 'রাইসিং সান লিউব্রিকেটর' ব্যবহার করল। একাজ করতে প্রথমে সে অপমানবোধ করেছিল; কিন্তু এই তেলের উপকারিতা বোঝার মতো জ্ঞান তার হয়েছিল। এতসব করার পরেও বারবার তাকে অপদস্ত হতে হল। প্রায় বারান্দার ওপরে দড়ি বেঁধে রাখত তারা। তার ফলে অন্ধকারে তাকে লাফিয়ে চলতে হত। একবার যমজ ভাই দুটি এমন এক কৌশল করেছিল যার ফলে তাকে ভীষণভাবে পড়ে যেতে হয়েছিল। এই শেষ অপমানটি তার এত বেশি লেগেছিল যে সে ঠিক করল—আর না, এবার তার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যে তাকে একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। সে ঠিক করে ফেলল পরের রাত্রিতে 'রেকলেস রুপার্ট' অথবা 'দ্য হেডলেস আর্ল'-এর যে বিখ্যাত ভূমিকায় সে অভিনয় করেছিল সেই বেশে ইটন-এ পড়া ওই দুটি উদ্ধত যুবককে একটা চরম শাস্তি সে দেবে।

সত্তর বছরেরও বেশি সে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি সুন্দরী লেডি বারবারা মোদিসকে সে যেদিন ভয়ে মুহ্যমান করে দিয়েছিল সেদিনই সে এই ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেছিল। সেই ভয়েই সে বর্তমান লর্ড ক্যানটারভিলে-এর পিতামহের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়ে সুন্দর যুবক জ্যাক ক্যাসলটনের সঙ্গে গ্রেটনা গ্রীন-এ পালিয়ে গিয়েছিল; বলেছিল, সন্ধে আর ভোরে যে বাড়ির বারান্দায় ভূত ঘুরে বেড়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে বেচারা জ্যাককে লর্ড

ক্যানটারভিলে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। তারই ফলে এক বছরের ভেতরেই ভগ্নহৃদয়ে লেডি বারবারা টার্নব্রিজ ওয়েলস-এ মারা গিয়েছিল। তবে সাজগোজটা শেষ বড়োই কঠিন। সেই সাজ সাজতে তার পুরো তিনটি ঘণ্টা লাগল। অবশেষে সাজগোজ শেষ হলে নিজের চেহারা দেখে সে বেশ খুশিই হল। একটা বেজে পনেরো মিনিটের সময় সে তার কুঠরি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গুঁড়ি দিয়ে বারান্দার ওপরে এসে দাঁড়াল। নীল পর্দা ঝোলানো থাকায় যে ঘরে যমজ ভাই দুটি থাকতো তাকে 'ব্লু বেড চেম্বার' বলা হত। ভালোভাবে ঢোকার জন্যে সে ধাক্কা দিয়ে কপাটটা খুল দিল। খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী জলের কুঁজো তার ওপরে পড়ে গেল; জল পড়ে তার চামড়া পর্যন্ত গেল ভিজে; ইঞ্চি দুয়েকের জন্যে তার বাঁ কাঁধটা কোনোরকমে বেঁচে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বিছানার ওপর থেকে চাপা গলার হাসি ভেসে এল। সমস্ত ব্যাপারটা তার স্নায়ুগুলিকে এমনভাবে বিকল করে দিল যে সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে তার ঘরে ফিরে এল। পরের দিন প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে সে শুয়ে রইল। তার একমাত্র সান্ত্বনা হল মাথাটাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি; গেলে কী সাংঘাতিক বিপদ ঘটত তা ঈশ্বরই জানেন।

সেই অভদ্র আমেরিকানদের ভয় দেখানোর বাসনা অতঃপর সে পরিত্যাগ করল। শব্দহীন স্লিপার পায়ে দিয়ে বারান্দায় গুঁড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েই সে খুশি হল; এই বেড়ানোর সময় ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গলায় সে একটা লাল মাফলার জড়াত; পাশে যমজ ভাইরা তাকে আক্রমণ করে এই ভয়ে হাতে সে রাখত সেকেলে একটা বন্দুক। শেষ ধাক্কা খেল সে ১৯শে সেপ্টেম্বর। কোনোরকম অপমানিত হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই এই মনে করে নীচের বিরাট ঘরে ঢোকার জন্যে সেদিন সে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী আর তাঁর স্ত্রীর যে দুটি ফটোগ্রাফ ছিল—কিছুদিন আগেও ওখানে টাঙানো থাকত ক্যানটারভিলে বংশের ছবি, সেইদিকে তাকিয়ে সে ঠাট্টা করছিল তাঁদের। তার পরনে ছিল কবরখানার ধাঁচের পরিচ্ছন্ন অথচ লম্বা পোশাক; চোয়ালটা বাধা ছিল বেগনে রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে হাতে ছিল কবর খননকারীর কোদাল। সত্যি কথা বলতে কি 'জোনাস দ্য গ্রেভলেস', অথবা 'চার্টসে বার্ন-এর করপস স্ন্যাচার'-এর ভূমিকায় যে পোশাক সে পরেছিল এটা সেই রকম। তার এই অভিনয় ক্যানটারভিলেদের মনে রাখার কথা; কারণ এই থেকে প্রতিবেশী লর্ড রুফোর্ড-এর সঙ্গে তাদের সত্যিকারের বিবাদ শুরু হয়। রাত্রি প্রায় দুটো বেজে মিনিট পনেরো হয়েছে। যতদূর সে জানত তখন কারও ঘুরে বেড়ানোর কথা নয়। রক্তের কোনো দাগ পড়েছে কিনা দেখার জন্যে সে যখন লাইব্রেরি ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঠিক সেই সময় অন্ধকার থেকে দুটি মূর্তি অকস্মাৎ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে উন্মত্তের মতো মাথার ওপরে হাত তুলে তার কানের কাছে চিৎকার করে বলল—বু—বু!!

অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল সে এবং সেই অবস্থায় ভয় পাওয়াটাই তার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভয় পেয়ে সে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল; কিন্তু দেখল মিঃ ওটিস তাঁর বিরাট 'গার্ডেন সিরিঞ্জ' নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এইভাবে দু'পাশে শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে, আর পালানোর কোনো প্রশস্ত পথ না পাওয়ার ফলে সে বিরাট লোহার স্টোভের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার ভাগ্য ভালো যে স্টোভটা নেবানো ছিল। চিমনির ভেতর দিয়ে কালিঝুলি মেখে এক কিম্ভুতকিমাকার অবস্থায় শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরে গিয়ে পৌঁছল সে।

এরপরে আর কোনোদিন সে রাত্রিতে বেড়াতে বেরতো না। যমজ ভাই দুটি অনেকবার তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকত; আর গোটা বারান্দাটায় সুপুরি ছড়িয়ে রাখত। এতে তাদের বাবা, মা আর চাকর-বাকর সবাই বিরক্ত হত। কিন্তু তাদের কাজ তার জন্যে ব্যাহত হয়নি। বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় ওদের ব্যবহারে সে এতই মর্মাহত হয়েছিল যে সে কিছুতেই বাইরে

বেরতে পারেনি। ফলে মিঃ ওটিস তাঁর অপরূপ সাংস্কৃতিক আসর বসানোর আয়োজন করলেন। ছেলেরা সব নানাজাতীয় খেলায় মেতে উঠল, ভার্জিনিয়া তার টাট্টু ঘোড়ার চেপে ঘুরতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়, আর চেশায়াবের যুবক ডিউক তার ছুটির শেষ সপ্তাহটা কাটাতে এল ক্যানটারভিলে চেস-এ। সবাই ভাবল ভুতটি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং মিঃ ওটিস লর্ড ক্যানটারভিলেকে এ-বিষয়ে দীর্ঘ একটি পত্র লিখলেন। উত্তরে লর্ড তাঁর স্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন।

সেদিক থেকে ওটিস প্রতারিত হয়েছিলেন। কারণ অকেজো হলেও, ভূত বাড়ি ছাড়েনি। বরং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে যখনই সে শুনল চেশায়ারের যুবক ডিউক ওখানে অতিথি হিসাবে আসছে তখনই সে আর একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। এরই বাবার কাকা লর্ড ফ্রানসিস স্টিলটন ক্যানটারভাইলের ভূতের সঙ্গে পাশা খেলবে বলে কর্নেল বারবারির সঙ্গে একবার একশো গিনি বাজি ধরেছিলেন। পরের দিন সকালে তাস খেলার ঘরে মেঝের ওপরে তিনি অসহায় অবস্থায় পক্ষাঘাতে পড়েছিলেন। তারপরে যদিও তিনি অনেক বছর বেঁচেছিলেন তবু আর কোনোদিন তিনি 'ডবল সিকসেস' ছাড়া আর কিছু বলতে পারেননি। যদিও এই ঘটনাটা তখনকার দিনে অনেকেই জানত তবু দুটি অভিজাত বংশের সম্মানের জন্যে ঘটনাটাকে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। স্টিলটনদের ওপরে তার যে প্রভাব এখনো রয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্যেই সে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই জন্য সে ঠিক করল ভার্জিনিয়ার প্রেমিকের কাছে সে 'ভাম্পায়ার মউক' অথবা 'ব্লডলেস বেনিডিকটাইন'-এর বেশ ধরে দেখা দেবে। এই অভিনয়টি লেডি স্টারটাপ ১৭৬৪ সালের নববর্ষের রাত্রিতে দেখেছিলেন; দেখেই ভয়ে চিৎকার করতে করতে তাঁর ফিট হল;আর তাতেই তিন দিনের দিন তিনি মারা গেলেন। মারা যাওয়ার সময় নিকট আত্মীয় ক্যানটারভিলেদের তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি তাঁর লন্ডনের ওষুধ বিক্রেতাকে দিয়ে গেলন। কিন্তু শেষকালে যমজ ভাইদের ভয়ে সেই পরিকল্পনা তাকে ছাড়তে হল।

এরই কয়েক দিন পরে একদিন ভার্জিনিয়া আর তার কোঁকড়ানো চুল-ওয়ালা প্রেমিক দুজনে ব্রকলে মাঠের দিকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে গেল। একটা বুনো ঝোপ পেরোতে গিয়ে ভার্জিনিয়া তার পোশাক এমন বিশ্রীভাবে ছিঁড়ল যে বাড়ি ফিরে সে ঠিক করল যাতে কেউ তাকে ওই অবস্থায় দেখতে না পায় সেই জন্যে সে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ঢুকবে। এই ভেবে সে ট্যাপেস্ট্রি চেম্বারের পাশ দিয়ে ছুটতে শুরু করল। চেম্বারের দরজাটা সামান্য একটু খোলা ছিল। তার মনে হল ভেতরে কেউ রয়েছে। তার মায়ের পরিচারিকা মাঝে-মাঝে ওইখানে বসে তার কাজকর্ম করত। সে ভাবল তাকেই সে তার পোশাকটা সেলাই করে দিতে বলবে। এই ভেবে ঘরের ভেতরে উঁকি দিল। উঁকি দিয়েই একেবারে অবাক হয়ে গেল। স্বয়ং ক্যানটারভিলে ভূত বসে রয়েছে সেখানে। জানালার ধারে বসে বসে ইয়োলো গাছের শুকনো সোনালি ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সোনালি ফুলগুলি বাতাসে উড়ছে; ঝড়ের আবেগে লাল পাতাগুল উন্মত্ত আবেগে দীর্ঘ পথের ওপরে বেড়াচ্ছে নেচে। একটা হাতের ওপরে মাথাটা রেখে সে বসে রয়েছে। দেখলেই মনে হবে তার সারা সত্তার ওপরে মারাত্মক রকমের একটা অবসাদ নেমে এসেছে। একেবারে নিঃসঙ্গ পরিত্যাক্ত মনে হল তাকে। এ-অবসাদ তার আর নয়। ভূতটিকে ওই অবস্থায় দেখে প্রথমেই তার মনে হয়েছিল ছুটে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে ঘরে ঢুকে পড়া; কিন্তু তারপরেই কেমন যেন দয়া হল তার। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বাসনায় ভার্জিনিয়া উদ্বুদ্ধ হয়ে হালকা পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। ভূতটি দুঃখ আর হতাশায় এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে কথা না বলা পর্যন্ত ভার্জিনিয়ার উপস্থিতি সে টেরই পায়নি।

ভার্জিনিয়া বলল—আপনার জন্যে আমি দুঃখিত; কিন্তু আমার ভাইরা কালই ইটন-এ পড়তে চলে যাচ্ছে। এরপর থেকে আপনি যদি ভালোভাবে চলাফেরা করেন তাহলে আপনাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

সেই সুন্দরী মেয়েটি যে তার সঙ্গে কথা বলবে এটা ভাবতে না পেরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ভূত বলল—আবোল—তাবোল বলে তো লাভ নেই—ভালোভাবে চলাফেরা করার কথা—সে অসম্বব—যা হয় না তাই, উদ্ভট ব্যাপার। আমাকে শেকলের শব্দ করতে কথা—সে অসম্ভব—যা হয় না তাই, উদ্ভট ব্যাপার। আমাকে শেকলের শব্দ করতে হবে, ঝাঁঝরির ভেতর দিয়ে গোঙাতে হবে—রাত্রিতে বারান্দায় বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে হবে। অবশ্য ভালোভাবে চলাফেরা বলতে এই যদি তুমি বোঝতে চাও সেটা হল অন্য কথা। আমার অস্তিত্বের কারণ একমাত্র ওইগুলিই।

উঁহু! অস্তিত্ব বজায় রাখার ওটা করণই হতে পারে না। তাছাড়া, আপনি যে খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন তা আপনি নিজেও জানেন। যেদিন আমরা এখানে প্রথম এলাম সেইদিনই মিসেস উমনে আমাদের বলেছেন যে আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছিলেন।

ভূত বিরক্ত হয়ে বলল—সেকথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সেটা আমার ঘরোয়া ব্যাপার। সেবিষয়ে আর কারও কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।

নীতির কথা শুরু হলে ভার্জিনিয়া মাঝে-মাঝে একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে। এই কথা শুনে সে বলল—কাউকে হত্যা করাটা অন্যায়।

বস্তুনিরপেক্ষ নীতির সস্তা বাড়াবাড়িটাকে আমি ঘৃণা করি। আমার স্ত্রী ছিল একেবারে অকর্মা। সে কোনোদিন আমার জামার কলারে মাড় দিল না; আর রান্নার ব্যাপারে সে ছিল একেবারে অপদার্থ। তোমাকে বলব কী, একবার 'হোগলে' বনে আমি একটা খরগোস শিকার করেছিলাম। কী অদ্ভুত মাংস তার! তুমি জান সেটা কী বিশ্রী রান্না করল সে। একেবারে অখাদ্য। সে সব কথা থাকগে। সে সব চুকেবুকে গেছে। কিন্তু তাদের বোনকে খুন করলেও তার ভাইদের উচিত হয়নি আমাকে অনাহারে মেরে ফেলা।

অনাহারে মেরে ফেলা! হায় মিষ্টার ভূত, অর্থাৎ, স্যার সাইমন, আপনার কি খিদে পেয়েছে? আমার ব্যাগে স্যানডউইচ রয়েছে। খাবেন?

না, ধন্যবাদ। আজকাল আমি আর কিছু খাই নে। তুমি যে বললে এতেই আমি খুশি। তোমাদের ওই বর্বর, অসৎ, ভয়ঙ্কর আর যাচ্ছেতাই রুচির পরিবারবর্গের তুলনায় তুমি অনেক ভালো।

ভার্জিনিয়া মেঝের উপর পা ঠুকে বলল—চুপ। আপনি নিজেই বর্বর, ভয়ঙ্কর আর যাচ্ছেতাই। আর অসৎ হওয়ার কথা যদি বলেন তা হলে বলতে হয় আপনিই আমার রঙের বাক্স থেকে রঙ চুরি করে লাইব্রেরি ঘরে ওই রক্তের দাগ এঁকেছিলেন। আমরা তো হেসে মরে যাই। প্রথমে আপনি নিলেন সিঁদুরসুদ্ধ সব লাল রঙ। ফলে, সূর্যাস্তের ছবি আঁকা আমার বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে আপনি চুরি করলেন আমার এমারেল্ড-গ্রীন আর ক্রোম ইয়োলো। শেষকালে পড়ে রইল কেবল ইনডিগো আর চাইনিস হোয়াইট। এখন আমি চাঁদনি রাতের ছবি ছাড়া আর কিছুই আঁকতে পারি নে। এই দৃশ্য কেবল যে মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তাই নয়, আঁকাও বড়ো কষ্টকর। যদিও আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলেম তবু এবিষয়ে আপনাকে আমি

কিছু বলিনি। তাছাড়া, সমস্ত ব্যাপারটাই বড়ো হাস্যকর। করাণ, রক্তের রঙ এমারেল্ড-গ্রীন হবে একথা কেউ কোনো দিন শুনেছে?

ভূতটি শান্ত আর বিনয়ের সঙ্গেই বলল—তা বটে। কিন্তু আমার করারই বা কী ছিল? আজকাল সত্যিকার রঙ পাওয়া মুস্কিল। তাছাড়া, তোমার ভাই যখন 'প্যারগান ডিটারজেনট'-এর সাহায্য নিলে তখন তোমার রঙ চুরি করতেই বা আমার দোষটা কোথায়? আর রঙের কথা যদি বল ওটা হচ্ছে রুচির কথা। ক্যানটারভিলেদের ধমনীতে নীল রক্ত বইছে—ইংলন্ডে সবচেয়ে গাঢ় নীলও বলতে পার—; কিন্তু আমি জানি তোমরা যারা আমেরিকান তাদের ওসব বালাই নেই।

আপনি কিছুই জানেন না। আপনার উচিত আমেরিকা গিয়ে নিজের মানসিক বৃত্তির উন্নতি করা। আমেরিকায় বিনা খরচে যদি যেতে চান তাহলে আমার বাবা আপনাকে খুশি হয়েই সাহায্য করতে পারেন। যদিও ওখানে সব রকম 'স্পিরিটের' ওপরেই বেশ মোটা সুল্ক রয়েছে তবু কাস্টমস-এর হাত থেকে রেহাই পেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। কারণ, ওই বিভাগের অফিসাররা সবাই ডেমোক্র্যাট। একবার নিউ ইয়র্কে হাজির হলেই আপনি নিশ্চয় উন্নতি করবেন। আমি জানি সেখানে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা পিতামহ সংগ্রহ করার জন্যে এক লক্ষ ডলার দিতে রাজি হবে; আর ঘরোয়া ভূত পেলে তো কথাই নেই।

না—না। আমেরিকা আমার ভালো লাগবে না।

ভার্জিনিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলল—মনে হচ্ছে আপনার কোনো ধ্বংসও নেই, কোনো কৌতূহলও নেই।

ধ্বংসও নেই! কৌতূহলও নেই! তোমাদের আছে নৌবিভাগ আর আচার!

আমি চললাম। বাবাকে গিয়ে ব লি যমজ ভাইদের জন্যে যেন তিনি আরো এক সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত করেন।

ভূত চিৎকার করে উঠল—না, না। আমি নিঃসঙ্গ, বড়ো দুঃখ আমার। কী যে করি বুঝতে পারছি নে। আমি ঘুমোতে চাই; কিন্তু ঘুমোতে পারছি নে।

কী কথা যে বলেন! ঘুমোতে হলে স্রেফ বিছানায় শুয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিন। মাঝে-মাঝে জেগে থাকাটা বড়ো কষ্টকর মনে হয়, বিশেষ করে গির্জায়। কিন্তু ঘুমোতে কোনো অসুবিধে নেই। এমন কি শিশুরাও ঘুমোতে জানে। তাদের যে বেশি বুদ্ধি রয়েছে সেকথা আপনিও স্বীকার করবেন না।

ভূত খুব দুঃখের সঙ্গে বলল—তিনশো বছর আমি ঘুমোইনি।

কথাটা শুনে ভার্জিনিয়ার সুন্দর চোখ দুটি অবার বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

ভূত বলে গেল—তিনশো বছর আমি ঘুমোইনি। আমি বড়ো ক্লান্ত।

ভার্জিনিয়া বলল—হতভাগ্য, হতভাগ্য ভূত! তোমার কি ঘুমানোর কোনো জায়গা নেই?

নীচু স্বপ্নালু স্বরে ভূত বলল—দূরে...দূরে পাইনবন ছাড়িয়ে ছোটো একটা বাগান রয়েছে।

সেখানে লম্বা ঘাস ঘন হয়ে জন্মেছে। সাদা হেমলক ফুলের সমারোহ জেগেছে সেখানে। সারা রাত ধরে নাইটিংগেল পাখি সেখানে গান করে। সেখানে ঘুমন্ত আত্মার মাথার ওপর ইউ গাছগুলি তাদের বিরাট হাতগুলি দেয় ছড়িয়ে।

জলে ভারর্জিনিয়ার চোখ দুটি ভিজে গেল; হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে। আস্তে-আস্তে সে বলল—মৃত্যুর উদ্যানের কথা বলছ?

হ্যাঁ, মৃত্যু। মৃত্যু সত্যিই বড়ো মধুর। নরম তামাটে মাটির তলায় শুয়ে থাকা; মাথার ওপরে ঘাসগুলি বীজন করবে কোন পেতে শুনবে স্তব্ধতার বাণী। ভূত-ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না আর। সময়ের জ্ঞান যাবে হারিয়ে; জীবনকে ক্ষমা করা, নিজেরে মধ্যে শান্তিকে অনুভব করা কী মধুর! তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার? মৃত্যুর দ্বার আমার জন্যে তুমি খুলে দিতে পার। কারণ প্রেম তোমার সঙ্গী। আর মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের ক্ষমতা অনেক বেশি।

কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছিন্ন হয়ে গেল ভার্জিনিয়া। মনে হল সে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছে।

তারপরে আবার কথা বলল ভূত। বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনাল তার স্বর: লাইব্রেরির জানালার ওপর পুরনো যে একটি ভবিষ্যৎবাণী লেখা রয়েছে তা কি তুমি পড়েছ?

মেয়েটি ওপর দিকে চোখ তুলে বলল—খুব পড়েছি। ভালো ভাবেই পড়েছি। অদ্ভুত কালো কালো অক্ষরে লেখা। পড়া খুবই কষ্টকর। মাত্র দুটো লাইন লেখা রয়েছে। সোজা কথায় বললে দাঁড়ায়—'কোনো সোনালি মেয়েকে দেখে পাপীর মুখ থেকে যেদিন প্রার্থনার বাণী উচ্চারিত হবে, যেদিন বন্ধ্যা বাদাম গাছে ফুলের সমারোহ জাগবে, যেদিন কোনো শিশু তার চোখের জল ফেলবে সেই দিনই সারা বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে যাবে। শান্তি নেমে আসবে ক্যানটারভাইলে।' কিন্তু এর অর্থ যে কী তা আমি জানি নে।

সে দুঃখের সঙ্গে বলল—অর্থ হচ্ছে আমার পাপের জন্যে তোমাকে কাঁদতে হবে। কারণ, আমার চোখে কোনো জল নেই, আমার আত্মার জন্যে আমার সঙ্গে তোমাকে প্রার্থনা করতে হবে। কারণ, আমার কোনো বিশ্বাস নেই তারপর আমার সঙ্গে যদি তুমি মিষ্টি আর সদয় ব্যবহার করে থাক তাহলে মৃত্যুর দেবদূত আমাকে দয়া করবেন। অন্ধকারে তুমি ভয়াল ছায়াদের ঘুরে বেড়াতে দেখবে, অমঙ্গলের স্বর তোমার কানে-কানে ফিস ফিস করে অনেক কিছু বলবে; কিন্তু তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ নরকের শক্তি শিশুর পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে না।

ভার্জিনিয়া কোনো উত্তর দিল না। তার দিকে তাকিয়ে গভীর নৈরাশ্যে ভূতটি তার নিজের হাত দুটো মোচড়াতে লাগল। হঠাৎ ভার্জিনিয়া বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত আলোর জ্যোতি বেরোতে লাগল। সে শক্ত হয়ে বলল—আমি ভয় পাই নে; তোমার ওপারে দয়া দেখাতে দেবদূতকে আমি বলব।

একটা ক্ষীণ আনন্দের ধ্বনি তুলে সে উঠে দাঁড়াল, তারপরে তার হাতটা ধরে পুরনো যুগের ভঙ্গিমায় চুমু খেল। তার আঙুলগুলি বরফের মতো ঠান্ডা; ঠোঁট দুটো আগুনের মতো গরম। ভার্জিনিয়া কাঁপল না সে তাকে হাত ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর দিয়ে নিয়ে গেল। বিবর্ণ দেওয়াল চিত্রের উপরে খুদে খুদে শিকারিদের চিত্র আঁকা রয়েছে। তারা তাদের শিঙা ফুঁকে তাকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। 'খুদে ভার্জিনিয়া চলে যাও, চলে যাও।' কিন্তু ভূত তার হাত শক্ত করে ধরে রইল। সে বন্ধ করে রইল তার চোখ দুটো। ভীষণ ভীষণ জানোয়াররা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। 'সাবধান, ছোটো ভার্জিনিয়া, সাবধান। আর হয়তো আমরা তোমাকে দেখতে পাব না।' কিন্তু ভূতটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল এবং ভার্জিনিয়া তাদের কথায় কান দিল না। ঘরের শেষে গিয়ে সে থেমে কী যেন বলল। ভার্জিনিয়া তা বুঝতে পারল না। চোখ খুলে সে দেখল ঘরের দেওয়ালটা কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। তার সামনেই বিরাট একটা গর্ত। কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে। যেন তার পোশাক ধরে টানছে। ভূতটি বলল—তাড়াতাড়ি। তা না হলে বড়ো দেরি হয়ে যাবে।

মিনিট দশেক পরে চা খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল। ভার্জিনিয়া না আসায় মিসেস ওটিস তাকে ডেকে আনার জন্যে চাকর পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরে চাকরটি ঘুরে এসে জানাল তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডিনার টেবিলের জন্যে ভার্জিনিয়া প্রতিদিন বাগানে ফুল তুলতে যেত। সেইজন্যে মিসেস ওটিস প্রথমে বিশেষ ভয় পাননি। কিন্তু ছ'টা বাজার পরেও যখন ভার্জিনিয়া এল না তখনই তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। উদ্বিগ্ন হয়েই ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন তার খোঁজে; আর মিঃ ওটিস-এর সঙ্গে নিজে প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। সাড়ে ছ'টা নাগাদ ছেলেরা ফিরে এসে জানাল তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং সেই বিশেষ ক্ষেত্রে কী করা উচিত সে সম্বন্ধে কেউ কিছু ঠিক করতে পারলেন না। ঠিক এই সময় হঠাৎ মিঃ ওটিসের মনে পড়ল যে দিন কয়েক আগে একদল জিপেসিকে তাঁর পার্কে তাঁবু ফেলতে অনুমতি দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই বড়ো ছেলে আর দুটি চাকরকে নিয়ে তিনি 'ব্র্যাকফেল হলো'র দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জানতেন জিপেসিরা ওখানেই তখন রয়েছে। বাচ্চা ডিউক তো মরিয়া হয়ে বলল সেও সঙ্গে যাবে। কিন্তু মারামারি বাধতে পারে এই ভয়ে মিঃ ওটিস রাজি হলেন না। সেইখানে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন জিপেসিরা চলে গিয়েছে—আর চলে গিয়েছে হঠাৎ। ওয়াশিংটন আর দুটি চাকরকে চারপাশ খুঁজতে বলে তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে দেশের সর্বত্র পুলিশকে টেলিগ্রাম করে দিলেন এই বলে যে জিপেসিরা একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তারপরে তিনি ঘোড়া থামাতে বলে স্ত্রী আর তিনটি ছেলেদের ডিনারে বসতে বললেন। তারপরে একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলেন অ্যাসকট রোড-এর দিকে। মাত্র দু'মাইলও তিনি যাননি এমন সময় তাঁর মনে হল কে যেন ঘোড়ায় চেপে তাঁর পেছনে-পেছনে আসছে। ঘুরে চেয়ে দেখলেন টাট্টুতে চেপে ডিউক দৌড়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ছেলেটি বলল—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিঃ ওটিস; কিন্তু ভার্জিনিয়াকে না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত আমি খেতে পারলাম না। আমার ওপরে দয়া করে রাগ করবেন না। গত বছর আমাদের বিয়েথে আপনি যদি রাজি হতেন তাহলে এসব ঝামেলা বাধত না। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না তো? আমি যেতে পারি নে। আমি যাব না।

মন্ত্রী সেই সুন্দর সব-সময় বিপদাপন্ন যুবকটির দিকে চেয়ে না হেসে পারলেন না। ভার্জিনিয়ার ওপরে তার এই আকর্ষণ দেখে মুগ্ধও হলেন একটু। সেই জন্যে ঘোড়া থেকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন—ঠিক আছে সিসিল। ফিরে যেতে না চাইলে নিশ্চয় তুমি আমার সঙ্গে আসবে। কিন্তু অ্যাসকট-এ গিয়ে তোমার জন্যে একটা টুপি কিনে দেব চল।

এই বলেই দুজনে ঘোড়ায় চড়ে রেল স্টেশনের দিকে ছুটলেন। সেখানে স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন ভার্জিনিয়ার চেহারার কাউকে স্টেশনে দেখা গিয়েছে কি না। কিন্তু সেখানে তার কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। স্টেশন মাস্টার অবশ্য চারপাশে তার পাঠিয়ে দিয়ে জানালেন যে চারপাশে তাকে খুঁজে বার করার জন্যে তীক্ষ্ণ প্রহরী রাখা হবে। এই শুনে ডিউকের জন্যে একটা টুপি কিনে মিঃ ওটিস বেকসলের দিকে ছুটলেন। জায়গাটা ওখান থেকে মাইল চারেক দূরে একটা গ্রাম। তিনি শুনেছিলেন জায়গাটার পাশেই বিরাট একটা মাঠ থাকায় জিপসিরা সাধারণত ওইখানে ডেরা পাততে ভালোবাসে। সেখানে গিয়ে তাঁরা গ্রাম্য চৌকিদারকে ডেকে তুললেন; কিন্তু ভার্জিনিয়ার কোনো সংবাদ সে দিতে পারল না। কোথাও কোনো সংবাদ না পেয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। লন্ঠন নিয়ে গেটের কাছে ওয়াশিংটন আর দুটি যমজ ভাই তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ভার্জিনিয়ার কোথাও কোনো সংবাদ নেই। আবার অন্বেষণ শুরু হল; কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল তাঁদের। স্পষ্টই বোঝা গেল অন্তত সেই রাত্রির মতো ভার্জিনিয়াকে তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। খুব দুঃখের সঙ্গে ঘোড়া দুটিকে সহিসের হাতে তুলে দিয়ে মিঃ ওটিস ছেলেদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। ঘরে এসে সবাই দেখলেন চাকররা সব ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। মিসেস ওটিস একটা সোফার ওপরে শুয়ে রয়েছেন। উদ্বেগে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। ওকটি পরিচারিকা তাঁর কপালে ও-ডি-কোলন-কোলন দিচ্ছে। মিঃ ওটিস মুখে কিছু দেওয়ার জন্যে তাঁকে বারবার অনুরোধ করে আর সকলের জন্যে ডিনার তৈরি করতে নির্দেশদিলেন। খুবই দুঃখের সঙ্গেই আহারপর্ব সমাধা হল তাঁদের। খাওয়ার সময় কেউ কোনো কথা বলল না। খাওয়ার শেষ হওয়ার পরে সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করেই সবাইকে তিনি ঘুমাতে যাওয়ার হুকুম দিলেন। যে হেতু তাঁদের দিক থেকে করণীয় কিছু নেই সেই হেতু তিনি ঠিক করলেন একজন ডিটেকটিভকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। পরের দিন সকালেই তিনি স্কটল্যানড ইয়ার্ডে টেলিফোন করবেন। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে গম্বুজের ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ হল; আর বারোটার শেষ ঘন্টাটি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাঠৎ যেন কিছু একটা ভেঙে পড়ে যাওয়ার শব্দ এল; সেই সঙ্গে শোনা গেল অকস্মাৎ তীব্র একটা আর্তনাদ। ভয়ঙ্কর বজ্রপাতে কেঁপে উঠল বাড়ি, অপার্থিব সঙ্গীতের একটা সুর ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, বিকট শব্দে সিঁড়ির মাথার ওপরে একটা কাঠের তক্তা ভেঙে পড়ল; আর তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিবর্ণ মুখে ভার্জিনিয়া। তার হাতে একটা ছোটো বাক্স। মুহূর্তের মধ্যে সবাই তার দিকে ছুটে গেলেন। মিসে ওটিস দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে, ডিউক তাকে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল; আর সকলকে ঘিরে যমজ ভাই দুটি উন্মাদের মতো নাচতে শুরু করল।

সকলের সঙ্গে ভার্জিনিয়া এতক্ষণ রসিকতা করছিল এই মনে করে মিঃ ওটিস রাগ করে বললেন—হা ঈশ্বর! এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমরা তোমার খোঁজে সারা দেশটা ঘুরে বেড়ালম। তোমার মা তো ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছেন। আর কোনোদনি এইরকম বাস্তব ঠাট্টা তুমি করবে না—বলে দিচ্ছি।

নাচতে-নাচতে যমজ ভাই দুটি বলল—অবশ্য এক ভূতের ওপরে ছাড়া।

ভার্জিনিয়া শান্তভাবে বলল—বাবা, আমি ভূতটির কাছেই এতক্ষণ ছিলাম। সে মারা গিয়েছে।

তোমরা তাকে দেখবে চল। সে সত্যিই বড়ো পাপ করে ছিল। তার জন্যে সে অনুতপ্ত হয়েছে। মারা যাওয়ার আগে সে আমাকে এই সব মণিমুক্তো দিয়ে গিয়েছে।

তার সেই গম্ভীর থমথমে ভাব দেখে সবাই তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তাঁদের ভাঙা দেওয়ালের ভেতর দিয়ে সরু একটা গোপন বারান্দায় নিয়ে এল। বাতি জ্বালিয়ে ওয়াশিংটন তাঁদের পিছু পিছু চলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা একটি ওক কাঠের বিরাট দরজার সামনে উপস্থিত হলেন। সেই দরজার গায়ে মরচে-পড়া পেরেক গাঁথা রয়েছে। ভার্জিনিয়া তার গায়ে হাত দিতেই সেটা হাট হয়ে খুলে গেল। তাঁরা একটা চোরা কুঠরির মধ্যে হাজির হলেন। এর ছাদ নীচু। একটা মাত্র জাফরি দেওয়া ছোটো জানালা সেই ঘরে রয়েছে। দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা রয়েছে বিরাট একটা লোহার বালা। তার সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা একটা শীর্ণ কঙ্কাল। মেঝের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে কঙ্কালটি। তার কাছ থেকে একটু দূরে নাগালের বাইরে একটা পুরনো খাবারের পাত্র আর কলসি বসানো। দেখে মনে হল কঙ্কালটি তার শীর্ণ হাত দিয়ে সেই দুটি পাত্রকে ধরার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওই কলসিতে সম্ভবত একদিন জল ছিল। সেই জলের সবুজ দাগ এখনো তার ভেতরে লেগে ছিল। ভার্জিনিয়া সেই কঙ্কালের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে হাত দুটি জড়ো করে নিঃশব্দে প্রার্থনা করল। বাকি সবাই সেই করুণ ঘটনাটির দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই ঘটনাটি তখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই ছিল।

ওই কুঠরিটা বাড়ির কোন অংশে তা জানার জন্যে যমজ ভাই দুটি এতক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—দেখ, দেখ; ওই শুকনো বাদাম গাছে ফুল ফুটেছে। এখান থেকে আমি তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

দাঁড়িয়ে উঠল ভার্জিনিয়া। তার মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল একটি স্বর্গীয় দ্যুতি। সে বলল—ঈশ্বর ওঁকে ক্ষমা করেছেন।

ডিউক চেঁচিয়ে বলল—তুমি একজন দেবকুমারী ভার্জিনিয়া।

এই বলে ভার্জিনিয়াকে জড়িয়ে ধরে সে তাকে চুমু খেল।

এই অদ্ভুত ঘটনার চারদিন পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হল। শবযাত্রা শুরু হল ক্যানটারভিলে চেস থেকে রাত্রি প্রায় এগারোটার সময়। আটটি কালো ঘোড়া শবাধারটিকে টেনে নিয়ে গেল। ঘোড়ার মাথায় ছিল উটপাখির পালকের নিশান। সীসের কফিনের ওপরে ঢাকা ছিল লাল কাপড়ের একটা আবরণ; তার ওপরে আঁকা ছিল ক্যানটারভিলে কোর্ট-অফ-আর্মস। শবাধারবাহী গাড়ির আশেপাশে মশাল জ্বালিয়ে চলছিল চাকর-বাকরদের দল। সমস্ত শোভাযাত্রাটিই বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। প্রধান শোককর্তা ছিলেন লর্ড ক্যানটারভিলে। ওয়েলস থেকে বিশেষ করে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতেই তিনি এসেছিলেন। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তিনি বসেছিলেন প্রথম গাড়িটিতে। তারপরে ছিলেন সস্ত্রীক যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী, তারপরে ওয়াশিংটন; তিনটি ছেলে তারপরে। সকলের শেষে ছিলেন মিসেস উমনে। তাঁর জীবনের পঞ্চাশটি বছর ভূতটি তাঁকে বিব্রত করেছিল বলেই তিনি যে তার শেষকৃত্যটা দেখবেন এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। গির্জার এক কোণে বৃদ্ধ একটি ইউ গাছের তলায় গভীর গর্ত খোঁড়া হল। রেভা. আগস্টাস ডামপিয়ার বেশ গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে প্রার্থনার পদগুলি পড়লেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে ক্যানটারভিলে বংশের প্রথা অনুযায়ী চাকররা তাদের মশালগুলি নিবিয়ে দিল। কফিনটাকে মাটির তলায় নামানোর সময় ভার্জিনিয়া এগিয়ে গিয়ে সাদা আর ফিকে রঙের বাদামের ফুল দিয়ে তৈরি করা বড়ো

একটা ক্রুশ তার ওপরে রাখলে মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠল আর সেই ছোটো গির্জার কবরখানাতে ছড়িয়ে দিল রুপোর আলো। দূর থেকে গান করতে লাগল। একটি নাইটিংগেল পাখি।

পরের দিন সকালে লর্ড ক্যানটারভিলে শহরে ফিরে যাওয়ার আগে ভূতটি ভার্জিনিয়াকে যে মুক্তোর বাক্সটি দিয়েছে সে সম্বন্ধে মিঃ ওটিস তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে বসলেন। মুক্তোর গয়নাগুলি ষোড়শ শতাব্দীর; মূল্য আর শিল্পকলার দিক থেকে সেগুলি অনবদ্য। তাই সেগুলি গ্রহণ করতে মিঃ ওটিসের বিবেকে লাগছিল। তিনি বললেন—মি লর্ড, এদেশে দানপত্রের সঙ্গে জমি আর ছোটো-খাটো অলঙ্কার দেওয়ার প্রথা রয়েছে। আর এটা আমার কাছে খুবই পরিষ্কার যে ওই সব অলঙ্কারগুলিই নীতিগতভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে আপনারই বংশের প্রাপ্য। সেই জন্যে বিশেষ একটি অজ্ঞাত পরিস্থিতিতে আবিষ্কৃত ওই রত্নগুলি সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে যেতে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি। আমার মেয়ের কথা যদি বলেন তাহলে বলব ও হচ্ছে বাচ্চা। তাছাড়া, ওই রকম অলঙ্কার নিয়ে, অলস বিলাসিতায় জীবন কাটাতেও সে অভ্যস্ত বা উৎসুক নয়। মিসেস ওটিসের আর্টের বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কারণ বাল্য বয়সে কয়েকটি শীত তিনি বোস্টনে কাটিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে ওই অলঙ্কারগুলি বিক্রি করলে অনেক দাম পাওয়া যাবে। এই সব কারণে লর্ড ক্যানটারভিলে, আপনি বেশ বুঝতে পারছেন ওইগুলি আমার পরিবারে কেন রাখতে আমি রাজি হচ্ছি নে। আর সত্যি কথা বলতে কি এই সব মূল্যবান জমকালো অলঙ্কার ব্রিটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে যতই গৌরবজনক বলে মনে হোক না কেন আমাদের মতো যারা রিপাবলিকানের সাধারণ আর অমর নীতিতে মানুষ হয়ে উঠেছে তাদের কাছে ওদের কোনো দাম নেই। অবশ্য একথাটা আমি উল্লেখ করতে চাই যে আপনার হতভাগ্য আর বিপথগামী পূর্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ওই বাক্সটি নিজের কাছে রাখতে পারলে ভার্জিনিয়া খুশি হবে বাক্সটা অতি পুরাতন আর সেই সঙ্গে সংস্কারের বাইরে চলে গিয়েছে বলেই আমার ধারণা আমার অনুরোধ রাখাটা আপনার কাছে কষ্টকর হবে না। আমার কথা যদি বলেন তাহলে একথা বলতে আমি বাধ্য যে আমার কোনো সন্তানের মধ্যযুগীয় কোনো জিনিসের ওপরে যে আকর্ষণ রয়েছে তা জানতে পেরে আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। এর একমাত্র কারণ সম্ভবত এই যে মিসেস ওটিস এথেন্স থেকে ফেরার পথে লন্ডনের একটি শহরতলিতে দিন কতক যখন অবস্থান করছিলেন সেই সময়েই ওর জন্ম হয়েছিল।

এই সম্মানিত মন্ত্রীর কথাগুলি বেশ গম্ভীরভাবেই মুচকি-মুচকি হাসতে-হাসতে লর্ড ক্যানটারভিলে শুনছিলেন। মন্ত্রী মহোদয়ের কথা শেষ হওয়ার পরে তিনি বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে তাঁর করমর্দন করে বললেন—প্রিয় স্যার, আপনার সুন্দরী কন্যা আমার হতভাগ্য পূর্বপুরুষ স্যার সাইমনের যথেষ্ট উপকার করেছে। সেদিক থেকে তার এই সাহসের জন্যে আমি এবং আমার বংশের সকলেই তার কাছে কৃতজ্ঞ। ওই অলঙ্কারগুলি ন্যায়ত তারই প্রাপ্য। তাছাড়া, হৃদয়হীনের মতো ওই অলঙ্কারগুলি আমি যদি তার কাছ থেকে নিয়ে চলে যাই তাহলে আমায় বিশ্বাস সেই দুষ্ট বৃদ্ধটি এক পক্ষের মধ্যেই তার কবরখানা থেকে উঠে আমার একেবারে প্রাণান্ত করে ছেড়ে দেবে। উত্তরাধিকারের কথা যদি বলেন তাহলে বলতে পারি যে উইল-এ যা লেখা নেই তা কখনো উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য নয়। ওই রত্নগুলির অস্তিত্ব আমরা কেউ জানতাম না। সেদিক থেকে বিচার করলে ওই রত্নগুলির ওপরে আমার যদি কোনো অধিকার থাকে, তাহলে আপনার হেড বাবুটিরও সেই একই অধিকার রয়েছে। তাছাড়া, মিঃ ওটিস আপনি হয়তো ভুলে যাচ্ছেন যে সভূত বাড়িটাকেই আপনি কিনেছিলেন; সুতরাং ভূতের যদি কোনো সম্পত্তি থেকে থাকে সে-সম্পত্তিও আপনারই। কারণ স্যার সাইমন রাত্রিতে বারান্দার ওপরে ঘুরে বেড়ালেও, আইনের দিক থেকে তিনি মৃত, এবং দাম দিয়েই

আপনি তাঁর সম্পত্তি কেনে নিয়েছিলেন।

লর্ড ক্যানটারভাইলের এবম্বিধ প্রত্যাখ্যানে মিঃ ওটিস খুবই মর্মাহত হলেন, তাঁর মতটা পুনর্বিবেচনা করার জন্যে অনুরোধও আর একবার তাঁকে করলেন; কিন্তু সৎ-বুদ্ধিসম্পন্ন লর্ড তাঁর মতে অবিচল হয়ে রইলেন। ভূতের সম্পত্তি রেখে দেওয়া ছাড়া মিঃ ওটিসের আর কোনো উপায় রইল না।

১৮৯০ সালের বসন্তকালে যখন চেশায়ারের যুবতী ডাচেসের বিবাহ উপলক্ষে তাকে রানির প্রথম ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাওয়া হল তখন সবাই তার অলঙ্কারগুলি দেখে একেবারে ধন্য-ধন্য করে উঠল। ভার্জিনিয়া আর যুবক ডিউকের বিয়েতে সবাই আনন্দিত হল; কারণ এমন রাজযোটক মিল নাকি সহজে কারও চোখে পড়ে না। খুশি হলেন না কেবল ডাম্বলটনের মারশনেস। ভদ্রমহিলার সাতটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল। তাদের একটিকে ডিউকের ঘাড়ে চাপানোর জন্যে তিন তিন বার বেশ মোটা খরচ করে ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে সেই পার্টিতে মিঃ ওটিসকেও তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মিঃ ওটিস ডিউককে খুবই পছন্দ করতেন; কিন্তু নীতিগতভাবে তার ওই খেতাবটি তাঁর কাছে ছিল বড়োই অবান্তর। কিন্তু আপত্তি শেষ পর্যন্ত তাঁর ধোপে টেকেনি। আমার মনে হয় বর আর বধূ হাত ধরাধরি করে যখন সেন্ট জর্জে গির্জার বেদির কাছে ঘুরছিল তখন ইংলন্ডের মধ্যে মিঃ ওটিসের মতো গর্বিত মানুষ আর কেউ ছিল না।

বিবাহ বাসর উদ্‌যাপন করে ডিউক আর ডাচেস ক্যানটারভিলে চেস-এ যেদিন ফিরে এল তার পরের দিন বিকেলের দিকে তারা হাঁটতে হাঁটতে পাইনবনে ঘেরা নির্জনে সমাধির কাছে হাজির হল। স্যার সাইমনের সমাধি ফলকটি খুঁজে বার করতে তাদের কষ্ট হয়েছিল যথেষ্ট। ডাচেস সঙ্গে নিয়ে এসেছিল কয়েকটি সুন্দর গোলাপ। সেইগুলি সে সমাধির ওপরে ছড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তারা ধ্বংসপ্রায় সমাধিগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেইখানে একটি ভাঙা স্তম্ভের ধারে ডাচেস বসে পড়ল, সিগারেট খেতে-খেতে ডিউক তার পায়ের কাছে বসে তার সুন্দর চোখ দুটির দিকে রইল তাকিয়ে। ডিউক হঠাৎ তার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ডাচেসের হাতটা ধরে বলল—ভার্জিনিয়া, কোনো স্ত্রীর তার স্বামীর কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা উচিত নয়।

প্রিয় সিসিল, আমি তো কিছু লুকিয়ে রাখিনি।

ডিউক হেসে বলল—রেখেছ। ভূতের সঙ্গে ঘরের মধ্যে থাকার সময় তোমার কী কথা হয়েছিল সেকথা তো বলনি।

ভার্জিনিয়া গম্ভীরবাবে বলল—সেকথা আমি কাউকে বলিনি।

আমি তা জানি; কিন্তু আমাকে বলতে পার।

দয়া করে আমাকে তা বলতে বলো না, সিসিল। আমি তা বলতে পারব না। হতভাগ্য স্যার সাইমন! তাঁর কাছে আমি সত্যিই বড়ো ঋণী। হেসো না, সত্যিই বলছি ঋণী। তাঁর কাছ থেকেই আমি বুঝতে পরেছি জীবন কী জিনিস, মৃত্যু বলতে কী বোঝায়; আর প্রেম ওদের চেয়ে কেন হমত্তর।

ডিউক উঠে তার স্ত্রীকে চুমু খেল।

তোমার ওই হৃদয়টা যতক্ষণ আমার থাকবে ততক্ষণ ওই কথাটা তুমি গোপন করেই রেখ।

আমার হৃদয় চিরকাল তোমারই থাকবে, সিসিল।

আমাদের সন্তানদের সেই কথাটা একদিন তুমি বলবে—বলবে না?

লজ্জায় ভার্জিনিয়ার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

ডোরিয়েন গ্রে-র ছবি
The Picture of Dorian Grey

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

গোলাপ ফুলের মিষ্ট গন্ধে স্টুডিওটি মশগুল হয়ে ছিল, আর বাগানের ভেতরে গ্রীষ্মকালীন বাতাস ঘুরপাক খাওয়ার সময় খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে লাইল্যাক ঝাড়ের ঘন সুবাস,অথবা লাল ফুলে ভরা কাঁটাগাছের ঝোপ থেকে মিষ্টি মেজাজি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে।

স্টুডিওর এক কোণে পারিশিয়ান-গদি মোড়া নীচু একটি বসার 'কোচ', তার ওপরে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী লর্ড হেনরি ওটন শুয়ে শুয়ে একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকে শেষ করছিলেন। মধুর মতো মিষ্টি আর রঙিন সোঁদাল গাছের ফুলের আভা তাঁর চোখে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল গাছটির কম্পমান শাখা-প্রশাখাগুলি তাদের আগুনে সমারোহের ভার বইতে পারছে না। বিরাট জানালার ওপরে সিল্কের পর্দা ঝোলানো ছিল, সেই পর্দার ওপরে মাঝে মাঝে উড়ন্ত পাখিদের ডানার ঝাপটায় মৃদু আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে জাপানি চিত্রকরদের চিত্রকলার সাময়িক ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত দিচ্ছিল। এই দেখে টোকিওর চিত্রকরদের বিবর্ণ জরাজীর্ণ মুখগুলির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। যে আর্ট অচল, গতিহীন ছাড়া আর কিছু নয়, সেই আর্টের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আর গতির সৃষ্টি করতে তাঁরা কী আয়াসই না করেন। চারপাশে নিস্তব্ধ। লম্বা ঘাসের মধ্যে অথবা ধূলিমলিন উডবাইন গাছের জড়ানো ডালের ভেতরে আসুরিক জেদ নিয়ে ঘূর্ণায়মান মৌমাছিদের ক্লান্ত গুঞ্জন সেই নিস্তব্ধতাকে আরো ক্লান্তিকর করে তুলেছিল। লন্ডন শহরের মৃদু গর্জন শুনে মনে হচ্ছিল দূরাগত কোনো সঙ্গীতযন্ত্রের উচ্চগ্রামের সুর ধ্বনিত হচ্ছে।

ঘরের মাঝখানে ছবি আঁকার একটি খাড়াই ফ্রেম দাঁড় করানো। তার ওপরে একটি যুবকের পূর্ণ প্রতিকৃতি। দেখে মনে হল, যুবকটির চেহারা অদ্ভুত সুন্দর। সেই প্রতিকৃতির সামনে, সামান্য একটু দূরে, চিত্রকর নিজে বসেছিলেন। চিত্রকরের নাম বেসিল হলওয়ার্ড। বছর কয়েক আগে এঁর হঠাৎ অন্তর্ধানের কাহিনিকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে বীষণ একটি উত্তেজনা জেগেছিল, আর সেই সঙ্গে মুখর হয়ে উঠেছিল নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত গুজব।

যে মিষ্টি লাবণ্যময় প্রতিকৃতিটি তিনি দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন তার দিকে চিত্রকর তাকিয়ে ছিলেন। ছবিটিকে দেখে তাঁর মুখের ওপরে একটুকরো আনন্দের হাসি ফুটে উঠল, শুধু উঠল না, মনে হল, হাসিটুকু লেগে রইলএকটু। কিন্তু হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন, চোখ বোজালেন; আঙুলগুলি রাখলেন বোজানো চোখের পাতার ওপরে। মনে হল একটি অদ্ভুত স্বপ্নকে তিনি মগজের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চান, ভয় হল, হয়তো তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

অবসন্নভাবে লর্ড হেনরি বললেন, বেসিল, এটি তোমার শ্রেষ্ঠ চিত্র। এত ভালো চিত্র জীবনে তুমি আর আঁকোনি। পরের বছর এটিকে নিশ্চয় তুমি গ্রসভেনর-এ পাঠাবে। অ্যাকাডেমি হচ্ছে যেমন বড়ো তেমনি কদর্য। যখনি আমি সেখানে গিয়েছি তখনি দেখেছি হয় সেখানে এত মানুষের ভিড় জমেছে যে ছবি দেখার সুযোগ পাইনি এতটুকু, ব্যাপারটা ভায়ানক,সন্দেহ নেই। অথবা, এথ ছবির ভিড় হয়েছে যে মানুষ দেখার সময় পাইনি। এটি আরো খারাপ। গ্রসভেনর-ই একমাত্র জায়গা যেখানে তোমার ছবি তার উপযুক্ত মূল্য পাবে।

একটু অদ্ভুতভাবে ঘাড় নাড়লেন চিত্রকর। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় এইভাবেই তিনি ঘাড় নাড়তেন। সেই ঘাড়নাড়া দেখে তাঁর সহপাঠীরা সবাই হাসতেন। সেই রকম একটি ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন, আমার মনে হয় না এটিকে আমি কোথাও পাঠাব। না, এটিকে আমি কোথাও পাঠাব না।

এই কথা শুনে লর্ড হেনরি কেমন যেন আবাক হয়েই মুখটা তুলে আফিঙের গুঁড়ো মেশানো সিগারেটের জমাট ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, কোথাও পাঠাবে না? কেন বন্ধু? এর পেছনে কি কোনো যুক্তি রয়েছে? তোমাদের এই চিত্রকরের জাতটা সত্যিই বড়ো কিম্ভুতকিমাকার। নাম কেনার জন্যে এ দুনিয়ায় তোমরা সব কিছু করতে পার। তার নাম হওয়া মাত্র তোমরা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাও। সুনামটাকে পরিত্যাগ করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ আলোচনা করার চেয়ে খারাপ, এবং যে জিনিসটি লোকে প্রায় আলোচনা করতে চায় না এরকম একটি জিনিসই পৃথিবীতে রয়েছে। এই রকম একটি প্রতিকৃতি ইংলন্ডের সমস্ত যুবকদের ওপরে তোমাকে বসাবে, আর বৃদ্ধেরা তোমাকে হিংসা করবে, অবশ্য কোনোরকম ভাব প্রকাশের শক্তি যদি তাদের থাকে।

বেসিল বললেন, আমি জানি আমাকে তুমি উপহাস করবে। কিন্তু আমি সত্যিই বলছি এটিকে আমি বাইরের প্রদর্শনীতে পাঠাতে পারব না। এর মধ্যে আমার নিজেকে অনেকখানি

মিশিয়ে দিয়েছি।

সোফার ওপরে শরীরটাকে বেশ ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে লর্ড হেনরি হাসলেন।

হ্যাঁ, আমি জানি তুমি হাসবে, কিন্তু কথাটা যে সত্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কী বলছ তুমি, বেসিল! তোমার অনেকখানি এই প্রতিকৃতির ভেতরে রয়েছে? তুমি যে এতটা অন্তঃসারশূন্য তা তো আমি জানতাম না। আর সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের দুজনের মধ্যে আমি কোনো সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি না। তোমার মুখ রুক্ষ, পুরুষ্টু চুলগুলি আলকাতরার মতো কালো; আর ওই যৌবনোচ্ছল যুবকটিকে দেখলে মনে হবে যেন হাতির দাঁত আর গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তার দেহটি তৈরি হয়েছে। তোমার ওই প্রতিকৃতিটি আত্মপ্রেমিক নারসিসাস বলে মনে হচ্ছে আমার; অবশ্য ওর মধ্যে তুমি কিছুটা বুদ্ধির কারুকার্য ফুটিয়ে তুলেছ—এই যা। কিন্তু বুদ্ধির জলুস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য, সত্যিকার সৌন্দর্য বলতে অবশ্য বোঝা যায়, তা নষ্ট হয়ে যায়।বুদ্ধি জিনিসটাই হচ্ছে অতিশয়োক্তির বহিপ্রকাশ। এর কাজ হচ্ছে মুখের কমনীয়তা নষ্ট করা। যে মুহূর্তে মানুষ চিন্তা করতে বসে সেই মুহূর্তেই তার মুখের ওপর থেকে লালিত্য সরে যায়। এক কথায়, মুখের আর কোনো চিহ্নই থাকে না। মানুষ তখন একটা নাক বা কপালে রূপান্তরিত হয়। ঘটনাটা ভয়ঙ্কর ছাড়া আর কিছু নয়। বিদগ্ধ পেশায় সাফল্য অর্জন করেছেন এমন যে কোনো একটি মানুষের দিকে লক্ষ কর। তাঁরা দেখতে কী ভয়ানক! অবশ্য গির্জার পাদরি ছাড়া। কিন্তু সত্যিকার চিন্তা করার বালাই পাদরিদের নেই। আঠার বছর বয়সে বিশপকে যা বলতে শেখানো হয় আশি বছর বয়সেও তিনি তাই বলতে থাকেন। ফলে, চিন্তার ভার থেকে তিনি সব সময়েই মুক্ত, সব সময়েই তিনি খুশি থাকেন। তোমার এই রহস্যময় যুবক বন্ধুটি—যাঁর নাম তুমি কোনো দিনই আমাকে বলনি এবং যিনি আমাকে মুগ্ধ করেছেন, কোনো দিনই চিন্তা করেন না। এদিকে থেকে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ভদ্রলোকটি নির্বোধ, সুন্দর মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। শীতকালে তাকিয়ে দেখার মতো যখন কোনো ফুল ফোটে না তখন এখানে তাঁর উপস্থিতি আমাদের আনন্দ দেবে। গ্রীষ্মকালে বুদ্ধির ধার ভোঁতা করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর সাহচর্য সব সময় আমাদের কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে। আমার কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ো না, বেসিল। কিন্তু তুমি আদৌ ওর মতো নও।

আর্টিস্ট বেসিল বললেন, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না, হ্যারি। অবশ্য ওর মতো আমি যে নই তা আমি ভালোভাবেই জানি। বাস্তবিক, ওর মতো আমাকে দেখাচ্ছে একথা কেউ বললে আমি দুঃখই পাব। বিশ্বাস হল না তোমার? আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলছি। সমস্ত শারীরিক আর মানসিক উৎকর্ষ ধ্বংস হয়ে যায়। ঠিক এমনিভাবেই ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে এই মরণশীলতা রাজাদের স্খলিত পদক্ষেপের পিছু ধাওয়া করেছে। সহযাত্রীদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে না থাকাটাই ভালো। যারা কুৎসিত এবং মূর্খ, এ জগতে তারাই সবচেয়ে ভালো জিনিসটা ভোগ করে। তারা আরাম করে বসে খেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। জয় সম্বন্ধে যদি তাদের কোনো জ্ঞান না-ও থাকে, পরাজয় সম্বন্ধে কোনো ধ্যান-ধারণাও তাদের নেই। কোনো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটই তাদের বিব্রত করে না, আর দশজনের মতো তারা শান্ত আর উদাসীনভাবেই জীবন কাটিয়ে দেয়। কোনোদিনই তারা অন্য লোকের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে না। অন্য লোকের কাছ থেকেও তারা কোনোরকম গুরুতর আঘাত পায় না। হ্যারি, তোমার পদমর্যাদা এবং অর্থ; আমার মস্তিষ্ক—দাম তার যাই হোক, আমার কলা—এদের দাম যাই হোক। ডোরিয়েন গ্রে-র মিষ্টি চাহনি, ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্যে আমরা সবাই দুঃখ পাব—বেশ ভালো রকম দুঃখই পাব আমরা।

বেসিল হলওয়ার্ডের দিকে কয়েকটি পা এগিয়ে যেতে যেতে লর্ড হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন, ডোরিয়েন গ্রে? কী নাম বললে?

হ্যাঁ, ওইটাই তাঁর নাম। ইচ্ছে করেই আমা তোমাকে বলিনি।

কিন্তু কেন বলনি?

তা আমি বলতে পারব না। যাদের আমার খুব ভালো লাগে তাদের নাম আমি কাউকে বলি না। এই নাম বলার অর্থই হচ্ছে তাদের কিছুটা অংশ বলে দেওয়া। সব জিনিসই গোপন রাখতে আমি কেমন যেন ভালোবাসি। আমার ধারণা, যে সব জিনিস আধুনিক জীবনযাত্রাকে রহস্যময় আর অপরূপ করে তুলেছে এটি তার মধ্যে একটি। লুকিয়ে রাখতে পারলে অতি তুচ্ছ সাধারণ জিনিসও আমাদের আনন্দ দেয়। আজকাল শহর ছেড়ে বাইরে কোথাও গেলে ঠিক কোথায় আমি যাচ্ছি সে-কথা আমি কাউকেই বলি না। একথা বললে বেড়ানোর সমস্ত আনন্দ আমার নষ্ট হয়ে যেত। অভ্যাসটা প্রশংসা করার মতো নয়, তবু মনে হয় এই ধরনের গোপনপ্রিয়তা মানুষের জীবনে বেশ কিছু রোমান্সের আমদানি করে। মনে হচ্ছে এর জন্যে আমাকে বেশ বোকা-বোকা লাগছে তোমার?

লর্ড হেনরি বললেন, মোটেই তা নয়। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি বিবাহিত। বিবাহের আকর্ষণ হচ্ছে প্রবঞ্চনা, বিবাহিত জীবনকে আকর্ষণীয় করতে হলে স্বামী আর স্ত্রী দুজনকেই প্রবঞ্চনার আশ্রয় অবশ্যই নিতে হবে। আমার স্ত্রী কোথায় যান তা আমি কোনো দিনই জানি না। আমি কোথায় ঘুরে বেড়াই সেবিষয়েও আমার স্ত্রী সমানভাবে অজ্ঞ। মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হয়, আমরা দুজনে বাইরে খেতে যাই, তখন বেশ গম্ভীর ভাবেই পরস্পরের কাছে আমরা নির্ভেজাল মিথ্যে কথা বলে যাই। মিথ্যে ভাষণে আমার স্ত্রী অত্যন্ত পটিয়সী, সত্যি কথা বলতে কি আমার চেয়ে অনেক বেশি। কবে কার সঙ্গে দেখা করার তাঁর কথা রয়েছে সে কথা তিনি একবারও ভুলে যান না, কিন্তু আমি ভুলে যাই। ফলে, আমি যখন ধরা পড়ে যাই তখন তা নিয়ে তিনি এতটুকু হইচই করেন না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, একটু-আধটু হইচই করলেই হয়তো ভালো হত, কিন্তু তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু উপহাসের হাসি হাসেন মাত্র।

স্টুডিওর একটা দরজা বাগানের দিকে খোলা ছিল, সেই দিকে পায়চারি করতে করতে বেসিল বললেন, হ্যারি, তোমার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যেসব কথা তুমি বললে তা শুনতে মোটেই ভালো লাগল না আমার। তুমি যে সত্যিকারের একজন ভালো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন স্বামী সেদিক থেকে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেকথা বলতে তোমার লজ্জা হয়। তুমি একটি চমৎকার মানুষ কোনোদিনই তোমার মুখ থেকে নীতিকথা বেরোয়নি, কিন্তু কোনোদিনই তুমি অন্যায় কাজ করনি। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৈরাগ্যটা তোমার একটা ভান মাত্র।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, আসল কথা হচ্ছে স্বাভাবিক হওয়াটাই একটা চাল, আর আমার মতে খুব একটা বিরক্তিকর চাল।

এই কথা বলে লর্ড হেনরি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বাগানের মধ্যে বেরিয়ে এলেন। একটি দীর্ঘ লরেল গাছের ঝোপের ছায়ায় বাঁশের একটা মাচা বাঁধা ছিল। দুজনে সেই মাচায় বসলেন। মসৃণ পাতার ওপর দিয়ে রোদ গড়িয়ে পড়ছিল। ঘাসের বনে প্রচুর পরিমাণে ফুটে ছিল ডেইজি ফুল।

একটু চুপ করে লর্ড হেনরি তাঁর পকেট-ঘড়িটা টেনে নিলেন পকেট থেকে, বললেন, আমাকে

এবার যেতে হবে, বেসিল। কিন্তু যাওয়ার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর আমি জানতে চাই। প্রশ্নটা একটু আগেই আমি তোমাকে করেছি।

মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চিত্রকর জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্নটা কী বল তো?

তুমি নিজেই তা ভালো জানো।

আমি জানি না, হ্যারি।

বেশ, আমি তোমাকে তা বলছি। আমি জানতে চাই ডোরিয়েন গ্রে-র প্রতিকৃতিটি তুমি প্রদর্শনীতে পাঠাবে না কেন? আসল কারণটা আমি জানতে চাই।

আমি তোমাকে আসল কারণটাই বলেছি।

না, তুমি তা বলনি। তুমি কেবল বলেছিলে। ওই ছবির ভেতরে তোমার নিজস্ব সত্তার অনেকটা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কিন্তু এটা তোমার ছেলেমানুষের কথা।

বন্ধুর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বেসিল হলওয়ার্ড বললেন, হ্যারি, গভীর দরদ আর আর অনুপ্রেরণার সঙ্গে যে ছবি আঁকা হয় সেটা হচ্ছে চিত্রকরের নিজস্ব প্রতিকৃতি, মডেলের নয়। সেই বিশেষ ক্ষেত্রে মডেলটা হচ্ছে আকস্মিক, চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনে গৌণ। চিত্রকর কোনোদিনই মডেলের সত্তাকে প্রতিফলিত করেন না; সেই রঙিন চিত্রপটের ওপরে তিনি প্রতিবিম্বিত করেন নিজেকেই। এই ছবিটিকে প্রদর্শনীতে না পাঠানোর কারণটা হল আমার আশঙ্কা।ভয় হচ্ছে,এই ছবির সঙ্গে আমার আত্মার অনেক গোপন বেদনা আর আনন্দ মিশে গিয়েছে।

হাসলেন লর্ড হেনরি, জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কী?

আমি তোমাকে বলব, উত্তর দিলেন চিত্রকর। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল সব যেন তিনি গুলিয়ে ফেলছেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরি বললেন, আমি শোনার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি, বেসিল।

চিত্রকর বললেন, বলার সত্যিই বেশি কিছু নেই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তুমি হয়তো আমার কথা বুঝতে পারবে না। হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করতেও পারবে না তুমি।

লর্ড হেনরি হাসলেন, ঝুঁকে ঘাসের বন থেকে এখটা লাল ডেইজি ফুল তুলে সেটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই ফুলটার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, না, না, আমি নিশ্চয় বুঝতে পারব। আর বিশ্বাস করার কথা যদি বল আমি যে-কোনো জিনিসই বিশ্বাস করতে লাগল, এবং সেই ক্লান্ত বাতাসে লাইল্যাক ফুলের ভারী ভারী গুচ্ছগুলি এদিকে-ওদিকে দুলতে লাগল। দেওয়ালের পাশে একটা ঘাস ফড়িং ভনভন করতে শুরু করল; আর নীল,সুতোর মতো লম্বা রোগাটে একটা ফড়িং তার রঙিন ডানা মেলে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। লর্ড হেনরির মনে হল তাঁর বন্ধুর বুকটা ঘন ঘন ওঠানামা করছে। বন্ধুটি এর পরে কি বলবেন তাই তিনি ভাবতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে চিত্রকর বললেন, ঘটনাটা হচ্ছে এই: মাস দুই আগে আমি একদিন লেডি

ব্র্যানডনের পার্টিতে গিয়েছিলাম। তুমি জান আমাদের মতো দরিদ্র আর্টিস্টের মাঝে মাঝে বাইরে লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় শুধু তাদের বোঝানোর জন্যে, যে আমরা বন্যপ্রাণী নই। তোমার কথাই ঠিক।সান্ধ্য পোশাক আর সাদা গলাবন্ধনী চড়িয়ে যে-কোনো মানুষই, এমনকি একজন পাতি ব্যবসাদারও সভ্য আর সংস্কৃতিবান বলে পরিচিত হওয়ার সাহস রাখে। সেদিন মিনিট দশেক আমি সুবেশা বিধবা আর বিরক্তিকর পণ্ডিতদের বিরাট সমাবেশে মিনিট দশেক গল্পগুজব করেছি এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল একজন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আধখানা ঘুরে দাঁড়ালাম, সেই প্রথম ডোরিয়েন গ্রে-র সঙ্গে চোখাচোখি হল আমার। চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি যেন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছি। একটা অদ্ভুত ভীতি আমাকে গ্রাস করে বসল। বেশ বুঝতে পারলাম আমি এমন একজনের সংস্পর্শে এসে পড়েছি যার ব্যক্তিত্বের মোহিনীশক্তি এত প্রবল যে তাকে যদি সময়ে আমি প্রতিরোধ করতে না পারি তাহলে সে আমার চরিত্র, আত্মা, আমার আর্ট সব গ্রাস করে ফেলবে। বাইরে থেকে কেউ আমার ব্যক্তিগত জীবনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে এ আমি চাইনে। তুমি নিজেই জান হ্যারি, চরিত্রের দিক থেকে আমি কতখানি স্বাবলম্বী। চিরদিনই আমি সেই রকমই ছিলাম; অন্তত ডোরিয়েন গ্রে-র সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত। তারপর—কিন্তু কী করে যে ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাব বুঝতে পারছি না। কে যেন বলে দিল জীবনে আমি একটি বিষম বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কী জানি কেন আমার মনে হয়েছিল সে ভাগ্য আমার জন্যে অনির্বচনীয় আনন্দ আর অবর্ণনীয় দুঃখ জমিয়ে রেখেছে। ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। বিবেক যে আমাকে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা নয়, আমার সেই মানসিক অবস্থাকে তুমি বরং কাপুরুষতা বলতে পার। সেদিন সেখান থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টার মধ্যে কোনো রকম যুৎসই কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

বিবেক এবং কাপুরুষতা, সত্যিকথা বলতে কি, একই বস্তু, বেসিল। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক নাম হচ্ছে বিবেক, এই যা।

হ্যারি, ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। জানি, তুমিও তা কর না। আমার উদ্দেশ্য যাই হোক, হয়তো সেটা আমার গর্বই হবে, এবং চরিত্রের দিক থেকে গর্বিত কিছুটা আমি ছিলাম, আমি যে দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই লেডি ব্র্যানডন-এর সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, মিঃ হলওয়ার্ড, এত তাড়াতাড়ি আপনি নিশ্চয় পালিয়ে যাচ্ছেন না? তাঁর গলার সেই অদ্ভুত স্বরটা নিশ্চয় তোমার মনে রয়েছে।

লর্ড হেনরি বললেন, রয়েছে। সৌন্দর্য বাদ দিয়ে ভদ্রমহিলা একেবারে ময়ূরকন্ঠী।

এই বলে দুর্বল আঙুলগুলি দিয়ে তিনি একটি ডেইজি ফুল ছিঁড়তে লাগলেন।

বেসিল বলে গেলেন, আমি তাঁকে এড়াতে পারলাম না। তিনি অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজবাড়ির অতিথি, খেতাবধারী পুরুষ, বড়ো-বড়ো টায়রা পরা সূঁচোল নাকধারিণী মহিলা। সকলের কাছেই তিনি আমার পরিচয় দিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু হিসাবে। এর আগে মাত্র একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, কিন্তু আমি যে একজন মহান ব্যক্তি এই রকম একটা ধারণা তাঁর মগজে ঢুকেছিল। আমার বিশ্বাস আমার কোনো একটা ছবি সেই সময় বেশ নাম করেছিল। অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিহীন ধ্বজাবাহী সস্তা দামের কিছু সংবাদপত্র সেই ছবিটি নিয়ে বেশ হইচই করেছিল। যে যুবকটির ব্যক্তিত্ব আমাকে ওই রকম অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়েছিল হঠাৎ দেখলাম সেই যুবকটির

সামনাসামনি এসে হাজির হয়েছিআমি। খুব কাছাকাছি এসেছি আমরা, যাকে বলে স্পর্শ দূরত্বের মধ্যে। আবার আমাদের চোখাচোখি হল। হঠকারিতা সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি সেদিন লেডি ব্র্যানডনকে অনুরোধ করেছিলাম। হয়তো একেবারে হঠকারিতাও নয়। আলাপ হওয়াটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। কোনোরকম পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মানুষ না থাকলেও, হয়তো আমরা নিজেরাই আলাপ করতাম। সেবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। পরে, ডোরিয়েন-ও আমাকে সেই কথাই বলেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিলে ভাগ্যই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত।

তাঁর বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন: এবং লেডি ব্র্যানডন তাঁর সেই অদ্ভুত বন্ধুটির কী পরিচয় দিলেন? আমি জানি অতিথিদের বর্ণনা করার সময় তিনি বেশ দ্রুত এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাঁদের গুণের বর্ণনা দেন। বেশ মনে পড়ে ভদ্রমহিলা একবার একটি বর্বর, সমস্ত শরীরে সরকার-দেওয়া খেতাব-আঁটা এক বৃদ্ধের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার কানে ফিস-ফিস করে তাঁর অজস্র গুণের বর্ণনা দিয়ে গেলন। তাঁর সেই ফিসফিসানি কেবল যে ঘরের প্রতিটি লোকের কানে গিয়ে পৌঁচেছিল তা-ই নয়, ভদ্রলোকের গুণাবলীর বর্ণনা তাঁর মুখ থেকে শুনে আমিও কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। এর পরেই আমি স্রেফ কেটে পড়লাম। আমার সমগোত্র, অথবা আমার পছন্দমতো মানুষ খুঁজে বার করতেই আমি চাই, কিন্তু ভদ্রমহিলার ব্যাপার স্বতন্ত্র। নিলামকারীরা যেভাবে তাদের জিনিসপত্রের দাম ধার্য করে, আমাদের ওই ভদ্রমহিলাটির কাছেও তাঁর অতিথিদের মূল্য নির্ধারণের প্রণালীটি ঠিক সেই জতীয়। হয় তিনি তাঁদের সরিয়ে রাখেন, অথবা তাঁদের সম্বন্ধে এমন কিছু নেই যা তিনি অপরকে বলেন না—বাদ দেন কেবল সেইটুকু যেটুকু আর সবাই জানতে চায়।

হলওয়ার্ড একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বললেন, ভদ্রমহিলার ওপরে অতটা কটোর হয়ো না হ্যারি। হায়, হতভাগ্য নারী লেডি ব্র্যানডন!

অতিথিদের জন্যে তিনি একটি আপ্যায়ন কক্ষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যা করতে পেরেছিলেন তা হচ্ছে একটি রেস্তোরাঁ। তাঁকে আমি প্রশংসা করব কেমন করে? কিন্তু সেসব কথা থাক, ডোরিয়েন গ্রে-র সম্বন্ধে তিনি তোমাকে কী বললেন সেইটাই আমাকে বল।

তেমন কিছু নয়। 'চমৎকার ছেলে, ওর মা আর আমি-যাকে বলে একেবারে হরিহর আত্মা। ও যে ঠিক কী করে তা আমার স্মরণ হচ্ছে না; সম্ভবত কিছুই করে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, করে বটে, পিয়ানো বাজায়! পিয়ানো, না, বেহালা মিঃগ্রে?'এই কথা শুনে আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে সঙ্কোচ কেটে গেল, আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।

আর একটি ডেইজি ফুল তুলে নিয়ে লর্ড হেনরি বললেন, বন্ধুত্বের শুরুতে হাসি-ঠাট্টা সূচনা হিসাবে খারাপ নয় আর বন্ধুত্বের সমাপ্তিতেও ওর চেয়ে ভালো জিনিস আর বোধ হয় নেই।

হলওয়ার্ড মাথা নেড়ে বললেন, বন্ধুত্ব আসলে জিনিসটা কী তা তুমি বোঝ না, হ্যারি, অথবা শত্রুতা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা-ও হয়তো তোমার অজানা। সবাইকেই তুমি পছন্দ কর, অর্থাৎ সকলের ওপরেই তুমি সমান ভাবে উদাসীন।

টুপিটা মাথার পেছেনে একটু ঠেলে দিয়ে, নীলকান্তমণি খচিত শূন্য গ্রীষ্মাকাশের বুকে সাদা দুধের ফেনার মতো যে ছোটো ছোটো মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছিল সেই দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরি বললেন, কী অন্যায় তোমার! নিশ্চয়, একশোবার অন্যায়। মানুষ আর মানুষের মধ্যে তফাৎ রয়েছে আমার কাছে। আমি সেই সব মানুষকে পছন্দ করি যারা দেখতে ভালো,

যারা সৎ তাদের সঙ্গেই পরিচয় জমাই, আর যাদের ধীশক্তি তীক্ষ্ণ তাদেরই আমি শত্রু বলে গণ্য করি। শত্রু নির্বাচনে মানুষ খুব বেশি সতর্ক হতে পারে না। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ মূর্খ নেই। সকলেরই কিছু না কিছু বুদ্ধি রয়েছে, ফলে, সকলেই প্রায় আমাকে পছন্দ করে। এ থেকে কি আমার কোনো দম্ভ প্রকাশ পায়, মনে হয় আমি এদিক থেকে কিছুটা দাম্ভিক।

আমারও তাই মনে হত, কিন্তু তোমার তালিকা অনুযায়ী, আমি তোমার নিছক পরিচিত ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রিয় বেসিল, তুমি তার চেয়ে অনেক বড়ো।

আর বন্ধুর নীচে, মনে হয় ভায়ের মতো; তাই না?

ওঃ, ভাই, ভাই! ভাইদের নিয়ে দুর্ভাবনা করার মতো কিছু নেই। আমার দাদা মারা যাবেন না, আর আমার ছোটো ভাইদেরও সেরকম কিছু করার সম্ভাবনা নেই।

হলওয়ার্ড বিরক্ত হয়ে বললেন, হ্যারি!

বন্ধু, আমি মোটেই সিরিয়াস হয়ে ওকথা বলিনি। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের আমি ঘৃণা না করে পারি না। মনে হয় আমাদের এই মানসিক অবস্থার জন্যে দায়ী একটা;সেটা হচ্ছে, আমাদের মতো যাদের দোষ রয়েছে তাদের আমরা সহ্য করতে পারি না। ইংলিশ গণতন্ত্র উচ্চ শ্রেণির মানুষের বিকৃত রুচি বলতে যা বোঝাতে চায় তার সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। জনসাধারণ মনে করে মদ্যপায়িতা, মূর্খতা আর চরিত্রহীনতা তাদের বিশেষ সম্পদ, এবং আমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদের সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে নাক গলাতে যায় তাহলে সে একটি গর্দভ বলে বিবেচিত হবে। যখন হতভাগ্য সাউথওয়ার্ক বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় জড়িয়ে পড়ল তখন তাদের ঘৃণা সত্যিই দেখার মতো হয়েছিল। তবু আমার মনে হয় শতকরা দশজন সাধারণ মানুষও নির্ভুল ভাবে জীবন কাটায় না।

তুমি যা বললে তার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি না, তার চেয়েও বড়ো কথা হ্যারি, আমার বিশ্বাস, তুমি নিজেও তা কর না।

লর্ড হেনরি তাঁর সূঁচলো কটা দাড়ির ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে পেটেন্ট চামড়ার তৈরি বুট জুতোর ওপরে তাঁর আবলুস কাঠের লাঠিটা ঠুকতে লাগলেন। তারপরে বললেন, বেসিস,তুমি একটি পাকা ইংরেজ। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তুমি ওই উক্তিটি করলে। যদি কেউ কোনো ইংরেজের কাছে নতুন কিছু বলে—যা বলাটা নিঃসন্দেহে হঠকারিতা, তাহলে সেটা ঠিক কি বেঠিক সে-সম্বন্ধে চিন্তা করার কথা সে স্বপ্নেও ভাবে না। একটি মাত্র জিনিস যা সে সত্যিই বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করে তা হচ্ছে এই যে বক্তা নিজেই সেকথা বিশ্বাস করে কিনা। এখন কথাটা হচ্ছে নতুন কথা বলার দাম এই নয় যে বক্তা নিজে সে কথা বিশ্বাস করেন। বরং একথা বললে ঐযৌক্তিক হবে না যে যার মুখের আর মনের কথার মধ্যে ফারাক যত বেশি তার মতবাদ তত উচ্চমানের। কারণ সেই মতবাদের সঙ্গে কোনো দিক দিয়েই তারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। যাই হোক, আমি তোমার সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। নীতির চেয়ে মানুষকে বেশি পছন্দ করি আমি, এবং এ জগতে নীতিহীন মানুষকে আমি যত পছন্দ করি, এত পছন্দ আর কিছুই আমি করি না। মিঃ ডোরিয়েন গ্রে-র সম্বন্ধে আরো কিছু তুমি আমাকে বল। তোমার সঙ্গে তার কেমন দেখাসাক্ষাৎ হয়?

প্রতিদিন, রোজ তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি আমার কাছে একেবারে অত্যাবশ্যকীয়।

অবাক কাণ্ড! আমার ধারণা ছিল আর্ট ছাড়া আর কিছুই গ্রাহ্য কর না তুমি।

চিত্রকর গম্ভীরভাবেই বললেন, তিনিই এখন আমার আর্টের বিষয়। হ্যারি, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে পৃথিবীর ইতিহাসে মূল্যবান বলতে মাত্র দুটি যুগ রয়েছে; প্রথমটি হল আর্টের নতুন বিষয়বস্তুর আবির্ভাব, দ্বিতীয়টি হল সেই আর্টের জন্যে নতুন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। ভেনিসিয়্যানদের কাছে তৈল-চিত্রের আবিষ্কারের দাম যা, পরবর্তী যুগের গ্রিক ভাস্কর্যের কাছে অ্যানটিনোয়াস-এর মূল্য যেরকম, ডোরিয়েন গ্রে-র মুখও একদিন আমার কাছে সেই রকম মূল্যবান হয়ে দেখা দেবে। সে আমার কাছে নিছক মডেল নয়। প্রতিকৃতি আঁকার জন্যে তার কাছ থেকে যতটুকু নেওয়ার দরকার তার প্রায় সবটুকুই আমি নিয়েছি। কিন্তু নিছক মডেল-এর চেয়ে সে আমার কাছে অনেক বড়ো। আমি তোমাকে একথা নিশ্চয় বলব না যে তার কাছ থেকে আমি যেটুকু পেয়েছি তাতে আমি খুশি নই, একথা নিশ্চয় বলব না যে তার কাছ থেকে আমি যেটুকু পেয়েছি তাতে আমি খুশি নই, অথবা তার সৌন্দর্য এমন একটা জিনিস যে আর্ট তা প্রকাশ করতে পারে না, আর এটাও আমি জানি যে ডোরিয়েন গ্রে-র সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি যে ছবি এঁকেছি তা সত্যিই ভালো, অথবা আমার জীবনের ওটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু কেন জানি না, বললে তুমি ও হয়তো তা বিশ্বাস করবে না, তার ব্যক্তিত্ব চিত্রকলার সম্বন্ধে একটি নতুন রীতি, একটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের সন্ধান দিয়েছে। এখন আমি প্রতিটি জিনিস অন্যভাবে দেখি, প্রতিটি জিনিসের সম্বন্ধে অন্যভাবে চিন্তা করি। এখন আমি কোনো জিনিসকে নতুনভাবে সৃষ্টি করি। এ-শক্তি এতদিন আমার ছিল না। 'চিন্তার দিনগুলিতে কল্পনার আভাস' একথা কে বলেছেল বল তো! আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু আমার কাছে ডোরিয়েন গ্রে ঠিক সেই ভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। বয়স তার কুড়ির খুব বেশি নয়। আমি তাকে বালক ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। তুমি ভাবছ সে আমার জীবনের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে? নিজের অজ্ঞাতসারেই চিত্রকলার একটি নবদিগন্তের সন্ধান সে আমাকে দিয়েছে। এটা হল গ্রিক মানসিকতার পূর্ণ বিকাশ। আত্মার সঙ্গে দেহের এই সমঝোতা—এর দাম কত! উন্মাদের মতো আমরা এই দুটিকে পৃথক করে রেখেছি। পৃথক করে, এমন একটি বস্তুবাদের সৃষ্টি করেছি যা সত্যিই বড়ো নিকৃষ্ট, যার আদর্শ মূল্যহীন। ডোরিয়েন গ্রে আমার কাছে যে কত বড়ো সম্পদ তা যদি তুমি জানতে, হ্যারি! অ্যাগনিউ আমার যে ছবিটি কেনার জন্যে অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল সেটা তুমি দেখেছ। সেই ছবিটিকে আমি বিক্রি করতে চাইনি। কয়েকটি ভালো ছবির মধ্যে ওটি আমার শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু কেন বল তো? কারণ, ওই ছবিটি আঁকার সময় ডোরিয়েন গ্রে আমার পাশে বসেছিল। সেই সময়ে নিঃশব্দে তার প্রভাব আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, এবং জীবনে সেই প্রথম সহজ অরণ্যের মধ্যে আমি এমন একটি সৌন্দর্যের, ব্যঞ্জনার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলাম। এতদিন ধরে আমি তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, কিন্তু তাকে খুঁজে পাইনি।

বেসিল, তোমার কথা শুনে তাজ্জব লাগছে আমার। ডোরিয়েন গ্রে-কে দেখতেই হবে আমাকে।

হলওয়ার্ড তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠে বাগানের ভেতরে পায়চারি করতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এসে বললেন, হ্যারি, ডোরিয়েন গ্রে আমার কাছে আর্টের প্রেরণা মাত্র। তার মধ্যে তুমি দেখার মতো কিছুই খুঁজে পাবে না। আমি তার মধ্যে সব কিছু দেখতে পাই। তার ভাবমূর্তি ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে ধরা পড়ে না। তোমাকে যা বলেছি, সে একটি নতুন রীতির ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই নয়। কয়েকটি রেখার ভঙ্গিমা আর কয়েকটি বিশেষ রঙের

চারুত্ব ছাড়া অন্য কোনোভাবেই তাকে আমি দেখতে পাই না। তার সম্বন্ধে এ ছাড়া অন্য কোনো কথা নেই।

লর্ড হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে, তুমি তাঁর ছবিটা প্রদর্শনীতে পাঠাচ্ছ না কেন?

কারণ, ইচ্ছে না করেই আমি এই সব অদ্ভুত চিত্রকল্পর সুচারু ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাগুলি ওই প্রতিকৃতির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছি। এ সম্বন্ধে আমি অবশ্য তাকে বলিনি। সে নিজেও এ বিষয়ে কিছু জানে না। কিছু জানবেও না কখনো। কিন্তু দর্শকরা হয়তো কিছুটা অনুমান করতে পারে এবং সেই সব সাধারণ অনুসন্ধিৎসুদের কাছে আমি নিশ্চয় আমার মনের কথাগুলি খুলে বলব না। সত্যি কথা বলতে কি হ্যারি, ওই প্রতিকৃতির মধ্যে আমার নিজস্ব অনেকটা মিশে গিয়েছে।

কবিরাও তোমার মতো দ্বিধাগ্রস্ত নয়। তাঁরাও জানেন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পেছনে তাঁদের তাগিদ কত বেশি। আজকাল হৃদয়-যন্ত্রণার কাব্যের বাজার অনেক বড়ো।

একটু অস্থির হয়েই হলওয়ার্ড বললেন, ঠিক এরই জন্যে আমি তাঁদের ঘৃণা করি। আর্টিস্টের কাজই হচ্ছে সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করা, কিন্তু সেইগুলির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলাটা উচিত নয়। আমরা এমন একটি যুগে বাস করি যে যুগে মানুষে ললিতকলাকে আত্মজীবনী বলে মনে করে। সৌন্দর্যের কায়াহীন সত্তাটিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এই সত্তাটি কী একদিন জগতকে তা আমি দেখাব। আর সেই জন্যেই ডোরিয়েন গ্রে-র যে প্রতিকৃতিটি আমি এঁকেছি তা বাইরের মানুষ দেখতে পাবে না।

বেসিল, আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ, কিন্তু তা নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। যাদের মগজে কিছু নেই তারাই তর্ক করে। সত্যি বল দেখি, ডোরিয়েন কি তোমাকে খুব ভালোবাসে?

কয়েকটি মুহূর্ত চিত্রকর কী যেন ভাবলেন, তারপরে বললেন, আমি জানি জানি সে আমাকে পছন্দ করে। অবশ্য আমিও তার ভয়ঙ্কর রকমের প্রশংসা করি। তাকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে আমার বেশ একটা আনন্দ হয়। আমি জানি, সে-সব কথা বলার জন্যে আমাকে দুঃখ করতে হবে। তাকে আমার বেশ ভালোই লাগে। আমার স্টুডিওতে বসে হাজার রকমের গল্প করি। মাঝে মাঝে সে বড়ো বোকার মতো কাজ করে, মনে হয় আমাকে যন্ত্রণা দিতে পারলে বেশ আনন্দ হয় তার। হ্যারি, তখন আমার মনে হয় আমি যেন আমার সমস্ত সত্তা তার কাছে সমর্পণ করেছি। মানুষ যেমন তার বোতামের ঘরে ফুল গুঁজে রাখে, তার কাছে আমার আত্মাটিও সেই রকম ফুলের মতো। তার দম্ভের অলঙ্করণ, গ্রীষ্মের জলুসের মতো।

ধীরে ধীরে বললেন লর্ড হেনরি, গ্রীষ্মের দিনগুলি দীর্ঘস্থায়ী, বেসিল। মনে হয় তার চেয়ে তুমিই তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। একথা ভাবতেও কষ্ট লাগে, কিন্তু প্রতিভা যে সৌন্দর্যের চেয়ে বিশি দিন বেঁচে থাকে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেইজন্যেই বেশি জ্ঞান অর্জন করার জন্যে আমরা এত কষ্ট পাই। জীবনযুদ্ধের উত্তেজনায় আমাদের এমন কিছু দরকার যা বেঁচে থাকে। ঘাঁটি আগলে রাখার মূর্খ চেষ্টায় আমরা তাই বস্তুর জঞ্জালে আমাদের মন পূর্ণ করে রাখি। আধুনিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় যত বেশি তিনিই এ যুগে তত বড়ো আদর্শ মানুষ। আজকাল কোনো জিনিসের ব্যবহারিক দামটা তার প্রকৃত মূল্যের অনেক ওপরে। ব্যাপরটা যাই হোক, আমার ধারণা, তুমিই ক্লান্ত হবে প্রথম। একদিন তুমি হয়তো তোমার বন্ধুর দিকে তাকাবে, মনে হবে দেখে ছবি আঁকার মতো চেহারা আর তার নেই।

হয়তো তার রঙটা আর তোমার ভালো লাগবে না। অথবা কোনো একটি বিশেষ জিনিস তুমি আর তার মধ্যে খুঁজে পাবে না। মনে মনে তুমি তীব্রভাবে তাকে তিরস্কার করবে, তোমার সত্যি সত্যিই মনে হবে সে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। তারপরে তোমার সঙ্গে তার দেখা হলে আগের মতো আনন্দের সঙ্গে তুমি তাকে অভ্যর্থনা জানাবে না, উদাসীন হয়ে যাবে তুমি। তোমার এই পরিবর্তনটা দুঃখজনক হয়ে দাঁড়াবে সন্দেহ নেই। আমাকে এতক্ষণ ধরে তুমি যা বললে তা রোমান্স ছাড়া আর কিছু নয়। বলতে পার চিত্রকল্পের উচ্ছ্বাস। আর যে-কোনো রঙিন উচ্ছ্বাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস হচ্ছে এই যে সে মানুষকে বড়ো অরসিক করে তোলে।

হ্যারি, ওকথা বলো না। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ডোরিয়েন গ্রে-র ব্যক্তিত্ব আমাকে গ্রাস করে থাকবে। আমি যা অনুভব করি, তুমি তা কর না। তোমার পরিবর্তন হতে সময় লাগে না বিশেষ।

সত্যি কথা বলতে কি বেসিল, ঠিক ওই কারণেই আমি তা বুঝতে পারি। যাদের আমরা বিশ্বাসী বলি প্রেমের একটি দুর্বল অংশ ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গেই তাদের পরিচয় নেই। প্রেমের ট্র্যাজিডি বলতে কী বোঝা তা একমাত্র অবিশ্বাসীরাই জানে।

পৃথিবীর অন্তর্নিহিত সত্যটিকে গুটিকতক কথায় চমৎকারভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন এই রকম একটি আত্মতুষ্টির আবেশে মাতোয়ারা হয়ে লর্ড হেনরি তাঁর সুন্দর সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট বার করে ধরালেন। সবুজ গাছের পাতার ভেতরে চড়ুই পাখিদের ডানার ঝাপটার সংঙে কিচর-মিচির শোনা গেল, ঘাসের ওপরে নীলচে মেঘের ছায়াগুলি চড়ুই পাখির মতো ছোটাছুটি করতে লাগল। তাঁর মনে হল বাগানের দৃশ্যটি বড় মনোরম, মনে হল বড়ো সুন্দর মানুষের উচ্ছ্বাস—মতবাদের চেয়ে মানুষের আবেগ অনেক বেশি সুন্দর। বেসিল হওয়ায়ার্ডের সঙ্গে থাকার ফলে তিনি যে বিরক্তিকর লাঞ্চ থেকে মুক্তি পেয়েছেন এই কথাটা ভাবতে তাঁর বেশ আমোদ লাগল। মাসির বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গেলে নিশ্চয় লর্ড গুডবড়ির সঙ্গে তাঁর দেখা হত এবং তাঁদের আলোচনা চলত দরিদ্র ভোজন আর আদর্শ আবাস বলতে কী বোঝায় তাই নিয়ে। যাঁদের নিজেদের জীবনে এই দুটি জিনিসের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই সেই দুটি জিনিসের গুণাবলী নিয়ে দু'দলেই আলোচনা করতেন সমান উত্তেজনা নিয়ে। ধনীরা মিতব্যয়িতার মূল্য কী তারই ওপরে বক্তৃতা দিতেন আর শারীরিক পরিশ্রমের সম্মান কতটা তাই নয়ে মনোজ্ঞ ভাষায় কথা বলতেন তাঁরা যাঁরা অলসভাবে জীবন যাপন করেন। এই সমস্ত অহেতুক বিরক্তির পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি বেশ খুশি হলেন। তাঁর মাসির কথা ভাবতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি হলওয়ার্ড-এর দিকে ঘুরে বললেন, বন্ধু, একটা কথা মনে পড়েছে আমার।

কী মনে পড়েছে?

ডোরিয়েন নামটা আমি যেন কোথায় শুনেছি।

সামান্য ভ্রূকুটি করে বেসিল জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়?

চটো না বেসিল। মাসি, লেডি আগাথার বাড়িতে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে একটি অসামান্য যুবককে তিনি আবিষ্কার করেছেন। এই যুবকটি ইস্ট এন্ড-এ তাঁকে সাহায্য করতে উৎসুক। তাঁর নাম হচ্ছে ডোরিয়েন গ্রে। আমি বলতে বাধ্য, ভদ্রলোক যে দেখতে সুন্দর সে কথা মাসি আমাকে জানাননি। মিষ্টি চাহনির কদর মহিলারা জানেন না অন্তত সৎ মহিলাদের

সে জ্ঞান বড়ো কম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ভদ্রলোক চপলমতি নন, তাঁর চরিত্রটিও বড়ো চমৎকার। ওই কথা শুনেই আমার মনে হয়েছিল ভদ্রলোকটি চশমাধারী, তাঁর চুলগুলি লম্বা, মুখের ওপরে গুটি-গুটি দাগ, লম্বা-লম্বা পা ফেলে তিনি হাঁটাচলা করেন। সেই মানুষটি যে তোমার বন্ধু তা যদি আমি জানতাম!

তুমি যে জানতে পারনি এতেই আমি খুশি, হ্যারি।

কেন?

তার সঙ্গে তোমার দেখা হোক তা আমি চাই না।

চাও না?

না।

এমন সময় খানসামা বাগনের মধ্যে ঢুকে এসে বলল, মিঃ ডোরিয়েন গ্রে স্টুডিওতে রয়েছেন, স্যার।

লর্ড হেনরি হাসতে হাসতে বেশ জোর গলাতেই বললেন, এখন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তোমাকে করিয়ে দিতে হবেই।

খানসামার দিকে ঘুরে চিত্রকর বললেন, পার্কার, মিঃ গ্রেকে একটু বসতে বল। আমি এখনি আসছি।

অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটি নুইয়ে পার্কার বেরিয়ে গেল বাগান থেকে।

বেসিল হেনরির দিকে তাকিয়ে বললেন, ডোরিয়েন গ্রে আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। বড়ো সরল, বড়ো সুন্দর তাঁর চরিত্র। তাঁর সম্বন্ধে তোমার মাসিমা যা বলেছেন সেইটাই সত্যি। তাঁকে তুমি নষ্ট করে দিও না। তাঁর ওপরে তোমার প্রভাব বিস্তার করতে চেয়ো না। তোমার প্রভাব তাঁর কাছে খুব খারাপই হবে। বিশাল এই পৃথিবী, এখানে অনেক আশ্চর্য জিনিস তুমি খুঁজে পাবে। আমার কলা-লালিত্যের যিনি প্রতীক তাঁকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেও না। আর্টিস্ট হিসাবে আমার জীবন তাঁরই উপরে নির্ভর করছে হ্যারি, মনে রেখো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

কথাগুলি বেশ ধীরে ধীরে বললেন তিনি, মনে হল, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

লর্ড হেনরি হাসতে হাসতে বললেন, কী বোকার মতো বকছো?

এই বলে হলওয়ার্ড-এর একটা হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘরের মধ্যে ঢুকেই ডোরিয়েন গ্রেকে দেখতে পেলেন তাঁরা। তাঁদের দিকে পেছন করে পিয়ানোর পাশে একটি টুলের ওপরে বসে-বসে স্কুম্যান রচিত 'বন্য দৃশ্যের' একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। পায়ের শব্দ পেয়েই তিনি বললেন, এগুলি আমাকে ধার দিও, বেসিল, আমি পড়তে চাই। বইগুলি বড়ো সুন্দর।

তুমি আজ কী ভাবে বসবে তারই ওপরে তোমার বই-পাওয়া নির্ভর করছে ডোরিয়েন।

টুল থেকে পেছনে ঘুরে খেলার ছলে গ্রে বললেন, একভাবে বসে-বসে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পূর্ণ প্রতিকৃতির ওপরে আমার আর কোনো লোভ নেই।

লর্ড হেনরিকে দেখে তাঁর গাল দুটি হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, বেসিল, আমাকে ক্ষমা কর। আমি বুঝতে পারিনি যে তোমার সঙ্গে অন্য একজন আছেন।

ডোরিয়েন, ইনি হচ্ছেন লর্ড হেনরি ওটোন, অক্সফোর্ডের পুরনো সহপাঠী আমার। মডেল হিসাবে তুমি যে কত ভালো সেই কথাই এতক্ষণ ওঁকে বলছিলাম। কিন্তু তুমি সব নষ্ট করে দিলে।

লর্ড হেনরি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিতে একটি হাত প্রসারিত করে বললেন, মিঃ গ্রে, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে আমার যে আনন্দ হয়েছে সে-আনন্দ আপনি নষ্ট করেননি। আপনার কথা মাসিমার কাছে আমি শুনেছি। আপনি তাঁর একজন প্রিয় বন্ধু, এবং আমার মনে হয় আপনি তাঁর একটি শিকার-ও।

একটু অনুশোচনার হাসি হেসে মিঃ গ্রে বললেন, লেডি আগাথার কালো খাতায় আমার নাম লেখা হয়ে গিয়েছে। গত মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে আমি হোয়াইট চ্যাপেলের একটি ক্লাবে যাব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। সেকথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের দ্বৈত সঙ্গীত গাওয়ার কথা ছিল, তিনটি সঙ্গীত, তিনি কী বলবেন জানি না। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভয় লাগছে।

মা ভৈঃ। মাসিমার সঙ্গে আপোস করিয়ে দেব আপনার। তিনি আপনাকে বেশ ভালোবাসেন। তাছাড়া সেদিন যে আপনি যাননি তার জন্যে তিনি কিছু মনে করেছেন বলে আমার মনে হয় না। দর্শকরা ওটাকে দ্বৈত সঙ্গীত বলেই হয়তো ভেবে নিয়েছিল। মাসিমা আগাথা যখন পিয়ানোর ধারে বসে গান ধরেন তখন তাঁর গলা থেকে যে স্বর বেরোয় তা দুজনের সমান।

ডোরিয়েন হেসে বললেন, লেডি আগাথার সম্বন্ধে এই মন্তব্য যে ভয়াবহ তা-ই নয়, আমার সম্বন্ধেও বেশ সু-উক্তি নয়।

লর্ড হেনরি তাঁর দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, সত্যিই অপরূপ সুন্দরী তিনি। চারুকার্যের মতো সুন্দর লাল দুটি ঠোঁট, দুটি নীল পরিচ্ছন্ন চোখ, কোঁকড়ানো সোনালি চুল। তাঁর মুখের দিকে তাকালে তাঁকে বিশ্বাস না করে আপনি পারবেন না। যৌবনের সমস্ত উচ্ছলতা তাঁর সর্বাঙ্গে, সেই সঙ্গে রয়েছে যৌবনের শুচিতা। দেখলে মনে হবে, পৃথিবীর সমস্ত কালিমা থেকে তিনি মুক্ত। বেসিল হলওয়ার্ড যে তাঁকে পুজো করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী?

সৎকাজের পক্ষে আপনি অত্যন্ত সুন্দর, মিঃ গ্রে, অত্যন্ত সুন্দর।

এই বলে, লর্ড হেনরি সোফার ওপরে বসে পড়ে সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করলেন।

চিত্রকর এর মধ্যে তাঁর রঙ আর তুলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এতক্ষণ তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। লর্ড হেনরির শেষ কথা শুনে তিনি একবার তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন, একটু দ্বিধা করলেন, তারপরে বললেন, হ্যারি, এই ছবিটা আজই আমি শেষ করতে চাই। তোমাকে যদি আজ আমি চলে যেতে বলি তাহলে কি আমার পক্ষে বেশি অশালীনতা প্রকাশ করা হবে?

লর্ড হেনরি হাসলেন এবং ডোরিয়েন গ্রে-র দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ গ্রে, আমাকে কি চলে যেতে হবে?

না, না, লর্ড হেনরি। আপনি দয়া করে যাবেন না। মনে হচ্ছে, বেসিলের মেজাজটা খুব খারাপ আর ও যখন রেগে যায় তখন আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি জানতে চাই সৎকাজ করা আমার দ্বারা কেন সম্ভব নয়।

আপনাকে বলব কি না সে কথা জানি না, মিঃ গ্রে। জিনিসটা এতই বিরক্তিকর যে ব্যাপারটা নিয়ে মনোযাগ দিয়ে আলোচনা করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে আমি পালিয়ে যাচ্ছি, না, বিশেষ করে আপনি যখন থাকতে বললেন। বেসিল, আমি থাকলে নিশ্চয় তোমার কোনো অসুবিধআ হবে না। হবে কি? তুমি আমাকে প্রায়ই বল যে ছবি আঁকার সময় তৃতীয় কেউ তোমার মডেলের সঙ্গে বসে গল্প করলে তোমার কাজের সুবিধা হয়।

হলওয়ার্ড ঠোঁট কামড়ালেন, বললেন, অবশ্য ডোরিয়েনের ইচ্ছে নিশ্চয় তুমি থাকবে। ডোরিয়েনের খেয়াল তার নিজের কাছে ছাড়া অন্য সকলের কাছেই আইন।

লর্ড হেনরি তাঁর টুপি আর দস্তানা তুলে নিয়ে বললেন, তোমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা কষ্টকর, বেসিল, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। অরলিনস-এ একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা দিয়েছি আমি। মিঃ গ্রে, বিদায়। একদিন বিকেলে কার্জন স্ট্রিটে আমার কাছে আসুন। পাঁচটার কাছাকাছি প্রতিদিনই আমি প্রায় বাড়িতে থাকি। কবে আসছেন আমাকে লিখে জানাবেন। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে দুঃখ পাব।

ডোরিয়েন গ্রে বেশ জোর গলাতেই বললেন, বেসিল, লর্ড হেনরি যদি চলে যান আমিও তাহলে চলে যাব। ছবি আঁকার সময় একবারও তুমি মুখ খোল না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে খুশি হওয়ার ভান করাটা আমার পক্ষে সত্যিই বড়ো কষ্টকর। ওঁকে থাকতে বল। আমি চাই উনি থাকুন।

ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে হলওয়ার্ড বললেন, ডোরিয়েন আর সেই সঙ্গে আমাকে খুশি করার জন্যে তুমি থেকে যাও হেনরি। কথাটা সত্যি যে কাজ করার সময় আমি কারো সঙ্গে কথাও বলি না, কারো কথা কানেও তুলি না। আমার মডেলদের কাছে সেটা সত্যিকারের কষ্টকরই হয়ে দাঁড়ায়। আমি অনুরোধ করছি—তুমি থেকে যাও।

কিন্তু অরলিনস-এ যাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে তাঁর কী হবে?

চিত্রকর হাসলেন, বললেন আমি মনে করি না তার জন্যে তোমার কোনো অসুবিধা হবে। হেনরি, তুমি আবার বসে পড়। ডোরিয়েন, এখন তুমি প্ল্যাটফর্মের ওপরে ওঠো, বেশি নড়াচড়া করো না, অথবা লর্ড হেনরির কথাতেও কান দিও না বিশেষ। একমাত্র আমি ছাড়া, সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের ওপরেই ওর প্রভাবটা বড়ো খারাপ।

ডোরিয়েন গ্রে প্ল্যাটফর্মের ওপরে উঠে এলেন, দেখে মনে হল তিনি একজন গ্রিক যুবক, আদর্শের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। লর্ড হেনরিকে তাঁর কেমন যেন ভালো লেগেছিল, তিনি মোটেই বেসিলের মতো নন। দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা বড়ো মধুর। তাছাড়া, হেনরির স্বরটি কী মধুর! কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লর্ড হেনরি, সত্যিই কি আপনার প্রভাব খারাপ?

সৎ প্রভাব বলে কিছু নেই, মিঃ গ্রে। সব প্রভাবই দুর্নীতির বাহক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দুর্নীতিমূলক।

কেন?

কারণ, কারো ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে গেলে নিজের আত্মাকে বিসর্জন দিতে হয়। তার স্বাভাবিক চিন্তা আর অনুভূতিকে বর্জন করতে হবে। তার নিজের গুণগুলি তার কাছে। বাস্তব নয়। তার পাপ, যদি পাপ বলে কোনো বস্তু থেকে থাকে, অপরের কাছ থেকে ধার করা। সে অন্য লোকের সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি; যে-নাটক তার জন্যে লেখা হয়নি সেই নাটকেরই অভিনয় করার জন্যে তার ডাক পড়ে। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে বিকাশ করা। নিজের স্বভাবটিকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা, অর্থাৎ কেন আমরা পৃথিবীতে এসেছি সেটা বুঝতে পারা। আজকাল মানুষ নিজেদেরই বড়ো ভয় করে। মানুষ ভুলে যায় নিজের ওপরে তার একটা কর্তব্য রয়েছে, আর সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য। অবশ্য তারা উদার প্রকৃতির। ক্ষুধার্তকে তারা অন্ন দেয়, দরিদ্রকে দেয় বস্ত্র। কিন্তু তাদের নিজেদের আত্মা থাকে অভুক্ত, উলঙ্গ। মনুষ্যজাতির কথা যদি ধরেন, তাহলে বলতে হবে আমাদের মধ্যে শৌর্য বলে কোনো পদার্থ নেই। সম্ভবত, কোনোদিনই আমাদের ও-জিনিসটা ছিল না। আমাদের শাসন করছে দুটি জিনিস, একটি হল সামাজিক ভীতি—ওটি হল নীতির গোড়ার কথা, আর একটি হল ভগবানের ভয়, এইটি হল ধর্মের মূল কথা। এবং তবু—

গভীর ভাবে কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন চিত্রকর। তাঁর মনে হল গ্রে-র মুখের ওপরে এমন একটি ভাব প্রতিফলিত হয়েছে যা তিনি আগে কখনো দেখেননি, তিনি বললেন, ডোরিয়েন, লক্ষ্মী ছেলের মতো ডান দিকে ঘাড়টা একটু বাঁকাও।

আস্তে আস্তে মিষ্টি গলায় এবং হাতটিকে অর্ধবৃত্তাকারে সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে (ইটনে পড়ার সময় এইভাবে তিনি কথা বলতেন) লর্ড হেনরি তাঁর কথার সূত্র ধরে বললেন, কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যদি মানুষকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হয়, যদি তাকে প্রতিটি অনুভূতি ভালোভাবে প্রকাশ করতে হয়, যদি তার প্রতিটি চিন্তা আর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তাহলে দুনিয়াটা আনন্দের এমন একটা সজীব উচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে যে আমরা মধ্যযুগের সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পাব, ফিরে আসব 'হেলেনিক' আদর্শে—তার চেয়েও সুন্দর, পবিত্র একটি আবহাওয়ায় প্রাণ ভরে বিশ্বাস নিতে পারব আমরা। কিন্তু আমাদের ভেতরে সে সবচেয়ে বেশি সাহসী সে-ও তার নিজেকে বড়ো ভয় করে।বর্বরতার অত্যাচার মানুষের আত্মত্যাগের মূর্তিতে তার বিষণ্ণ স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই অকারণ আত্মত্যাগই আমাদের জীবনের সুখ-সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। ত্যাগের জন্যেই আমরা শাস্তি পাই। যে সব

প্রবৃত্তিকে আমরা গলা টিপে হত্যা করি, সেই সব রুদ্ধ প্রবৃত্তিই আমাদের মনের মধ্যে বংশ বৃদ্ধি করে, বিষাক্ত করে আমাদের। দেহ পাপ করে একবারই, দু'বার নয়, আর আমাদের কর্ম পবিত্র করে তাকে। তারপরে একমাত্র আনন্দের কিছু স্মৃতি, অথবা অনুতাপের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রলোভন এড়ানোর একমাত্র উপায়ে হচ্ছে প্রলোভনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। বাধা পাও, না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তোমার আত্মা রুগ্ন হয়ে যাবে, যে বাসনাকে ভয়ঙ্কর নীতিগুলো ভয়ঙ্কর বলে চিহ্নিত করেছে, প্রচার করেছে দুর্নীতি বলে, সেই বাসনার উন্মাদনায় তুমি জ্বলে পুড়ে মরবে। মানুষের বলে বিশ্বের বিরাট বিরাট ঘটনার জন্ম মানষের মস্তিষ্কে। এই মস্তিষ্কের ভেতেরই পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট পাপ অঙ্কুরিত হয়। আপনি, মিঃ গ্রে, নিজের কথাই ধরুন, আপনার এই গোলাপি যৌবন আর গোলাপ-সাদা তারুণ্যের ভেতরে এমন সব আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত রয়েছে যাদের কথা ভাবতেই আপনার ভয় লাগে, জেগে জেগে অথবা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এমন সব স্বপ্ন আপনি দেখেন যাদের স্মৃতিগুগি আপনার মুখে লজ্জার আভা ছড়িয়ে দেয়—

ডোরিয়েন স্খলিত স্বরে বললেন, থামুন, থামুন। আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছেন। কী বলব আমি তা বুঝতে পারছি না, আপনার প্রশ্নের উত্তর একটা কিছু রয়েছে, কিন্তু সেটা কী তা আমি ঠিক পারছি না। আপনি আর কিছু বলবেন না। আমাকে একটু ভাবতে দিন। অথবা এ বিষয়ে কিছু চিন্তা না করাই ভালো।

ঠোঁট দুটি ফাঁক করে প্রায় দশটি মিনিট তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ দুটি তাঁর অস্বাভাবিক ভাবে জ্বল জ্বল করতে লাগল। তিনি যেন বুঝতে পারলেন একেবারে নতুন ধরনের কিছু প্রভাব তাঁর মনের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। তবু তাঁর মনে হল এগুলি তাঁর নিজেরই। যে কটি কথা বেসিলের বন্ধু তাঁকে বলেছেন, কথাগুলি নিঃসন্দেহ-হঠাৎ করেই বলা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, সেগুলি তাঁর হৃদয়ের গোপন তারে গিয়ে আঘাত করেছে। এরকম আঘাত আগে কেউ কখনো করেনি। কিন্তু এখন তাঁর মনে হলো একটি নতুন মূর্চ্ছনায় সেই তন্ত্রীগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সঙ্গীত তাঁকে এইভাবেই উদ্বেলিত করেছে। অনেকবার সঙ্গীত তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু সে সঙ্গীত মুখর ছিল না, এটা তাঁর কাছে নতুন কিছু ছিল না, এটি হচ্ছে আর একটি অনাবিষ্কৃত বিশৃঙ্খলা। আমাদের মনের মধ্যে ভগবান এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছেন। কথা, কেবল কথা! কী নিষ্ঠুর এরা! কত স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং নিষ্ঠুর। এদের হাত থেকে মুক্তি নেই কারো। অথচ তাদের মধ্যে কী তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা রয়েছে। একদিন যা নিরাকার ছিল তাকেই সাকার করে তোলে এরা। বেহালা অথবা বাঁশির সুরের মতো মিষ্টি এর সুর। শুধু কথা! কথার মতো বাস্তব জিনিস আর কোথাও কিছু রয়েছে?

সত্যি কথা, তাঁর বাল্যে এমন সব জিনিস ছিল যার অর্থ তিনি তখন বুঝতে পারতেন না। সেগুলিকে এখন তিনি বুঝতে পারেন। জীবন হঠাৎ তাঁর কাছে অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছে। মনে হচ্ছে তিনি যেন আগুনের ওপরে বিচরণ করছেন। একথা তিনি বুঝতে পারেননি কেন?

ইঙ্গিতময় হাসি হেসে লর্ড হেনরি তাঁকে লক্ষ করলেন। মনের অবস্থা ঠিক কী রকম থাকলে মানুষকে কিছু বলা উচিত নয় তা তিনি জানতেন। তাঁর কৌতূহল বেশ বেড়ে উঠল। তাঁর কথাগুলি যে হঠাৎ এতটা অর্থবহ হয়ে দাঁড়াবে তা বুঝতে পেরে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি একটি বই পড়েছিলেন। সেই বইটি পড়ে তিনি এমন কতকগুলি জিনিস জানতে পেরেছিলেন যেগুলি তিনি আগে জানতেন না। ডোরিয়েন গ্রে কি সেই ধরনেরই বিশেষ কোনো অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন? তিনি তো বাতাসে একটি তীর

ছুঁড়েছেন মাত্র, সেই তীর কি কোনো লক্ষ্যবস্তু ভেদ করেছে? মানুষকে মুগ্ধ করার শক্তি ছেলেটির কী সত্যিই অপরিসীম?

দুজনেই যে নির্বাক হয়ে রয়েছেন সে দিকে কোনো খেয়াল ছিল না বেসিলের। তিনি আপন মনে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ছবি এঁকে চলেছেন। সত্যিকারের নিপুণ চিত্রকর ছাড়া এ ধরনের ছবি আঁকা সত্যিই কল্পনার অতীত।

ডোরিয়েন গ্রে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, বেসিল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি একটু বাগানে গিয়ে বসি, আমর দম বন্ধ হয়ে আসছে এখানে।

বন্ধু, আমি খুব দুঃখিত। ছবি আঁকার সময় আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি না। কিন্তু আজকের মতো ভালোভাবে আর কোনোদিনই তুমি মডেলের কাজ করতে পারনি। একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি। আর আমি তোমর কাছ থেকে যা পেতে চেয়েছিলাম তার সবটুকুই পেয়েছি—অর্ধউন্মোচিত দুটি ঠোঁট এবং চোখের ওই উজ্জ্বল আভা। হ্যারি তোমাকে এতক্ষণ কী বলছিল তা আমি জানি না, কিন্তু সে নিশ্চয় এমন কিছু বলেছিল যার প্রভাবে পড়ে তোমার মুখের ওপরে এই রকম অপরূপ একটি ব্যঞ্জনা ফুটে বেরিয়েছে। মনে হচ্ছে, তোমাকে সে প্রশংসা করছিল। ও যা বলে তার একটি বর্ণও তুমি বিশ্বাস করো না।

উনি মোটেই আমাকে প্রশংসা করেননি। সম্ভবত সেই জন্যেই উনি আমাকে যা বলেছেন তার একটুও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

ক্লান্ত আর স্বপ্নিল চোখে তাকিয়ে লর্ড হেনরি বললেন, আপনি জানেন আমি যা বলেছি তার সমস্তটাই আপনি বিশ্বাস করেন। আপনার সঙ্গে বাগানে আমিও যাব চলুন। এই স্টুডিওর ঘরটিতে ভীষণ গরম লাগছে। বেসিল আমাদের ঠান্ডা কিছু খেতে দাও, স্ট্রবেরি মেশানো কিছু।

নিশ্চয়, নিশ্চয় হ্যারি। বেলটা বাজাও। পার্কার এলে তোমাদের যা যা দরকার সব এনে দিতে বলছি। আমার কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সেটুকু করতে আমি যাচ্ছি। ডোরিয়েনকে বেশিক্ষণ আটকে রেখ না। আজকে আমরা যে মুড এসেছে, এরকম মুড অনেকদিন আসেনি। এটা আমার সর্বোত্তম সৃষ্টি হবে, এমনিতেই এটা একটা মাস্টারপিস।

লর্ড হেনরী বাগানে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন লাইল্যাক ফুলের ঝাড়ের ঠান্ডা ছায়ার ডোরিয়েন গ্রে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছেন। যেমন করে মানুষ মদ্যপান করে, মনে হল ঠিক সেই রকম ভাবে ফুলের সুগন্ধ তিনি পান করছেন। তিনি তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন, একটা হাত তাঁর কাঁধের উপরে রাখলেন, এবং মৃদুস্বরে বললেন, আপনি ঠিকই করছেন। অনুভূতি ছাড়া আত্মাকে সুস্থ করা যায় না, যেমন আত্মাকে বাদ দিয়ে অনুভূতি পঙ্গু হয়ে যায়।

যুবকটি চমকে উঠে পিছিয়ে বসেন। তাঁর মাথা খোলা এবং গাছের পাতাগুলি তাঁর সেই উদ্দাম বিদ্রোহী চুলগুলির ওপরে পড়ে রঙিন জালের সৃষ্টি করেছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরে মানুষের চোখের মধ্যে যেমন একটা ভীতিজনক বিহ্বলতা জেগে ওঠে, তাঁর চোখের ভেতর থেকে সেই রকম একটা ভয়ের আমেজ ফুটে বেরোল। তাঁর খোদাই করা সুন্দর নাকটি কাঁপতে লাগল, কোনো একটি গোপন দুর্বল স্নায়ুর কাঁপুনি জেগে উঠল তাঁর রঙিন ঠোঁটের ওপরে। ঠোঁট দুটি সেই আবেগে কাঁপতে লাগল।

লর্ড হেনরী বলে গেলেন, হ্যাঁ, প্রবৃত্তি দিয়ে আত্মাকে নীরোগ করা, আর আত্মা দিয়ে প্রবৃত্তির

নিবৃত্তি করা—এটি হল জীবনের একটি প্রধান গোপন কথা। আপনি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। যতটুকু জানেন বলে আপনার ধারণা তার চেয়ে অনেক বেশি আপনি জানেন, ঠিক যেমন যতটা আপনি জানতে চান তার চেয়ে অনেক কম জ্ঞান আপনার রয়েছে।

ভ্রূকুটি করে ডোরিয়েন গ্রে তাঁর মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। তাঁর সামনে যে দীর্ঘাঙ্গ সুন্দর যুবক দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁকে তাঁর ভালো না লেগে উপায় ছিল না। তাঁর রোমান্টিক অলিভ রঙের মুখ এবং ক্লিষ্ট কন্ঠস্বর তঁকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। তার সেই খাদে বাঁধা এবং ক্লান্ত স্বরের মধ্যে এমন একটি জিনিস ছিল সেটা তাঁকে মুগ্ধ না করে পারেনি। এমন কি তাঁর ঠান্ডা, সাদা, ফুলের মতো হাতের মধ্যেও কেমন যেন একটা অদ্ভুত কমনীয়তা ছিল। কথা বলার সময় লর্ড হেনরির হাতগুলি নড়ছিল। মনে হচ্ছিল সেগুলি যেন সঙ্গীতের তালে তালে দুলছে, তাদের যেন নিজস্ব একটি ভাষা রয়েছে। কিন্তু ডোরিয়েনের কেমন যেন ভয় লাগছিল, এবং সেই ভয় পাওয়ার জন্যে তিনি যেন লজ্জিত-ও হচ্ছিলেন। নিজের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে একজন অপরিচিতের প্রয়োজন হল কেন? বেসিল হলওয়ার্ডকে তিনি অনেক দিনই জানেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব কোনোদিনই তাঁর মনে কোনোরকম পরিবর্তন আনতে পারেনি। হঠাৎ তাঁর সামনে এমন একজনের আবির্ভাব হল যিনি তাঁর কাছে জীবনের রহস্যটি প্রকাশ করে দিলেন। কিন্তু তবু ভয় করার কী রয়েছে? তিনি তো স্কুলের ছাত্র অথবা ছাত্রী নন। ভয় পাওয়াটা তো একটা হাস্যকর ব্যাপার।

লর্ড হেনরি বললেন, চলুন, ওই ছায়ায় গিয়ে বসি, পার্কার পানীয় নিয়ে এসেছে, এবং এই রোদের ঝাঁজে আপনি যদি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকেন তাহলে আপনার দফা রফা হয়ে যাবে, বেসিল আর কখনো আপনার ছবি তুলবে না। রোদে পোড়া আপনার চলবে না। এটা ঠিক উচিত হবে না আপনার।

বাগানের ধারে বসে হাসতে হাসতে ডোরিয়েন বললেন, তাতে ক্ষতি কী?

তাতে আপনারই সমূহ ক্ষতি, মিঃ গ্রে।

কেন?

কারণ আপনার অনবদ্য যৌবন রয়েছে আর যৌবন এমন একটা জিনিস যাকে পাওয়ার জন্যে মানুষ লালায়িত হয়।

লর্ড হেনরি, আমার কিন্তু সে রকম কিছু মনে হয় না।

না, এখন তা আপনারা মনে হবে না। একদিন আপনি যখন বৃদ্ধ হবেন, আপনার দেহের চামড়া যখন কুঁচকে যাবে, আপনি যখন দেখতে কদাকার হয়ে যাবেন, দুশ্চিন্তা আপনার কপালের রেখাগুলিকে যখন কুঞ্চিত করে তুলবে, আর কামনায় আপনার ঠোঁট দুটি মারাত্মকভাবে জ্বলতে থাকবে, তখনি যৌবনের কথা আপনার মনে পড়বে, তখনি আপনি এর অভাবটা ভীষণভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। এখন যেখানেই আপনি যাবেন সেখানেই সবাইকে আনন্দ দেবেন। এটা কি সব সময়েই সম্ভব হবে? আপনার মুখটা কেবল সুন্দর নয়, অসম্ভব সুন্দর, মিঃ গ্রে, হাসবেন না। কথাটা সত্যি। আর সৌন্দর্য যে প্রতিভার একটি স্ফুরণ, অথবা তার চেয়েও বড়ো—সেকথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। সূর্যের আলো, বসন্তকাল, অথবা কালো জলের ওপরে চাঁদের প্রতিফলনের মতো এটাও বিশ্বের একটি বড় সত্য। এ নিয়ে তর্ক করার অবকাশ নেই। এর সার্বভৌমত্ব ঈশ্বর ঠিক করে দিয়েছেন।

যাঁদের এই বস্তুটা রয়েছে তাঁরা রাজকুমারের পর্যায়ে পড়েন। হাসছেন? হায়, যখন আপনার যৌবন থাকবে না তখন কিন্তু আপনি আর হাসবেন না। লোকে মাঝে মাঝে বলে সৌন্দর্য নাকি দেহের বাইরের জিনিস। তা হতে পারে। কিন্তু চিন্তা যতটা বাহ্যিক, এ অন্তত ততটা নয়। আমার কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে সকল বিস্ময়ের সেরা বিস্ময়। বাইরের চেহারা দেখে যারা মানুষকে বিচার করে না তাদের বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রয়েছে। বিশ্বের আসল রহস্য যা আমরা সাদা চোখে দেখতে পাই তার মধ্যে নিহিত, যা দেখতে পাই না তার মধ্যে নয়। হ্যাঁ, মিঃ গ্রে, দেবাতারা আপনার ওপরে সদয়। কিন্তু দেবতারা যা দেন তা তাঁরা তাড়াতাড়িই ফিরিয়ে নেন। মাত্র কয়েকটি বছরই আপনি ভালোভাবে, পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে পারেন। যৌবন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার যৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে। তখনি আপনি হঠাৎ আবিষ্কার করবেন জয় করার মতো আর আপনার কিছু নেই। যেটুকু রয়েছে সে শুধু অতীতের স্মৃতি। সেই স্মৃতি পরাজয়ের চেয়েও আপনার কাছে তিক্ত বলে মনে হবে। প্রতি মাসে এই ক্ষয়মান সৌন্দর্য আপনাকে এমন সব পরিবেশের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সেগুলি ভয়নক ছাড়া আর কিছু নয়। সময় আপনাকে হিংসা করে, আপনার লিলি আর গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কমে যাবে, গাল যাবে তুবড়ে, চোখের দৃষ্টি যাবে ক্ষীণ হয়ে। ভীষণভাবে দুঃখ পাবেন আপনি। হায়, যতক্ষণ আপনার যৌবন রয়েছে ততক্ষণই তাকে উপলব্ধি করুন। নীরস নীতিকথা শুনে, অপরিবর্তনীয় ব্যর্থতাকে দেখার জন্যে, অজ্ঞদের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে, সাধারণ আর অশিক্ষিতদের সেবা করার বাসানায় আপনার সোনার দিনগুলিকে নষ্ট করবেন না। এ যুগের এইগুলিই হচ্ছে রুগ্ন আদর্শ, মিথ্যা উন্মাদনা। বাঁচুন, ভগবান আপনাকে যে সুন্দর জীবন দিয়েছেন তাকে পরিপূর্ণ ভাবেউপলব্ধি করুন। কোনো কিছুই যেন আপনার কাছে নগণ্য বলে গণ্য না নয়, সব সময় নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথে এগিয়ে যান, কিছুই ভয় করবেন না, একটি নতুন ভোগসুখবাদ—আমাদের শতাব্দী এই মতবাদেই বিশ্বাসী। আপনি হয়তো এর প্রকাশ্য প্রতীক। এমন কিছু নেই যা আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব নিয়ে করতে পারেন না। কিছুদিনের জন্যে পৃথিবী আপনার, যখনি আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল তখনি দেখলাম আপনি নিজে কী, এবং কী হতে পারেন সে বিষয়ে আপনি নিজেই জানেন না। আপনার মধ্যে অনেক জিনিস আমি দেখেছি যেগুলি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয়েছিল আপনার সম্বন্ধে আপনাকে আমি কিছু বলব। আমার মনে হয়েছিল আপনি যদি নষ্ট হয়ে যান তাহলে ব্যাপারটা খুবই মর্মান্তিক হবে। কারণ, খুব অল্পদিনই আপনার যৌবন বেঁচে থাকবে। সাধারণ পাহাড়ি ফুল ঝরে যায় বটে, কিন্তু আবার তারা ফোটে। এখনো যেমন আগামী জুন মাসেও ল্যাবারনাম ফুল তেমনি হলুদ রঙা হয়ে ফুটবে। এখন থেকে একমাসের মধ্যে ক্লিম্যাটিস লতা গাছের পাতায় বেগনে রঙের তারকা চিহ্নগুলি ফুটে বেরোবে এবং বছরের পর বছর এর পাতার সবুজ রাত্রিগুলি বেগনে তারকা চিহ্নগুলিকে মেলে ধরবে। কিন্তু কোনো দিনই আমরা আমাদের হারানো যৌবনের ফিরে পাব না। বিশ বছর বয়সে আমাদের মধ্যে যে আনন্দের জয়ধ্বনি ওঠে সেই আনন্দ শেষ পর্যন্ত ঝিমিয়ে আসে। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি শিথিল হয়ে আসে, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি পচে যায়। ভয়ঙ্কর অতলে আমরা অধঃপতিত হই। সে বাসনার জন্যে আমরা অতিমাত্রায় ভয় পাই তারই অতৃপ্তির স্মৃতি আমাদের পিছু ধাওয়া করে। যৌবন! যৌবন! এ পৃথিবীতে এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে, অবাক হয়ে ডোরিয়েন গ্রে তাঁর কথাগুলি শোনেন। লাইল্যাক ফুলের পাপড়িগুলি তাঁর হাত থেকে খসে নীচে শানুবাঁধানো জায়গায় পড়ে যায়, একটা ব্যস্তবাগীশ মৌমাছি কাছে এসে একটু ভনভন করে। তারপরে সে ফুলের ওপরে ঘোরার আশায় ছুটে বেরিয়ে যায়। সামান্য জিনিসের ওপরে কৌতূহলে নিয়ে তিনি এর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভয়ে বড়ো জিনিসের কাছাকাছি ঘেঁষতে না পেরে আমারা ঠিক এই ভাবেই ছোটোর

দিকে ঝুঁকে পড়ি। কোনো নতুন ভাবধারা প্রকাশ করতে না পেরে, অথবা ভয়ঙ্কর কোনো চিন্তা যখন হঠাৎ আমাদের মগজকে অবরোধ করে বসে, এবং তার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণের দাবী জানায়—তখন আমরা এই ধরনের ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে মেতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে মৌমাছিটা উড়ে গেল, গিয়ে বসল আর একটি ফুলের ওপরে। ফুলটি এপাশ থেকে ওপাশে ধীরে ধীরে নড়তে লাগল।

স্টুডিওর দরজার সামনে হঠাৎ চিত্রকরকে দেখা গেল, তিনি ভেতরে আসতে তাঁদের ইশারা করলেন।

তিনি বললেন, আমি অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্যে। আলো বেশ ভালোই রয়েছে। তোমাদের পানীয় নিয়ে এস।

তাঁরা দুজনে উঠে পড়লেন, তারপরে ধীরে ধীরে স্টুডিওর দিকে এগিয়ে গেলেন, সবুজ আর সাদা রঙে মেশানো দুটি প্রজাপতি তাঁদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল, বাগানের কোণে একটা পিয়ারা গাছে একটা থ্রাসপাখি গান শুরু করল।

লর্ড হেনরি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ গ্রে, আমাকে দেখে আপনি খুশি হয়েছেন?

হ্যাঁ। বর্তমানে আমি খুশি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই রকম আনন্দ কি সব সময় আমি পাব?

সব সময়! শব্দ দুটো সত্যিই বড়ো ভয়ঙ্কর। কথাটা শুনলেই আমি কাঁপতে থাকি। এই কথাটা বলতে মহিলাদের বেশ ভালো লাগে। চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে চাওয়ার ফলে প্রতিটি রোমান্সকেই তারা নষ্ট করে ফেলে। তা ছাড়া, কথাটা অর্থহীন, খামখেয়াল আর জীবনব্যাপী আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তফাৎ এই সে খামখেয়াল একটু বেশি দীর্ঘস্থায়ী।

স্টুডিওতে ঢোকার পরে ডোরিয়েন গ্রে তাঁর একটি হাত লর্ড হেনরির কাঁধের ওপরে রেখে বললেন, তাহলে, আমাদের বন্ধুত্ব খামখেয়াল-ই হোক।

এই বল তিনি প্ল্যাটফর্মের ওপরে উঠে গিয়ে মডেলের ভঙ্গিমায় দাঁড়ালেন।

একটা বড়ো আরাম কেদারার ওপরে বসে লর্ড হেনরি তাঁকে দেখতে লাগলেন। চারপাশে নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কেবল ক্যানভাসের ওপরে ব্রাশের মৃদু খসখসানি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল, আর যখন চিত্রকর কখনো-সখনো দু-এক পা পিছিয়ে দূর থেকে তাঁর ছবিটিকে দেখছিলেন তখন। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে তির্যক ভঙ্গিতে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল, সেই আলোর মধ্যে সোনালি রঙের ধূলিকণাগুলি নাচতে লাগল। গোলাপ ফুলের ভারী গন্ধ এসে ভরিয়ে দিয়েছিল জায়গাটা।

প্রায় মিনিট পনেরো কাজ করার পরে হলওয়ার্ড থামলেন। অনেক্ষণ ধরে ডোরিয়েন গ্রে-র দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে তাঁর বিরাট একটা ব্রাশের ডগা দাঁতের মধ্যে চেপে ধরে তাকলেন তাঁর ছবিটির দিকে, ভ্রূকুটি করলেন।

প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে ছবিটা।

এই বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে ক্যানভাসের বাঁদিকের এক কোণে সিঁদুরে অক্ষরে নিজের

নামটা লিখে দিলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন লর্ড হেনরি। ছবিটিকে বেশ ভালো করে পরীক্ষা করলেন। অপরূপ চিত্রকলাই বটে, যেন জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল, একেবারে দ্বিতীয় ডোরিয়েন গ্রে।

তিনি বললেন, বন্ধু, আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর। আধুনিকস যুগের একটি সুন্দরতম প্রতিকৃতি তুমি সৃষ্টি করেছ। মিঃ গ্রে, নেমে আসুন, নিজের প্রতিকৃতির দিকে একবার তাকান।

যুবকটি চমকে উঠলেন, মনে হল হঠাৎ যেন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই কি শেষ হয়েছে?

চিত্রকর বললেন, প্রায়। আজ তোমার বসা-টি হচ্ছে অদ্ভুত, চমৎকার। তোমার কাছে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ।

লর্ড হেনরি বললেন, সেই সাফল্যের মূলে রয়েছি আমি। তাই না মিঃ গ্রে(?

কোনো উত্তর দিলেন না ডোরিয়েন, অন্যমনস্কভাবে একবার তাঁর প্রতিকৃতির সামনে দিয়ে হাঁটলেন। তারপরে সেই দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রতিকৃতিটির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র তিনি পিছু ফিরলেন, আনন্দের আতিশয্যে কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে তাঁর গাল দুটি রঙিন হয়ে উঠল। তাঁর চোখের মধ্যে বেরিয়ে এল আনন্দের এক টুকরো জ্যোতি, মনে হল, তিনি যেন এই প্রথম নিজেকে চিনতে পেরেছেন। সেইখানে তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে কেমন যেন নির্বাক হয়ে গেলেন তিনি। মনে হল, হলওয়ার্ড তাঁকে যেন কিছু বলছেন, কিন্তু ঠিক কী বলছেন তা তাঁর কানে ঢুকল না। তিনি যে এত সুন্দর এই কথাটা আজই যেন তিনি জীবনে প্রথম বুঝদতে পারলেন। এর আগে ঠিক এমনভাবে তিনি বোঝেননি। বেসিল হলওয়ার্ড এতদিন তাঁকে যে-সব কথা বলে এসেছিলেন সেগুলিকে তিনি বন্ধুর মিষ্ট ভাষণ বলেই মনে করতেন। সে সব কথা তিনি শুনতেন, হাসতেন, এবং ভুলে যেতেন। সেই কথাগুলি তাঁর চরিত্রের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তারপরে এলেন লর্ড হেনরি যৌবনের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন তিনি, কিন্তু সেই সঙ্গে বলে দিলেন, সাবধান, যৌবন ক্ষণস্থায়ী!

কথাটা শোনার সময় তাঁর মনে লেগেছিল সত্যি কথা, কিন্তু এখন নিজের পূর্ণ প্রতিকৃতির ছায়ার সামনে দাঁড়িয়ে সেই কথাগুলি তাঁকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে গেল। হেনরির বক্তব্যের আসল ব্যঞ্জনাটা তিনি বুঝতে পারলেন। হ্যাঁ, সত্যি কথাই। এমন একটা দিন আসবে যেদিন তাঁর মুখের রেখাগুলি কুঁচকে যাবে, ঝুলে পড়বে গালের চামড়া, চোখের দৃষ্টি হবে নিষ্প্রভ, বিবর্ণ, তাঁ লাবণ্য নষ্ট হয়ে যাবে, নিটোল প্রাণবন্ত স্বাহ্যটি ঝুরঝুর করে পড়বে ভেঙে। তাঁর ঠোঁটের লালিমা, চুলের সোনালি বর্ণ সব নষ্ট হয়ে যাবে, নিঃশব্দে মিলিয়ে যাবে। আত্মার পরিপোষক যে জীবন, সেই জীবনই তাঁর দেহটিকে বিকৃত করে তুলবে। তিনি পরিণত হবেন একটি ঘৃণ্য জঘন্য, ভয়ঙ্কর মাংসপিণ্ডে।

এই কথা চিন্তা করতে করতে একটি তীক্ষ্ণ বেদনা শাণিত লৌহ শলকার মতো বুকে গিয়ে খোঁচা দিল। তাঁর দেহের প্রতিটি স্পর্শকাতর তন্ত্রী সেই আঘাতে আর্তনাদ করে উঠল। ঘোলটে হয়ে উঠল তাঁর চোখ দুটি, ধীরে ধীরে সে দুটি অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেল। মনে হল কার যেন তুষারশীতল একটি হাত তাঁ বুকের ওপরে এসে পড়েছে।

ডোরিয়েন গ্রে-কে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন হলওয়ার্ড, ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পছন্দ হচ্ছে না?

লর্ড হেনরি বললেন, অবশ্যই ওঁর পছন্দ হয়েছে। এ ছবি কার পছন্দ হবে না?

আধুনিক চিত্রকলায় এটি হচ্ছে সর্বোত্তম চিত্র। এর জন্যে তুমি আমার কাছে যা চাও তাই দেব। ছবিটা আমার চাই।

এটা আমার সম্পত্তি নয় হ্যারি।

কার সম্পত্তি?

কার আবার? ডোরিয়েনের।

ভাগ্যবান মানুষ।

ডোরিয়েন গ্রে তখনো তাঁর প্রতিকৃতির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, সেইভাবে তাকিয়ে থেকেই বিড়বিড় করে অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই তিনি বললেন, কী দুঃখের, কী দুঃখের! আমি বৃদ্ধ হব, বিকৃত আর ভয়ঙ্কর হবে একদিন। কিন্তু এই প্রতিকৃতি চিরকালই যৌবনের আবেগে থাকবে ভরা। আজকের এই জুন মাসের বিশেষ দিনটিতে সে যেমন রয়েছে, চিরকাল সে ঠিক তেমনিই থাকবে।...মনে হবে এ যেন এই সেদিনের ব্যাপার। যদি ঠিক উল্টোটা হত, আমি চিরকালই যুবক থাকতাম, আর এই প্রতিকৃতিটা যেত বুড়িয়ে। এর জন্য আমি আমার সর্বস্ব দিতে পারতাম। হ্যাঁ, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমি দিতে পারতামি না। প্রয়োজন হলে, আমার আত্মাকেও বিকিয়ে দিতে পারতাম।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, এ ব্যবস্থার নিশ্চয় তুমি রাজি হবে না বেসিল। এর জন্য তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ।

হলওয়ার্ড বললেন, আমার খুব বেশি আপত্তি রয়েছে হ্যারি।

ডোরিয়েন গ্রে ঘুরে তাঁদের দিকে তাকলেন, বললেন, বেসিল, আমি জানি তা তুমি করবে। বন্ধুদের চেয়ে তোমার চিত্রকলাকে তুমি বেশি ভালোবাস। একটা সবুজ ব্রোঞ্জের মূর্তি ছাড়া তোমার কাছে আমি আর কিছু নই। মনে হয় ততটুকুও নয়।

চিত্রকর অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডোরিয়েন তো ঠিক এইভাবে কথা বলেন না? ওঁর হল কী? মনে হচ্ছে যেন বেশ চটেছেন তিনি। তাঁর মুখ আর গাল দুটি লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

ডোরিয়েন বলে গেলেন, হ্যাঁ, তোমার হাতির দাঁতের 'হারমিস' অথবা রুপোর 'ফন' যা, আমার দাম তোমার কাছে তার চেয়ে-ও কম। তুমি তাদের সব সময়েই পছন্দ করবে। কিন্তু আমকে তোমার কতদিন ভালো লাগবে? যতদিন পর্যন্ত আমার মুখে প্রথম কুঞ্চন না দেখা দেয়। তাই না? এখন আমি বুঝতে পারছি, দেহের সৌন্দর্য, তার দাম যাই হোক, নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার সব কিছু হারিয়ে ফেলে, তোমার ছবি আমাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছে। লর্ড হেনরি খাঁটি কথা বলেছেন। পরম-পাওয়া বলে যদি মানুষের কিছু থাকে তা হল একমাত্র ওই যৌবন। যখনি আমার মনে হবে আমি বুড়ো হচ্ছি তখনি আমি আত্মহত্যা করব।

হলওয়ার্ডের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ডোরিয়েনের একটা হাত ধরে তিনি বললেন, ডোরিয়েন, ডোরিয়েন! ওকথা বলো না। তোমা মতো বন্ধু আমার নেই, আর হবেও না। এইসব জিনিসগুলোকে নিশ্চয় তুমি হিংসে কর না। কর কি? এইসব জিনিসের চেয়ে তুমি অনেক বেশি সুন্দর।

পৃথিবীতে যাদের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না তাদের সকলেরই আমি হিংসে করি। আমার যে চিত্রটি তুমি এঁকেছ সেটিকেও হিংসা করি আমি। আমি যা হারাব তা এ ধরে রাখবে কেন? চলমান প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছ থেকে কিছু-না সরিয়ে নিচ্ছে, তার পরিবর্তে কিছু দিচ্ছে। হায়রে, এর উল্টোটা যদি হত! যদি চিত্রটারই পরিবর্তন ঘটত, আমি এখন যা রয়েছি তাই যদি আমি চিরকাল থাকতাম! তুমি এ-ছবি কেন আঁকলে? একদিন না একদিন এ আমাকে বিদূপ করবে, মর্মান্তিকভাবে বিদূপ করবে।

উষ্ণ অশ্রু তাঁর চোখের ওপরে ছলছল করে উঠল। তিনি তাঁর হাতটাকে ছিনিয়ে নিলেন। তারপর ডিভানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটাকে লুকিয়ে ফেললেন, মনে হল তিনি যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করছেন।

চিত্রকর তিক্তভাবে বললেন, এর জন্যে হ্যারি তুমি দায়ী।

লর্ড হেনরি চিত্রকরের তিরস্কারকে গ্রাহ্য না করে কাঁধে একা শ্রাগ করে বললেন, এ-ই হচ্ছে আসল ডোরিয়েন গ্রে—অন্য কিছু নয়।

না, এ তা নয়।

এ যদি তা-ই না হয়, তাহলে একে নিয়ে আমি কি করব?

চিত্রকর বিড়-বিড় করে বললেন, তোমাকে যখন চলে যেতে বলেছিলেন তখনি তোমার চলে যাওয়া উচিত ছিল হ্যারি।

লর্ড হেনরি বললেন, তুমি থাকতে বললে বলেই তো থাকলাম।

হ্যারি, একই সঙ্গে আমার দুটি প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আমি ঝগড়া করে থাকতে পারব না। কিন্তু আমার জীবনের যেটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তোমরা দুজনে সেটিকে ঘৃণা করতে আমাকে বাধ্য করছ। আমি এটাকে নষ্ট করে ফেলব। এটা ক্যানভাস আর রঙ ছাড়া আর কী! আমাদের তিনটা জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধ্বংস করতে আমি আর কী! আমাদের তিনটি জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধ্বংস করতে আমি একে দেব না।

এই বলে হলওয়ার্ড ভারী পর্দা দেওয়া জানালার নীচে বসানো ছবি আঁকার টেবিলের দিকেএগিয়ে যাওয়ার সময় ডোরিয়েন গ্রে বালিশের ওপর থেকে মাথাটা তুলে বিবর্ণ মুখে আর অশ্রুসিক্ত লোচনে তাঁর দিকে তাকালেন। হলওয়ার্ড ওখানে কী করছেন? টিনের টিউব আর শুকনো ব্রাশের জঙ্গলে তিনি কি যেন হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। হ্যাঁ, তিনি লম্বা পাতলা ব্লেডের স্টিলের ছুরিটা খুঁজছিলেন। শেষ পর্যন্ত জিনিসটা খুঁজে পেলেন তিনি, তারপরেই প্রতিকৃতিটা এফোঁড়-ওফোঁড় করার জন্য তিনি তৈরি হলেন।

একটা চাপা আর্তনাদ করে ছেলেটি সোফা থেকে লাফিয়ে উঠলেন, এবং দৌড়ে গিয়ে হলওয়ার্ড-এর হাত থেকে ছুরিটা ছিনিয়ে নিলেন। ছুরিটাকে স্টুডিওর একধারে ছুঁড়ে ফেলে

তিনি বললেন, বেসিল, ও কারো না, কো না। ওটা হত্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

ডোরিয়েনের ক্রিয়াকলাপে চিত্রকর কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই বিস্ময় কাটার পরে তিনি একটু উদাসীনভাবেই বললেন, ডোরিয়েন তুমি যে শেষ পর্যন্ত আমার তৈরি প্রতিকৃতির মূল্য বুঝতে পেরেছে তা বুঝতে পেরে আমি খুশি হয়েছি। আমি ভাবতে পারিনি যে তুমি তা পারবে।

মূল্য বোঝার কথা বলছ? আমি এর প্রেমে পড়ে গিয়েছি, বেসিল। ওটা আমার অচ্ছেদ্য অংশ। এটা আমার মুখের নয়, মনের কথা।

ঠিক আছে। তোমার ছবিটা শুকিয়ে গেলেই তাকে বার্নিশ করা হবে, বাঁধানো হবে ফ্রেম দিয়ে। তারপর তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তখন তোমার প্রতিকৃতিটা নিয়ে তোমার যা খুশি তা-ই করতে পার।

এই কথা বলে তিনি ঘরের একপ্রান্তে এসে চা আনার জন্য বেল বাজালেন, ডোরিয়েন, নিশ্চয় তুমি চা খাবে? হ্যারি, তুমিও? অথবা এই সাধারণ আনন্দে তোমাদের কোনো আপত্তি রয়েছে।

লর্ড হেনরি বললেন, সাধারণ আনন্দকে আমি পুজো করি। জটিলতার শেষ আশ্রয় তারাই। কিন্তু একমাত্র স্টেজের ওপরে ছাড়া আমি হইচই পছন্দ করি না। তোমরা দুজনেই কি অদ্ভুত জীব বল তো? আমি ভেবে আশ্চর্য হই কে মানুষকে সামাজিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী বলে চিহ্নিত করেছেন। যত অপরিপক্ক ব্যাখ্যা রয়েছে এটি হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অর্বাচীন। মানুষ অনেক কিছু সন্দেহ নেই, কিন্তু সে আদৌ বিচারবুদ্ধিসম্মপন্ন নয়। সব দিক দিয়ে ভাবতে গেলে সে যে মোটের ওপরে তা নয় এতে আমি খুশিই হয়েছি। যদিও আমি মনে করি একটা ছবি নিয়ে তোমাদের মতো ছোকরাদের এতটা কচকচি করা উচিত হয়নি। বেসিল, এত গোলমালে কাজ নেই। ওটা বরং আমাকে দিয়ে দাও। এই মূর্খ বালক সত্যি সত্যিই ওটা চায় না। আমি চাই।

ডোরিয়েন গ্রে চিৎকার করে উঠলেন, আমাকে না দিয়ে ও-ছবি যদি তুমি আর কাউকে তাহলে আমি তোমাকে কোনোদিনই ক্ষমা করব না, বেসিল এবং অন্য লোকে আমাকে বোকা বলবে তা-ও আমি সহ্য করব না।

ডোরিয়েন, তুমি জান এ ছবি তোমার। আঁকার আগেই এটা আমি তোমাকে দান করেছি।

এবং আপনি যে কিছুটা বোকার মতো কাজ করেছেন তা আপনি জানেন, মিঃ গ্রে। আপনাকে নিশ্চয় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে আপনার বয়সটা খুব কাঁচা।

লর্ড হেনরি, আজ সকালেই আমার ভীষণ আপত্তি জানানো উচিত ছিল।

হ্যাঁ, আজকে সকাল! তখন থেকেই আপনি বেঁচে আছেন।

দরজায় একটি টোকা পড়ল, বাটলার একটা পেতলের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপরে সেটিকে একটি ছোটো জাপানি টেবিলের ওপরে রেখে দিল। চায়ের কাপ আর সসারের টুঙ-টাঙ আওয়াজ হল, একটি চাকর বয়ে নিয়ে এল দুটি গোলাকার চায়না ডিশ। ওই দুজনে অবসন্নভাবে টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ঢাকনির তলায় কী রয়েছে।

লর্ড হেনরি বললেন, আজকে রাত্রিতে আমরা সবাই থিয়েটারে যাই চল। কোথাও না কোথও নিশ্চয় কিছু-না-কিছু হচ্ছে। হোয়াইট-এ আজ আমার ডিনার খাওয়ার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হচ্ছে আমারই এক বৃদ্ধ বন্ধু। তাঁকে আমি একটা টেলিগ্রাম করে দেব, বলব শারীরিক অসুস্থতার জন্যে যেতে পারলাম না। অথবা হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ায় যেতে পারলাম না সেকথাও বলতে পারি। আমার ধারণা অজুহাত হিসাবে ওটা বেশ জুৎসই হবে। অকপটতার মধ্যে যত বিস্ময় রয়েছে এটা হবে তাদের মধ্যে আর এক বিস্ময়।

হলওয়ার্ড বিড়-বিড় করলেন, এটা হচ্ছে নিজের পোশাক পরার মতো একঘেয়ে। পরার পরেই মনে হয় সেগুলি কত বিতিকিচ্ছিরি।

লর্ড হেনরি স্বপ্নিল চোখে বললেন, ঠিক কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর পোশাকই হচ্ছে জঘন্য। এটা যেমন জাঁকালো তেমনি হতাশাব্যঞ্জক। আধুনিক জীবনে পাপই হচ্ছে একমাত্র রঙিন।

হ্যারি, ডোরিয়েনের কাছে ওই সব কথা বলা তোমার নিশ্চয় উচিত হচ্ছে না।

কোন ডোরিয়েনের কথা তুমি বলছ? যিনি এখন আমাদের জন্যে চা করছেন, তিনি? না, ওই ছবির ডোরিয়েন?

দুজনের কাছেই।

ডোরিয়েন বললেন, লর্ড হেনরি, আমি আজ আপনার সঙ্গে থিয়েটারে যাচ্ছি।

তাহলে আপনি আসুন। বেসিল, তুমিও নিশ্চয় আসছ। না কি?

না, সত্যিই যেতে পারব না। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে আমার।

মিঃ গ্রে, এই পরিস্থিতিতে আমরা একাই যাব।

খুব খুশি হব আমি।

ঠোঁট কামড়ালেন চিত্রকর। তারপরে একটি কাপ হাতে নিয়ে তিনি ছবিটির দিকে এগিয়ে গেলেন। বিষণ্ণভাবে তিনি বললেন, আমি আসল ডোরিয়েনের সঙ্গেই থাকব।

জীবন্ত ছবিটি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটাই কি তোমার আসল ডোরিয়েন? আমি কি সত্যিই ওই রকম দেখতে?

হ্যাঁ, তুমি তাই।

কী চমৎকার, কী চমৎকার বেসিল!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হলওয়ার্ড বললেন, অন্তত বাইরে থেকে দেখতে। তবে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না। তারও দাম যথেষ্ট।

লর্ড হেনরি চেঁচিয়েই বললেন, আনুগত্য নিয়ে মানুষ কেন যে এত হইচই করে বুঝি না। এমনকি প্রেমের ব্যাপারেও জিনিসটা শারীরবৃত্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। যুবকরা বিশ্বাসী হতে চায়, কিন্তু তারা বিশ্বাসী

নয়। বৃদ্ধেরা অবিশ্বাসী হতে চান, কিন্তু হতে পারেন না। এছাড়া আর কিছুই বলার নেই আমাদের।

হলওয়ার্ড বললেন, তুমি আজ থিয়েটারে যেয়ো না ডোরিয়েন। এখানে রয়ে যাও। রাত্রিতে আমরা একসঙ্গে ডিনাক খাব।

না, বেসিল।

কেন?

কারণ লর্ড হেনরির কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য ওর কাছে তোমার দাম বাড়বে না। নিজের প্রতিজ্ঞাই ও ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আমি অনুরোধ করছি তুমি যেয়ো না।

হেসে মাথা নাড়লেন ডোরিয়েন।

আমি তোমাকে অনুরোধ করছি।

ডোরিয়েন ইতস্তত করতে লাগলেন। চায়ের টেবিলে বসে লর্ড হেনরি বেশ রসিকতার দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন।

ডোরিয়েন বললেন, আমাকে যেতেই হবে বেসিল।

হলওয়ার্ড বললেন, ঠিক আছে।

তিনি ফিরে গিয়ে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপরে রেখে দিলেন, বললেন, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তোমাদের আবার পোশাক পালটাতে হবে। বিদায় হ্যারি। বিদায় ডোরিয়েন। তাড়াতাড়ি একদিন এস। কালকেই।

নিশ্চয়।

ভুলে যাবে না?

না, নিশ্চয় না।

আর...হ্যারি?

বলুন বেসিল।

আজকে সকালে তোমাকে কী বলেছিলাম মনে করে দেখ।

আমার মনে নেই।

তোমার ওপরে আমার বিশ্বাস রয়েছে।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, আমি যদি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারতাম! আসুন, মিঃ গ্রে,

বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে। আপনাকে আমি যথাস্থানে নামিয়ে দেব। বেসিল, চললাম, আজকের বিকালটা বেশ ভালোই কাটল।

তাঁদের পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেসিল সোফার ওপরে ঢলে পড়লেন। তাঁর চোখের ভেতর থেকে একটি ক্লিষ্ট বেদনার জ্যোতি বেরিয়ে এল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন বেলা সাড়ে বারোটার সময় লর্ড হেনরি ওটোন কার্জন স্ট্রিট থেকে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর কাকার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অ্যালব্যানির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর কাকা হচ্ছেন লর্ড ফারমোর, বৃদ্ধ এবং অবিবাহিত। বাইরে থেকে কিছুটা রুক্ষ মনে হলেও, আসলে তিনি ছিলেন মিষ্টি স্বভাবের। তাঁর সমাজের বাইরের লোকেরা তাঁকে স্বার্থপর বলে চিহ্নিত করত, কারণ তার কাছ তাঁরা কোনো উপকার পেত না। অথচ তাঁর নিজস্ব সমাজে দিলদরিয়া বলে নামডাক ছিল তাঁর। কারণ যারা তাঁকে খুশি করতে পারত তাদের তিনি ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করতেন। ইসাবেলা যখন যুবতী ছিলেন সেই সময় তাঁর বাবা মাদ্রিদে আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ব্যাপরটা অচিন্ত্যনীয়, কিন্তু সত্য যে প্যারিসের দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের পদ না পাওয়ায় বিরক্ত হয়ে খামাখেয়ালি করে তিনি কূটনৈতিক চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসেন। তিনি বিশ্বাস করতেন উচ্চ বংশ, আলস্য সরকারি চিঠিপত্র লেখার যোগ্যতা এবং আমোদ-প্রমোদের অযৌক্তিক স্পৃহার দিক থেকে বিচার করলে ওই পদটির যোগ্যতম প্রার্থী ছিলেন একমাত্র তিনিই। পুত্রটি ছিলেন তাঁর পিতার সেক্রেটারি। পিতার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রও চাকরিতে ইস্তফা দেন, সে সময়ে সকলেই ভেবেছিল কাজটা তাঁর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হয়েছিল; এবং কিছুদিন পরে পিতার খেতাবের অধিকারী হয়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের যেটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কলা—সেই কিছু-না-করার চর্চার তিনি মশগুল হয়ে রইলেন। শহরে তাঁর দুটি বড়ো বাড়ি ছিল, বেশি ঝামেলা এড়ানোর জন্য তিনি ছোটো বাড়িতে বাস করতে ভালোবাসতেন, খাওয়া-দাওয়া করতেন ক্লাবে। মিডল্যান্ড-এ তাঁর যে সব কয়লার খনি ছিল সেগুলি দেখাশোনা করতেন কিছুটা। পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে তিনি কয়লার ব্যবসাতে মেতেছেন কেন কেউ এই প্রশ্ন করলে তিনি প্রায়শই বলেতন যে ওইটাই একমাত্র জিনিস যা ভদ্রলোকেরা নিজেদের বাড়িতে জ্বালানোর ভব্যতা অর্জন করেন। রাজনীতির দিক থেকে তিনি ছিলেন টোরি সম্প্রদায়ভুক্ত। যখন অবশ্য টোরিরা সরকার গঠন করতে অসমর্থন হত, সেই সময় তিনি তাদের একদল র‍্যাডিক্যাল বলে যথার্থই গালাগালি দিতেন। নিজের পরিচারকের কাছে তিনি ছিলেন বীরপুরুষ যদিও সেই পরিচারকটি সব সময় তাঁর কাছে তর্জন-গর্জন করত। বেশির ভাগ আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে রীতিমতো ভয় করত, কারণ তিনি প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাঁদের ধমক দিতেন। একমাত্র ইংলন্ডেই তাঁর মতো মানুষের জন্ম সম্ভব। এবং সব সময়েই তিনি অভিযোগ করতেন যে দেশটা একেবারে জাহান্নামে গিয়েছে। তাঁর সমস্ত নীতিগুলিই পুরনো যুগের, কিন্তু তাঁর যতগুলি খেয়াল অথবা বদখেয়াল রয়েছে তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা যায়।

লর্ড হেনরি ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর কাকা লর্ড ফারমোর সাধারণ গোছের শিকারে-কোট গায়ে দিয়ে চুরুট খেতে খেতে টাইমস কাগজের ওপারে চোখ বুলোতে বুলোতে ঘোঁত-ঘোঁত করছেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, আরে হ্যারি যে!(এত সকালে? আমার ধারণা ছিল তোমাদের মতো সুখী ছোকরারা বেলা দুটোর আগে বিছানা থেকে ওঠে না। বিকাল পাঁচটার আগে টিকিট দেখা যায় না তাদের।

সত্যি বলছি কাকা, একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার! কিছু পেতে এসেছি তোমার কাছ থেকে।

বিকৃত মুখে লর্ড ফারমোর বললেন, সম্ভবত টাকা চাই! ঠিক আছে, বসো। ব্যাপারটা কী খুলে বল তোমাকে। আজকাল যুবকরা মনে করে টাকাটাই মানুষের সব।

কোটের বুকে বোতামটা লাগিয়ে লর্ড হেনরি ধীরে ধীরে বললেন, ঠিক বলেছ কাকা, এবং টাকার সত্যিকার দামটা যে কী তা তারা বড়ো হলেই বুঝতে পারে। আমি কিন্তু টাকা চাইতে আসিনি। আঙ্কল জর্জ, সত্যিকার টাকার দরকার তাদেরই যাদের জিনিসপত্রের দাম মেটাতে হয়। আমি কোনদিন ক্যাশ টাকা দিয়ে জিনিস কিনি না। ছোটো ছেলের ধারটাই হচ্ছে একমাত্র মূলধন। ওর ওপরে বেশ আরাম করে বাঁচা যায়। তাছাড়া আমি সব সময় ডার্টমুরের ব্যবসাদারদের সঙ্গে কারবার করি। ফলে টাকা-পয়সা নিয়ে কোনোদিন তারা আমাকে বিরক্ত করে না। বর্তমানে আমি এখানে এসেছি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে। অবশ্য এমন কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ নয়, একেবারে অপ্রয়োজনীয়।

ইংলিশ ব্লু-বুক-এ যা রয়েছে তার সবটুকুই আমি তোমাকে বলতে পারি। অবশ্য আজকাল লোকগুলো যা-তা লিখে যাচ্ছে। আমি যখন ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে ছিলাম তখন এখানকার চেয়ে লোকে আরো অনেক ভালো লিখত। কিন্তু শুনছি ওরা আজকাল পরীক্ষা করে ওই সব চাকরিতে লোক নিচ্ছে। কী তুমি আশা কর? পরীক্ষাটা নিছক প্রতারণা ছাড়া আর কী বল? মানুষ যদি ভদ্রলোক হয় তাহলে তার সব জিনিসই জানা হয়ে যায়, আর যদি সে তা না হয়, তাহলে সে যতটুকু শেখে তার সবটুকুই তার ক্ষতি করে।

লর্ড হেনরি কিছুটা বিকৃত স্বরেই বললেন, তোমার ওই সব সরকারি কেতাবে মিঃ ডোরিয়েন গ্রে-র সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই, আঙ্কল জর্জ।

সাদা চুলে ভরা ভুরু দুটি কুঁচকিয়ে লর্ড ফারমোর জিজ্ঞাস করলেন, মিঃ ডোরিয়েন গ্রে? কে বল তো?

সেইটাই তো আমি জানতে এসেছি, আঙ্কল জর্জ। অথবা বলতেও পার আমি তা জানি, তিনি হচ্ছেন শেষ লর্ড কেলসোর নাতি। তাঁর মা ছিলেন দেবেরু, লেডি মার্গারেট দেবেরু। তাঁর মায়ের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু বল। তিনি কেমন দেখতে ছিলেন? তিনি বিয়ে করেছিলেন কাকে? তোমার সময়কার প্রায় সকলকেই তুমি চিনতে, তাঁকেও হয়তো তুমি জানতে পার। বর্তমানে মিঃ গ্রে-র সম্বন্ধে কিছু জানার কৌতূহল আমার হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে সবেমাত্র।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি লর্ড হেনরির স্বর অনুকরণ করে বললেন, কেলাসোর নাতি! কেলাসোর নাতি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। তার মা-কে আমি খুব ভালো করেই জানতাম। মনে হচ্ছে তার যখন খ্রিশ্চানিং হল সেই থেকেই তাকে আমি জানি। অপরূপ সুন্দরী বলতে যা বোঝায় সে ছিল সেই রকম মেয়ে—এই মার্গারেট দেবেরু। একটা কপর্দশূন্য ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেল মেয়েটা। এই দেখে সবাই তো খাপ্পা। ছোকরাটার কিছুই ছিল না, পদাতিক সেনাবাহিনীতে সামান্য বেয়ারা ছিল মাত্র, কিম্বা ওই জাতীয় সামান্য একটা চাকরি করত। নিশ্চয়। মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা। বিয়ের কয়েক মাস পরেই স্পা-তে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে ছোকরাটা মারা যায়। এ-সম্বন্ধে একটা নোংরা কথাও অবশ্য শোনা যায়। লোকে বলে কেলসো নাকি একটা বেলজিয়াম গুণ্ডাকে তার পেছনে লেলিয়ে দেয়। গুণ্ডাটা প্রকাশ্য রাস্তার ওপরে জামাইকে অপমান করে। এর জন্যে কিছু অর্থও ঢালতে হয়েছিল তাকে। তারপরেই যা ঘটার ঘটল। লোকে যেমন ভাবে পায়রা জবাই করে সেই গুণ্ডাটাও ঠিক তেমনিভাবে একদিন সেই ছোকরাকে শেষ করে ফেলল। ব্যাপারটা চেপে দেওয়া হল বটে, কিন্তু সেই থেকে বেশ কিছুদিন কেলসোর সঙ্গে বিশেষ কেউ আর মেলামেশা করত না। বেচারাকে ক্লাবে বসে একাই খাওয়া শেষ করতে হত। শুনেছি সে তার মেয়েকে আর নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল। সেই মেয়ে কিন্তু তার বাবার সঙ্গে জীবনে আর কোনদিন কথা বলেনি। না, না, কাজটা কেলসো

ভালো করেনি। মেয়েটাও মারা গেল—এক বছরের মধ্যেই। তার একটা ছেলে ছিল। তাই কি? আমার মনে নেই। কেমন দেখতে বল তো? যদি তার মায়ের মতো হয় তাহলে ছোকরাটাকে নিশ্চয় সুন্দর-ই বলতে হবে।

সায় দিলেন লর্ড হেনরি, দেখতে ছেলেটি বেশ সুন্দরই বটে।

বৃদ্ধ লোকটি বলে চললেন, আশা করি, উপযুক্ত মানুষের হাতেই সে পড়বে। কেলসো যদি তার জন্যে যতটুকু করা উচিত তাই করে যায় তাহলে অনেক টাকারও মালিক সে হবে। তার মায়ের ঠাকুরদার মারফৎ সেলবি-র সমস্ত সম্পত্তি তার মা পেয়েছিল। তার ঠাকুরদা কেলসোকে ঘৃণা করতেন, তাঁর মতে কেলসো ছিল একটা ঘৃণ্য কুকুর। কথাটা মিথ্যে নয়। আমি যখন মাদ্রিদে ছিলাম সেই সময় একবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সত্যি বলছি, তাকে দেখে আমি তখন লজ্জিতই হয়েছিলাম। রানি একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা, ভাড়া নিয়ে কোচোয়ানের সঙ্গে সব সময়ে ঝগড়া করেন ওই ইংরেজ ভদ্রলোকটি কে বলুন তো? এই নিয়ে স্থানীয় লোকেরা বেশ একটা মুখরোচক গল্পই রচনা করে বসল। তোমাকে কী বলব, মাসখানেক আমি কোর্টে মুখ দেখাতে পারিনি। আমার ধারণা নাতির সঙ্গে সে খুব একটা ভালো ব্যবহার করত না।

লর্ড হেনরি বললেন, তা আমি জানি না। আমার ধারণা, ছেলেটির যথেষ্ট অর্থ রয়েছে। তবে সে এখনো সাবালক হয়নি। সেলবি যে তাঁর আত্মীয় সেকথা আমি জানি, তিনিই আমাকে তা বলেছেন। আর...তাঁর মা খুব সুন্দরী ছিলেন, তাই না?

আমার মতে মার্গারেট দেবেরু সবচেয়ে সুন্দরী রমণী, যাকে বলে পরমা সুন্দরী। সে যে কেন অমন কাজ করল তা আমি জানি না। কত ভালো পাত্র ছিল। তাদের যাকে খুশি তাকেই সে বিয়ে করতে পারত। কার্লিংটন তো তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। রোমান্টিক বলতে তোমরা যা বোঝ মার্গারেট ছিল তা-ই। আর শুধু তার কথাই বা বলি কেন, ওই বংশের সব মহিলারাই ওই রকম। পুরুষ মানুষরা অতি সাধারণ, কিন্তু মেয়েরা অসাধারণ। কার্লিংটন তার কাছে নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা করেছিল, সেকথা সে আমাকে নিজেই বলেছিল। মার্গারেট তাকে বিদ্রূপ করে হাসত। বিবেচনা কর, লন্ডনে এমন কোনো যুবতী ছিল না যে কার্লিংটনকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে ছোটাছুটি না করত। আচ্ছা হ্যারি বিয়ের কথা যখন উঠলই তখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ডার্টমুর নাকি একটি আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করতে চায়? কোনো ইংরেজ যুবতীই কি তার যোগ্য নয়?

আঙ্কল জর্জ, এখন আমেরিকান বিয়ে করাই তো ফ্যাশান।

টেবিলের ওপরে ঘুষি মেরে লর্ড ফারমোর বললেন, পৃথিবীর সমস্ত মেয়েদের মধ্যে ইংরেজ মেয়েরাই শ্রেষ্ঠ, হ্যারি। একথা আমি জোর করেই বলতে পারি।

সেদিক থেকে আমেরিকান মেয়েদেরই আমাদের দেশের ছেলেরা বেশি পছন্দ করে, একথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

তাঁর কাকা বিড়বিড় করলেন, আমি শুনেছি, আমেরিকান মেয়েরা বেশিদিন টেকে না।

দীর্ঘদিন ধরে প্রণয়লীলা তাদের ক্লান্ত করে তোলে, কিন্তু বেড়াবাজির দৌড়ে তারা অনবদ্য। ঘোড়ার মতো সব সময়েই তারা ছুটতে ভালোবাসে। ডার্টমুর-এর কোনো আশা রয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গজগজ করে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটির আত্মীয়স্বজন কেন জান? আছে কেউ?

লর্ড হেনরি মাথা নাড়লেন, আমেরিকান মহিলারা তাদের বাপ-মায়ের পরিচয় লুকিয়ে রাখে, ঠিক যেমন ইংরেজ মহিলার লুকিয়ে রাখে তাদের অতীত জীবনের কাহিনি।

তারা শুয়োর মাংসের ব্যবসা করে, তাই না?

ডার্টমুরের দিক থেকে ভাবলে ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়ায় বটে, আঙ্কল জর্জ, শুনেছি, আমেরিকাতে রাজনীতির পরেই যে ব্যবসাটা জমেজমাট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে ওই শুয়োর মাংসের ব্যবসা।

মেয়েটি কি দেখতে ভালো?

তার ধারণা সে সুন্দরী। বেশির ভাগ আমেরিকান মহিলারা নিজেদের সুন্দরী বলে মনে করে। তাদের লাবণ্যের এইটাই হচ্ছে গোপন কথা।

এই সব আমেরিকান মহিলার নিজেদের দেশে কেন থাকতে পারে না বল তো? তারা তো সব সময়েই বলে বেড়াচ্ছে যে আমেরিকা হচ্ছে স্বর্গ।

তাই বটে। লর্ড হেনরি বললেন, বিশেষ করে সেই জন্যেই ইভ-এর মতো সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তারা ব্যাকুল। এখন আমি চলি আঙ্কল জর্জ। এখানে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে লাঞ্চের দেরি হয়ে যাবে। আমি যে সংবাদ জানতে চাই সেইটুকু আমাকে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। নতুন বন্ধুদের সম্বন্ধে সব সময় আমি কিছু জানতে চাই। পুরনো বন্ধুদের সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ নেই।

আজ কোথায় লাঞ্চ খাচ্ছ হ্যারি?

আন্‌ট আগাথার বাড়িতে। আমি আর মিঃ গ্রে দুজনেই যাচ্ছি। তিনিই হচ্ছেন তাঁর সর্বাধুনিক অনুগৃহীত।

হুম। হ্যারি, তোমার আন্‌ট আগাথাকে জানিয়ে দিয়ো তিনি আর যেন চাঁদা দেওয়ার জন্যে বিরক্ত না করেন। আমি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি। ভদ্রমহিলা মনে করেন তাঁর ওইসব বদ খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে চেক কাটা ছাড়া আর কোনো কাজ আমার নেই।

ঠিক আছে আঙ্কল জর্জ, তোমার কথা আমি তাঁকে জানিয়ে দেব, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হবে না। পরোপকারী ব্যক্তিদের মনুষ্যত্ব বলে কোনো বোধশক্তি নেই। এইটাই হচ্ছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে শব্দ করলেন, তারপরে চাকরকে ডাকার জন্যে বেল বাজালেন। নীচু খিলান পেরিয়ে লর্ড হেনানি বার্লিংটন স্ট্রিটে গিয়ে পড়লেন, তারপরে এগিয়ে চললেন বার্কলে স্কোয়ারের দিকে।

তাহলে ডোরিয়েন গ্রে-র বাবা আর মায়ের কাহিনীটা হল এই? কাহিনিটি যত অমার্জিতে ভাবেই বলা হোক না কেন, একটা অদ্ভুত, যাকে বলে বলে আধুনিক রোমান্সের গন্ধে তাঁর মন

ভরে উঠেছিল। উন্মাদ আবেগের জন্যে একটি সুন্দরী যুবতী জীবনের সবকিছু ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কয়েকটি সপ্তাহের উন্মাদ আনন্দ। তারপরেই একটি ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক অপরাধ তাঁর সেই জীবনকে কেটে ছোটো করে দিল। কয়েকটি মাসের নির্বাক যন্ত্রণার পরে জন্ম হল একটি ছেলের। মৃত্যু ছিনিয়ে নিল মাকে, নিঃসঙ্গ শিশুটি পড়ে রইল এমন একটি মানুষের কাছে যার মনে স্নেহ ছিল না, ছিল না কোনো ভালোবাসা। হ্যাঁ, এইটিই হচ্ছে ছেলেটির জীবনের পটভূমি। এই পরিস্থিতিতেই সে মানুষ হয়েছে, সম্ভবত এইটাই যেন তাকে পূর্ণ করে তুলেছে। প্রতিটি অপরূপ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এই রকমের একটি যন্ত্রণা, একটি দাহ।সামন্য একটি ফুল ফোটানোর জন্যেও পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়। গত রাত্রিতে ডিনার-এর সময় কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল তাঁকে! সন্ত্রস্ত চোখে আর ঠোঁট দুটি ফাঁক করে একটি উদ্বিগ্ন আনন্দ নিয়ে ক্লাবে ঠিক তাঁর মুখোমুখি বসে ছিলেন তিনি। বাতির লাল রঙের ঢাকনি থেকে রঙিন আলোর দ্যুতি তাঁর মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে গণ্ড দুটিকে গোলাপ রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর একটি প্রথম শ্রেণির বেহালার ঝঙ্কার তোলার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। প্রতিটি কথা আর ইঙ্গিতের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। প্রভাব বিস্তার করার মধ্যে একটি চরম দাসত্বের গন্ধ রয়েছে। আর কোনো কাজই বোধ হয় ঠিক এরকমটি নয়। এইভাবে নিজের আত্মাটিকে অপর একটি শরীরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দাও। একটু অপেক্ষা কর, তারপরে কান পেতে শোন। যৌবনের আবেগে ঝঙ্কৃত হয়ে তোমারই চিন্তাধারা নতুনভাবে রূপায়িত হবে, নতুন তার ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা নতুন। নিজের চিন্তাধারা আর একজনের ভাবরসে সিঞ্চিত হয়ে প্রকাশ পাওয়ার মধ্যে সুখকর বস্তু আর নেই। মনে হবে একটি অতীন্দ্রিয় সুবাসের জারক রসে সঞ্জীরিত হয়ে মধুর স্রোত তা একটু একটু করে ঝরে পড়ছে। আমাদের এই সীমিত, অশালীন যুগে, আত্মসর্বস্ব এবং দেহজ আনন্দে যখন আমরা সবাই মতোয়ারা, সেই সময় এই রকম একটি অনুভূতি যে নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সত্যিই বড়ো অদ্ভুত এই ছেলেটি। বেসিল-এর স্টুডিওতে তার সঙ্গে লর্ড হেনরির নেহাৎ আকস্মিকভাবেই আলাপ হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিসের ভাস্কর্যের মতো তার গঠন, তার লালিত্য। বিশ্বে এমন কিছু নেই যা তাকে দিয়ে করানো যায় না। তাকে দিয়ে মহীরুহ সৃষ্টি করা যায় অথবা খেলার পুতুলের মতোও ব্যবহার করা যায় তাকে। এই সৌন্দর্য বিবর্ণ হয়ে যাবে—এটা কী দুঃখের কথা!

আর বেসিল! মনস্তত্ত্বের দিকে থেকে আর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করা কত কৌতুককর। আর্টের নতুন আঙ্গিকস, জীবনকে দেখার নতুন রীতি তিনি কী সুন্দরভাবেই না ফুটিয়ে তুলেছেন। অথচ যার প্রতিকৃতির মধ্যে দিয়ে তিনি এই পরীক্ষা করলেন সে তা জানতেও পারল না। যে নির্বাক আত্মা এতদিন কুয়াশাচ্ছন্ন বনপ্রদেশে ঘুমিয়েছিল এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে অদৃশ্যভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই আত্মাটি যেন হঠাৎ বন্য-অপ্সরীর মতো নিজেকে প্রকাশ করে দিল। এই আত্মাটিকে প্রকাশ করার জন্যে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। কারণ তিনি জানতেন এরই মাধ্যমে অপরূপ সৃষ্টি সম্ভব, সেই আত্মার দ্যুতিতে পৃথিবীর যা কিছু সাধারণ তাই অসাধরণত্ব লাভ করে। অসাধারণত্ব লাভ করে সত্যিকার বাস্তবে রূপায়িত হয়। কী আশ্চর্য অনুভূতি—কী অপরূপ সৃজন দক্ষতা!

ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্তের কথা কোথায় যেন তিনি পড়েছিলেন। চিন্তাকুশলী প্লেটোই কি এই দক্ষতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি? কিন্তু আমাদের দেশে এর নজির নেই। চিত্রকর বেসিল-এর কাছে নিজের অজ্ঞাতসারেই ডোরিয়েন গ্রে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঠিক সেইভাবেই হেনরি তাকে প্রতিফলিত করবেন। তিনি তার ওপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করবেন, সম্পূর্ণভাবে অধিকার করবেন তার চিন্তার জগৎ। অর্ধেকটা তার প্রায় অধিকার করেই ফেলেছেন। সেই অনবদ্য আত্মাটিকে তিনি তাঁর নিজস্ব করে নেবেন। ভগবানের এই অদ্ভুত

সন্তানটির মধ্যে রয়েছে একটি দুর্নিবার আকর্ষণ।

হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, চারপাশের বাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি তাঁর কাকিমার বাড়ি অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছেন, একটু হেসে তিনি ফিরলেন। কাকিমার থমথমে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই বাটলার তাঁকে জানালেন যে সবাই লাঞ্চের ঘরে রয়েছেন। একটি চারককে তাঁর টুপি আর ছড়িটা দিয়ে তিনি ডাইনিং ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

তাঁর দিকে মাথা নেড়ে আন্‌ট বললেন, হ্যারি, আজ-ও তোমার দেরি হয়েছে—স্বভাব যাবে কোথায়?

হেনরি একটা জুতসই কৈফিয়ৎ দিয়ে তাঁর পাশের ফাঁকা চেয়ারটায় বসলেন, চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন কে কে এসেছেন। টেবিলের একপ্রান্ত থেকে ডোরিয়েন তাঁর দিকে লজ্জিত ভাবে একবার তাকালেন। তাঁ গালের ওপরে আনন্দের একটা মৃদু রেখা ফুটে উঠল। বিপরীত দিকে বসেছেন হার্লের ডাচেস। পরিচিত মহলে ভদ্র বলে তাঁর পরিচিতি রয়েছে, এবং তাঁর শরীরের গঠন দেখে সমসাময়িক ইতিহাসকাররা ডাচেস নয় এই রকম সব মহিলাদের শক্ত-সমর্থ বলে রায় দেন। তাঁর পাশে, ডান দিকে বসেছেন স্যার টমাস বার্ডন। ইনি পার্লামেন্টের র‍্যাডিক্যাল সদস্য। বাইরের জগতে ইনি এঁর দলীয় নেতাকে অনুসরণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণ করেন পাকা রাঁধুনিদের। চরিত্রের দিক থেকে বিজ্ঞ মানুষ এবং বহুল প্রচারিত বিজ্ঞ নীতির মতোই তিনি খানাপিনা করতেন টোরিদের সঙ্গে, চিন্তা করতেন লিবারেলদের মতো। তাঁর বাঁদিকের চেয়াটিতে বসেছেন ট্রেডলির মিঃ এর্কস্কিন, সুন্দর চেহারার সংস্কৃতিবান একটি বৃদ্ধ। চুপচাপ বসে আছেন তিনি, চুপচাপ থাকার কারণটা লেডি আগাথাকে তিনি একবার বলেছিলেন। কারণটি হচ্ছে তাঁর বলার আর কিছু নেই, যা বলার ছিল তা তিরিশ বছরের মধ্যেই তিনি বলে শেষ করে ফেলেছেন। হেনরির নিজেরে পাশে বসেছিলেন মিসেলস ভ্যানডেলার, ভদ্রমহিলা তাঁর আন্‌ট-এর একজন পুরনো বন্ধু, মানুষ হিসাবে একেবারে খাঁটি সোনা। কিন্তু পোশাক-আশাকে এবং চেহারায় একেবারে নিকৃষ্ট। তাঁকে দেখে রদ্দি বাঁধাই একটি প্রার্থনার বইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। তার কপাল ভালো যে সেই সময় লেডি আগাথা লর্ড ফডেল-এর সঙ্গে তখন তন্ময় হয়ে কথা বলেছিলেন। ভদ্রলোক মধ্যবয়শী, বুদ্ধির দিক থেকে মাঝামাঝি। হাউস-অফ-কমনস-এ মন্ত্রীর ঘোষণার মতো যাঁর মাথাটা ছিল টোটো। একটা তন্ময় হয়ে দুজনে কথা বলছিলেন যেটা তাঁর মতে একটি বিশেষ ত্রুটি। প্রতিটি সৎ মানুষটা এই ত্রুটির শিকার এবং এর হাত থেকে মুখ কম মানুষই নিস্তার পেয়েছে।

টেবিলের পাশ থেকে তেরচাভাবে তাকিয়ে মিষ্টি সুরে ডাচেস তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, আমরা বেচারা ডার্টমুরের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম, হেনরি। তোমার কি মনে হয় ডার্টমুরর এই কুহকিনী যুবতীটিকে সত্যিই বিয়ে করবে?

আমার বিশ্বাস, মেয়েটি ডার্টমুরকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে মনস্থির করে ফেলেছে, ডাচেস।

চিৎকার করে উঠলেন লেডি অগাথা, কী ভয়ঙ্কর! সত্যি বলছি, এ ব্যাপারে কারো না কারো প্রতিবাদ করা উচিত।

স্যার টমাস বার্ডান উদ্ধতভাবে বললেন, আমি খুব ভালো জায়গা থেকে শুনেছি, মেয়েটির বাবার শুকনো খাবারের দোকান রয়েছে।

স্যার টমাস, আমার কাকা বলেছেন দোকানটা শুয়োরের মাংস প্যাক করার।

শুকনো খাবার! আমেরিকান শুকনো জিনিস বলতে কী বোঝাতে চাও তোমারা! বেশ উত্তেজিত ভাবে অবাক হয়েই ডাচেস তাঁর বড়ো বড়ো হাত দুটি তুলে প্রশ্ন করলেন।

কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়ে লর্ড হেনরি বললেন, আমেরিকান নভেল।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন ডাচেস।

লেডি আঘাথা ফিস ফিস করে বললেন, ওর কথা তোমরা কেউ বিশ্বাস করো না। ও একবিন্দু সত্যি কথা বলে না।

ব্যাডাক্যাল সদস্যটি বললেন, যখন আমেরিকান আবিষ্কার করা হল...।

এইটুকু বলার পরেই তিনি কিছু ক্লান্তিকর একঘেয়ে ঘটনার পরিবেশন করতে লাগলেন। এবং যে-সব কথকরা ঘটনার বিশদ বর্ণানায় ক্লান্তিকর পরিবেশেনর সৃষ্টি করে তিনিও তাদের মতো তাঁর শ্রোতাদের ক্লান্ত করে তুললেন। ডাচেস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাধা দিয়ে বললেন, আমেরিকাকে যদি কেউ কোনো দিন আবিষ্কার না করত তাহলে কত ভালো হল। সত্যি বলছি, আমাদের মেয়েদের আর হিল্লে হবে না। এটা খুব অন্যায়।

মিঃ আরস্কিন বললেন, সম্ভবত আমেরিকা আদৌ আবিষ্কৃত হয়নি। আমার কথা যদি ধরেন তাহলে আমি বলতে পারি যে আমেরিকাকে আমরা সবেমাত্র দেখতে পেয়েছি।

ডাচেস সাধারণভাবে বললেন, তাই বুঝি? আমি কিন্তু আমেরিকার অধিবাসীদের কিছু কিছু দেখেছি। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তারা সত্যিই খুব সুন্দর। তাদের পোশাক-পরিচ্ছেদও বেশ ভালো। প্যারিস থেকেই তারা তাদের পোশাক তৈরি করায়। আমি যদি তা পারতাম!

স্যারা টমাস রসিকতা করে বললেন, এবং পুরনো পরিত্যক্ত রসিকতার বাণীতে তাঁর বিরাট আলমারি একবাসে ঠাসা। লোকে বলে, সৎ আমেরিকানরা মরার পর প্যারিসে যায়।

ডাচেস প্রশ্ন করলেন, বলেন কী? তাহলে মরার সময় খারাপ আমেরিকানরা কোথায় যায়?

লর্ড হেনরি আস্তে আস্তে বললেন, আমেরিকায়।

স্যার টমাস ভ্রূকুটি করলেন, লেডি আগাথাকে বললেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমেরিকার বিরুদ্ধে আপনার ভাইপোর মনে কিছু ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। সমস্ত দেশটা আমি গাড়িতে করে ঘুরেছি। অবশ্য ডায়রেকটাররাই সেই গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। এসব বিষয়ে ওরা বেশ ভদ্র। আমি আপনাদের নির্ভয়ে বলতে পারি যে আমেরিকাতে শেখার জিনিস অনেক রয়েছে।

মিঃ আরস্কিন করুণাভাবে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কিছু শেখার জন্যে আমাদের শিকাগোতে কি যেতেই হবে? আমার তো মনে হয় তার জন্যে যাওয়ার ঝক্কি পোষাবে না।

স্যার টমাস হাত নেড়ে বললেন, ট্রেডলির মিঃ আরস্কিনের ঘরে সারা পৃথিবী ঢোকানো রয়েছে। বাস্তববাদী আমাদের মতো মানুষ নিজেদের চোখে সব কিছু দেখতে চায়, বই পড়ে তাদের আশা মেটে না। আমেরিকানরা সত্যিকারের হৃদয়গ্রাহী মানুষ। তাদের কাজ অথবা

কথার মধ্যে যুক্তিহীনতার স্থান নেই। আমার মতে ওইটিই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ, মিঃ আরস্কিন, সত্যিকারের যুক্তিবাদী ওরা। আমি আপনাদের নিশ্চিতভাবে বলতে পারি বাজে কথা অথবা বাজে কাজের ধার দিয়ে তারা হাঁটে না।

লর্ড হেনরি বললেন, কী বিপদ, কী বিপদ! পাশবিক শক্তি আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু কঠোর যুক্তিবাদ আমার অসহ্য। এই যুক্তি ব্যবহার করার বিপক্ষে কিছু বলার নেই। কিন্তু যুক্তির রাজত্বে ওইটাই হচ্ছে নাভির তলায় আঘাত করার মতো অযৌক্তিক।

চটে লাল হয়ে স্যার টমাস বললেন, আপনার বক্তব্যটা আমার মাথায় ঢুকছে না।

মিঃ আরস্কিন হেসে বললেন, আমার মাথায় ঢুকছে, লর্ড হেনরি।

ব্যারনেট যোগ দিলেন, প্যারাডক্স্ অর্থাৎ কূটাভাস হিসাবে কথাটা একরকম সত্যি...

মিঃ আরস্কিন বললেন, কূটাভাস! ওঁর কথার মধ্যে কূটের আভাসটা কোথায় দেখলেন? আমার তা মনে হয়নি। হয়তো আপনার কথাই সত্যি। সত্যের রীতিটাই হচ্ছে কূট। সত্যকে যাচাই করতে গেলে আমাদের সরু শক্ত দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। সেই দড়ির ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হেঁটে চলার নির্ভরতা অর্জন করতে পারলেই তবে আমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারব।

লেডি আগাথা বললেন, হায় ভগবান, পুরুষরা কীরকম তর্ক করে দেখ! সত্যি বলছি,ক তোমরা কী সব তর্ক করছ তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। আর হ্যারি, তোমার ওপরে আমি খুব বিরক্ত হয়েছি। আমাদের প্রিয় ডোরিয়েন গ্রেকে ইস্ট এন্ড ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তুমি তাঁকে তাতাচ্ছো কেন? আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি এখানে তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। এখানের সবাই তাঁর পিয়ানো বাজানো শুনেতে ভালোবাসে।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, আমি চাই তাঁর বাজনা আমি শুনবো।

এই বলেই তিনি টেবিলের দিকে তাকালেন, ডোরিয়েন গ্রে-র সম্মতিজনক দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখি হল তাঁর।

লেডি আগাথা বললেন, কিন্তু হোয়াইট চ্যাপেলের সবাই বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

লর্ড হেনরি কাঁধে শ্রাগ করে বললেন, দুঃখ ছাড়া সব জিনিসের ওপরেই আমার সহানুভূতি রয়েছে। ওই দুঃখবোধের ওপরে আমার কোনো সহানুভূতি নেই। কেউ যন্ত্রণা পেলে আজকাল মানুষরা তাকে সহানুভূতি জানায়। এটাই হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর রকমের মানসিক ব্যাধি। মানুষের উচিত রঙ, সৌন্দর্য আর আনন্দের সঙ্গে সহানুভূতি জানানো। জীবনের দুঃখ সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভালো।

স্যার টমাস গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, তবু জরুরি সমস্যাটা হচ্ছে ইস্ট এন্ড।

লর্ড হেনরি বললেন, ঠিক কথা। এ সমস্যা হচ্ছে দাসত্বের। ক্রীতদাসদের মনে স্ফূর্তি জাগিয়ে আমরা সেই সমস্যার সমাধান করতে চাই।

রাজনীতিবিদটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনি কী

করতে চান?

লর্ড হেনরি হাসলেন, এক আবহাওয়া ছাড়া ইংলণ্ডে আর কিছুই আমি পরিবর্তন করতে চাই না। দার্শনিক চিন্তা করেই আমি খুশি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীদতে মানুষ সহানুভূতি খরচ করে করে একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছে, আমি তাই বিজ্ঞানের কাছে আবেদন রাখছি সে যেন মানুষকে ঠিক্ পথে চালিত করে। উচ্ছ্বাস-আবেগের সুবিধে হচ্ছে এ মানুষকে বিপদে পরলিচালিত করে, আর বিজ্ঞানের সুবিধে হচ্ছে তার কাছে উচ্ছ্বাসের কোনো দাম নেই।

মিসেস ভ্যানডেলের ভয়ে ভয়ে বলেলন, কিন্তু আমাদের দায়িত্বও বড়ো কমন নয়।

লেডি আগাথা সমর্থন করলেন তাঁর কথা: গুরু দায়িত্ব।

লর্ড হেনরি মিঃ আরস্কিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, মানুষ নিজের অত্যন্ত সিরিয়াস জীব বলে মনে মনে করে। এইটি হচ্ছে পৃথিবীর আদি পাপ। গুহাবাসী মানুষ যদি হাসতে জানত তাহলে মানুষের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হত।

ডাচেস মিষ্টি সুরে বললেন, তোমার কথায় সান্ত্বনা পেলাম। তোমর আন্‌ট-এর সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় আমি নিজেকে অপরাধিনী মনে করতাম, কারণ ইস্ট এন্ডের ওপরে আমার কোনো মোহ ছিল না। ভবিষ্যতে কোনো রকম লজ্জিত না হয়েই আমি তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারব।

লর্ড হেনরি বললেন, একটুখানি লজ্জা ভালোই দেখাবে, ডাচেস।

তিনি উত্তর দিলেন, সে কথা ঠিক, তবে ও জিনিসটা যৌবনেই ভালো মানায়। আমার মতো বৃদ্ধার গাল যখন লজ্জায় লাল হয়ে যায় তখন দেখবে কুৎসিতই লাগে। হায়, লর্ড হেনরি, কী করে আবার যৌবন ফিরিয়ে পাওয়া যায় তা যদি আপনি আমাকে বলতে পারতেন!

একটু চিন্তা করে তিনি জিজ্ঞাসা করেলন, আচ্ছা ডাচেস, পূর্ব জীবনে আপনি কোনো দিন খুব বড়ো ধরনের ভুল করেছিলেন?

ডাচেস বললেন, একটা নয়,অনেক।

লর্ড হেনরি বেশ গম্ভীরভাবেই বললেন, তাহলে সেই ভুলগুলি আবার করুন। যৌবন ফিরে পেতে প্রথম জীবনের সব ভুলগুলি আবার আবার আপনাকে করতে হবে।

চিৎকার করে উঠলেন ডাচেস, চমৎকার নীতি! ওই নীতিটাকে আবার আমাকে খাটাতে হবে।

স্যার টমাসের পাথর-চাপা ঠোঁটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কথাটা, অতি বিপজ্জনক নীতি!

লেডি আগাথা ঘাড় নাড়লেন, কিন্তু তিনিও খুশি না হয়ে পারলেন না। মিঃ আরস্কিন শুনলেন কথাগুলি।

লর্ড হেনরি তাঁর পূর্ব কথার জের টানলেন, হ্যাঁ, জীবনের গোপন রহস্যগুলির মধ্যে এ হচ্ছে একটি। আজকাল একটি নিঃশব্দ সঞ্চারী সাধারণ জ্ঞানের কবলে পড়ে অধিকাংশ মানুষই মারা যায়, তারা অনেক দেরিতে আবিষ্কার করে যে মানুষ যেগুলির জন্যে অনুতাপ করে না সেগুলি হচ্ছে তাদের ভুল।

সারা টেবিল জুড়ে হাসির বন্যা বয়ে গেল।

কথাটা নিয়ে খেলতে লাগলেন তিনি, ইচ্ছে করেই লোফালুফি করতে লাগলেন। একটি অর্থহীন চিন্তাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন নানাভাবে—কল্পনার রঙে তুলতেল রাঙিয়ে, উড়িয়ে দিলেন আপাতবিরোধী সত্যের ডানায়। তাঁর আবেগের উচ্ছ্বাসে মূর্খতার স্তুতি দার্শনিক তত্ত্বে রূপান্তরিত হল। তারুণ্যের উন্মাদনায় সেই দর্শন জীবনের চড়াই-এর ওপরে মনের আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলি তার সামনে থেকে অরণ্যের পশুর মতো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে লাগল পালাতে। মনে হল যেন একটা অদ্ভুত অপরিকল্পিত কবিতা স্বতঃ উৎসারিত হয়ে তার মুখের মধ্যে থেকে ঝরে পড়ছে। তাঁর মনে হল ডোরিয়েন গ্রে-র চোখ তাঁর দিকে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে এমন একজন রয়েছেন যাঁকে তিনি মুগ্ধ করতে চান, এই সজাগ অনুভূতির ফলে তাঁর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, কল্পনা হয়ে উঠল রঙিন। অপরিসীম চাতুরির মায়াজাল বিস্তার করে তিনি সবাইকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভ্রান্ত করে দিলেন। এবং তাঁরাও সকলে হাসতে হাসতে তাঁকে সমর্থন জানালেন। ডোরিয়েন গ্রে একদৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ লর্ড হেনরি কথা বলছিলেন ততক্ষণ তিনি চোখ দুটি অন্য পাশে সরাতে পারেননি। মনে হল একটি সম্মোহন মন্ত্র এসে তাঁকে একবারে গ্রাস করে ফেলেছে, অভিভূত করেছে তাঁকে। মাঝে মাঝে দুজনের স্মিত হাসি দুজনকেই অভিবাদন জানাতে লাগল। এবং ডোরিয়েনের কালো চোখের তারা দুটি একটি গভীর আবেদনা মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

অবশেষে বাস্তব জগতে ফিরে এল সবাই। যুগের উপযোগী পোশাক পরে একটি চাকর ঘরে ঢুকে ডাচেসকে সবিনয়ে জানাল যে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর গাড়িটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন এই রকম ভান করে নিজের হাত দুটো মুচড়ে বললেন, কী জ্বালা! আমাকে এবার যেতেই হবে। ক্লাব থেকে আমার স্বামীকে তুলে নিতে হবে। উইলিস রুমস-এর 'কাজ নেই তো খই ভাজ' মিটিং-এ যোগ দিতে যাবেন তিনি। একটু দেরি হলেই তিনি রেগে বোম হয়ে যাবেন। আমি তাঁর সঙ্গে রাগারাগি বা হইচই করতে চাইনি। শক্ত কথা বললে তাঁর মাথাটা বিগড়ে যাবে। না, না, আর আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আমাকে যেতেই হবে। ডিয়ার আগাথা বিদায়, লর্ড হেনরি, তোমার কথা শুনে খুব আনন্দ হল আমার। ভয়ঙ্কর রকমের দুর্নীতির একটি ডিপো তুমি। তোমার মতবাদের বিরুদ্ধে যে কী বলব তা আমিই জানি না। একদিন রাত্রিতে আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে এস, আগামী মঙ্গলবার, ওই দিন কি ডিনার খাওয়ার জন্যে কাউকে কথা দিয়েছে?

ঘাড়টা কিঞ্চিৎ নত করে লর্ড হেনরি বললেন, আপনার জন্যে ডাচেস সকলকে আমি সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করব।

ডাচেস বললেন, সুন্দর কথা, সেই সঙ্গে অন্যায়ও। যাই হোক, আমি ধরে নিলাম তুমি আসছ, আগামী মঙ্গলবার।

এই বলেই তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন, লেডি আগাথা এবং অন্যান্য মহিলারা তাঁকে এগিয়ে দিতে পিছু পিছু গেলেন।

লর্ড হেনরি আবার বসে পড়লেন। মিঃ আরস্কিন নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন, লর্ড হেনরির কাছে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। একটা হাত তাঁর হাতের ওপরে রেখে বললেন, আপনার কথা শুনলে আর বই পড়তে ইচ্ছে করে না। আপনি বই লেখেন না কেন?

আমি বই পড়তে এত ভালোবাসি যে বই লেখার কথা ভাবার সময় পাইনে, মিঃ আরস্কিন। আমার একখানা উপন্যাস লেখার নিশ্চয় বাসালা রয়েছে। উপন্যাসটি হবে পার্শিয়ান কার্পেটের মতো ঝলমলে, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার এতটুকু সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু পড়বে কে? আজকোল ইংলন্ডের পাঠক-পাঠিকারা পড়েন কেবল খবরের কাগজ, আর এনসাইক্লোপিডিয়া। পৃথিবীর মধ্যে ইংরেজরাই বোধ হয় একমাত্র জাত সাহিত্যের সৌন্দর্য বলতে ঠিক কি বোঝায় সে-সম্বন্ধে যাদের ধারণা নেই বললেই হয়।

মিঃ আরস্কিন বললেন, আমার মনে হয় আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমারও একসময় সাহিত্যিক হওয়ার বাসালা ছিল, কিন্তু সেই বাসনাকে অনেক দিন আগেই আমি পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, যদি অবশ্য বন্ধু বলে আপনাকে সম্বোধন করার অনুমতি দেন, একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি: আজকে লাঞ্চের সময় যেসব কথা আপনি বললেন, সেগুলি কি আপনি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করেন?

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, তখন কি বলেছিলাম তা আমার মনে নেই। সত্যিই কি আমার কথাগুলো খুব খারাপ লাগছিল আপনাদের?

সত্যিই খুব খারাপ। আমার বিশ্বাস আপনার সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের প্রিয় ডাচেসের শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি হয় তাহলে তার জন্যে আমরা আপনাকেই মূলত দায়ী করব। কিন্তু সে কথা থাক। জীবন সম্বন্ধে আপনি কি বোঝেন সেই সম্বন্ধে কিছু আপনার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই। যে-যুগে আমি জন্মেছি সে যুগটা বড়ো বিরক্তিকর। কোনোদিন যদি লন্ডনের আবহাওয়ায় আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তাহলে বিনা দ্বিধায় ট্রেডলেতে চলে আসবেন। আমার স্টকে কিছু প্রথম শ্রেণির বার্গেন্ডি সুরা রয়েছে। তারই গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে জীবনদর্শন বলতে আপনি কী বোঝেন তাই শোনা যাবে।

খুব খুশি হব আমি। সেদিনের আশায় দিন গুনবো আমি। ট্রেডলের আতিথ্যই কেবল প্রথম শ্রেণীর নয়, আমি জানি আপনার লাইব্রেরিটিও উৎকৃষ্ট।

ভদ্রভাবে এবং ভদ্রসমাজের রীতি অনুযায়ী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁর মাথা কিঞ্চিৎ অবনত করে বললেন, আবলি তাদের পূর্ণ করবেন। এখন আপনার ওই অতিথিবৎসলা আন্টা-এর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। এখন আমার অ্যাথিনিয়াম-এ যাওয়ার কথা। এইখানেই আমরা ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা উপভোগ করি।

মিঃ আরস্কিন, আপনারা সবাই?

চল্লিশজনে, চল্লিশটি আরাম কেদারায় চুপচাপ বসে থাকি আমরা। 'ইংলিশ অ্যাকাডেমি অফ লেটারস'-এর সভ্য হওয়ার জন্য ওইখানেই আমাদের প্রস্তুতি চলে।

হাসলেন লর্ড হেনরি, তারপরে উঠে বললেন আমি পার্কে যাচ্ছি।

দরজার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডোরিয়েন গ্রে তাঁকে আলতো ভাবো ধরে ফিসফিস করে বললেন, আমিও যাব।

কিন্তু আমি ভেবেছিলাম বেসিল হলওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে আপনার।

আপনার সঙ্গেই আমি যেতে চাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনি অমত করবেন না। কথা দিন সব

সময় আমার সঙ্গে আপনি কথা বলবেন? আপনার মতো অত সুন্দর কথা আর কেউ বলতে পারবে না।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, আজ আমি অনেক কথা বলেছি। এখন আমি আসল জীবনটা কী তাই দেখতে চাই। আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন, এবং ইচ্ছে হলে আমার চোখ দিয়ে রক্তমাংসের মানুষ বলতে কী বোঝায় তা-ও পারেন দেখতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাসখানেক পরের কথা। সময় অপরাহ্ন। মে ফেয়ারে লর্ড হেনরির যে বাড়ি ছিল তারই ছোটো লাইব্রেরিতে একটি মোটা গদি-আঁটা ইজিচেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেছিলেন ডোরিয়েন গ্রে। বলতে গেলে ঘরটি বড়ো চমৎকার। ভেতরের খিলানগুলি ওক কাঠের তক্তা দিয়ে আঁটা, এর পীত রঙের কারুকার্য করা কার্নিশ, পলেস্তারা করা উঁচু ছাদ আর মেঝে পার্শিয়ান কার্পেট দিয়ে মোড়া। ছোটো সাটিন কাঠের টেবিলের ওপরে ক্লডিয়নের তৈরি একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পাশে পড়ে রয়েছে লা সাঁৎ নোভেলার একটি কপি, ক্লোভিস ইভ ভ্যালয়-এর মার্গারেটের এটি বেঁধেছেন চারপাশে ডেইজি ফুলের রঙ দিয়ে ছোপানো, রানি এই রঙটিই বড়ো পছন্দ করতেন।

কতকগুলি বড়ো বড়ো নীল রঙের চিনা জার আর প্যারটফুলের গুচ্ছ সাজানো রয়েছে অগ্নিকুণ্ডের ওপরে কারুকাজ করা তাকে। গ্রীষ্মকালে লন্ডনে কমলালেবু রঙের আলো জানালার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

লর্ড হেনরি তখনো ফেরেননি। সব সময়েই তিনি দেরি করে ফিরতেন। তাঁর মতে সময়ানুবর্তিতা হচ্ছে সময়-অপহারক। সেই জন্যে ডোরিয়েন গ্রে উদাস দৃষ্টিতে বসেছিলেন মাঝে মাঝে চিত্রবহুল ম্যানন লেকট-এর একখানি বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। ঘড়ির অবিরাম টিক টিক শব্দ একঘেয়ে সুরে একটি বিরক্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। ঘর থেকে চলে যাওয়ার জন্যে দু-একবার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন।

অবশেষে দরজার বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ হল, দরজা খুলে গেল। তিনি একটু বিরক্তির সুরে বললেন, হ্যারি, কত দেরি করলে বল তো!

তারপরেই তিনি চকিতে একবার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি ভাবছিলাম...

আপনি আমাকে আমার স্বামী বলে ভুল করেছিলেন। আমি তাঁর স্ত্রী মাত্র। আমি নিজেই আমার পরিচয় দিচ্ছি। আপনার ছবি দেখেছি, সেই থেকেই আমি আপনাকে চিনি। আমার স্বামীর কাছে আপনার সতেরখানা ফটো রয়েছে।

লেডি হেনরি, সতেরখানা নয়।

তাহলে, আঠারখানা। সেদিন অপেরাতে তাঁর সঙ্গে আপনাকে আমি দেখেছি।

কথা বলতে বলতে তিনি একটু হাসলেন, সেই হাসিতে একটু জড়তা ছিল, হাসতে হাসতে তাঁর সেই ভুলো-না-আমায় চোখ দুটি দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অদ্ভুত মহিলা এই লেডি হেনরি। তাঁর পোশাক দেখলে মনে হবে সেগুলি তাঁর মানসিক অব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে তৈরি হয়েছে। পরিধানের মধ্যেও বেশ হঠকারিতার লক্ষণ বিদ্যমান। সাধারণত সব সময়েই কারো না কারো সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েন এবং প্রতিদিন না পাওয়ার ফলে তিনি সব সময়েই ভ্রান্তির স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকেন। নিজেকে অপরূপা করে সাজানোর জন্যে চেষ্টার অন্ত ছিল না তাঁর, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। তাঁর নাম ভিকটোরিয়া, গির্জায় যাওয়াটা তাঁর একটা ঝোঁকে পরিণত হয়েছিল।

আপনি বোধ হয় লোহেন গ্রিন-এর কথা বলছেন, তাই না, লেডি হেনরি?

হ্যাঁ। আমার প্রিয় লহেন গ্রিন-এর কথাই বলছি। ওয়াগনারের সঙ্গীত আমার খুব ভালো লাগে। সত্যি কথা বলতে কি অত ভালো আর কারো সুরই আমার লাগে না। এ গানের লয় এত চড়া যে নির্বিবাদে কথা বলা যায়, পাশের লোক সেকথা শুনতে পায়না। চড়া গানের সুবিধে এইখানে, তাই না, মিঃ গ্রে?

সেই একই রকমের ভীরু হাসি তিনি হাসলেন, তাঁর পাতলা ঠোঁট দুটি ফাঁক হল। কচ্ছপের খোলা দিয়ে তৈরি লম্বা একটা কাগজকোটা ছুরি তিনি আঙুলের মধ্যে ধরে নাড়াতে লাগলেন।

ডোরিয়েন হেসে তাঁর মাথা নাড়লেন, লেডি হেনরি, আমার তা মনে হয় না। গানের সময় আমি কথা বলি না। বিশেষ করে গান যদি ভালো হয়। গান খারাপ হলে শ্রোতাদের কর্তব্য হচ্ছে চেঁচিয়ে সেই গান মহৎ করে দেওয়া।

ওঃ, এটা হ্যারিরই একটি মত, তাই না মিঃ গ্রে? হ্যারির সমস্ত মত-ই আমি তার বন্ধুদের মুখ থেকে শুনতে পাই। তার মত জানার এইটিই আমার একমাত্র উপায়। কিন্তু আপনি নিশ্চয় ভাববেন না। আমি ভালো গান পছন্দ করি না। ভালো গানকে আমি খুব প্রশংসা করি। কিন্তু ভয়-ও পাই যথেষ্ট। আমাকে এ অতিমাত্রায় কল্পনাবিলাসিনী করে তোলে। আমি পিয়ানোবাদকদের পুজো করি বলতে পারেন, কখনো কখনো দুজনকে—হ্যারি সেই কথাই আমাকে বলে। তাঁদের মধ্যে কী রয়েছে তা আমি জানি না, হয়তো তাঁরা বিদেশি বলে। ভালো পিয়ানো বাজিয়েদের সবাই বিদেশি, তাই না? এমন কি যাঁরা ইংলন্ডে জন্মান তাঁরাও একটা সময় পরে বিদেশি হয়ে যান। তাই না? তাঁরা অতি বুদ্ধিমান, এবং ললিতকলার পক্ষে সেটা বেশ গৌরবের কথা। এই ধরনের রীতি বাজিয়েদের সর্বজনীন করে তোলে। আপনার তাই মনে হয় না? মিঃ গ্রে, এই ধরনের কোনো মজলিসে আপনি কখনো গিয়েছেন? আপনার যাওয়া উচিত। ওর্কিড কেনার সামর্থ্য নেই আমার, কিন্তু বিদেশিদের জন্য কিছু খরচ করতে কার্পণ্য করি না আমি। তাঁদের উপস্থিতি ঘরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। কিন্তু হ্যারি এসে পড়েছে। হ্যারি, তোমার খোঁজে আমি এই ঘরে ঢুকেছিলাম, তোমার সঙ্গে কিছু দরকার ছিল আমার, কী দরকার ছিল তা আমি ভুলে গেছি। তোমার পরিবর্তে মিঃ গ্রে-কে দেখলাম। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের বেশ চমৎকার আলোচনা হচ্ছিল এতক্ষণ। আমাদের ধারণা প্রায় একই। না, না। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আমাদের মতবাদ পৃথক। কিন্তু আমার সঙ্গে আলোচনা করে উনি খুব খুশি হয়েছেন। ওঁকে দেখে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।

বাঁকানো অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি ভুরু তুলে, এবং দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে লর্ড হেনরি বললেন, আমিও খুব খুশি হয়েছি, প্রিয়তমে। দেরি হল বলে আমি অত্যন্ত দুখিত, ডোরিয়েন। ওয়ার্ডোর স্ট্রিটে একটা পুরনো ব্রকেডের তল্লাশে যেতে হয়েছিল আমাকে, এবং দর কষাকষি করতে অনেকটা সময় নষ্ট হল আমার। আজকাল সবাই জিনিসের বাজার দরটাই জানে, কোনো জিনিসের মূল্যবোধ বলতে তাদের কোনো জ্ঞান নেই।

হঠাৎ একটু বোকার মতো হেসে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে দিলেন লেডি হেনরি, বললেন, আমাকে এখনি বাইরে যেতে হবে। ডাচেসকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার কথা দিয়েছি আমি। মিঃ গ্রে, হ্যারি, আমি চললাম। সম্ভবত তুমিও বাইরেই যাচ্ছ? আমিও। সম্ভবত লেডি থ্রেনবেরির বাড়িতে আমাদের দেখা হবে।

দরজাটা বন্ধ করতে করতে লর্ড হেনরি বললেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

ঘরের মধ্যে মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে লেডি হেনরি লঘু পদক্ষেপে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন, মনে হল, সারা রাত্রি ধরে বৃষ্টিতে ভিজে স্বর্গের একটা পাখি আটকে পড়েছিল, হঠাৎ দরজা খোলা পেয়ে সে তীব্র বেগে উড়ে গেল। দরজা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালেন লর্ড হেনরি। তারপরে সোফার ওপরে বসে পড়লেন।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে লর্ড হেনরি বললেন, কটা চুল রয়েছে এরকম কোনো মহিলাকে তুমি বিয়ে করো না, ডোরিয়েন।

কেন বল তো?

তারা বড়ো ভাবপ্রবণ হয়।

কিন্তু ওই জাতীয় মানুষকেই যে আমার ভালো লাগে, হ্যারি।

কক্ষনো বিয়ে করো না। মানুষ বিয়ে করে কেন? কারণ তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কারণ তাদের কৌতূহল থাকে যথেষ্ট। এই জাতীয় মহিলাদের বিয়ে করলে দু'দিক থেকেই তাদের নিরাশ হতে হয়।

হেনরি আমার বিয়ে করার সম্ভাবনা বড়ো কম। আমি একজনকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি। এই অদ্ভুত যুক্তি অবশ্য তোমারই। সেইটাই আমি বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে যাচ্ছি, ঠিক অন্যান্য বিষয়েও আমি যেমন তোমার উপদেশ মতো চলার বা করার চেষ্টা করি।

একটু থেকে হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে তুমি ভালোবেসেছ?

লজ্জা পেয়ে ডোরিয়েন বললেন, একজন অভিনেত্রীকে।

লর্ড হেনরি কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধে একটা শ্রাগ করে বললেন, এটা একটা সাধারণ রোমান্স ছাড়া আর কিছু নয়।

তাকে দেখলে তুমি একথা বলতে না, হ্যারি।

তার পরিচয়?

তার নাম সাইভিল ভেন।

ওরকম নাম তো কখনো শুনিনি।

কেউ শোনেনি, তবে একদিন সবাই শুনবে। মেয়েটি অভিনয় জগতে একটি জিনিয়াস।

শোন বালক, শোন। কোনো নারীই কোনোদিন জিনিয়াস-এর পর্যায়ে পড়তে পারে না। নরলোকে ওরা অলঙ্করণের পূজারিণী। কোনোদিনই ওদের বলার কিছু থাকে না, কিন্তু সেই কথাটাই ওরা বেশ মিষ্টি করে ললিতকলার ছন্দে বলে যায়। পুরুষরা যেমন নীতির ওপরে মননকে প্রাধান্য দেয়, নারীরা তেমনি প্রাধান্য দেয় মনের ওপরে নিছক বস্তুকে।

হ্যারি, এই রকম কথা বলছ কী করে?

প্রিয় বন্ধু, যেমন করেই বলি, কথাটা সত্যি। বর্তমানে আমি নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করছি। সুতরাং নারীচরিত্র বলতে কী বোঝা যায় তা আমার জানা উচিত। বিশ্লেষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে নারী মূলত দুটি শ্রেণির: সাধারণ এবং রঙিন। সাধারণ অর্থাৎ ঘরোয়া মহিলারা প্রয়োজন মেটানোর দিক থেকে উৎকৃষ্ট। তুমি যদি সমাজে সম্ভ্রম পেতে চাও তাহলে এই শ্রেণির একটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢোকো। অন্য শ্রেণির মহিলারা দেখতে সুন্দরী, কিন্তু তারা একটা ভুল করে। নিজেদের যুবতী বলে জাহির করার জন্যে তারা অতিমাত্রায় প্রসাধন করে। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা প্রসাধন করতেন সুন্দর করে কথা বলার জন্যে। রুজ-পাউডারের সঙ্গে তখন মেশানো থাকত বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যবিন্যাসের কলাকৌশল। কিন্তু সে যুগকে আমরা আজ হারিয়েছি। আজকাল মহিলারা খুশি হয় কিসে জান? যদি তারা নিজেদের বয়সটাকে তাদের মেয়েদের বয়সের চেয়ে দশটা বছর কমিয়ে আনতে পারে। আর বাচনভঙ্গির কলাকৌশলের কথা যদি ধর তাহলে আমি বলব যে বর্তমানে সারা লন্ডন শহরে ওই জাতীয়া মহিলা মাত্র পাঁচজন রয়েছেন। এবং সেই পাঁচজনের মধ্যে দুজনকে কোনো সভ্য, বিদগ্ধ সমাজে বার করা যায় না। সে যাক গে, এখন তোমার ওই জিনিয়াসটির সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল। কদ্দিন তোমাদের আলাপ হয়েছে?

হায় হ্যারি, তোমার কথা শুনে আমার ভয় লাগছে।

ওকথা বাদ দাও। কদ্দিন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তোমার?

তিন সপ্তাহের কাছাকাছি।

তার সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?

তোমাকে আমি সব বলছি, হ্যারি। কিন্তু আমার কাহিনি শুনে তুমি নির্দয়ের মতো হাসবে না। অবশ্য তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে এ সমস্যা আমার কোনোদিনই দেখা দিত না। জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ভালো করে দেখার একটা উন্মাদ কামনা তুমিই আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পরে অনেকদিন আমার শিরায়-শিরায় কৌতূহলের ঢল নেমেছিল। পার্কে ঘুরতে ঘুরতে অথবা পিকাডেলির পথে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে বেড়াতে বেড়াতে একটা উদগ্র বাসনা নিয়ে, একটি অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল নিয়ে পথচারী প্রতিটি মানুষের দিকে আমি তাকিয়ে থাকতাম। কী ভাবে তারা বেঁচে রয়েছে তাই অনুসন্ধান করে বেড়াতাম। কেউ কেউ আমাকে মুগ্ধ করেছিল, কেউ কেউ বা আমাকে করে তুলেছিল ভয়ার্ত। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল লক্ষ লক্ষ বিষের অতি মনোরম কণিকা। উন্মাদ উচ্ছ্বাসের ওপর আমার কেমন যেন একটা ঝোঁক ছিল।...তারপরে একদিন সন্ধ্যায় জীবনের সম্বন্ধে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আমি বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। আমি মনে করেছিলাম আমাদের এই ধোঁয়াটে রঙের দানব লন্ডন শহর কেবল বহু বিচিত্র মানুষেরই আবাসস্থল নয়, আদর্শহীন পাপী আর গৌরবময় পাপে একেবারে বোঝাই। লন্ডনের এই ব্যাখ্যা অবশ্য তোমারই। ভেবেছিলাম এ-হেন লন্ডন শহর আমার জন্যে কিছু সঞ্চয় করে রেখেছে। হাজার রকমের কল্পনায় মন আমার উদ্বেলিত হয়ে উঠল। নিছক বিপদের সম্ভাবনা আমাকে উৎসাহিত করল। সে চমৎকার রাত্রিতে আমরা দুজনে একসঙ্গে প্রথম ডিনার খেলাম সেদিন তুমি আমাকে যা বলেছিল তা আমার মনে ছিল। ঠিক কী চাইছিলাম তা আমি জানতাম না, কিন্তু আমি বেরিয়ে গেলাম। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে পূর্বদিকে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত আমি শক্ত দৈত্যদীঘল গাছ, কালো আর রুক্ষ পার্কের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। সাড়ে আটটার কাছাকাছি আমি একটা কিম্ভুতকিমাকার ছোটো থিয়েটারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, বড়ো বড়ো গ্যাসের আলো আর মোটা মোটা হরফে লেখা পোস্টারে ঝকমক করছিল তার

দেওয়ালগুলি। একটি বিরাটাকার জু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সস্তাদামের সিগার খাচ্ছিল। তার গায়ের ওপরে ওয়েস্ট কোট দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। আসল কথা, ওরকম পোশাক জীবনে আর কখনো আমার চোখে পড়েনি। তার আঙুলে একটা তেল চিটচিটে ছোটো আঙটি, একটা নোংরা শার্টের মাঝখানে বিরাট একটা হিরে বসানো। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে জিজ্ঞাসা করল, মি লার্ড, একটা বক্স চাই? এই কথা বলেই দাসত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমাকে অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে সে তার টুপিটা খুলে ফেলল। হ্যারি, লোকটির মধ্যে এমন একটি জিনিস ছিল যা আমার কাছে বেশ কৌতুকপ্রদ বলে মনে হয়েছিল। চেহারার দিক থেকে মানুষটা একেবারে দৈত্যবিশেষ। বুঝতে পারছি আমার কথা শুনে মনে মনে তুমি হাসছ, কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই ভেতরে ঢুকে এক গিনি খরচ করে একটা বক্সের টিকিট কিনে ফেললাম। কেনই বা ওই থিয়েটারে ঢুকলাম, আর কেনই বা অত দামের টিকিট কিনলাম তা আমি আজও বুঝতে পারছি না, তবু একথাও সত্যি যে আমি যদি সেদিন না যেতাম, সত্যি বলছি হ্যারি, তাহলে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমান্স থেকে বঞ্চিত হতাম আমি। দেখতে পাচ্ছি আমার কথা শুনে তুমি হাসছ। ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়।

না ডোরিয়েন, আমি হাসছি না, অন্তত তোমাকে উপহাস করার জন্যে হাসছি না। কিন্তু তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমান্স বলে ওটিকে চিহ্নিত করো না। বরং বল, ওটি তোমার জীবনের প্রথম রোমান্স। সব সময়েই তোমাকে কেউ না কেউ ভালোবাসবে, তুমি ভালোবাসবে কাউকে না কাউকে। করার মতো কোনো কাজ যাদের হাতে থাকে না এই রকম উচ্ছ্বাসের শিকার হওয়ার নৈতিক অধিকার নিশ্চয় তাদের রয়েছে। দেশের অলস শ্রেণির ওইটিই একমাত্র কাজ। ভয় পেয়ো না। অনেক অপরূপ সুন্দর জিনিস তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। এই তো সবে শুরু।

চটে উঠলেন ডোরিয়েন গ্রে, একটু চেঁচিয়েই বললেন, তোমার ধারণা আমার চরিত্র এতখানি খেলো, অগভীর?

না, আমার মনে হয় তোমার চরিত্র সত্যিকারের গভীর।

অর্থাৎ?

প্রিয় বালক, অবধান কর। যারা জীবনে একবার মাত্র প্রেমে পড়ে সত্যিকারের অগভীর হচ্ছে তারা। যে জিনিসটাকে তারা আনুগত্য অথবা আস্থা বলে, আমার মতে সেটা হয় সামাজিক আলস্য, অথবা সুস্থ চিন্তার অভাব। বুদ্ধিজীবীদের কাছে চারিত্রিক দৃঢ়তা যা, উচ্ছ্বাসময় মানুষের কাছে বিশ্বাসের দাম তাই। দুটিই পরাজয়ের কলঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিশ্বাস! ওটা নিয়ে বিশদ আলোচনা একদিন আমাকে করতেই হবে। এর ভেতরে রয়েছে কিছু হাতিয়ে নেওয়ার প্রয়াস। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলিকে আমরা অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, ফেলে দিই না এই ভয়ে যে অন্য লোকে হয়তো সেগুলি কুড়িয়ে নেবে। কিন্তু তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না। তোমার গল্পটা বলে যাও।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম: আমি একটা বিশ্রী ছোটো বক্সের ওপরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বসলাম। একটা নোংরা পর্দা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। পর্দার আড়াল থেকেই ঘরটাকে আমি পরীক্ষা করে দেখছিলাম। বিবাহের নিকৃষ্ট কেকের মতো ঘরটা খুবই চটক দিয়ে সাজানো, গ্যালারি আর নীচেটা মোটামুটি ভর্তি ছিল কেবল খালি ছিল সরু সরু দু'সারি বিবর্ণ স্টল। আর ড্রেস সার্কেলে একজন দর্শকও আমার চোখে পড়েনি। কমলালেবু আর জিনজার বিয়ার নিয়ে মহিলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারপাশে বাদামের ছাড়ানো খোলায় একেবারে ভরপুর।

ব্রিটিশ নাটকের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু মন-মেজাজ একেবারে বিগড়ে দেয়। নাটকের নাম শুনে তো আমি অবাক। এ কী কাণ্ড! কী অভিনয় হচ্ছিল বল তো, হ্যারি?

আমার ধারণা, নাটকের নাম হয় 'ইডিয়ট বোয়' অথবা 'ডাম্ব বাট ইনোসেন্ট'। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ওই রকম নাটকই পছন্দ করতেন বেশি। যতই দিন যাচ্ছে ডোরিয়েন, ততই বুঝতে পারছি বাপ-কাকা-জেঠাদের কাছে যেটা ভালো ছিল সেটা আর আমাদের কাছে ভাল নয়। আর্টই বল, অথবা রাজনীতিই বল—সর্বত্র ওই একই ব্যাপার।

না, হ্যারি, নাটকটা আমাদের পক্ষে ভালোই। নাটকের নাম হচ্ছে 'রোমিও-জুলিয়েট'। এই রকম একটা গর্তের মধ্যে সেকস্‌পীয়রের নাটক অভিনীত হচ্ছে বুঝতে পেরে সত্যি কথা বলতে কি প্রথমেই আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। তবু ভাবলাম, দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কী রকম দাঁড়ায়। যাই হোক, প্রথম অঙ্কটা পর্যন্ত দেখতে আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম। আবহসঙ্গীত কী ভয়ানক রে বাবা! একটা ভাঙা পিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে একটি ইহুদি যুবক সঙ্গীত পরিচালনা করছিল। এই দেখেই চম্পট দেব ভাবছি এমন সময় সিন উঠে গেল, শুরু হল অভিনয়। একটি মোটাসোটা বয়স্ক ভদ্রলোক রোমিওর অভিনয় করছিলেন, তাঁর ভুরু যুগল কিঞ্চিৎ উঁচু, স্বর শ্রুতিকটু, ভারিক্কি—অনেকটা বিয়োগান্ত ধাঁচের। চেহারাটা হচ্ছে বিয়ারের পিপের মতো। মারকিউরিয়োর চেহারাটা আরো খারাপ। অভিনয় করল একটা নিম্নমানের বিদূষকের মতো, পোশাক আর চালচলনে মনে হল মানুষটি এই গর্তের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীর মতো তারাও কিম্ভূতকিমাকার, তাদের দেখে মনে হল এইমাত্র তারা যেন পাড়াগাঁয়ের কোনো অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু জুলিয়েট! হ্যারি, ভেবে দেখ—একটি মেয়ে, সতের ছুঁই-ছুঁই করছে তার বয়স, ফুলের মতো ছোটো তার মুখ, তামাটে রঙের ঘন চুলের স্তবকে যার মাথাটা গ্রিক ভাস্কর্যের নিপুণ কারুকার্যের মতো দেখাচ্ছিল, চোখ দুটি তার ঢল-ঢল, দেখলেই মনে হবে ভাবের উচ্ছ্বাসে যেন তারা উপচে পড়ছে। ঠোঁট দুটি যেন গোলাপের পাপড়ির মতো। জীবনে অত সুন্দর আর কোনো যুবতী আমার চোখে পড়েনি। তুমি একবার আমাকে বলেছিলে যে মানুষের দুঃখ তোমার মনে কোনো রেখাপাত করে না, কিন্তু একটি সুন্দর জিনিস, তা সে যত সামান্যই হোক, তোমার চোখ জলে ভরিয়ে দেয়। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলছি হ্যারি, মেয়েটিকে দেখে আমার চোখ দুটিও জলে ভরে উঠল, ফলে তার দিকে ভালো করে সেদিন আমি তাকিয়ে থাকতেই পারিনি।

আর তার কন্ঠস্বর! ওরকম স্বর আর কখনো আমি শুনিনি। প্রথমে মৃদু সুরে সে কথা শুরু করল, ধীরে ধীরে সেই সুর পরিণত হল উদাত্ত স্বরে, তারপরে সঙ্গীতের মূর্ছনায় আবিষ্ট করে ফেলল তোমাকে। ধীরে ধীরে সেই স্বর উচ্চগ্রামে উঠে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। মনে হল অনেক দূরে কোথাও কোনো ফ্লুট অথবা সানাই বাজছে। বাগানের দৃশ্যটাও একই রকমের উচ্ছ্বাসবিধুর, নাইটেঙ্গল পাখির গানের মধ্যে দিয়ে ভোরের আলো ফুটে ওঠার কিছু আগে প্রেমিক-প্রেমিকারা আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যেমন মুষড়ে পড়ে—এই দৃশ্যটিও ঠিক সেই রকমের বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সমতা রাখার চেষ্টায় বেহালার করুণ সুর বেশ চড়া গলায় ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে। তুমি জান, মাঝে মাঝে কারো কন্ঠস্বর মানুষকে মাতাল করে দেয়, কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে একেবারে মর্মস্থানে গিয়ে আঘাত করে। তোমার স্বর আর সাইবিল ভেন-এর স্বর—এই দুটি স্বর জীবনে আমি

কোনোদিনই ভুলতে পারব না, হ্যারি, চোখ বন্ধ করে থাকলেই আমি সেই স্বর দুটি শুনতে পাই। যদিও চরিত্রের দিক থেকে, ব্যঞ্জনার দিক থেকে তারা ভিন্ন জাতের। ওদের কোনটিকে আমি অনুসরণ করব তা আমি জানি না।

আমি তাকে ভালোবাসব না কেন? হ্যারি, তাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। আমার জীবনে সে একটি আবিষ্কার ছাড়া আর কিছু নয়। দিনের পর দিন আমি তার অভিনয় দেখতে যাই। একদিন সে রোজালিনড-এর অভিনয় করে, আর একদিন ইমোজেন-এর। প্রিয়তমের বিষমাখা ঠোঁটে চুম্বন করে, ইটালিয়ান কবরখানার অন্ধকারে তাকে মারা যেতে আমি দেখেছি। আর্ডেন-এর বনপ্রদেশ কিশোরের পোশাক পরে কিশোরের বেশে ঘুরে বেড়াতে তাকে আমি দেখেছি। সে উন্মাদ হয়ে অপরাধী রাজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে তাঁর কৃতকার্যের জন্যে অনুশোচনা করতে বাধ্য করেছে। হিংসার কালো কুটিল হাত সেই অপাপবিদ্ধা মেয়েটির শরগাছের মতো নরম গলা চিপে ধরেছে। প্রতিটি বয়সের অভিনয় করতে নানান যুগের পোশাক পরা তাকে আমি স্টেজের ওপরে দেখেছি। সাধারণ মেয়েরা কারো চিন্তার জগতে আবেদন জাগায় না। তাদের যুগে তাদের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত সীমিত। কোনো জাঁকজমকই তাদের সৌন্দর্য বাড়ায় না, তাদের চিনে নিতে মানুষের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। তাদের মধ্যে কোনো রহস্য নেই। সকালে গাড়িতে চড়ে তারা পার্কে বেড়াতে যায়, বিকালে চায়ের টেবিলে কিচমিচ করে। তাদের মুখের হাসি আর চমকপ্রদ পোশাক গতানুগতিকতার ছাপ মারা। তারাই অত্যন্ত সাধারণ।

কিন্তু অভিনেত্রীদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণের কাছ থেকে তাদের পার্থক্য কত! পৃথিবীতে ভালোবাসার একমাত্র উপযুক্ত নারী যে অভিনেত্রী, একথা আগে তুমি আমাকে কেন বলনি হ্যারি?

কারণ, আমি অনেক অভিনেত্রীকে ভালোবেসেছি, ডোরিয়েন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়। তুমি সেই সব অভিনেত্রীদের ভালোবেসেছ যারা চুলে কলপ দিয়ে আর মুখে প্রসাধনের ছোপ লাগিয়ে বিতিকিচ্ছির দেখায়।

চুলের কলপ আর মুখের প্রসাধন ওভাবে নাকচ করে দিও না। মাঝে মাঝে তাদের ভেতরে অসাধারণ মহিলা লুকিয়ে থাকে।

এখন ভাবছি, সাইবিল ভেন-এর কথা তোমাকে না শোনালেই ভালো হত।

তার কথা আমাকে না বলে তুমি পারতে না, ডোরিয়েন। সারা জীবন ধরে যা করবে তার সবটুকুই তুমি আমাকে বলবে।

হ্যাঁ, হ্যারি। মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তোমাকে কোনো কিছু না বলে আমি থাকতে পারি না। আমার ওপরে তোমার প্রভাব বিস্ময়কর। যদি আমি কোনোদিন কোনো অন্যায় কাজ করি, তা-ও তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমাকে বুঝতে পারবে।

ডোরিয়েন, তোমার মতো সুন্দর মানুষ ইচ্ছে করে ভুল করে না। কিন্তু তুমি এইমাত্র যা বললে তার জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এখন বল দেখি—তার আগে দেশলাইটা এগিয়ে দাও, লক্ষ্মী ছেলে, এখন বল সাইবিল ভেন-এর সঙ্গে তোমার আসল সম্পর্কটা কোথায়?

হঠাৎ চটে উঠলেন ডোরিয়েন, চোখমুখ লাল হয়ে উঠল তাঁর, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তিনি বললেন, হ্যারি, সাইবিল ভেন পবিত্র, নিষ্পাপ।

কথার মধ্যে অদ্ভুত একটা দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে লর্ড হেনরি বললেন, ডোরিয়েন, পবিত্র জিনিসকেই মানুষের স্পর্শ করা উচিত। কিন্তু তুমি এত বিরক্ত হচ্ছ কেন? আমি ধরে নিচ্ছি একদিন সে তোমারই হবে। প্রেমে পড়লে মানুষ নিজের সঙ্গে প্রতারণা করতে শুরু করে, আর সব সময়ে শুরু করে অপরকে প্রতারণা করতে। এই প্রতারণাকেই আমরা বলি রোমান্স। যাই হোক, ধরে নিচ্ছি তুমি তাকে চিনতে পেরেছ!

হ্যাঁ নিশ্চয়। তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। প্রথম যেদিন আমি থিয়েটারে গিয়েছিলাম সেইদিন নাটক ভাঙার পরে সেই ভীষণদর্শন বৃদ্ধ ইহুদি এসে আমার সঙ্গে দেখা করল, তারপরে সাজঘরে নিয়ে গিয়ে সাইবিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিল। আমি খুব চটে উঠে তাকে বললাম, জুলিয়েট কয়েকশো বছর আগে মারা গেছে, তার মৃতদেহ এখন ভেরোনার মার্বেল কবরখানার মধ্যে শুয়ে রয়েছে। সে কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার চাহনি দেখে মনে হল বেটা ভেবেছিল আমি প্রচুর পরিমাণ শ্যাম্পেন বা অন্য কোনো মাদকদ্রব্য পান করে বেহেড হয়ে গিয়েছি।

তোমার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হইনি, ডোরিয়েন।

তারপরে সে জিজ্ঞাসা করল আমি কোনো খবরের কাগজে লিখি কিনা, আমি তাকে বললাম, লেখা দূরের কথা কোনো খবরের কাগজই আমি পড়ি না। আমার কথা শুনে মনে হল সে বেশ হতাশ হয়ে পড়েছে। তারপরে সে আমাকে গোপনে জানাল যে সমস্ত নাট্য সমালোচকরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এখন ব্যবসা চালাতে গেলে তাদের সবাইকে কিনে নিতে হবে।

লোকটি যে ঠিক কথা বলেছে সেদিক থেকে আমার কোনো রকমসন্দেহ নেই। তবে একথাও আমি বলতে চাই যে, তাদের চেহারা আর হাবভাব দেখে আমার মনে হয় তাদের কিনতে বেশি কিছু খরচ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ডোরিয়েন হেসে বললেন, তার কথা শুনে মনে হল সে সামর্থ্যও তার নেই। এই সময় থিয়েটারে আলো নেবানোর সময় হয়ে এল, কয়েকটা বাতি নিবেও গেল। সুতরাং আমাকেও বেরিয়ে আসতে হল। তার ইচ্ছে আমি তার দেওয়া দু'একটা সিগার খাই, আমি তার উপহার প্রত্যাখ্যান করলাম। পরের রাত্রিতেও আমি আবার সেই আগের আসনটি দখল করলাম। আমাকে দেখেই সে মাথাটা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আমার মতো অর্থশালী এবং দিলদরিয়া পেট্রন তার আর নেই। লোকটা একটা দুর্বিনীত পশু, মানুষকে রূঢ় কথা বলতে ওস্তাদ। কিন্তু শেকসপীয়রকে সে অসাধারণ ভালোবাসে। একবার সে বেশ বুক ফুলিয়ে গর্ব করে আমাকে বলেছিল যে ওই 'চারণকবিটি'র জন্যে সে পাঁচবার দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছিল। শেকসপীয়রকে সে চারণকবি ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকতে রাজি নয়। এই নামে ডাকার মধ্যে সে তার আভিজাত্য খুঁজে পেয়েছে।

হ্যাঁ, এটা তো একটা অভিজাত-বোধ বটেই, ডোরিয়েন, বড়ো রকমের অভিজাত-বোধ। অনেক মানুষ গদ্যময় জীবন নিয়ে ফাটকাবাজি খেলতে গিয়ে দেউলিয়া হয়েছে। কাব্যের জন্যে নিজেকে ধ্বংস কার একটা সম্মান বৈকি! কিন্তু মিস সাইবিল ভেন-এর সঙ্গে তোমার প্রথম আলাপ হল কবে?

তৃতীয় রাত্রিতে। সেদিন সে রোজালিনড-এর অভিনয় করেছিল। আমি তার কাছাকাছি না গিয়ে পারিনি। আমি তাকে কিছু ফুল ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। অন্তত, সেই রকমই মনে হল আমার। বৃদ্ধ ইহুদিও তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে আমার কাছে ঘ্যান ঘ্যান করছিল। আমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। আমিও তাই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম। তার সঙ্গে আমি যে আলাপ করতে চাইনি সেটা অস্বাভাবিক, তাই না?

না, আমি তা মনে করি না।

কেন?

এর উত্তর আর একদিন তোমাকে আমি দেব। এখন মেয়েটির সম্বন্ধে আমি কিছু শুনতে চাই।

সাইবিল? ওঃ, সে বড়ো লাজুক মেয়ে, আর কি ভদ্র! একেবারে যাকে বলে শিশু।তার অভিনয় সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা হয়েছিল সেকথা আমার মুখ থেকে শুনে সে অবাক হয়ে চোখ দুটি বড়ো বড়ো করে সোৎসাহে আমার দিকে তাকিয়েছিল। নিজের দক্ষতার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তার ছিল না। মনে হয়, আমরা দুজনেই কেমন আমতা আমতা করতে লাগলাম। সেই ধূলিমলিন সাজঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো ইহুদি পরম কৌতুকের সঙ্গে তাকিয়ে রইল, তারপরে আমাদের দুজনের ওপরে লম্বা টানা বক্তৃতা দিল। আর আমরা নির্বাক হয়ে শিশুর মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইহুদিটি বার বার আমাকে 'দি লার্ড' বলে সম্বোধন করতে লাগল। সেই জন্যে সাইবিলকে নিশ্চিন্ত করতে হল যে আমি আদৌ ও-শ্রেণির মানুষ নই। সে আমাকে শুধু বলল, আপনি রাজকুমারের চেয়ে দেখতে সুন্দর, আপনাকে আমি 'প্রিন্স চার্মিং' বলে ডাকব।

সত্যি বলছি ডোরিয়েন, কী ভাবে মানুষকে প্রশংসা করতে হয় সাইবিল তা জানে।

হ্যারি, তুমি তাকে বুঝতে পারছ না। নাটকের একটি অভিনেতা বলেই সে আমাকে ধরে নিয়েছিল। বাস্তব জীবনের সমন্ধে কোনো ধারনাই তার নেই। সে তার মায়ের সঙ্গে থাকে, সংসারের চাপে পড়ে ভদ্রমহিলা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছেন। পরিশ্রমের ক্লান্তিতে স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সুদিন তাঁর জীবনে এসেছিল।

আঙুলের আংটি খুঁটতে খুঁটতে লর্ড হেনরি মন্তব্য করলেন, ওদের মুখের চেহারা কি তা আমি জানি। ওদের দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়।

ইহুদিটি তার কাহিনি বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি তাকে বলতে দিইনি, কারণ তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

তুমি ঠিকই করেছ, অন্য লোকের দুঃখের কাহিনির মধ্যে সব সময় অসম্ভব রকমের নীচতা রয়েছে।

সাইবিলই একমাত্র জিনিস যার ওপরেই আমার আগ্রহ রয়েছে। সে কোথায় জন্মেছে তা জেনে আমার লাভ নেই। সেই ছোটো মাথা থেকে ছোটো পা পর্যন্ত সবটাই তার স্বর্গীয়। প্রতিদিন রাত্রিতেই তার অভিনয় আমি দেখতে যাই, আর প্রতিদিনই সে আমার চোখে অপরূপা হয়ে দেখা দেয়।

আমার মনে হয় সেই জন্যেই তুমি আজকাল আমার সঙ্গে ডিনারে যাওয়ার সময় পাও না। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় কারো সঙ্গে রোমান্স করছ। করছ ঠিকই, কিন্তু আমি তোমার সম্বন্ধে যা ভেবেছিলাম তা করছ না।

শোন হ্যারি, প্রতিদিন আমরা হয় লাঞ্চ না হয় ডিনার খাই। আর তোমার সঙ্গে এর ভেতরে অনেকবারই আমি অপেরায় গিয়েছি—তাই না! অবাক হয়ে দুটি নীল চোখ বিস্তারিত করে ডোরিয়েন হেনরির মৃদু অভিযোগ নস্যাৎ করে দিলেন।

তুমি প্রায়ই অনেক দেরি করে আস।

অবশ্য সাইবিলের অভিনয় না দেখে আমি পারি না। একটা অঙ্কের জন্যে হলেও আমাকে থিয়েটারে যেতে হয়। তাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি আমি। যখন ভাবি তার ওই হাতির দাঁতের মতো কারুকার্যমণ্ডিত ছোটো দেহটির মধ্যে অত্যাশ্চর্য একটি আত্মা লুকিয়ে রয়েছে তখন আমি ভয় পেয়ে যাই।

আজ তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাবে চল, ডোরিয়েন। যাবে না?

ডোরিয়েন মাথা নাড়ল, আজ সে ইমোজেন-এর অভিনয় করবে। আগামীকাল সাজবে জুলিয়েট।

কখন সে সাইবিল ভেন-এর অভিনয় করবে?

কোনোদিন না।

আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কী ভয়ঙ্কর তুমি হ্যারি! বিশ্বের সমস্ত নায়িকাকে এক করলে যা দাঁড়ায় সাইবিল হচ্ছে তাই। ব্যক্তির চেয়ে অনেক বড়ো সে। তুমি হাসছ? কিন্তু আমি তোমাকে বলছি সে একটি জিনিয়াস। আমি তাকে ভালোবাসি। সে যাতে আমাকে ভালোবাসে সে চেষ্টা আমাকে অবশ্যই করতে হবে। তুমি তো জীবনের অনেক গোপন রহস্যের সন্ধান জান। কেমন করে সাইবিলকে আমি মুগ্ধ করব, কী করলে সে আমাকে ভালোবাসবে সে-কথাটা আমাকে তুমি বলে দাও। রোমিওকে বাধ্য করব সে যাতে আমাকে হিংসে করে। আমি চাই বিশ্বের মৃত প্রেমিকদের আত্মা যেন আমাদের দ্বৈত হাসির শব্দ শুনতে পায়, শুনতে পেয়ে বিষণ্ণ হয়। আমি চাই আমাদের উন্মাদ ভালোবাসার নিশ্বাস ধূলায় মেশানো তাদের মৃত আত্মাগুলিকে যেন সঞ্জীবিত করে তোলে, তাদের ছাইগুলিকে বেদনার আঘাতে জর্জরিত করে। ভগবানের দিব্যি, হ্যারি, আমি তাকে পুজো করি।

এই কথা বলতে বলতে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন, তাঁর গাল দুটি লাল টকটকে করতে লাগল। বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি।

লর্ড হেনরি তাঁকে লক্ষ করলেন, মনে মনে খুশিই হলেন তিনি। বেসিল হলওয়ার্ডের স্টুডিওতে যে লাজুক, নম্র, আর ভীতচকিত যুবকটিকে তিনি দেখেছিলেন, আজকের এই মানুষটির সঙ্গে পার্থক্য তার কত। তাঁর স্বভাবটি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে, রক্তবর্ণ কুসুমস্তবকে ভরে উঠেছে তাঁর আবেগ। গোপন বিবর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে তাঁর আত্মা, তার সঙ্গে মিতালি করার জন্যে বিবর থেকে এগিয়ে এসেছে আকাঙ্ক্ষা।

শেষকালে লর্ড হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কি করতে চাও তুমি?

আমি চাই একদিন তুমি আর বেসিল আমার সঙ্গে তার অভিনয় দেখতে এস। এর ফল কী হবে সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমার নেই। অভিনয়ে তার দক্ষতা যে তর্কাতীত সেকথা স্বীকার করতে তোমরাও বাধ্য হবে। তারপরে তাকে আমরা ইহুদির হাত থেকে ছাড়িয়ে আনব। তিন বছরের জন্যে, আজ থেকে মোটামুটি দু'বছর আট মাসের মতো—চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাকে ওখানে থাকতে হবে। অবশ্য তাকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে ইহুদিকে কিছু দিতে হবে। সব চুকেচুকে গেলে, ওয়েস্ট এন্ডে আমি একটা থিয়েটার খুলব, সেইখানে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অভিনয় করাব। আমাকে যেমন সে উন্মাদ করে সেই রকম উন্মাদ সারা বিশ্বকে সে করে তুলবে।

প্রিয় বালক, তোমার ও-আশা পূর্ণ হবে না।

হ্যাঁ, সে করবে। অভিনয় কলাটাকে সে যে বিশেষভাবে রপ্ত করেছে তা-ই নয়। ব্যক্তিত্বও তার খুব জোরালো এবং তুমি আমাকে অনেকবারই বলেছ যে আধুনির যুগকে যা নাচাতে পারে তা মানুষের নীতি নয়, ব্যক্তিত্ব।

ঠিক আছে। কবে আমরা যাচ্ছি?

দাঁড়াও, দেখি। আজ হচ্ছে মঙ্গলবার। আগামীকাল যাই চল। কাল সে জুলিয়েটের অভিনয় করবে।

বহুৎ আচ্ছা। ব্রিস্টল—রাত আটটা। বেসিলকে আমি আনানোর ব্যবস্থা করব।

আটটা নয়, প্লিজ হ্যারি। সাড়ে ছটা। পর্দা ওঠার আগেই আমাদের সেখানে পৌঁছতে হবে। প্রথম অঙ্কেই রোমিওর সঙ্গে তার দেখা হবে। সেই সময়েই তাকে তোমাদের দেখা উচিত।

সাড়ে ছটা! যা বাব্বা। ওই সময় তো লোকে হয় 'মিট টি' খায়, অথবা ইংরেজি নভেল পড়ে। সাতটা কর অন্তত। রাত্রি সাতটার আগে কোনো ভদ্রলোকই ডিনার খেতে বেরোয় না। এর মধ্যে বেসিলের সঙ্গে কি দেখা হবে তোমার? না, আমি তাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব?

প্রিয় বেসিল। সাত-সাতটা দিন তাকে আমি দেখিনি। কাজটা আমার খুব খারাপ হয়েছে। এর মধ্যে একটি অদ্ভুত সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাই করে, ফ্রেমের ডিজাইন কী হবে সেটা সে নিজেই ঠিক করে দিয়েছে—সে আমার প্রতিকৃতিটা পাঠিয়ে দিয়েছে। যদিও আমার বয়স একমাস বেড়ে যাওয়ার ফলে ছবিটাকে আমি হিংসে করি তবু একথাও আমি স্বীকার না করে পারব না যে ছবি দেখে আমি আনন্দ পেয়েছি। তুমিও বরং তাকে চিঠি দিয়ে দাও একটা। একা তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না। তার কথা শুনতে বিরক্ত লাগে আমারা। সে আমাকে কেবল সৎ উপদেশ দেয়।

লর্ড হেনরি হাসলেন, নিজেদের যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেইটাই বিলিয়ে দিতে মানুষ বড়ো আনন্দ পায়। এই অভ্যাসটাকে আমি বলি বদান্যতার গভীরতা।

কিন্তু বেসিল আমাদের বন্ধু হিসাবে সেরা। তবে আমার মনে হয় চরিত্রের দিক থেকে মানুষটি একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরেই, হ্যারি, এ জিনিসটা আমি বুঝতে পেরেছি।

বেসিলের সব কিছু মাধুর্য সবই তুমি তার কাজের মধ্যে দেখতে পাবে। ফলে নিজের বলতে কুসংস্কার, নীতিবোধ, আর যাকে আমরা 'কমনসেন্স' বলি এগুলি ছাড়া তার আর কিছু নেই। ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে আমি জানি নিম্নমানের আর্টিস্টরাই হচ্ছে সত্যিকারের আলাপী। তাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। সত্যিকার ভালো আর্টিস্টরা বেঁচে থাকে তাদের সৃষ্টির মধ্যে, ফলে ব্যক্তিগত জীবনে তারা কাউকেই আকর্ষণ করতে পারে না। বড়ো কবি, অর্থাৎ যাঁকে আমরা সত্যিকার বড়ো কবি বলি—হচ্ছেন ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বের সবচেয়ে অকবি। কিন্তু নিম্নমানের কবিদের সঙ্গে মিশলে চমৎকৃত হতে হয়। তাদের ছন্দ যত খারাপ, ততই তারা সুন্দর করে নিজেদের প্রকাশ করে। যে কবি একটিমাত্র দ্বিতীয় মানের চতুর্দশপদী কবিতার বই ছাপিয়েছেন, নরকুলে বাহবা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনিই। যে কাব্য-সৌরভ পরিবেশন করা তাঁর সাধ্যাতীত, মজার কথা হচ্ছে সেই সৌরভের মধ্যে তিনি নিজে বাস করেন। অপরে কবিতা লেখে বটে, কিন্তু সেই কাব্যরস পান করার মতো সাহস তাদের নেই।

টেবিলের ওপরে বড়ো একটা বোতলে আতর ঢালা ছিল, রুমালে সেই আতর কিছুটা ছিটিয়ে ডোরিয়েন বললেন, হ্যারি, তুমি যা বললে তাই কি সত্যি? তুমি যদি বল, তাহলে তাই সত্যি হতে বাধ্য। আমি এখন চললাম। ইমোজেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আগামীকালের কথা ভুলে যেও না। বিদায়।

ডোরিয়েন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। লর্ড হেনরির ভারী ভারী চোখের পাতাগুলি নেমে এল। তিনি ভাবতে লাগলেন। সত্যি কথা বলতে কি ডোরিয়েন গ্রে তাঁকে যেমন করে আকর্ষণ করেছিলেন তেমন আকর্ষণ আর কেউ তাঁকে করতে পারেনি। তবু ছোকরা যে একজনকে পাগলের মতো প্রশংসা করে তা তিনি যেন সহ্য করতে পারছিলেন না, তাঁর মনের কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধছিল। তিনি খুশিও হয়েছিলেন। এর ফলে, ডোরিয়েনকে আর ভালো করে বিশ্লেষণ করার সুযোগ হল তাঁর। প্রকৃতি বিজ্ঞানকে তিনি কোনোদিনই অস্বীকার করতে পারেননি, কিন্তু বিজ্ঞানের সাধারণ শাখাগুলি কোনোদিনই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি, সেগুলিকে তিনি অর্থহীন বলেই মনে করতেন। সেই জন্যে শুরু করেছিলেন তিনি নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করতে, শেষ করলেন অন্য লোককে ব্যবচ্ছেদ করে। মানুষের জীবন—তিনি মনে করতেন মানুষের জীবনটাই হচ্ছে বিচার করার, বিশ্লেষণ করার একমাত্র উপযুক্ত জিনিস। এর সঙ্গে তুলনা করলে আর সব বস্তুই তাদের জেল্লা হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে তাদের মূল্যবোধ। এটা সত্যি যে মানুষ যখন এই বেদনা আর আনন্দের আধারটিকে বিশেষভাবে লক্ষ করল তখন মুখে কাচের মুখোশ পরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি দহ্যমান সালফারের ধোঁয়া সরিয়ে রাখা, সে ধোঁয়া কেবল মস্তিষ্ককেই জখম করে ক্ষান্ত হয়নি, আমাদের চিন্তার জগতে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, স্বপ্নকে করেছে বিকৃত। এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে তাদের চরিত্র কী ভালোভাবে জানতে গেলে নিজেদের অসুস্থ করতে হয়। এমন কয়েকটি ব্যাধি রয়েছে যাদের ভালোভাবে জানতে গেলে আপনাকে অসুস্থ হতে হবে। কিন্তু তবু কী পুরস্কারই না মানুষে পায়! তার কাছে পৃথিবী কী আশ্চর্য রকমের সুন্দরই না দেখায়? মানুষের মনে কেন উচ্ছ্বাস জাগে, তার চরিত্রটাই বা কী, বুদ্ধিজীবীদের রঙিন জীবনের উচ্ছ্বাস বলতেই বা কী বোঝা যায়, কোথায় তাদের মিল রয়েছে, অমিলটাই বা কোথায়, এই সব পর্যবেক্ষণ করা, বিশ্লেষণ করার মধ্যে একটা আনন্দ রয়েছে। তার জন্যে মানুষকে কী দাম দিতে হবে তা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। কোনো সংবেদনের জন্যেই মানুষ খুব বেশি একটা দাম দিতে পারে না।

তিনি তা জানতেন। যে চিন্তাটা তাঁর কটা চোখের মধ্যে আনন্দের সামান্য একটু রশ্মি ফুটিয়ে তুলল—ডোরিয়েনের যে মিষ্টি কথাগুলি তাঁর কানে গিয়েছিল সেইগুলি থেকে তিনি বুঝতে

পেরেছিলেন যে ডোরিয়েন গ্রে-র হৃদয় এই শ্বেতাঙ্গিনীর দিকে ঝুঁকেছে, তাকেই তিনি পুজো করছেন। ছেলেটি অনেকখানি তাঁর নিজেরেই সৃষ্টি। তিনিই তাকে নাবালক করে রেখেছেল। এটা অবহেলার বস্তু নয়। জীবন তার রহস্য প্রকাশ করে না দেওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষে অপেক্ষা করে। কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা খুব কমই রয়েছে আর এঁরাই হচ্ছেন নির্বাচিত কিছু জনপ্রতিনিধি—যবনিকা তুলে নেওয়ার আগেই যাঁদের কাছে জীবনের রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। কখনো কখনো জীবনের এই ব্যঞ্জনাটি ফুটে ওঠে চিত্রকলার মাধ্যমে, বিশেষ করে সাহিত্যকলায়। কারণ, উচ্ছ্বাস এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটানোই সাহিত্যের কাজ। কিন্তু মাঝে মাঝে কখনো-সখনো কোনো জটিল ব্যক্তিত্ব বিচারকের স্থান অধিকার করে বসে এবং আর্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কবিতা, ভাস্কর্য অথবা চিত্রকলার মতো মানুষের জীবনও আর্টের একটি বিস্তৃত লীলাক্ষেত্র ছাড়া আর কী?

সত্যি কথাই। ছোকরাটির বুদ্ধি এখনো পর্যন্ত পোক্ত হয়নি। বসন্তকালেই সে শস্য কাটার আয়োজন মেতে উঠেছে। যৌবনের সমস্ত উন্মাদনা তাঁর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তিনি আজকাল আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন। তাঁর গতিবিধি লক্ষ করাটা বেশ আনন্দের। সেই সুন্দর মুখ, আর সুন্দর আত্মা—দুই-এ জড়িয়ে তাঁর যে সত্তাটি গড়ে উঠেছে তার দিকে অবাক হয়েই চেয়ে থাকতে হয়। কী ভাবে এই জীবনের পরিণতি আসবে তা ভেবে লাভ নেই কিছু। অভিনয়ের মঞ্চে তিনি সেই ধরনের একজন আদর্শ অভিনেতা যাঁর ব্যক্তিগত সুখের সন্ধান রাখার কোনো সম্ভাবনা আমাদের নেই, অথচ যাঁর দুঃখবোধ আমাদের অভিভূত করে তোলে। যাঁর দেহের ক্ষত তাজা গোলাপের মতো লাল টকটকে।

আত্মা এবং দেহ, দেহ আর আত্মা—কী অদ্ভুত সৃষ্টি ভগবানের! আত্মার মধ্যে পশুত্ব রয়েছে দেহের মধ্যে মাঝে মাঝে অধ্যাত্ম জগতের প্রতিফলন ঘটে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলি সুন্দর হতে পারে, এবং অধঃপতন ঘটতে পারে ধীশক্তির। জৈব উচ্ছ্বাসের সমাপ্তি কোথায় অথবা কোথা থেকে আমাদের দৈহিক সংবেদনের সৃষ্টি হয়—এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? সাধারণ মনস্তত্ত্ববিদরা নিজেদের ইচ্ছামতো যে সব ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছেন সেগুলি কত অগভীর। এবং বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে বিভিন্ন মত আর পথের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা সে কথা কে বলবে? পাপের ঘরে যে আত্মা বসে রয়েছে সেটা কি ছায়া মাত্র? অথবা দেহটা সত্যি সত্যিই আত্মার অন্তজ? বস্তু থেকে তার শক্তির বিচ্যুতি সত্যিই বড়ো রহস্যময়। আর বস্তুর সঙ্গে তার শক্তির সংহতি একই রকম রহস্যে ঘেরা। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক এ সম্বন্ধে শেষ কথা কে বলবে।

আচ্ছা, মনস্তত্ত্বই কি শেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মধ্যে দিয়ে মানুষের অবচেতন মনের সমস্ত কিছু ছোটোখাটো চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়? তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন। ব্যাপারটা যাই হোক, আমরা সব সময় নিজেদের আর সেই সঙ্গে অপরকে ভুল বুঝেছি, নীতির দিক থেকে অভিজ্ঞতার কোনো দাম নেই। মানুষ যে সমস্ত ভুল করে সেগুলিকেই তারা অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দিয়েছে। নীতিবাগীশরা যথারীতি এটিকে সতর্কবাণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের মতো চরিত্র গঠনে এর নৈতিক দক্ষতা অনস্বীকার্য, তাঁরা এর প্রশংসা করেছেন এই জন্যে যে কী করা উচিত আর কী বর্জন করা উচিত সে বিষয়ে এ আমাদের শিক্ষা দেয়। কিন্তু পরিচালনা করার মতো কোনো শক্তি অভিজ্ঞতার নেই। বিবেকের মতো এরও কর্মক্ষমতা নেই বললেই হয়। এ যেটুকু বলে দেয় তা হচ্ছে এই যে আমাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীতের কোনো পার্থক্য নেইষ যে পাপ আমরা একবার করেছি এবং অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গেই করেছি সেই পাপ ভবিষ্যতে আবার আমরা করব, আর বেশ আনন্দের সঙ্গেই।

এটা তাঁর কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে প্রায়োগিক পদ্ধতিটাই হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি যার সাহায্যে জীবনের সমস্ত আবেগ আর উচ্ছ্বাসের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন সম্ভব। সেদিক থেকে ডোরিয়েনকে নিয়ে কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে, এবং সম্ভবত সেই পরীক্ষায় বিশেষ ফললাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে। সাইবিল ভেনকে তিনি যে হঠাৎ উন্মাদের মতো ভালোবেসে ফেললেন, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটা কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। অবশ্য এর মূল কারণ যে কৌতূহল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কৌতূহলই নিছক নয়, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষাও বটে। তবু এটা সাধারণ উচ্ছ্বাস নয় এ উচ্ছ্বাস সত্যিই বড়ো জটিল। যে অনুভূতিটা প্রাথমিক পর্যায়ে নিছক শিশুসুলভ একটা কৌতূহল ছিল, সেইটাই হঠাৎ তার নিজের কাছেই ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল, পরিণত হল কামনায়, ভোগ-সম্ভাবনার অতৃপ্তিতে। এইটাই তার কাছে বিপজ্জনক। এই কামনাগুলিই আমাদের ওপর চিরকাল প্রভাব বিস্তার করে এসেছে, অত্যাচার করে এসেছে আমাদের। অথচ এদের আসল রূপটি সম্বন্ধে আমরা সব সময় ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে প্রবঞ্চিত করেছি আমাদের।

লর্ড হেনরি যখন এই সব আলোচনা করছিলেন, এমন সময় দরজায় একটা টোকা পড়ল, তাঁর চাকর ঘরে ঢুকে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল যে ডিনারে যাওয়ার সময় হয়েছে। তিনি উঠে পড়লেন, তাকিয়ে দেখলেন রাস্তার দিকে। বিপরীত দিকে বাড়িগুলির জানালার ওপরে অস্তগামী সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। জানলার কাচগুলি আগুনে পোড়ানো ধাতুর মতো লাল টকটকে করছে। মাথার ওপরে আকাশের রঙ বিবর্ণ গোলাপের মতো। বন্ধুর আগুনের মতো রঙিন জীবনের কথা মেন পড়ে গেল তাঁর। কেমন করে কোথায় কোন পথ দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন এগিয়ে চলবে তা কে বলবে?

রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় বাড়ি ফিরলেন তিনি, দেখলেন, টেবিলের ওপরে একখানা টেলিগ্রাম পড়ে রয়েছে। তিনি সেটি খুললেন, দেখলেন টেলিগ্রামটি ডোরিয়েনের কাছ থেকে এসেছে। সংক্ষিপ্ত সংবাদ: ডোরিয়েন আর সাইবিল বিয়ে করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মা, মা, আমি আজ খুশি—আনন্দে আমার মন-প্রাণ ভরে উঠেছে।

একটি বিবর্ণা শীর্ণকায়া মহিলার কোলের ওপরে মুখ লুকিয়ে মেয়েটি আনন্দে যেন ফেটে পড়ল। দেখে মনে হয়, বয়স্থা মহিলাটি সংসার-যাঁতার মধ্যে পড়ে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ছোটো বসার ঘর, আলো-হাওয়ার বালাই সেখানে নেই বললেই হয়। সেই ঘরের একমাত্র আসবাব ছোটো একটি আর্মচেয়ারের ওপরে বসে ছিলেন। উজ্জ্বল আলোর ধকল সহ্য করতে পারছিলেন না বলেই হয়তো আলোর দিকে বসেছিলেন পেছন করে।

মেয়েটি আবার বলল, আনন্দ রাখার আর জায়গা পাচ্ছি না আমি। তোমারও আনন্দ হচ্ছে নিশ্চয়।

মিসেস ভেন ভ্রূকটি করলেন, কিন্তু তাঁর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে রঙের একটি হাত তাঁর মেয়ের মাথার ওপরে রাখলেন।

আনন্দ! তোমাকে যখন অভিনয় করতে দেখি আমার আনন্দ হয় তখনি। অভিনয় ছাড়া বর্তমানে অন্য তোমার চিন্তা করা উচিত নয়। মিঃ আইস্যাকস আমাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। তিনি যে আমাদের ধার দিয়েছেন সে ধার এখনো শোধ হয়নি।

মেয়েটি ওপরের দিকে মুখ তুলে বলল, মা, টাকার কথা বলছ? টাকায় কি যায় আসে! ভালোবাসার টাকার চেয়ে অনেক বেশি।

ভুলে যেও না, ঋণ শোধ আর জেমস-এ পোশাক তৈরি করার জন্যে মিঃ আইস্যাকস আমাদের পঞ্চাশ পাউন্ড অগ্রিম দিয়েছেন। সেকথা ভুলে যেও না সাইবিল। পঞ্চাশ পাউন্ড অনেক টাকা। এদিক থেকে মিঃ আইস্যাকসকে সুবিবেচক না বলে আমি পারছি না।

দাঁড়িয়ে উঠল মেয়েটি, তারপরে জানলার ধারে গিয়ে বলল, মা, ও ভদ্রলোক নয়। আমার সঙ্গে ও যেভাবে কথা বলে তাতে ওকে আমার ঘৃণা হয়।

স্বরে কিঞ্চিৎ ঝাঁকানি দিয়ে বর্ষীয়সী মহিলাটি বললেন, তাঁর সাহায্য ছাড়া কী করে যে আমাদের চলত তা আমি জানি না।

সাইবিল ভেন নিজের মাথাটা নাড়িয়ে হাসল, আর তাকে আমাদের দরকার নেই মা। এখন থেকে প্রিন্স চার্মিং-ই আমাদের সব ভার নেবেন।

এই বলে সে থামল। একটা লজ্জার ঢল নামল তার ধমনীতে, সে একটু কেঁপে উঠল, সেই রঙে ধীরে ধীরে রাঙা করে দিল তার দুটি কপোলকে। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে তার পদ্মপাতার মতো নরম দুটি ঠোঁট বিভক্ত হল—কাঁপতে লাগল ঠোঁটের দুটি পাপড়ি। দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে, সুন্দর পোশাকের ভাঁজগুলি দিল খুলে। সে শুধু বলল, আমি তাকে ভালোবাসি।

টিয়াপাখির মতো তাঁর মা চিৎকার করে উঠলেন—বোকা, বোকা মেয়ে! কথার সঙ্গে সঙ্গে নকল হিরে-বসানো আংটি পরা আঙুলটি তাঁর অদ্ভুতভাবে নড়তে লাগল।

মেয়েটি আবার হেসে উঠল। খাঁচায় পোরা পাখির আনন্দ তার স্বরে ধ্বনিত হল। সেই সুর ধরা পড়ল তার চোখের মণিতে। দৃষ্টির আলোতে বিচ্ছুরিত হল তারই দ্যুতি। তারপরে তার চোখের পাতাগুলি মুহূর্তের জন্যে বুজে এল, মনে হল, সে কিছু গোপন রহস্যকে ঢেকে রাখতে চায়। যখন সে চোখ খুলল তখন স্বপ্নের কুয়াশা কেটে গিয়েছে।

সেই জীর্ণ চেয়ার থেকে রুগ্ন ভদ্রমহিলাটি তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তিনি তাকে বিজ্ঞ হওয়ার উপদেশ দিলেন, উপদেশ দিলেন সমঝে চলার জন্যে। কাপুরুষদের জন্যে যে সব বই লেখা হয়েছে এবং যেখানে লেখক 'সাধারণ জ্ঞান' বলে শব্দটা না বুঝে বারবার উচ্চারণ করেছেন, সেই বই থেকে কিছু উপদেশ বাণী উদ্ধৃত করে তিনি তাকে শোনালেন। মেয়েটি সেদিকে কান দিল না। কামনার কারাগারে সে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন। তার রাজকুমার প্রিন্স চার্মিং, তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে তখন। তাকে মনের মতো সৃষ্টি করার চেষ্টায় সে তখন মশগুল। তাকে খুঁজে বার করার জন্যে সে তার আত্মাকে দূত করে পাঠিয়েছে, সেই দূত তাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। রাজকুমারের জ্বালাময় চুম্বন আবার তার ঠোঁট দুটিকে স্পর্শ করেছে। তার নিশ্বাসে মেয়েটির চোখের পাতাগুলি গরম হয়ে উঠেছে।

তারপর বিজ্ঞতা চিন্তার পদ্ধতি পরিবর্তন করল। এই যুবকটি ধনী হতে পারে। তাই যদি হয়, বিয়ের কথা চিন্তা যেতে পারে। তার কানের উপকূলে সাংসারিক জ্ঞানের ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ল। ছলনার তীর ছুঁড়ল মেয়েটি। সে দেখতে পেল পাতলা ঠোঁটগুলি তার নড়ছে। সে হাসল।

হঠাৎ কথা বলার তাগিদ এল তার। সে চেঁচিয়ে বলল, মা, মা, সে আমাকে এত ভালোবাসে কেন? আমি তাকে কেন ভালোবাসি তা আমি জানি। তাকে আমি ভালোবাসি এই জন্যে যে সে নিজেই ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু আমার মধ্যে সে কী দেখেছে? আমি তো তার যোগ্য নই। কিন্তু তবু কেন জানি না, যদিও তার কাছে আমি অনেক ছোটো তবু তার প্রেমের অযোগ্য মনে হয় না নিজেকে। তার ভালোবাসা পেয়ে গর্বে আমার বুকটা ভরে ওঠে। মা, আমি যেমন আমার প্রিন্স চার্মিং-কে ভালোবাসি, তুমিও কি বাবাকে সেই রকমই ভালোবাসতে?

অল্প দামের প্রসাধনের নীচে বয়স্কা মহিলার গণ্ড দুটি হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। একটা যন্ত্রণার আকস্মিক আবেগে তাঁর শুকনো ঠোঁট দুটি বিকৃত হল। সাইবিল ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, মা আমাকে ক্ষমা কর। বাবার সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে গেলে যে তোমার কষ্ট হয় তা আমি জানি। কারণ, তুমি তাঁকে ভালোবাসতে, খুব ভালোবাসতে। দুঃখ করো না মা। বিশ বছর আগে তুমি একদিন যেমন সুখী হয়েছিল আজ আমি তেমনি সুখী। আমাকে চিরকাল সুখী থাকতে দাও।

বৎসে, প্রেমে পড়ার কথা চিন্তা করার মতো বয়স তোমার এখনো হয়নি। তাছাড়া এই ছেলেটির সম্বন্ধে কতটুকুই বা তুমি জান? তার নামটা কি তা-ও পর্যন্ত তুমি জান না। এসব কথা আলোচনা করার এতটুকু সময়, বিশেষ করে জেমস এখন অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কত জিনিস ভাবতে হচ্ছে আমাকে। আশা করেছিলাম ঠিক এখনি তুমি বুঝে শুনে চলবে। যাই হোক, তোমাকে আমি আগেই বলেছি, ছেলেটি যদি ধনী হয়...

মা, মা। টাকা-পয়সার কথা ছাড়, আমাকে সুখী হতে দাও।

মিসেস ভেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, এবং নকল নাটকীয় ভঙ্গিমায়, যে ভঙ্গিমাটি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্টেজের ওপরে স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশলের সঙ্গে প্রকাশ করতে হয়,

তিনি মেয়েকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে এল একটি যুবক, মাথার চুলগুলি তার উসকো-খুসকো, কটা রঙের। চেহারার বাঁধুনি শক্ত, হাত আর পা বেশ লম্বা, চলার ভঙ্গিমাটা বেশ সাবলীল নয়। বোনের মতো পরিচ্ছন্ন ভাবে সে মানুষ হয়ে ওঠেনি। দুজনের মধ্যে যে একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে হঠাৎ দেখলে তা বোঝা বেশ কষ্টকর। মিসেস ভেন ছেলেটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটি। মনে মনে ছেলেটিকে তিনি রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের ভূমিকাতে দেখতে লাগলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে মূকনাটকটি ভালোই জমেছে।

ছেলেটি মিষ্টি সুরে একটু বিক্ষোভ জানিয়ে বলল, তোমার কয়েকটা চুমু আমার জন্যে রেখো, সাইবিল।

সাইবিল বলল, তাই বুঝি! কিন্তু কেউ তোমাকে চুমু খেলে তো তোমার ভালো লাগে না। তুমি একটি দুষ্ট বৃদ্ধ ভালুক।

এই বলে মেঝের ওপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরল।

জেমস ভেন তার বোনের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, বলল, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে চল, সাইবিল। মনে হচ্ছে, এই বিতিকিচ্ছিরি লন্ডনে আমি ফিরব না। আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, এখানে ফিরে আসার ইচ্ছে আমার নেই।

একটা জমকালো থিয়েটারের পোশাক তুলে নিয়ে ভাঁজ করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস ভেন বললেন, ওরকম ভয়ংকর কথা বলো না বাছা।

ছেলেটি যে থিয়েটারে নামল না এতে তিনি খুবই হতাশ হয়েছিলেন, নামলে নাটকটা জমত ভালোই।

কেন বলব না, মা? সত্যিই বলছি, ফিরে আসার ইচ্ছে আমার নেই।

তোমার কথা শুনলে আমার বড়ো কষ্ট হয় বাছা। আমি বিশ্বাস করি প্রচুর অর্থ নিয়েই তুমি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে আসবে। সমাজ বলতে কলোনিতে কিছু নেই, যা রয়েছে বলে শুনেছি তাকে আমরা সোসাইটি বলতে পারি না। সেই জন্যে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করার পর আর তোমার সেখানে থাকার দরকার নেই। এখানে ফিরে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে তুমি।

ছেলেটি প্রতিবাদের সুরে বিড় বিড় করে বলল, সোসাইটি! ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে প্রচুর অর্থ রোজগার করা। তারপরে তোমাকে আর সাইবিলকে স্টেজ থেকে সরিয়ে আনা। স্টেজে অভিনয় করাকে আমি ঘৃণা করি।

সাইবিল হাসতে হাসতে বলল, ও জিম। কী নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছ তুমি? কিন্তু সত্যিই কি তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে? খুব খুশি হব আমি। আমার ভয় হচ্ছিল তুমি হয়তো তোমার কিছু বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিতে বেরিয়ে গিয়েছ, বিশেষ করে টম হার্ডি। যে তোমাকে ওই বিচ্ছিরি পাইপটা দিয়েছে, অথবা নেড ল্যাঙটন, সেই পাইপ টানার জন্যে যে তোমাকে সব সময় ঠাট্টা করে। বিকেলটা আমার সঙ্গে বেড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে তুমি যে আমাকে ভালোবাস তারই প্রমাণ দিয়েছ। কোথায় যাবে বল তো? চল, পার্কে যাই।

ছেলেটি একটু চটেই বলল, আমার পোশাক নোংরা। ধনী লোকরাই কেবল পার্কে যায়।

তার জামার হাতাটা চাপড়াতে চাপড়াতে সাইবিল বলল, বোকা কোথাকার, জিম।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জিম, তারপরে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু সাজতে বেশি দেরি করো না। চটপট সেরে নাও।

নাচতে নাচতে ঘরের বাইরে চলে গেল সাইবিল। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সেই গানের সুর নীচেও শোনা গেল। মাথার ওপরে তার ছোট্ট পা দুটি অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করতে লাগল।

জিম দু-তিনবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করল, তারপরে চেয়ারের ওপরে নিশ্চলভাবে যে মূর্তিটি বসেছিল তার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, মা, আমার জিনিসপত্র সব ঠিক করে রেখেছ?

নিজের কাজের দিকে চোখ রেখে মা বললেন, হ্যাঁ, জিম। সব ঠিক রয়েছে।

এই রুক্ষ, কড়া মেজাজের পুত্রটির সঙ্গে যখনি তিনি একা থেকেছেন, বিশেষ করে শেষ কটি মাস, তখনি মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করেছেন। দুজনের চোখাচোখি হলেই, তাঁর গোপন সফরী-চরিত্রটা নিজেকে বিপদাপন্ন বলে মনে করত। ছেলেটি কিছু সন্দেহ করছে নাকি এই কথাটাই প্রায় তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন। ছেলেটি কথা বলত কম, চুপচাপ থাকত বেশি। এই সময়টাই তাঁর কাছে অসহ্য লাগত। ফলে তিনি অভিযোগ করতে শুরু করলেন। ওপরকে আক্রমণ করেই মহিলারা নিজেদের রক্ষা করে, ঠিক যেমন হঠাৎ এবং অদ্ভুতভাবে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে।

তিনি বললেন, জেমস, আমি আশা করি, নাবিকের জীবনে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। স্মরণ রেখ, এ-জীবন তুমি নিজেই বেছে নিয়েছ। তুমি কোনো সলিসিটরের অফিসে চাকরি নিতে পারতে, শ্রেণি হিসাবে সলিসিটরদের আমরা সম্মানার্হ বলে মনে করি, এবং এদেশে তারা বেশ উঁচু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ডিনার খায়।

জেমস উত্তর দিল, চাকরির জীবনটাকে আমি ঘৃণা করি, বিশেষ করে কেরানির চাকরি। কিন্তু তুমি ঠিক কথাই বলেছ। নিজের পেশা আমি নিজেই ঠিক করে নিয়েছি। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, সাইবিলের ওপরে লক্ষ রেখো। তার যেন কোনো ক্ষতি না হয় মা, তার দিকে নজর রেখো।

জেমস, তোমার কথা শুনে অবাক হচ্ছি। তার ওপরে নিশ্চয় আমি লক্ষ রাখি।

শুনলাম একটি ভদ্রলোক নাকি প্রতিদিন থিয়েটারে আসেন, আর তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে স্টেজের পিছনে যান। এ সংবাদ কি সত্যি? এ বিষয়ে কী বল তুমি?

জেমস, তুমি কি বলছ তা তুমি নিজেই জান না। আমাদের পেশায় আমাদের যাঁরা গুণমুগ্ধ তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে আমরা অভ্যস্ত। একসময় আমি নিজেও অনেক ফুলের তোড়া উপহার পেয়েছি। সে-যুগে সত্যিকার অভিনয় কাকে বলে মানুষ তা বুঝত। সাইবিলের কথা যদি বল, আমি জানি না ওদের এই আলাপ সত্যিকার সিরিয়াস, কি সিরিয়াস নয়। কিন্তু যুবকটি যে সত্যিকার ভদ্র সেদিক থেকে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমাকে সে খুব শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া দেখলে মনে হয় ছেলেটি ধনী, যে সব ফুল সে আমাদের পাঠায় সেগুলিও খুব সুন্দর।

জেমস কর্কশ স্বরেই বলল, যদিও তুমি তার নাম জান না।

মুখের চেহারা কোনো রকম বিকৃত না করেই মা বললেন, না। ছেলেটি তার আসল নামটা পর্যন্ত আমাকে এখনো বলেনি। মনে হচ্ছে, এই না-বলাটাই তার একটা আনন্দ। ছেলেটি সম্ভবত অভিজাত শ্রেণির।

নিজের ঠোঁট কামড়াল জেমস, শুধুমাত্র বলল, ওর দিকে লক্ষ রেখো মা, ওর ওপরে লক্ষ রেখো।

বাছা, তোমার কথা শুনে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। সাইবিল সব সময় আমার বিশেষ নজরের মধ্যে রয়েছে। অবশ্য এই ছেলেটি যদি ধনী হয় তাহলে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই বা সাইবিল ইতস্তত করবে কেন? আমার বিশ্বাস ছেলেটি অভিজাত সম্প্রদায়ের। পাত্র হিসাবে সাইবিলের পক্ষে ছেলেটি হবে পয়লা নম্বরের। দুজনে মিলবেও ভালো, যাকে বলে রাজযোটক মিল। ছেলেটি দেখতেও বেশ ভালো। সবাই তা লক্ষ করেছে।

নিজের মনে মনে বিড় বিড় করতে লাগল জেমস, তারপরে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে শার্সির ওপরে আঙুলের টোকা দিতে লাগল। কিছু বলার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখল দরজাটা খুলে গিয়েছে, সেই খোলা দরজার ভেতর দিয়ে সাইবিল দৌড়ে আসছে।

সে বলল, তোমরা দুজেনি দেখছি বেশ গম্ভীর। বলি, ব্যাপারটা কী?

জেমস বলল, ও কিছু নয়। মাঝে মাঝে মানুষের কিছুটা সিরিয়াস হওয়া উচিত। মা, আমরা চললাম। সন্ধে পাঁচটার সময় আমি ডিনার খাব। একমাত্র শার্ট ছাড়া, আর সবই গোছানো হয়ে গেছে। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।

একটু কষ্টকল্পিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মা বললেন, এস।

জেমস যে ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল তাতে তিনি সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার চোখের মধ্যে এমন একটা জিনিস তিনি দেখছিলেন যেটা তাঁকে রীতিমতো শঙ্কিত করে তুলেছিল।

সাইবিল বলল, আমাকে একটা চুমু দাও, মা।

এই বলে সে তার ফুলের মতো নরম দুটি ঠোঁট দিয়ে তার মায়ের শুকনো গালের হাড়ের ওপর চুমু খেল। তাঁর ঠান্ডা গাল দুটিকে উষ্ণ করে তুলল।

কাল্পনিক দর্শকের অন্বেষণে ওপরের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিমায় মা বললেন, বাছা, বাছা আমার!

জেমস অস্থির হয়ে বলল, এস সাইবিল।

মায়ের এই স্নেহ প্রবণতাকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না।

বাতাসে কাঁপানো সূর্যের আলোতে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, হাঁটতে লাগল। নিরানন্দ উসটন রোড ধরে। একটি সুন্দরী পোশাকে-চলনে পরিচ্ছন্ন বুচির মেয়ের পাশে ওই রকম বেখাপ্পা পোশাক পরা গম্ভীর মেজাজের বিষণ্ণ একটি যুবককে হাঁটতে দেখে পথচারীরা একটু

অবাক হয়েই তাদের দিকে তাকাতে লাগল। তাদের মনে হল যেন একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে একটা সাধারণ মালি হেঁটে চলেছে।

অপরিচিত কোনো মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির ওপরে চোখ পড়ার ফলে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জিম, মাঝে মাঝে ভ্রূকুটিও করল। অদ্ভুত চেহারার মানুষদের কৌতূহলী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস সাধারণ মানুষরা কোনো দিনই ছাড়তে পারে না। শেষ জীবনে জিনিয়াসরা এই দৃষ্টির জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠেন। সেই রকমের একটা অনুভূতি জিমকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল। সাইবিলের অবশ্য অন্য কথা। পথচারীদের ওপরে সে যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে সে-বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। প্রেমের আবেগ হাসির উচ্ছ্বাসে তার ঠোঁট দুটিকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। সে তখন প্রিন্স চার্মিং-এর কথাই ভাবছিল। তার সম্বন্ধে বেশি চিন্তা করার জন্যে তাঁকে নিয়ে মুখে কোনো আলোচনা করল না সাইবিল। আলোচনা করল কেবল জিম-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে, যে-জাহাজে চড়ে সে যাবে সেই জাহাজ নিয়ে, বিদেশে গিয়ে সে যে প্রচুর সোনা রোজগার করবে সেই সোনা নিয়ে, দুষ্টপ্রকৃতির রেড-ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে যে অপরূপ সুন্দরী রাজকুমারীকে সে উদ্ধার করবে—সেই সম্ভাবনা নিয়ে। কারণ, একটি সাধারণ নাবিক অথবা সুপার-কারগো অথবা এখন সে যে কাজের জন্যে যাচ্ছে সেইটুকু নিয়েই সে জীবন কাটাবে না। না, না, নিশ্চয় না। নাবিকের জীবন বড়ো কষ্টকর। একটা জাহাজের খোলের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকটা কি ভীষণ কষ্টকর। চারপাশে সমুদ্রের তরঙ্গ, হাজার হাজার সেই তরঙ্গ বিরাট বিরাট ঝুঁটি বাগিয়ে ফুলে-ফুঁসে চারপাশে সমুদ্রের তরঙ্গ, হাজার হাজার সেই তরঙ্গ বিরাট বিরাট ঝুঁটি বাগিয়ে ফুলে-ফুঁসে চারপাশ থেকে ধাক্কা দিচ্ছে জাহাজটাকে। কখনো কখনো বা কালো কালো দৈত্যদানব ঝড়ের ঝাপটায় পাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। নাবিকের জীবন সে যে কত ভয়ঙ্কর, কত বিপজ্জঙ্ক তা একবার ভেবে দেখুন। মেলবোর্নে সে জাহাজ থেকে নামবে, ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা সোনার খনিতে হাজির হবে। এক সপ্তাহ কাটার আগেই একতাল খাঁটি সোনা সে পেয়ে যাবে। আজ পর্যন্ত অত বড়ো তাল কেউ খুঁজে পায়নি। ছ'জন সশস্ত্র অশ্বারোহী পুলিশের তত্ত্বাবধানে সেই তালটা রেলগাড়িতে চাপিয়ে সমুদ্রোপকূলে নিয়ে আসা হবে। বনে-বাদাড়ে যে সব ডাকাতরা লুকিয়ে থাকে সেই সোনা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে তারা অন্তত বার তিনেক গাড়িটাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু তাদের আক্রমণ প্রতিহত হবে। অনেক হতাহতকে পেছনে গেলে পালিয়ে যাবে তারা।

অথবা, না। জিম আদৌ হয়তো সোনার খনির দিকে যাবে না। এই খনিগুলি বড়ো খারাপ জায়গা। এসব জায়গায় যারা কাজ করে তারা সব সময়ে মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে। সেই মত্ত অবস্থায় সরাইখানায় তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, মুখ খিস্তি করে। হয়তো সে যাবে কোনো মেষপালকের খামারে। কোনো কোনো এক সন্ধ্যায় যখন সে ঘোড়ায় চড়ে খামারে ফিরবে এমন সময় সে হয়তো দেখতে পাবে কোনো দস্যু কালো পোশাক পরে একটা কালো ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে একটি ধনীর অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। সেই দেখে সে দস্যুকে তাড়া করবে, উদ্ধার করে আনবে মেয়েটিকে। তারপরে নিশ্চয় মেয়েটি তার প্রেমে পড়ে যাবে, জিমও ভালোবেসে ফেলবে তাকে। শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে প্রচুর সম্পদ নিয়ে ফিরে আসবে জিম; লন্ডনে বিরাট একটি প্রাসাদ নিয়ে বসবাস করবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়; অনেক প্রাচুর্য, অনেক আনন্দ জিমের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে; কিন্তু তাকে চরিত্রের দিক থেকে ভালো হতে হবে, মেজাজটিকে রাখতে হবে শরিফ; মূর্খের মতো অর্থ নষ্ট করলে তার চলবে না, জিমের চেয়ে সে মাত্র এক বছরের বড়ো; কিন্তু সাংসারিক অভিজ্ঞতা তার অনেক, অনেক বেশি। প্রতিটি ডাকে সে যেন তাকে চিঠি দেয়, আর প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে সে যেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। ভগবান খুব ভালো; তিনি নিশ্চয় তাঁর

দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সে নিজেও তার ভাই-এর জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবে। কয়েকটা বছরের মধ্যে জিম বেশ ধনী আর সুখী হয়ে ফিরে আসবে।

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে তার কথা শুনছিল; কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার চিন্তায় তার মনটা খুব খারাপ হয়েছিল।

তবু ওই একটা ব্যাপারই তাকে বিষণ্ণ করেনি। সাংসারিক অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট না থাকলেও, সাইবিলের পেশায় যে বিপদ রয়েছে সে-সম্ভাবনাটাও কেমন যেন তাকে বিব্রত করে তুলেছিল। ওই যে ভদ্রবেশধারী যুবকটি তার সঙ্গে প্রেম করে চলেছে সেটা তার কাছে মঙ্গলজনক না-ও হতে পারে। যুবকটি ভদ্রলোক; বিশেষ করে সেই জন্যেই জিম তাকে ঘৃণা করে, যদিও এর পেছনে ঠিক কী কারণ রয়েছে তা সে বুঝতে পারে না; হয়তো শ্রেণিবিদ্বেষই এর মূল কারণ। তার মায়ের বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তি যে যথেষ্ট কম সে-বিষয়েও তার সন্দেহ কম ছিল না। বিশেষ করে সেই কারণে বিপদে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা সাইবিলের রয়েছে বলে সে মনে করত। শিশুরা তাদের বাবা-মাকে ভালোবেসেই জীবন শুরু করে; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাঁদের বিচার করতে শুরু করে; কখনো-কখনো তাঁদের দোষ তারা ক্ষমাও করে।

তার মা! একটা প্রশ্ন মাকে তার করার ইচ্ছা ছিল; অনেক দিন ধরে এই প্রশ্নটা সে মনের গভীরে লুকিয়ে রেখেছিল। থিয়েটারে একদিন হঠাৎ কথাটা তার কানে গিয়েছিল; একদিন সে যখন থিয়েটারের দরজায় অপেক্ষা করছিল সেই সময় কিছু লোক কথাটা নিয়ে হাসাহাসি করছিল। সেই হাসির টুকরো সে শুনতে পেয়েছিল। মনে হল, কে যেন তার মুখের ওপরে সপাং করে একটা চাবুক কষিয়ে দিয়েছে। তার কপালে কুঞ্চিত হল এবং একটা মারাত্মক রকমের যন্ত্রণাকে সহ্য করার জন্যে সে তার নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছিল।

সাইবিল: আমার কথা কিছুই তোমার কানে ঢুকছে না, জিম। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কী সুন্দর পরিকল্পনাই তোমার জন্যে আমি তৈর করে দিচ্ছি। কিছু বল।

কী শুনতে চাও তুমি?

সাইবিল ভাই-এর দিকে চেয়ে হেসে বলল: তুমি বেশ লক্ষ্মী ছেলে হবে, আর আমাদের ভুলে যাবে না।

জিম তার কাঁধে একট স্রাগ করল, তারপরে বলল: তুমিই বরং আমাকে তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে সাইবিল; অন্তত সেদিক থেকে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

সাইবিলের মুখ লাল হয়ে উঠল: তুমি ঠিক কী বলতে চাচ্ছ জিম?

শুনছি, তোমার একটি নতুন বন্ধু হয়েছে। সে কে? তার বিষয়ে তুমি আমাকে কিছু বলনি কেন? তাকে দিয়ে তোমার কোনো মঙ্গল হবে না।

সাইবিল চেঁচিয়ে উঠল: জিম, তুমি থাম, তার বিরুদ্ধে কোনো কথা তুমি বলবে না, আমি তাকে ভালোবাসি।

জিম বলল: ভালোবাসা? সাবাস! তুমি তার নামটা পর্যন্ত জান না। কে সে? তার পরিচয় কী? এসব জানার অধিকার আমার রয়েছে।

তাকে সবাই প্রিন্স চার্মিং বলে ডাকে। এ-নামটা তোমার পছন্দ হয় না? বোকা ছেলে কোথাকার। এ নামটা ভুলে যাওয়া তোমার উচিত নয়। তাকে একবার চোখে দেখলে তোমার মনে হত অমন সুন্দর, অপরূপ মানুষ পৃথিবীতে আর বুঝি নেই। একদিন তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে; অবশ্য অস্ট্রেলিয় থেকে ফিরে আসার পরে; খুব ভালো লাগবে তোমার। সবাই তাকে পছন্দ করে; আর আমি...আমি তাকে ভালোবাসি। তুমি যদি আজ থিয়েটারে আসতে পারতে! সে আজ আসছে। আজ আমি জুলিয়েট-এর ভূমিকায় অভিনয় করব। উঃ, কী রকম অভিনয় করব বল তো? জিমি, ভেব দেখ, সত্যিকার প্রেমে পড়ে জুলিয়েট-এর অভিনয় করব আমি। সে থিয়েটারে বসে আমার অভিনয় দেখবে। তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে অভিনয় করব আমি। ভয় হচ্ছে, আমি হয়তো দর্শকদের ভয় পাইয়ে দেব; প্রেমে পড়লেই মানুষ তার স্বাভাবিকতার বেড়া ডিঙিয়ে কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে যায়। আর ওই হতভাগ্য বদমেজাজী আইস্যাকস তার বার-এ যে সব তৃতীয় শ্রেণির মানুষরা মদ খেতে ঢোকে তাদের কাছে আমার অভিনয়ের প্রশংসা করে বলবে—একটি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। এতদিন সে আমাকে প্রচার করেছিল গোঁড়া বলে; এখন সে প্রচার করে আমি একটি ঐশ্বরিক শক্তিধারিণী প্রতিভা বিশেষ। আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। আর এ-সমস্তই কেবল তারই জন্যে—সেই প্রিন্স চার্মিং-এর। কিন্তু তার উপযুক্ত আমি নই? দরিদ্র আমি! দরিদ্র? তাতে কী যায় আসে? ঘরের দরজা দিয়ে যখন দারিদ্র্য হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে আসে, প্রেম তখন জানালার ভেতর দিয়ে উড়ে যায়। আমাদের এই প্রবাদ বচনটিকে নতুনভাবে লিখতে হবে। মানুষের দুঃখের দিনে এই প্রবচনটি রচিত হয়েছিল; এখন সুখের দিন আমার—বসন্তের মাতাল করা দিন; নীল আকাশের বুক ফুলের সমারোহ জাগার দিন।

জিমে গম্ভীরভাবেই বলল: তিনি ভদ্রলোক...

গানের ঢঙে সাইবিল বলল: ভদ্রলোক কি বলছ—বল—রাজকুমার—প্রিন্স। আর বেশি তুমি কী চাও?

তিনি তোমাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধতে চান।

তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশঙ্কায় আমি কাঁপি।

আমি চাই তাঁকে তুমি এড়িয়ে চল।

তাকে দেখা পাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাকে পুজো করা; তাকে যে জানে সে তাকে বিশ্বাস না করে পারে না।

সাইবিল, তুমি উন্মাদের মতো কথা বলছ।

সাইবিল হেসে তার একটা হাত ধরে বলল: ভাই জিমে, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বয়স তোমার একশো বছরের কাছাকাছি। সময় আসবে যেদিন তুমি নিজেকেই নিজে ভালোবেসে ফেলবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে ভালোবাসা কী বস্তু। অতটা মুখ গম্ভীর করে রেখো না। যদিও তুমি চলে যাচ্ছ, তবু যাওয়ার সময় এই কথাট জেনে যাও যে আগের চেয়ে এখন আমি অনেক সুখী। তোমাকে এবং আমাকে দুজনকেই বেশ কষ্টের ভিতর দিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু এখন সেই কষ্টের সমাপ্তি। তুমি পেয়েছ একটি নতুন জগতের সন্ধান, আমি পেয়েছি একটি নতুন জীবনের সন্ধান। দুটি চেয়ার আমাদের সামনে রয়েছে পাতা। এস, আমরা এদের ওপরে বসে চালাক-চতুর মানুষদের আসা-যাওয়া দেখি।

একদল উৎসুক দর্শকদরে চোখের সামনে তারা দুটি চেয়ার দখল করে বসল। রাস্তার ওপরে একরাশ আগুন রঙের লাল ফুল গোল করে কাঁপছে। মহিলাদের চকচকে রৌদ্রনিবারণী ছাতাগুলি বাতাসে কাঁপছে; দেখে মনে হচ্ছে যেন বিরাট-বিরাট প্রজাপতির দল নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে।

সাইবিলের অনুরোধে জিম তার ভবিষ্যতের অনেক আশা-ভরসার কথা বলতে লাগল। বেশ কষ্ট করেই সে ধীরে-ধীরে মুখ খুলল। তারপরে দুজনেই কথায় মেতে উঠল। বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল সাইবিল। নিজের আনন্দের কথা কিছুতেই খুলে বলতে পারছিল না। ভাই-এর কাছ থেকে কোন সহানুভূতির কথা সে শুনতে পায়নি। তার কথা শুনে সে মাঝে-মাঝে একটু আধটু ভ্রূকুটি করছিল মাত্র। কিছুক্ষণ পরে সাইবিল নিজেই চুপ করে গেল। হঠাৎ ডোরিয়েন গ্রে-র সোনালি চুল আর হাসিমাখা মুখখানা তার চোখ পড়ল। একটা খোলা গাড়িত চেপে দুটি মহিলার সঙ্গে গ্রে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

সাইবিল উত্তেজনায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল: ওই যে সে।

জিমে জিজ্ঞাসা করল: কার কথা বলছ?

অপস্রিয়মান গাড়িটির দিকে তাকিয়ে সাইবিল বলল: প্রিন্স চার্মিং।

জিমে লাফিয়ে উঠল; তারপর সাইবিলের একটা হাত ধরে জোরে নাড়া দিয়ে বলল: কোথায়, কোথায়? কোনটি তোমার প্রিন্স চার্মিং? বল—বল। তাকে আমি দেখবই।

কিন্তু দেখা বা দেখানোর সুযোগ কোনোটাই হল না। ঠিক সেই মুহূর্তে বারউইকসএর ডিউকের চার ঘোড়ার গাড়িটি দু'দলের মাঝখানে এসে হাজির হল। পথ যখন পরিষ্কার হল তখন ডোরিয়েনের গাড়িটি পার্কের এলাকা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

দুঃখের সঙ্গে সাইবিল বলল: সে চলে গিয়েছে। তাকে যদি তুমি দেখতে পেতে আমি তাহলে খুব খুশি হতাম।

দেখতে পাওয়া উচিত ছিল আমার, কারণ, ভগবানের দিব্যি করে বলছি, ওর হাতে যদি তোমার কোনো ক্ষতি হয় তাহলে ওকে শেষ করে ছাড়ব।

কথাটা শুনে সাইবিল তার ভাই-এর দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইল। জিমে সেই কথাটাই আবার বলল। ধারালো ছুরির মতো কথাগুলি বাতাসের বুকে কেটে-কেটে বসল। আশপাশের লোকেরা তাদের দিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে। সাইবিলের পাশে দাঁড়ানো একটি মহিলা তো মুখ চিপে ফিক-ফিক করে হেসেই উঠল।

চারপাশের অবস্থা দেখে সাইবিল ফিস-ফিস করে বলল: জিমে, চলে এস।

জিমে ভিড়ের ভিতর দিয়ে সাইবিলের পিছু-পিছু এগোতে লাগল। সে যে ওই কথাগুলি বলতে পেরেছে তাতেই সে খুশি।

অ্যাকিলিস-এর মূর্তির কাছাকাছি আসার পরে, সাইবিল ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখের মধ্যে এতক্ষণ করুণার একটা ছায়া লুকিয়ে ছিল; সেইটাই এবারে তার ঠোঁট দুটির ওপরে হাসির ছটায় রূপান্তরিত হল। জিমে-এর দিকে তাকিয়ে মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে সে বলল: জিমে, তুমি

বোকা; শুধু বোকাই নও, একেবারে যাকে বলে নিরেট গর্দভ, বদমেজাজী। এসব কথা তুমি উচ্চারণ কর কেমন করে? কী বলছ তা তুমি জান না। তুমি কেবল হিংসুটেই নও, বড়ো কঠিন। আমি চাই তুমিও প্রেমে পড়। একমাত্র প্রেমই মানুষকে ভালো করে। এইমাত্র তুমি যা বললে সে-সব কথা দুষ্ট লোকেরা বলে থাকে।

জিম বলল: আমার বয়স ষোল। আমি কি বলছি তা আমি জানি। কোনোদিন দিয়ে মা তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারছে না। তোমাকে কী ভাবে মানুষ করতে হবে সে-সম্বন্ধে মায়ের কোনো ধারণা-ও নেই। ঠিক এই সময় অস্ট্রেলিয়া না যেতে পারলেই খুশি হতাম আমি। সব জিনিসটা বেশ ভালো করে তলিয়ে দেখার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু কাগজপত্র সব সই হয়ে গিয়েছে। বিপদটা সেইখানেই।

না, না জিম। অত ভাববার দরকার নেই। মা যে সব রম্য-নাটক অভিনয় করতে ভালোবাসত, তুমি সেই সব নাটকেরই নায়কের মতো কথা বলছ। তোমার সঙ্গে ঝগড়া আমি করব না। আমি তাকে দেখছি, তাকে দেখেই আমার মন-প্রাণ আনন্দে ভরে উঠেছে। কোনোদিনই আমরা ঝগড়া করব না। আশা করি, আমি যাকে ভালোবাসি তার কোনো ক্ষতিই তুমি করবে না। আমার এ ধারণা ঠিক তো?

জিম গম্ভীরভাবে বলল:অবশ্য যতক্ষণ তুমি তাকে ভালোবাসবে ততক্ষণ।

সাইবিল একটু চেঁচিয়ে আর বেশ জোর দিয়েই বলল: আমি তাকে চিরকাল ভালোবাসব।

আর সে?

সেও চিরকাল।

স্বার্থের খাতিরে তাই তার করা উচিত।

সাইবিল তার কাছ থেকে একটু সরে গেল; তারপরে হেসে তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরল। জিম সত্যিই বড়ো ছেলেমানুষ।

মার্বেল আর্চের কাছে এসে তারা একটা 'বাস' ধরল। এসটেন রোড-এ বাড়ির কাছাকাছি একটা জায়গায় নেমে গেল তারা। বিকাল পাঁচটার পরেই তারা ফিরে এল। থিয়েটারে যাওয়ার আগে ঘন্টা-দুই সাইবিলকে বিশ্রাম নিতে হবে, স্রেফ বিছানার ওপরে গড়াগড়ি দিতে হবে তাকে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে জিমও বারবার তাকে চাপ দিল। সে বলল তার মা একটু সরে গেলেই সে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে; অন্যথায়, মা কান্নাকাটি করে শেষ পর্যন্ত একটা কাণ্ড করে তুলবে। কান্নাকাটি করে হইচই করাটাকে সে একদম বরদাস্ত করতে পারে না।

সাইবিলের ঘরেই তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। ছেলেটির মনের মধ্যে হিংসার একটা বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তাদের দুজনের মধ্যে এই তৃতীয় ব্যক্তিটির আগমন সে মোটেই বরদাস্ত করে উঠতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, আগন্তুকটির সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে খুন করে ফেলতে পারত। তবু, যখন সাইবিল দুটি হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, তার চুলের ভেতর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাকে চুমু খেল তখনই তার মনটা নরম হয়ে গেল; সত্যিকার ভালোবাসা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল; সেও আদুরে ভাই-এর মতো বোনকে চুমু খেল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল তারা; চোখের জলের ভেতর দিয়ে বিদায় নিল।

তার জন্যে নীচে তার মা অপেক্ষা করছিলেন। সে ঘরে ঢুকতেই, দেরি করার জন্যে মা গজ গজ করতে লাগলেন। কোনো উত্তর না দিয়ে জিম খেতে বসল। খাওয়ার আয়োজন এমন কিছু ছিল না। কিন্তু তা-ও তার খুব ভালো লাগল বলে মনে হল না। চারপাশে মাছি ভন ভন করতে লাগল; দু'চারটে টেবিলের ওপরে লাগল ঘুরতে। রাস্তায় যান-বাহনের হট্টগোল; এদের মধ্যে দিয়েই তার বিদায়ের শেষ কটি মুহূর্ত ধীরে-ধীরে নিঃশোষিত হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সে খাবারের থালাটা সরিয়ে রাখল; মাথাটাকে দুটো হাতের চেটো দিয়ে চেপে ধরল। তার মনে হল ওদের মধ্যে কী ঘটছে তা বিশেষভাবে জানার অধিকার তার রয়েছে; এ ব্যাপারটা তাকে আরো আগেই জানানো উচিত ছিল। তাহলে সে বুঝতে পারত সে যা সন্দেহ করেছে সেটা সত্যি কি না। ছেলের অকস্মাৎ এই ভাবালুতায় মা ভয় পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যান্ত্রিকভাবেই তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল, একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার রুমাল তিনি আঙুলে জড়াতে লাগলেন। ঘড়িতে ছটা বাজল। জিম ধীরে-ধীরে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপরে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে তাকাল। চোখাচোখি হল দুজনের। জিম দেখল মা তাকে সব জিনিসটা ক্ষমার চোখে দেখতে অনুরোধ করছেন। এই মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে চটে উঠল।

মা, তোমাকে কিছু বলার রয়েছে আমার।

মা-র চোখ দুটি ঘরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোনো উত্তর দিলেন না তিনি।

মা, আমাকে সত্যি কথা বল। কথাটা জানার অধিকার রয়েছে আমার। বাবার সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হয়েছিল?

ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বুকের বোঝা অনেকটা হালকা হয়ে গেল তাঁর। এতদিন ধরে, দিনে আর রাতে, সপ্তাহ আর মাস ধরে সে মুহূর্তটির জন্যে আতঙ্কিত হৃদয়ে তিনি অপেক্ষা করে দিন গুনছিলেন সেই চরম মুহূর্তটি তাঁর সামনে এসে হাজির হয়েছে। যতই কদর্য হোক, প্রশ্নটি সোজা; সোজা উত্তরই দিতে হবে তাঁকে। এই রকম একটি অবস্থার জন্যে কোনোরকম প্রস্তুতি ছিল না। জিমে-এর প্রশ্নটি অকস্মাৎ; কেবল অকস্মাৎ-ই নয়, একেবারে যাকে বলে অমার্জিত; অনেকটা নাটকের খারাপ রিহার্সালের মতো।

জীবনের সহজ বর্বর গতির কথা চিন্তা করে অবাক হয়েছিলেন তিনি। এটাই যেন জীবনের একমাত্র সত্য; কিন্তু কেন যে এই বর্বরতা মানুষ মেনে নেয়, বা মেনে নিতে বাধ্য হয়, তা জানার মতো দক্ষতা তাঁর ছিল না, অনেক সহজ জিনিসের মতো এটা-ও একটা বর্বর সত্য্য।

না; বিয়ে হয়নি।

দুটো হাত শক্ত করে ঘুষি পাকিয়ে ছেলেটি চিৎকার করে উঠল: আমার বাবা তাহলে একটি স্কাউনড্রেল।

ঘাড় নাড়লেন তিনি; বললেন: না, আমি জানতাম, সামাজিকভাবে বিয়ে তিনি আমাকে করতে পারতেন না। সেদিকে থেকে যথেষ্ট অসুবিধে ছিল তাঁর। কিন্তু আমরা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসতাম। বেঁচে থাকলে, নিশ্চয় তিনি আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে যেতে পারতেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করো না, বাছা; তিনি তোমার বাব এবং ভদ্রলোক। তাছাড়া, অভিজাত ছিলেন তিনি।

ভ্রূকুটি করল জিম: আমার জন্যে কিছুই আমি গ্রাহ্য করিনে। কিন্তু সাইবিলকে তুমি কিছুতেই...এও তো একজন ভদ্রলোক—তাই নয়—ওই যে লোকটি সাইবিলকে ভালোবাসে—অথবা, বলে সে ভালোবাসে? তাছাড়া, মনে হচ্ছে—বেশ অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ—তাই না?

হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। একটা ভয়ঙ্কর রকমের ক্লেদাক্ত অপমান তাঁকে স্তব্ধ করে দিল। লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ল তাঁর। হাত দুটো কাঁপতে লাগল। সেই কাঁপানো হাত দিয়ে চোখ দুটো তিনি মুছলেন; বললেন: সাইবিলের মা রয়েছে। আমার মা ছিল না।

মায়ের কথা শুনে জিমের মন নরম হয়ে গেল; সে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে তাঁকে চুমু খেল; বলল: বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে তোমাকে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি তার জন্য আমি দুঃখিত, মা। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না; এখন আমাকে যেতেই হবে। ভুলে যেয়ো না যে এখন থেকে লক্ষ রাখার মতো একটি সন্তানই তোমার কছে রইল; আর এটাও তুমি বিশ্বাস করো যে সেই লোকটা আমার বোনের যদি এতটুকু ক্ষতি করে, আমি নিশ্চয় খুঁজে বার করব তাকে, তারপর কুকুরের মতো গুলি করে মারব। প্রতিজ্ঞা করছি আমি।

ভয় দেখানোর এই অনাবশ্যক মূর্খতা, উচ্ছ্বাস, আর উন্মত্ত নাটকীয় ঢঙ ভদ্রমহিলার কাছে জীবনটাকে আরো স্ফষ্ট করে তুলল। এইরকম একটি আবহাওয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এই আবহাওয়ার তিনি আরো সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারতেন; আর অনেক দিন পরে সেই প্রথম ছেলেকে তিনি সত্যি-সত্যিই প্রশংসা করলেন। উচ্ছ্বাসভরা এই পরিস্থিতি আরো কিছুক্ষণ কাটানোর ইচ্ছে ছিল তাঁর; কিন্তু সে-সুযোগ তিনি পেলন না; পুত্রই তাঁকে থামিয়ে দিল। তখনো ট্রাঙ্কটা নামানো হয়নি; খোঁজা হয়নি 'মাফলার'। বাস-করার অনেক টুকিটাকি জিনিস এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিল। গাড়োয়ানের সঙ্গে দর কষাকষি করতে হল; খুঁটিনাটি কাজের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। ছেলে গাড়িতে উঠে চলে যাওয়ার পরে, নতুন ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানালা থেকে ছেঁড়া রুমালের একটা টুকরো নিয়ে নাড়তে লাগলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন একটা বড়ো রকমের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। সাইবিলকে এই বলে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন যে বর্তমানে তাঁর আর কাজ নেই, তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন; কারণ, এখন লক্ষ রাখার মতো একটি সন্তানই তাঁর কাছে রয়েছে। ছেলের কথাটা তাঁর মনে ছিল। কথাটা তাঁকে খুশিই করেছিল। ছেলে যে ভয় দেখিয়েছিল সে-বিষয়ে মেয়েকে তিনি কিছুই বলেননি। কথাটা জিম বেশ স্পষ্ট করে আর নাটকীয় ভঙ্গিতেই বলেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল এই কথাটা নিয়ে একদিন সবাই তাঁরা হাসাহাসি করবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রিস্টল হোটেলের একটি ছোটো কামরায় সেদিন সন্ধ্যায় কেবল তিনজনের জন্যে ডিনার দেওয়া হয়েছিল। বেসিল হলওয়ারর্ডের সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে লর্ড হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন: বেসিল, তুমি নিশ্চয় খবরটা শুনেছ?

একজন ওয়েটার মাথা নীচু করে তাঁদের অভিবাদন জানাল; সেই ওয়েটারের হাতে টুপি আর কোটটা দিয়ে আর্টিস্ট হলওয়ার্ড বললেন: না, হ্যারি। কী খবর বল তো? আশা করি রাজনীতির ব্যাপার কিছু নয়? ও-সব খবরে আমার আগ্রহ নেই। হাউস-অফ-কমনস-এ এমন একজন সদস্যও নেই যার প্রতিকৃতি আঁকা চলতে পারে; যদিও অবশ্য, কিছুটা পালিশ করলে তাদের ভালোই দেখায়।

লর্ড হেনরি বললেন: ডোরিয়েন গ্রে বিয়ে করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

চমকে উঠলেন হলওয়ার্ড; তারপরে ভ্রূকুটি করলেন, বললেন: কী বললে! ডোরিয়েন গ্রে বিয়ে করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে? অসম্ভব, অসম্ভব!

না, সত্যি; যাকে বলে নির্ভেজাল সত্যি।

কাকে বিয়ে করবে?

একটি খুদে অভিনেত্রী বা ওই জাতীয় কোনো মেয়েকে।

আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই। এসব ব্যাপারে ডোরিয়েন অনেক বেশি বুদ্ধিমান।

প্রিয় বেসিল, বরং বলতে পার মাঝে-মাঝে বোকার মতো কাজ না করার মতো ডোরিয়েন বুদ্ধিমান।

হ্যারি, মাঝে-মাঝে করার মতো কাজ বিয়েটা মোটেই নয়।

লর্ড হেনরি ক্লান্তভাবে বললেন: আমেরিকা ছাড়া। কিন্তু আমি বলিনি সে বিয়ে করেছে; আমি বলেছি নিজের বিয়ে সে নিজেই ঠিক করে ফেলেছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক। আমার কথাই ধর না কেন। কবে আমার বিয়ে হয়েছে সেকথাটা আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে, কিন্তু কবে আমি বিয়ে করব বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম সেকথা আমি স্রেফ ভুলে গিয়েছি। আমার যেন মনে হচ্ছে, বিয়ে করতে আমি কোনোদিনই চুক্তিবদ্ধ হইনি।

কিন্তু ডোরিয়েনের সম্পদ, জন্ম, আর সামাজিকে প্রতিষ্ঠার কথাটা একবার চিন্তা করে দেখ। তার সামাজিক পদমর্যাদার এত নীচের কাউকে বিয়ে করাটা তার পক্ষে হাস্যকর হবে।

বেসিল, মেয়েটিকে সে বিয়ে করুক এটা যদি তুমি চাও, তাহলে সে কথাটা তাকে তুমি বলতে পার। তাহলে সে মেয়েটিকে নিশ্চয় বিয়ে করবে। যখনই মানুষ আকাট মূর্খের মতো কাজ করে তখনই বুঝবে তার পেছনে তার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে।

আশা করি মেয়েটি ভালো। কোনো দুশ্চরিত্রাকে ডোরিয়েন বিয়ে করুক তা আমি চাই নে; তাতে তার চরিত্র নষ্ট হবে; নষ্ট হবে তার বুদ্ধি।

অরেঞ্জ-বিটার মেশানো ভারমুথের গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে লর্ড হেনরি বললেন: না, না; মেয়েটি ভালোর চেয়েও ভালো; সে সুন্দরী।ডোরিয়েন বলছে—মেয়েটি সুন্দরী। এসব ব্যাপারে সাধারনত তার ভুল হয় না। তুমি যে তার ছবিটি এঁকেছ তাই দেখে অন্য লোকের সৌন্দর্য তার চোখে ধরা পড়েছে। অনেক জিনিসের মধ্যে অপরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মতো শক্তি তার রয়েছে। আর রাত্রিতে মেয়েটিকে দেখার কথা রয়েছে আমাদের, যদি অবশ্য ছোকরা এখানে আসার কথা বেমালুম ভুলে যায়।

তুমি কি সিরিয়াস?

নিশ্চয়, বেসিল। বর্তমানে আমি যতটা সিরিয়াস তার চেয়ে বেশি সিরিয়াস আর কখনো আমি হতে পারি একথা ভাবতেই আমার কষ্ট হচ্ছে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে-করতে ঠোঁটে কামড় দিয়ে বেসিল হলওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করলেন: কিন্তু এ-বিয়েতে কি তোমার মত রয়েচে? নিশ্চয় না। এটা একটা অর্থহীন মোহ ছাড়া আর কিছু নয়।

অনুমোদন অথবা অননুমোদন—বর্তমানে আমি কিছুই করিনে। জীবনের সম্বন্ধে এই ধরনের চিন্তা করাটা উদ্ভট। আমাদের নৈতিক কুসংস্কারকে ঢাক পিটিয়ে জাহির করার জন্যে পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করিনি। সাধারণে এ বিষয়ে কী বলে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে; আর মনোহর মানুষেরা যা করে তার মধ্যে আমরা নাক গলাই নে। মনোমুগ্ধকারী ব্যক্তি যে কাজ যে ভাবেই করুক না কেন আমি তাতে আনন্দ পাই। ডোরিয়েন একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি জুলিয়েট-এর ভূমিকায় অভিনয় করে। মেয়েটিকে সে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। তাতে আপত্তি কী? সে যদি মেসালিনাকে বিয়ে করত তাতেই বা কী ক্ষতি হত। তুমি জান বিয়ের সমর্থক আমি নই। বিয়ের সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছে এই যে বিয়ে করলে মানুষ নিঃস্বার্থপর হয়; আর যে সব মানুষ স্বার্থের কথা চিন্তা করে না, চরিত্রের দিক থেকে তারা বিবর্ণ। তাদের ব্যক্তিত্ব বলে কোনো বস্তু নেই। তবু এমন কয়েকটি মানসিক বৃত্তি রয়েছে বিয়ে যাদের জটিলতর করে তোলে। এই সব মানুষরা তাদের অহমিকা বজায় রাখে; আর সেই অহমিকার সঙ্গে আরো অনেক দম্ভ মিশিয়ে দেয়। বিবাহিত ব্যক্তিরা একাধিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। বিয়ের পরে তারা বেশ ভালোভাবেই সংঘবদ্ধ হয় এবং আমার মতে, এই সংঘবদ্ধতাই হচ্ছে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, প্রতিটি অভিজ্ঞতারই দাম রয়েছে; এবং বিয়ের বিরুদ্ধে যে যাই বলুক, নিঃসন্দেহে এটি একটি অভিজ্ঞতা। আমি আশা করি ডোরিয়েন এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে, ছ'মাস পাগলের মতো ভালোবাসবে—তারপরে আর কেউ তাকে মোহগ্রস্ত করে ফেলবে। অনুশীলনের জন্যে ডোরিয়েন একটি অদ্ভুত চরিত্রে পরিণত হবে।

হ্যারি, এতক্ষণ ধরে তুমি যা বললে তার একটি বর্ণ-ও তুমি নিজে বিশ্বাস কর না। বিশ্বাস যে কর না তা তুমি নিজেই জান। ডোরিয়েন গ্রে-র জীবন যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার চেয়ে বেশি দুঃখ আর কেউ পাবে না। তুমি যা দেখাও তার চেয়ে তুমি অনেক উঁচু।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন: অন্য লোক যে ভালো একথা আমরা চিন্তা করি কেন জান? কারণ, নিজেরাই আমরা নিজেদের ভয় করি। অপরের ভালো দেখার ভিত্তি হচ্ছে নিছক ভীতি। আমাদের উপকারে আসতে পারে এই এইরকম কিছু গুণ অন্য লোকের মধ্যে খুঁজে বার করে আমরা তাদের প্রশংসা করি; ভাবি, এটাই আমাদের বিরাট একটা বদান্যতা। ব্যাঙ্কারকে আমরা প্রশংসা করি এই উদ্দেশ্যে যে আমরা প্রয়োজনমতো আমাদের সঞ্চিত অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারব। দস্যুদের বীরত্বের প্রশংসা করি এই ভরসায় যে তারা

আমাদের পকেটটা রেহাই দেবে। আমি যা বললাম তা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—এই আশাবাদকে আমি যথেষ্ট ঘৃণা করি। আর জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা যদি বল তাহলে এটুকু আশ্বাস তোমাকে আমি দিতে পারি যে যে-জীবনের গতি রুদ্ধ হয়নি তার বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মানুষের প্রকৃতিকে যদি তুমি ধ্বংস করতে চাও তাহলে তাকে শুধু সংস্কার করে দাও। বিয়ের কথা যদি বল তাহলে অবশ্য মূর্খতা হবে; কিন্তু বিয়ে বাদ দিয়েও নর-নারীর মধ্যে অনেক রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে; এই সম্পর্কগুলি কেবল যে মনোরম তাই নয়, এগুলি আমাদের কৌতূহল-ও উদ্রেক করে যথেষ্ট। এইগুলি যারা গড়ে তোলে তাদের নিশ্চয়ই আমি উৎসাহিত করব। ফ্যাশানেবল বলে স্বীকৃতি পাওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে তাদের। কিন্তু ডোরিয়েন সশরীরে হাজির হয়েছে; আমার চেয়ে অনেক দক্ষতার সঙ্গে সে তোমাকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারবে।

সাটিনের পালক-দেওয়া টুপিটা মাথা থেকে খুলে এবং দুজনের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে করমর্দন করে ডোরিয়েন উৎসাহের আতিশয্যে বলে উঠল: প্রিয় হ্যারি, প্রিয় বেসিল, তোমরা নিশ্চয় আমাকে অভিনন্দন জানাবে। এত আনন্দ জীবনে আর কোনোদিনই আমি পাইনি। অবশ্য এর জন্যে কোনোরকম প্রস্তুতি ছিল না; সত্যিকার সুখের জিনিসগুলি এইরকম আকস্মিকভাবেই আমাদের কাছে হাজির হয়। তবু মনে হয় এইরকম একটি আনন্দকেই আমি এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

উত্তেজনায় আর আনন্দে তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল; দেখতে তাকে অপরূপ দেখাল।

হলওয়ার্ড বললেন, আশা করি, ডোরিয়েন, সব সময়েই তুমি খুব সুখী হবে। কিন্তু তোমার বিয়ে যে ঠিক হয়ে গিয়েছে একথা তুমি আমাকে জানাওনি বলে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না। সে-সংবাদ হ্যারিকে তুমি দিয়েছ।

ছোকরাটির কাঁধে হাত রেখে হাসতে-হাসতে লর্ড হেনরি বললেন: এবং ডিনারে আসতে দেরি করার জন্যে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না ডোরিয়েন। এখন এস, বসে পড়ি। এখানকার খাবার কীরকম খেতে তাই পরীক্ষা করি এস। তারপরে তোমার কাহিনি বলো।

ছোটো টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসতে-বসতে ডোরিয়েন বলল: বেশি বলার সত্যিই কিছু নাই। কী হয়েছিল সেইটাই সোজা কথায় বলছি। গতকাল সন্ধ্যায় হ্যারি তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে আমি পোশাক বদলালাম; রুপার্ট স্ট্রিটের যে রেস্তোরাঁতে আমাকে তুমি নিয়ে গিয়েছিলে সেখানে ডিনার খেতে ঢুকলাম। ডিনার সেরে রাত প্রায় আটটা নাগাদ আমি থিয়েটারে হাজির হলাম। রোজালিনড-এর ভূমিকায় অভিনয় করছিল সাইবিল। অবশ্য দৃশ্যপট একদম জঘন্য ছিল; আর প্রায় সেইরকম ছিল অরল্যানডো। কিন্তু সাইবিল! সে-অভিনয় তোমরা দেখলে খুশি হতাম আমি। ছেলের পোশাক পরে সে যখন স্টেজে এসে নামল তখন তাকে যা দেখাচ্ছিল কী আর বলব! শ্যাওলা রঙের ফতুয়ার সঙ্গে সরু পায়জামা পরেছিল সে; মাথায় ছিল দামি পাথর বসানো বাজপাখির একটা পালক; গায়ের ওপরে জড়ানো ছিল ফিকে লাল লাইনটানা একটা ঢিলে জামা। এমন অপরূপ সাজে আর কখনো তাকে আমি দেখিনি। বেসিল, তোমার স্টুডিওতে তানাগ্রা যুবতীর যে অপরূপ ছবি রয়েছে ঠিক সেইরকম দেখতে। একটা বিবর্ণ গোলাপের চারপাশে ঘন কালো পাতার আচ্ছাদনের মতো তার ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের রাশি তার মুখের চারপাশে জড়ানো ছিল। তার অভিনয়ের কথা যদি বল তা সে নিজেদের চোখেই আজ তোমরা দেখতে পাবে। একেবারে জাত আর্টিস্ট বলতে যা বোঝা যায় সাইবিল সেই জাতীয় অভিনেত্রী। সেই ছোটো ঘিঞ্জি জায়গায় আমি তো একেবারে অভিভূতের মতো বসে রইলাম। আমি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর লন্ডনে বসে রয়েছি

সেকথা আমি একেবারে ভুলেই গেলাম। যে-অরণ্য কেউ কোনোদিন দেখেনি, মনে হল সেই অরণ্যের ভিতরে আমি আমার প্রেমিকার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অভিনয় শেষ হওয়ার পরে আমি নীচে নামলাম; তারপরে সাজঘরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম। আমরা যখন দুজনে পাশাপাশি বসেছিলাম তখন হঠাৎ তার চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম। তার চোখের ওই রকম চাহনি আগে কোনোদিন আমার চোখে পড়েনি। আমার ঠোঁট দুটি তার দিকে এগিয়ে গেল। দুজনেই দুজনকে গভীর আবেগের সঙ্গে চুমু খেলাম। সেই মুহূর্তে আমি যে কেমন বিভোর হয়ে গেলাম সে কথা তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। মনে হল, আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত যৌবন গোলাপী আনন্দের একটি মুহূর্তে কেন্দ্রীভূত হল। সাদা নর্সিসাস ফুলের মতো সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তরপরে সে হাঁটু মুড়ে বসে আমার হাতে চুমু খেল। এসব কথা অবশ্য তোমাদের বলে লাভ নেই; তবু, না বলে আমি পারছি নে। অবশ্য আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা এখনো খুব গোপন রয়েছে। এমন কি, সে তার মাকেও একথা জানায়নি। জানি নে, আমার অভিভাবকরাই বা কী বলবেন। লর্ড ব্র্যাডলি নিশ্চয় খুব চটে যাবেন। আমার তাতে কিছু আসে যায় না। সাবালক হতে আমার আর এক বছর-ও নেই; তারপরে খুশিমতো যা ইচ্ছে তাই করতে পারব। বেসিল, তোমার কি মনে হয় কাব্যলোক থেকে প্রেমিকাকে সরিয়ে এনে আমার স্ত্রীকে শেকসপীয়রের নাটকে অভিনয় করার সুযোগ দেওয়াটা আমার পক্ষে উপযুক্ত হবে না? শেকসপীয়রের বাণী যে গোপনে আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে। রোজালিনড-এর দুটি বাহু যে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে, আমি যে জুলিয়েটের ঠোঁটে চুমু খেয়েছি।

হলওয়ার্ড আস্তে-আস্তে বললেন: হ্যাঁ, ডোরিয়েন, মনে হয় তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

লর্ড হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার সঙ্গে তার কি আজ দেখা হয়েছে?

ডোরিয়েন গ্রে মাথা নাড়লেন: আমি তাকে আর্ডেনের বনভূমিতে ছেড়ে এসেছি, ভেরোনার উদ্যানে আমি আবার তাকে খুঁজে পাব।

গভীর মনোনিবেশ সহকারে লর্ড হেনরি তাঁর শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলেন।

ঠিক কোন মুহূর্তে তুমি বিয়ের কথাটা উচ্চারণ করলে ডোরিয়েন? সেই বা কী উত্তর দিল? সম্ভবত, কিছুই মনে নেই তোমার।

প্রিয় হ্যারি, বিয়েটাকে আমি ব্যবসাদারী চোখে দেখিনি; আর এ-বিষয়ে কোনো প্রস্তাবও আমি তাকে দিইনি—। তাকে যে আমি ভালোবাসি এই কথাটাই কেবল তাকে আমি বলেছি। সে বলেছে, আমার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা তার নেই। যোগ্যতা নেই! শোনো কথা! আমার কাছে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যাকে আমি তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

লর্ড হেনরি বিড়-বিড় করে বললেন, বাস্তববুদ্ধিতে নারীজাতির সঙ্গে কারও তুলনাই চলে না। আমাদের চেয়ে তারা অনেক বেশি বুদ্ধিমতী। ওইরকম অবস্থায় বিয়ের কথাটা বলতে আমরা প্রায়শই ভুলে যাই—তারা আমাদের সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

হলওয়ার্ড তাঁর হাতের ওপরে একটা হাত চাপিয়ে বললেন: থাক হ্যারি। ডোরিয়েনকে বিরক্ত করছ তুমি। অন্য পুরুষদের সঙ্গে ওর তুলনা করো না। ও কারো জীবনে দুঃখ ডেকে আনবে না। ওরে চরিত্রটি বেশ সুন্দর, মার্জিত।

টেবিলের উলটো দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরি বললেন: ডোরিয়েন কোনোদিনই আমার ওপরে

বিরক্ত হয় না। আমার প্রশ্নের মধ্যে কোনোরকম কুটিলতা নেই; অথবা, প্রশ্নটা আমি করছি খোলা মনে। প্রশ্নের কারণটা হচ্ছে নিছক কৌতূহল। আমার ধারণা, বিয়ের ব্যাপারে মহিলারাই আমাদের কাছে প্রস্তাব তোলে প্রথম। আমরা তাদের কাছে কোনো প্রস্তাব রাখিনে। অবশ্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে এ-রীতিটা খাটে না। কিন্তু মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়কে আমরা আধুনিক বলিনে।

হেসে মাথা নাড়লেন ডোরিয়েনঃ তোমাকে নিয়ে পারা গেল না, হ্যারি; কিন্তু তোমার কথায় আমি কিছু মনে করিনে। তোমার ওপরে রাগ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সাইবিল ভেনকে দেখলে তুমি বুঝতে পারবে, একমাত্র জানোয়ার ছাড়া আর কেউ তাকে দুঃখ দিতে পারে না। আমি তাকে সোনার চৌকিতে দাঁড় করিয়ে দেখতে চাই আমার স্ত্রীকে বিশ্বের লোক পুজো করছে। বিয়েটা কী বল তো? একটা চুক্তি, একটা প্রতিজ্ঞা—যাকে কোনো অবস্থাতেই ভাঙা যায় না। তুমি আমার কথা শুনে হাসছ? না, না, হেস না। একটি অপরিবর্তনীয় চুক্তিই তার সঙ্গে আমি করতে চাই। ভালোবাসাকে মানুষ কী করে যে অপমান করে তা আমি জানিনে। আমি সাইবলি ভেনকে ভালোবাসি। তার আস্থা আমাকে বিশ্বাসী করে তুলেছে, করে তুলেছে সৎ। তার পাশে বসে থাকলে তুমি আমাকে যা শিখিয়েছ তার জন্যে অনুতাপ করি আমি। তোমরা আমাকে যা জান আমি তখন আর ঠিক সে রকমটি থাকিনে। আমার সব কিছু পালটে যায়। সাইবিল ভেন-এর একটু ছোঁওয়া আমাকে সব ভুলিয়ে দেয়; ভুলিয়ে দেয় তোমার মনোমুগ্ধকর চিত্তাকর্ষী, বিষাক্ত, মুখরোচক নীতিগুলি।

কিছু স্যালড নিজের দিকে টেনে নিয়ে লর্ড হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন, এবং ওগুলি কি...

ওই জীবন, প্রেম, এবং আনন্দের ওপরে তোমার নীতিগুলির কথাই বলছি। হ্যারি, কেবল ওইগুলি নয়, তোমার যাবতীয় নীতি।

আস্তে-আস্তে সুরেলা কন্ঠে লর্ড হেনরি বললেন, আনন্দই হচ্ছে একমাত্র জিনিস যার সম্বন্ধে কিছু নীতিকথা বলা যায়। কিন্তু এ-নীতি আমার নিজস্ব নয়—প্রকৃতির। প্রকৃতি এই আনন্দের মারফতেই মানুষকে যাচাই করে। যে আনন্দ করতে জানে তাকেই প্রকৃতি সমর্থন করে। সুখী হলেই আমরা সৎ হব, কিন্তু সৎ হলেই যে আমাদের সব সময় সুখী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

বেসিল হলওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু "সৎ হওয়া" কথাটার অর্থ কী বল তো?

টেবিলের ওপরে টবে রাখা ঘন ফুলগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে লর্ড হেনরির দিকে চোখ চিরে তাকাতে-তাকাতে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে ডোরিয়েন গ্রে বললেনঃ ঠিক, ঠিক, "সৎ হওয়া" বলতে কী বোঝ তুমি তাই আমাদের বল।

গ্লাসের পাতলা কাচের ওপরে নিজের সুন্দর একটি আঙুলের চাপ দিয়ে লর্ড হেনরি বললেন, সৎ-হওয়া আর নিজের আত্মার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া একই কথা অন্য লোকের সঙ্গে যে একাত্মতা তারই মধ্যে বিভেদের বীজ লুকিয়ে থাকে। মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় হল তার নিজের জীবন। প্রতিবেশীদের কথা যদি ধর, তাহলে প্রয়োজন হলে তাদের লক্ষ করে তুমি অনেক নৈতিক উপদেশের বাণী ছাড়তে পার। তা ছাড়া, উঁচু আদর্শ বলতে আমরা যা বুঝি তা রয়েছে একমাত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের। যুগের মাণদণ্ডই হচ্ছে আধুনিক নীতিজ্ঞানের মাপকাঠি। আমার মনে হয় কোনো মানুষের পক্ষেই তার যুগের মাপকাঠি মেনে নেওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অনৈতিক কাজ।

বেসিল হলওয়ার্ড বললেনঃ সত্যি কথা বলতে কি হ্যারি, কেউ যদি নিছক নিজের জন্যেই, বেঁচে থাকে তাহলে কি তাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয় না?

নিশ্চয়। আজকাল প্রতিটি জিনিসের জন্যেই আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়। আমার ধারণা, দরিদ্রদের সত্যিকার ট্র্যাজিডি হচ্ছে নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই তারা বঞ্চিত করতে পারে না। সমস্ত কিছু সুন্দর জিনিসের মতোই সুন্দর পাপ করার অধিকার আর সুযোগ একমাত্র ধনীদেরই রয়েছে।

অর্থের কথা বাদ দিলেও, মানুষকে অন্যভাবে দাম দিতে হয়।

কী ভাবে, বেসিল?

ধর, অনুতাপের দাম, দুঃখ-যন্ত্রণার দাম... নৈতিক অবনতির দাম।

কাঁধে স্রাগ করে লর্ড হেনরি বললেন, প্রিয় বন্ধু, মধ্যযুগের কথা খুব মনোমুগ্ধকর। কিন্তু মধ্যযুগের অনুভূতিগুলি বর্তমান যুগে অচল। অবশ্য, সেই অনুভূতিগুলিকে নভেল-নাটকে চালানো যায়। কিন্তু নভেল-নাটকে স্থান পায় কারা? বর্তমান যুগের বাস্তব পটভূমিকায় যারা অচল। বিশ্বাস কর, এমন কোনো সভ্য মানুষ নেই যে আনন্দের জন্যে অনুতাপ করে, আর এমন কোনো সভ্য মানুষ নেই সত্যিকার আনন্দ বলতে কী বোঝায় সে-বিষয়ে যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান রয়েছে।

ডোরিয়েন গ্রে বললেন, আমি জানি আনন্দ কাকে বলে। আনন্দ হচ্ছে কাউকে গভীরভাবে ভালোবাসা।

লর্ড হেনরি ফল নাড়তে-নাড়তে বললেন, ভালোবাসা পাওয়ার চেয়ে ভালোবাসা অবশ্যই ভালো। কারো পুজো পাওয়াটা হচ্ছে জঘন্য জিনিস। মানুষরা দেবতাদের যে চোখে দেখে, নারীরাও সেই চোখে পুরুষদের দেখে থাকে। তারা সব সময় আমাদের পুজো করে; আর সেই অজুহাতে তাদের জন্যে কিছু করার জন্যে সব সময় আমাদের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করে।

ডোরিয়েন একটু গম্ভীরভাবেই বললেনঃ আমার ধারণা, আমাদের চরিত্রে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করে তারা; আমাদের কাছ থেকে সেই প্রেম চাওয়ার পূর্ণ অধিকার তাদের রয়েছে।

হলওয়ার্ড বললেন; খাঁটি কথা, ডোরিয়েন।

লর্ড হেনরি বললেন; কোনো জিনিষই চিরকাল খাঁটি নয়, বেসিল।

বাধা দিলেন ডোরিয়েন; অর্থাৎ, এ কথাটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে হ্যারি, যে নারীরা তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস পুরুষদের উপহার দেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লর্ড হেনরি বললেন, সম্ভবত, কিন্তু টুকরো-টুকরো করে সেইটাই তারা ফিরে পেতে চায়। আমাদের দুশ্চিন্তাটা সেখানেই। কোনো একজন ধীসম্পন্ন ফরাসি ভদ্রলোক একবার বলেছেন—বড়ো কাজ করার জন্যে মহিলারা সব সময় আমাদের উৎসাহিত করে; কিন্তু সেই কাজ আমরা যখন করতে যাই তখনই চরম বাধা আসে তাদের কাছ থেকে।

হ্যারি, তোমার কথাগুলি বড়ো ভয়ঙ্কর। আমি জানি নে তোমাকে আমি এত পছন্দ করি কেন।

তিনি বললেন, তুমি আমাকে সব সময় পছন্দ করবে ডোরিয়েন। একটু কফি চলবে? ওয়েটার, কফি নিয়ে এস; সেই সঙ্গে নিয়ে এস সেরা শ্যাম্পেন আর সিগারেট। না, না, সিগারেট থাক। আমার কাছে কয়েকটা রয়েছে। বেসিল, আমি তোমাকে সিগার খেতে হবে না। একটা সিগারেট খাও। নিখুঁত আনন্দ তোমাকে একটি নিখুঁত সিগারেটই দিতে পারে। এই জিনিসটি অপরূপ। খেয়েও তৃপ্তি পায় না মানুষ। আর কী চাই আমরা? হ্যাঁ, ডোরিয়েন, আমাকে তুমি সব সময় পছন্দ করবে। আজ পর্যন্ত যে সব পাপ করার সাহস তোমার হয়নি, তোমার কাছে সেই সব পাপের প্রতীক আমি।

সিগারেট ধরাতে-ধরাতে ডোরিয়েন বললেন; কী সব আবোল-তাবোল বকছো হ্যারি! চল, এবারে আমরা থিয়েটারের দিকে এগোই, সাইবিল স্টেজে এসে দাঁড়ালেই নতুন জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে তোমরা। সে এমন একটি জীবন তোমাদের সামনে তুলে ধরবে যা তোমরা আগে কোনোদিন দেখনি।

ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে লর্ড হেনরি বললেন; আমি সব জানি, কিন্তু সব সময় আমি নতুন-নতুন অনুভূতি সংগ্রহ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকি। অথচ, বলতে আমি ভয় পাচ্ছি, সেবকম কোনো অনুভূতির সাক্ষাৎ আমি পাইনি। তবু হয়তো তোমার এই অপরূপা আমার মধ্যে কিছুটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে। আমি অভিনয় ভালোবাসি। বাস্তব জীবনের চেয়ে এ অনেক বেশি সত্য। চল, আমরা যাই। ডোরিয়েন, তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি দুঃখিত বেসিল, কিন্তু আমার গাড়িতে দুজনের বেশি জায়গা হবে না। গাড়িতে করে আমাদের পিছু-পিছু এস।

তাঁরা উঠে পড়লেন, কোট চাপালেন গায়ে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কফি খেতে লাগলেন। হলওয়ার্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন; কী যেন ভাবছিলেন তিনি। একটা বিষাদের ছায়া তাঁর ওপরে নেমে এসেছিল। এই বিয়েটাকে কেমন যেন মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি; অথচ তাঁর মনে হল ডোরিয়েনের জীবনে যেসব ঘটনা ঘটতে পারত তাদের অনেকের চেয়ে এটা ভালো। কয়েক মিনিট পরে, তাঁরা সবাই নীচে নেমে এলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি একাই গাড়িতে উঠলেন; সামনে দেখলেন লর্ড হেনরির গাড়িতে আলো চকচক করে উঠল। অদ্ভুত একটা ক্ষতির অনুভূতি তাঁকে গ্রাস করে ফেলল। তাঁর মনে হল আগের মতো ডোরিয়েন আর তাঁর নিজের হবেন না। তাঁদের মধ্যে নতুন একটি জীবন এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর চোখের দৃষ্টি কালো হয়ে এল; উজ্জ্বল আলোয় ভরা জনাকীর্ণ রাস্তাগুলি কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এল তাঁর চোখে। গাড়িটা থিয়েটারে এসে হাজির হলে তাঁর মনে হল তিনি যেন অনেকগুলি বছর পেরিয়ে এসেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কী জানি কেন সেদিন রাত্রিতে প্রেক্ষাগৃহ লোকে গিজগিজ করছিল। মেদবহুল ইহুদি ম্যানেজার দরজার সামনে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল; চাটুকারের ভীরু হাসি তার মুখের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঝলসে উঠল। জোরে-জোরে কথা বলতে-বলতে আর হিরের আংটি পরা হাত দোলাতে-দোলাতে বিনয়ের অবতার সেজে সে তাঁদের নির্ধারিত বকস-এ নিয়ে গেল। লোকটিকে ডোরিয়েন গ্রে-র কোনো দিনই ভালো লাগত না; সেদিন আরো খারাপ লাগল। তাঁর মনে হল মিরান্দার সন্ধানে এসে তিনি ক্যালিব্যানের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছেন। লর্ড হেনরির অবশ্য তাকে ভালোই লাগল। অন্তত সেই রকমের একটা ইঙ্গিত করে তার সঙ্গে করমর্দন করার বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই সঙ্গে একথাটাও বলতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না যে এমন একটি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তিনি গর্ববোধ করছেন যে সত্যিকার প্রতিভাময়ী একটি অভিনেত্রীকে আবিষ্কার করেছে এবং একজন কবির জন্যে যে দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখিয়েছে। একতলায় গর্তে সমবেত দর্শকবৃন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে হলওয়ার্ড দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা করতে লাগলেন। অতিরিক্ত গরম আবহাওয়াটা সহ্য করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তাঁদের; বিরাট সূর্যটিকে মনে হচ্ছিল গাঢ় পীত রঙের দানবীয় আকৃতির একটি ডালিয়া ফুলের পাপড়ির মতো। গ্যালারিতে যে যুবকগুলি বসেছিল তাদের কোট আর ওয়েস্ট কোট খুলে হাতলের ওপরে রেখে দিল। থিয়েটারের ভেতরে তারা নিজেদের মধ্যে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বলাবলি করছিল, জমকালো পোশাক পরে তাদের পাশে যে সব মেয়েরা বসেছিল তাদের সঙ্গে তারা কমলালেবু ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল। গর্তের মধ্যে কয়েকটি মহিলা হাসছিল। তাদের গলার স্বর কেবল তীব্রই নয়, অনেকটা বেসুরো-ও। মদের দোকান থেকে ছিপি খোলার শব্দও ভেসে আসছিল।

লর্ড হেনরি বললেনঃ প্রিয়তমা খুঁজে বার করার জায়গাই বটে! বাপরে, বাপ!

ডোরিয়েন গ্রে বললেনঃ ঠিকই বলেছ। এইখানেই তাকে আমি খুঁজে বার করেছি এবং আমার কাছে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে সে অনেক বেশি স্বর্গীয়। তার অভিনয় দেখলে তোমরা সব ভুলে যাবে। সে স্টেজে নামলেই এই সব সাধারণ, কর্কশ স্বভাব এবং পাশবিক চরিত্রের মানুষগুলির হাবভাবও পালটিয়ে যাবে। তাদের চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে যাবে; চুপ করে বসে তার অভিনয় তারা দেখবে। তারই ইচ্ছেমতো এই সব মানুষগুলি হাসবে, কাঁদবে। সে তাদের বেহালার তারের মতো সুরময় করে তুলবে। তাদের আত্মিক জগতে সে তুলবে সুর। নিজেদের রক্তমাংসের কথা ভুলে যাবে তারা।

অপেরা-কাচ চোখে বসিয়ে লর্ড হেনরি একতলার দর্শকদের দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, ডোরিয়েনের কথা শুনে তিনি বললেন, ভুলে যাবে! অর্থাৎ নিজেদের রক্তমাংসের কথা। এবিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত নই।

হলওয়ার্ড বললেনঃ ওর কথা শোনো না, ডোরিয়েন। তুমি কী বলছ তা আমি বুঝতে পারছি। এই মেয়েটির ওপরে আমার আস্থা রয়েছে। অপরূপা ছাড়া আর কাউকেই তুমি ভালোবাসতে পার না। মেয়েটির সম্বন্ধে এইমাত্র তুমি যা বললে সেই সমস্ত গুণ যার মধ্যে রয়েছে সে নিশ্চয় চরিত্রের দিক থেকে সুন্দরী এবং রুচিসম্পন্না। নিজের যুগকে উন্নত করা নিশ্চয় একটা সৎ কাজ। আত্মা বলে যাদের কিছু নেই তাদের মধ্যে মেয়েটি যদি আত্মার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যারা চিরকাল ঘৃণ্য আর কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে বাস করে এসেছে তাদের মনে মেয়েটি

যদি সৌন্দর্যের পরশ বুলিয়ে দিতে সক্ষম হয়, মেয়েটি যদি তাদের স্বার্থপরতার ঊর্ধে তুলে ধরতে, আর অপরের দুঃখে তাদের চোখে জল আনাতে পারে তাহলে বুঝতে হবে সে তোমার ভালোবাসার যোগ্য—শুধু তুমি নয়, সারা পৃথিবী। তোমাদের এই বিয়ের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। প্রথমে এতটা আমি ভাবিনি; কিন্তু এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তোমার নির্বাচনের মধ্যে কোনো গলদ নেই। কেবল তোমার জন্যেই ভগবান সাইবিল ভেনকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ওকে বাদ দিলে তোমার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

তাঁর হাতের ওপরে চাপ দিয়ে ডোরিয়েন বললেনঃ ধন্যবাদ। আমি জানতাম যে তুমি আমাকে বুঝতে পারবে। হ্যারি বড়ো সিনিক। বিশ্বের কোনো ভালোই ওর চোখে পড়ে না। ওর কথা শুনলে আমি কেমন ভয় পেয়ে যাই। কিন্তু ওই অরকেস্ট্রা শুরু হয়েছে; বাপরে, বাপ; কী ভয়ঙ্কর শব্দ! তবে পাঁচ মিনিটের বেশি নয়; তারপরেই ওটা থেমে যাবে। তারপরেই যবনিকা উঠবে; স্টেজের ওপরে দেখতে পাবে সেই মেয়েটিকে যাকে আমার সমস্ত জীবন আর যৌবন সমর্পণ করতে যাচ্ছি; আমার মধ্যে যা কিছু ভালো আর সুন্দর রয়েছে যাকে আমি আগেই সব দিয়ে দিয়েছি।

মিনিট পনেরো পরে ঘন-ঘন করতালির মধ্যে সাইবিল ভেন স্টেজের ওপরে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ; কথাটা ঠিক। মেয়েটির বড়ো চমৎকার দেখতে; লর্ড হেনরির মনে হল এমন সুন্দর মেয়ে জীবনে তিনি খুব কমই দেখেছেন। তার সেই লাজুক ভঙ্গিমা আর চকিত চাহনির মধ্যে একটা মাদকতা রয়েছে। উৎসাহী দর্শকে পরিপূর্ণ প্রেক্ষগৃহের দিকে একবার তাকাতেই একটা মৃদু লজ্জার আভাস তার মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল; মনে হল, রুপোর আয়নার ওপরে একটা গোলাপ ফুলের ছায়া পড়েছে। সামনে থেকে কয়েক পা সে পিছিয়ে গেল, মনে হল তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। বেসিল হলওয়ার্ড দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিতে লাগলেন। তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন ডোরিয়েন গ্রে; মনে হল তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন। চশমার ভেতর দিয়ে তাকাতে-তাকাতে লর্ড হেনরি বলে উঠলেনঃ চমৎকার, চমৎকার!

দৃশ্যটা ছিল ক্যাপুলেত-এর বাড়ির বড়ো একখানা বসার ঘর। মারকুসিয়ো আর কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে দরবেশের পোশাক পরে রোমিয়ো সেখানে ঢুকল। স্টেজের পেছনে বাজনা বেজে উঠল, শুরু হল নাচ। একদল অতি সাধারণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নোংরা মলিন পোশাক পরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাঝখানে সাইবিল ভেন লোকান্তরের মানুষের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। জলের মধ্যে বেতস লতা যেমনভাবে দোলে নাচের তালে-তালে, তার দেহটাও সেইরকম দুলতে লাগল; কখনো সামনে, কখনো পেছনে। তার গলার আদলটা সাদা শালুকের গলার মতো বাঁকানো; মৃদু হিল্লোলে দুলতে লাগল। মনে হল, হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি হয়েছে তার হাত দুটি।

তবু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল সাইবিল। রোমিয়োকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েট-এর মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল সে রকম কোনো আনন্দ সাইবিলের চোখে-মুখে, চলনে-বলনে ফুটে উঠল না। কিছু কথা তাকে অবশ্য বলতে হল হে দরবেশ, হাত দুটির ওপরে তুমি যথেষ্ঠ অন্যায় করছ। এই হাত দুটি দিয়ে মানুষ তার মনের ভক্তি জানায়; কারণ, তাদের হাত দুটি সাধুদের হাত স্পর্শ করে—এবং তীর্থযাত্রা শেষ করে এসে তীর্থযাত্রীরা সেই হাত ভক্তিভরে চুম্বন করে।

এর পরেও কয়েকটি কথা তার বলার ছিল; সেগুলি-ও সে বলল; কিন্তু সেই বলার মধ্যে আবেগ দেখা গেল না—মনে হল সবটাই কৃত্রিম। কথাগুলি অপরূপ মিষ্টি; কিন্তু আবেগ প্রকাশের দিক থেকে সেগুলি ব্যর্থ, ব্যঞ্জনার দিক থেকে দ্যুতিহীন। কাব্যের সমস্ত মাধুর্যই নষ্ট হয়ে গেল তাতে,

অবাস্তব মনে হল জুলিয়েতের উচ্ছ্বাস।

তার অভিনয়ে এই জড়তা দেখে ডোরিয়েনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কেমন যেন মাথাটা গুলিয়ে গেল তাঁর; উদ্বেগে ভরে উঠল তাঁর মন। তাঁকে লক্ষ করে বন্ধুরাও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস করলেন না। তাঁদের মনে হল, জুলিয়েত-এর ভূমিকায় অভিনয় করার যোগ্যতা মেয়েটির নেই। নিরাশ হয়ে পড়লেন তাঁরা। এই রকম একটি অভিনয় দেখার জন্যে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না তাঁদের।

তবু তাঁরা ভাবলেন যে জুলিয়েত-এর শ্রেষ্ঠ অভিনয় হচ্ছে দ্বিতীয় অংকের "বারান্দার দৃশ্যে"। সেই দৃশ্যটি দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁরা। সেই দৃশ্যটি যদি সাইবিল জমিয়ে তুলতে না পারে তাহলে তাকে কোনোমতেই অভিনেত্রী বলা যেতে পারবে না।

চাঁদের আলোতে জুলিয়েত-এর বেশে সাইবিল যখন বেরিয়ে এল তখন তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেবিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না কিছু। কিন্তু তার অভিনয়ের জড়তা অসহ্য মনে হল। দৃশ্যটি যতই এগোতে লাগল ততই খারাপ হতে লাগল তার অভিনয়। তার চাল-চলন, হাত আর মুখ নাড়ার ভঙ্গিমা শুধু কৃত্রিমই হল না, হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল। সব কথাই অনাবশ্যক জোর দিয়ে সে বলতে শুরু করলঃ

তুমি জান আমার মুখের ওপরে রাত্রির—
ছায়া এসে নেমেছে; অন্যথায় কিশোরীর
কুমারী লজ্জা আমার মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়বে;
আজ রাত্রিতে আমার মুখ থেকে এই মাত্র তুমি যা শুনলে
তার পরে আমি আমার লজ্জা ঢাকব কেমন করে!

এমন সুন্দর কথাগুলি সে উচ্চারণ করল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে; মনে হল সে কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রী; একটি দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষকের কাছে আবৃত্তি করার শিক্ষা নিয়েছে। তারপরে সে বারান্দার ওপরে ঝুঁকে পড়ে বললঃ

যদিও তোমাকে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে
তবু আমি বলব, আজকের এই মিলনে আমার
কোনো আনন্দ নেই, রাত্রির এই মিলন হঠকারী,
যুক্তিহীন এবং অকস্মাৎ। এ-মিলন বিদ্যুতের মতো
চমকপ্রদ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ীঃ 'অন্ধকার দূর হল'
বলতে না বলতেই আবার তা অন্ধকারে হারিয়ে যায়।
প্রিয়তম, বিদায়;
আবার আমাদের যখন দেখা হবে তখন
এই বসন্তে প্রেমের যে কোরক অঙ্কুরিত হয়েছে
তা যেন ভালোবাসার তাজা ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।

প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার এই সংযত অথচ গভীর প্রেমোচ্ছ্বাস মাখা কথাগুলি গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেল সাইবিল; যেন কেবল বলার জন্যেই বলা; সেগুলি জুলিয়েত-এর নয়; সেগুলির মধ্যে প্রেমিকার হৃদয়-মাধুর্য নেই। দেখে মনে হল না, সে হঠাৎ ভয় পেয়ে নিজের ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে; দেখে মনে হল, সে আত্মস্থা, কী বলছে, কী করছে তা সে জানে। অভিনয়কলার দিক থেকে ব্যাপারটা কদর্য ছাড়া আর কিছু নয়। অভিনয় করার কোনো

যোগ্যতা তার নেই।

গ্যালারির দর্শক, এমন কি সস্তা দামের টিকিট কেটে নীচে যারা বসেছে সেই সব অশিক্ষিত মানুষরাও কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। নাটক জমছে না। কদর্য অভিনয়ের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল তারা, চেঁচামেচি করতে লাগল; দিতে লাগল শিস। ইহুদি ম্যানেজার এতক্ষণ সাজঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাপারটা দেখে রাগে গর-গর করতে-করতে সে পা ঠুকতে লাগল। এত গোলমাল আর হই-চই-এর মধ্যে যে মানুষটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে হচ্ছে সাইবিল নিজে। প্রেক্ষাগৃহের কোনো বিশৃঙ্খলাই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

দ্বিতীয় অংক শেষ হওয়ার পরে চারপাশ থেকে আবার হিস-হিস শব্দ উঠল। লর্ড হেনরি উঠে দাঁড়ালেন; তারপরে কোটটা কাঁধে ফেলে বললেন; মেয়েটি দেখতে সুন্দরী—সেদিকে থেকে তোমার সঙ্গে আমি একমত; কিন্তু ও অভিনয় করতে জানে না। এবার আমরা চলে যাই—এস।

ডোরিয়েন বললেন; শেষ পর্যন্ত আমি নাটকটা দেখব।

স্বটা তাঁর তিক্ত কর্কশ।

তোমাদের সন্ধেটা নষ্ট করে দিলাম বলে আমি খুব দুঃখিত, হ্যারি। তোমাদের দুজনের কাছেই আমি ক্ষমা চাইছি।

হলওয়ার্ড বাধা দিয়ে বললেনঃ আমার বিশ্বাস, মিস ভেন অসুস্থ। আর এক রাত্রিতে আসব আমরা।

ডোরিয়েন বললেনঃ ও অসুস্থ হলেই খুশি হব আমি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অভিনয়ে তার আজ মন নেই। ও সম্পূর্ণভাবে পালটিয়ে গিয়েছে। গত রাত্রিতে ও একজন উঁচু দরের অভিনেত্রী ছিল। আজ সে অতি সাধারণের পর্যায়ে।

ডোরিয়েন, যাকে তুমি ভালোবাস তার সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলো না; বলার চেয়ে ভালোবাসা অনেক উঁচু দরের।

লর্ড হেনরি বললেনঃ আঙ্গিকের দিক থেকে ও-দুটিই হচ্ছে অনুকরণের বিশেষ রূপ। কিন্তু চল। ডোরিয়েন, তোমারও এখানে ওর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত নয়। খারাপ অভিনয় দেখা নীতির দিক থেকে কারও উচিত নয়। তাছাড়া আমার ধারণা, তোমার স্ত্রী অভিনয় করুক এটা তুমি চাইবে না। সুতরাং কাঠপুতুলের মতো সে জুলিয়েতের অভিনয় করুক, বা না করুক, তাতে তোমার কি যায় আসে? মেয়েটি দেখতে বড়ো মিষ্টি। সুতরাং অভিনয়ের মতো জীবনের সম্বন্ধে-ও যদি তার জ্ঞানটা না থাকে, তাহলে তাকে নিয়ে নতুন-নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তুমি পাবে। সেই অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তোমাকে আনন্দ দেবে। পৃথিবীতে দু'জাতের মানুষ রয়েছে যারা সত্যিকারের আকর্ষণীয় ঃ একদল সব জানে, একদল কিছুই জানে না। হায় ভগবান, তুমি এতটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলে কেন? যৌবনের রহস্য কী জান? যৌবনের গোপন কথা হচ্ছে অশোভনীয় কোনো উচ্ছ্বাসকেই সে বরদাস্ত করে না। এস আমরা ক্লাবে যাই। সেখানে শ্যাম্পেন আর সিগারেট খেতে-খেতে সাইবিলের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করিগে চল। মেয়েটি সত্যিকারের সুন্দরী। আর কি চাও তুমি।

ডোরিয়েন একটু চিৎকার করেই বললেনঃ হ্যারি তুমি যাও। আমি একা থাকতে চাই। বেসিল, তোমাকেও যেতে হবে। আমার হৃদয় যে ভেঙে যাচ্ছে তা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

তাঁর চোখ দুটি গরম অশ্রুতে ভরে উঠল, কাঁপতে লাগল দুটি ঠোঁট; বকস-এর পেছনে দৌড়ে গিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে তিনি চোখ দুটিকে হাতের চেটো দিয়ে ঢেকে দিলেন।

স্বরটাকে অদ্ভুতভাবে নরম করে লর্ড হেনরি বললেনঃ এস বেসিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুজনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার মঞ্চের আলো জ্বলে উঠল; যবনিকা তোলা হল; শুরু হল তৃতীয় অঙ্ক। ডোরিয়েন তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। তাঁকে তখন বিবর্ণ দেখাচ্ছিল; কেবল বিবর্ণ নয়, গর্বিত; সেই সঙ্গে উদাসীন। গড়িয়ে-গড়িয়ে নাটক চলতে লাগল; সময় যেন আর কাটতে চায় না। হাসতে হাসতে ভারী বুট ঠুকতে-ঠুকতে প্রায় অর্ধেক দর্শক নাটক শেষ হবার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সব জিনিসটাই শেষ পর্যন্ত পরিণত হল প্রহসনে। শেষ অংক অভিনীত হল শূন্য ঘরে। শেষ পর্যন্ত অভিনয় শেষ হল; অসন্তোষের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

অভিনয় শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডোরিয়েন ছুটে সাজঘরে গিয়ে হাজির হলেন। বিজয়িনীর মতো সাইবিল একাই দাঁড়িয়েছিল। তার চোখের ওপরে একটা অপরূপ জ্যোতি ফুটে উঠেছিল। তার চারপাশে একটা আলোর দ্যুতি খেলা করছিল। তার ঠোঁট দুটি কী জানি একটা গভীর রহস্যে বিমুক্ত হয়ে হাসছিল।

ডোরিয়েন ঘরে ঢুকতেই সে তাঁর দিকে তাকাল, একটা বিপুল আনন্দ তাকে নাড়া দিয়ে গেল। সে বললঃ ডোরিয়েন, আজ আমি কি রকম খারাপ অভিনয় করলাম দেখেছ?

তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তিনি বললেনঃ ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর রকমের খারাপ অভিনয় আজ তুমি করেছ। তুমি কি অসুস্থ? কী রকম জঘন্য অভিনয় আজ তুমি করেছ সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তোমার নেই। সেই অভিনয় দেখে আমি কত কষ্ট পেয়েছি তা-ও তুমি জান না।

মেয়েটি হেসে বললঃ ডোরিয়েন, কেন আমি খারাপ অভিনয় করেছি তা তোমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু এখন তুমি বুঝতে পারছ তাই না?

তিনি রেগেই জিজ্ঞাসা করলেনঃ কী বুঝব?

আজ রাত্রিতে আমি এত খারাপ অভিনয় করলাম কেন? কেন আমি সব সময় খারাপ অভিনয় করব? কারণ আর আমি অভিনয় করব না।

কাঁধে একটা স্রাগ করলেন তিনি; বললেনঃ আমার ধারণা তোমার শরীর আজ ভালো নেই। অসুস্থ শরীর নিয়ে অভিনয় করতে আসাটা উচিত হয়নি তোমার। এইভাবে অভিনয় করে তুমি সকলের হাসির খোরাক জুগিয়েছ। আমার বন্ধুরা বিরক্ত হয়েছেন; বিরক্ত হয়েছি আমি।

মনে হল, এই সব কথা মেয়েটির কানে ঢুকল না; আনন্দে আবেগে সে তখন মাতোয়ারা। একটা অপরূপ আনন্দের উচ্ছ্বাস তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

তারপরে সে বললঃ ডোরিয়েন, তোমাকে জানার আগে অভিনয়টাই আমার জীবনে ছিল সত্য। এই থিয়েটারেই আমি বেঁচে ছিলেম। ভেবেছিলেম, এটাই পরম সত্য। এক রাত্রিতে

আমি রোজালিনড, আর এক রাত্রিতে পোর্শিয়া। পোর্শিয়ার আনন্দ, কোর্ডিলায়ার দুঃখ—সব আমার নিজস্ব। সবার উপরেই বিশ্বাস ছিল আমার। যারা আমার সঙ্গে অভিনয় করত সেই সব সাধারণ মানুষকে আমি দেবতার মতো মনে করতাম। স্টেজের চিত্রিত দৃশ্যগুলিই ছিল আমার জগৎ। ছায়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। সেইগুলিকেই আমি বাস্তব বলে মনে করতাম। তারপরে তুমি এলে—ভালোবাসলে আমাকে, মুক্ত করে আনলে ছায়ার কারাগার থেকে; বাস্তব কী জিনিস তুমি আমাকে তাই শেখালে। আজকের রাত্রিতেই—আমার জীবনে এই প্রথম—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে জীবনের মধ্যে দিয়ে আমি এতদিন কাটিয়েছি তা কতটা অন্তঃসারহীন, লজ্জাকর এবং ঘৃণ্য। আজকের রাত্রিতেই এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম রোমিয়ো কত ভয়ঙ্কর; কত বৃদ্ধ এবং প্রসাধনের আড়ালে যে মানুষটা লুকিয়ে রয়েছে তার দেহ কতটা কুৎসিত। আজকেই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম বাগানের এই চাঁদের আলো কত মিথ্যে, দৃশ্যটি কত কদর্য, এবং যে কথাগুলি আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেগুলি যে কেবল অবাস্তব তাই নয়, সেগুলি আমার মনের কথা নয়—সে কথাগুলি মন থেকে আমি বলতে চাইনি। তুমি আমার মধ্যে এমন একটা জিনিস এনে দিয়েছ যা অনেক উঁচু—যার কাছে সমস্ত কলাই প্রতিবিম্ব বিশেষ। ভালোবাসা কী তুমি আমাকে তা শিখিয়েছ। প্রিয়তম, তুমিই আমার রূপকথার রাজকুমার। ছায়ার পেছনে ঘুরে-ঘুরে আমি ক্লান্ত। বিশ্বের সমস্ত কলার চেয়ে আমার কাছে তোমার দাম অনেক বেশি। মঞ্চে সাক্ষীগোপালের অভিনয় করে কী লাভ হবে আমার? আজকে যখন আমি অভিনয় করতে এলাম তখন আমি বুঝতেই পারিনি কেমন করে আমার ভেতর থেকে পূর্বের সব আবেগ আর আকাঙ্ক্ষা নির্বাসিত হয়েছে। ভেবেছিলেম আমি অপরূপ অভিনয় করব; শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম যে কিছুই করার ক্ষমতা আমার নেই। এই পরিবর্তন বা অক্ষমতার কারণটা কী তা যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম। আবিষ্কারটি আমার কাছে নিঃসন্দেহে অপরূপ; কানের কাছে কেবলই সে গুনগুন করতে লাগল। আমি হাসলাম। আমাদের প্রেম যে কত গভীর তা তাছাড়া জানবে কেমন করে? আমাকে তুমি নিয়ে চল ডোরিয়েন, যেখানে আমরা দুজনে একলা থাকতে পারি এমন একটা জায়গায় আমাকে তুমি নিয়ে চল। রঙ্গমঞ্চকে আমি ঘৃণা করি। যে আবেগ আমাকে মাতায় না, এখানে আমি তারই একটা ব্যর্থ অনুকরণ করতে পারি মাত্র; কিন্তু যে আবেগ আমার মনের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে তাকে আমি অনুকরণ করতে পারিনে। ডোরিয়েন, ও ডোরিয়েন, এর অর্থ কী তা কি তুমি বুঝতে পারছ? প্রকাশ করতে পারলেও, স্টেজে অন্য লোকের সঙ্গে সত্যিকার প্রেমের অভিনয় করাটা আমার কাছে নিছক ব্যভিচার ছাড়া আর কিছু নয়। এই সহজ কথাটা বুঝতে শিখিয়েছ তুমি।

সোফার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ডোরিয়েন; তারপরে বিড়বিড় করে বললেন: আমার ভালোবাসাকে হত্যা করেছ তুমি।

তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সাইবিল; হাসল। কোনো উত্তর দিলেন না ডোরিয়েন। সাইবিল তাঁর কাছে এগিয়ে এসে তার ছোটো-ছোটো আঙুল দিয়ে তাঁর মাথার চুলগুলিকে আস্তে-আস্তে টানতে লাগল। হাঁটু মুড়ে বসে তাঁর আঙুলগুলি দিয়ে তার ঠোঁটের ওপরে ধরল চেপে। তিনি হাতটাকে টেনে নিলেন; তাঁর দেহটা কাঁপতে লাগল।

তারপরেই তিনি লাফিয়ে উঠে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে বললেন: হ্যাঁ সত্যি কথা, তুমি আমার প্রেমকে হত্যা করেছ। তুমি আমার কল্পনাকে উদ্বোধিত করেছিলে একদিন; আজ তুমি আমার মনে সামান্য কৌতূহল জাগাতেও অক্ষম হয়েছে। তুমি আমাকে আর নাড়া দিতে পারছ না। তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলেম কারণ তুমি ছিলে অপরূপা, কারণ তোমার ছিল প্রতিভা, ছিল ধীশক্তি, মহান কবিদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তোমার এবং কলার

যাকে আমরা ছায়া বলি তাকেই বাস্তবে রূপায়িত করতে তুমি পারতে—সেই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েও তুমি তাদের ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছ। তোমার গভীরতা নেই, মূর্খ তুমি! হায় ভগবান, কত ভালোই না তোমাকে আমি বেসেছিলেম! কী মূর্খই না আমি ছিলেম! এখন থেকে তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই আমার। আর তোমার মুখ আমি দেখব না। আর তোমার কথা আমি চিন্তা করব না। আর তোমার নাম আমি উচ্চারণ করব না। একদিন তুমি যে আমার কাছে কি ছিলে তা তুমি জান না। ওঃ, আমি আর ভাবতে পারছিনে। হায়রে, তোমার সঙ্গে আমার যদি কোনোদিন দেখা না হত! আমার জীবনের রোমান্স তুমি নষ্ট করে দিয়েছ। ভালোবাসা তোমার আর্টকে নষ্ট করে দেয় এই যদি তোমার মত হয় তাহলে বুঝতে হবে ভালোবাসা কাকে বলে তা তুমি জান না। আমি তোমাকে দিগ্বিজয়িনী করিয়ে আনতে পারতাম, তোমাকে বিশ্বের মানুষ পুজো করত এবং আমার স্ত্রী হিসাবে পরিচিতি পেতে তুমি, কিন্তু এখন তুমি কী? সুন্দর মুখধারিণী তৃতীয় শ্রেণির অভিনেত্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে গেল; কাঁপতে লাগল সে; নিজের দুটো হাত মুচড়াতে লাগল। গলার মধ্যে স্বরটা তার আটকে গেল যেন; সে বলল, ডোরিয়েন, তুমি সিরিয়াস নও। তুমি অভিনয় করছ।

তিনি তিক্তভাবে বললেন: অভিনয়! ওটা আমি তোমার জন্যে রেখে দিলাম। ওটা তুমি ভালোই কর।

সাইবিল উঠে দাঁড়াল; তারপর বিবর্ণ মুখে ডোরিয়েনের সামনে এসে হাজির হল; একটা হাত তাঁর হাতের ওপরে রেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

ডোরিয়েন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল সাইবিল: আমাকে তুমি ছোঁবে না?

একটা অস্পষ্ট কান্নায় ভেঙে পড়ল সাইবিল; ডোরিয়েনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। সেইখানে পায়ে মাড়ানো ফুলের মতো কিছুক্ষণ সে পড়ে রইল, তারপরে ফিস ফিস করে বলল: ডোরিয়েন, আমাকে পরিত্যাগ করো না। ভালো অভিনয় করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। অভিনয়ের সময় সারাটা ক্ষণই আমি তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম। কিন্তু আমি চেষ্টা করব—সত্যিই আমি চেষ্টা করব। তোমাকে ভালোবাসি বলেই হঠাৎ আমায় এই ভাবান্তর ঘটেছিল। যদি তুমি আমাকে চুমু না খেতে, যদি আমি তোমাকে চুমু না খেতাম, তাহলে আমরা যে দুজনে দুজনকে ভালোবাসি তা আমি বুঝতে পারতাম না। আমাকে আবার চুমু খাও। আমার কাছ থেকে চলে যেয়ো না। আমার ভাই...না না, সেকথা থাক। সত্যি সত্যিই কিছু করবে বলে সে একথা বলেনি, ঠাট্টা করেই বলেছিল...কিন্তু তুমি। আজকের মতো তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পার না? আমি ভালো অভিনয় করার জন্যে আবার চেষ্টা করব। পৃথিবীর মধ্যে তোমাকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি বলে আমার ওপরে নিষ্ঠুর হয়ো না তুমি। মোট কথা, মাত্র একবারই আমি তোমাকে খুশি করতে পারিনি। কিন্তু ডোরিয়েন, তুমিই ঠিক কথা বলেছ। আর্টিস্ট হিসাবেই নিজেকে আমার বেশ মনে করা উচিত ছিল। মূর্খের মতো কাজ করেছি আমি, না করে পারিনি বলেই করেছি। আমাকে তুমি ছেড়ে যেয়ো না, ছেড়ে যেয়ো না।

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল সাইবিল; ডোরিয়েন গভীর অনীহা নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, অপরূপ ঘৃণায় তাঁর কারুকার্যকরা ঠোঁট দুটি বিকৃত হল, ভালোবাসা নষ্ট হলে মানুষের সমস্ত উচ্ছ্বাসই কেমন যেন হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। সাইবিল ভেনকেও অদ্ভুত রকমের অতি নাটকীয় বলে মনে হল তাঁর। সাইবিলের ফোঁপানির শব্দ আর চোখের জল বিরক্ত করল তাঁকে।

শেষকালে পরিচ্ছন্ন স্বরে তিনি বললেন: আমি যাচ্ছি। আমি নিষ্ঠুর হতে চাই নে; কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। তুমি আমাকে নিরাশ করেছ।

মেয়েটি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল; কোনো উত্তর দিল না; কিন্তু তাঁর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। তার ছোটো-ছোটো হাত দুটি বিস্তারিত হয়ে অন্ধকারে কী যেন খুঁজতে লাগল, মনে হল তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি পিছন ফিরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই থিয়েটারের বাইরে গিয়ে পড়লেন।

কোথায় যা যাচ্ছিলেন তা তিনি নিজেও জানতেন না। মনে হল, আলো-আঁধারের ভেতর দিয়ে, স্বল্প আলোকোজ্জ্বল রাস্তার ওপর দিয়ে, কালো-কালো গম্বুজ আর ভূতুড়ে বিরাট-বিরাট প্রাসাদের পাশ দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। কর্কশভাবে হাসতে-হাসতে স্ত্রীলোকেরা তাঁকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। মদ খেয়ে মাতালগুলো হনুমানের মতো কিচকিচ করতে-করতে আর গালাগালি দিতে-দিতে রাস্তার ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কিম্ভুতকিমাকার চেহারার বাচ্চাদের রকের ওপরে বসে থাকতে তিনি দেখলেন; ভেতরের উঠোন থেকে অশ্লীল ভাষায় যে সব কথাবার্তা চলছিল সে-শব্দও শুনতে পেলেন তিনি।

ভোরের দিকে তিনি বুঝতে পারলেন কোভেনট গার্ডেন-এর খুব কাছে এসে পড়েছেন। অন্ধকার অপসারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা ফিকে আগুনে রঙ দেখা দিল; তারপরেই আকাশ মুক্তোর মতো হয়ে গেল। লিলি ফুলের বোঝা নিয়ে বড়ো-বড়ো গাড়িগুলি ফাঁকা রাস্তার ওপর দিয়ে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করতে-করতে এগিয়ে যেতে লাগল। ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। তাদের গন্ধে যন্ত্রণার কিছুটা উপসম হল তাঁর। বাজারের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি; বিরাট-বিরাট গাড়ি থেকে মাল খালাস করতে দেখলেন। সাদা পোশাক পরা একটি গাড়োয়াল তাঁকে কয়েকটা চেরি দিল। তিনি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন লোকটা তাঁর কাছ থেকে দাম নিল না কেন। সেই ফলগুলি নিয়ে অন্যমনস্কভাবে

তিনি খেতে লাগলেন। ফলগুলিকে মধ্যরাত্রিতেই তোলা হয়েছে; রাত্রির ঠান্ডা ফলগুলির ভেতরে ঢুকে সেগুলিকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে। একদল ছেলে টিউলিপ, বেগনে আর লাল গোলাপের টুকরি নিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে শাকসব্জির দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। সূর্যের আলোকে চকচকে বড়ো-বড়ো থাম দেওয়া গাড়িবারান্দার নীচে নিলাম ডাকা শেষ হওয়ার জন্যে একদল মেয়ে খোলা মাথায় অপেক্ষা করছে। আর সবাই পিয়াজার কফি-হাউসের ঠেলা দরজার কাছে কফি খাওয়া জন্যে ভিড় করেছে। বড়ো-বড়ো শকটগুলো ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। কয়েকটা গাড়োয়ান খালি বস্তার ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে; আবার রাস্তার ওপরে ছড়ানো খাবার খুঁটে খাওয়ার জন্যে পায়রার দল ঝাঁক বেঁধে উড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে একটা গাড়ি ডেকে বাড়িতে ফিরে এলেন তিনি। কিছুক্ষণ তিনি বন্ধ দরজার সামনেই পায়চারি করতে লাগলেন; সামনেই পার্ক; পার্কের চারপাশের বাড়িগুলি জানালা-দরজা বন্ধ করে তখনো ঘুমোচ্ছিল। সেইদিকে কয়েক মিনিট তিনি তাকিয়ে রইলেন।

ঘরের সামনেই বিরাট হলঘর। ওক-গাছের বিম দেওয়া তৈরি নীচের ছাদ থেকে ভেনিসের তৈরি বিরাট একটা বাতিদান ঝুলছিল। তার ভেতরে তিনটে বাতি তখনো জ্বলছিল মিটমিট করে। বাতিগুলিকে নিবিয়ে দিলেন তিনি; টুপি আর ঢিলে জামাটা টেবিলের ওপরে খুলে রেখে লাইব্রেরির মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর শোওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। নীচের তলার ঘরটি তাঁর বেশ বড়োই। জীবনে নতুন ভোগের আস্বাদ পেয়ে ঘরটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন তিনি। ঘরের দরজা খোলার সময় হঠাৎ বেসিলের তৈরি তাঁর সেই প্রতিকৃতিটির দিকে নজর পড়ে গেল। সেটি তাঁর ঘরের দরজার সামনেই দাঁড় করানো ছিল। প্রতিকৃতিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে একটু পিছু হটে গেলেন তিনি। একটু বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। কোটটা খুলে একটু ইতস্তত করলেন; তারপরে বেরিয়ে এলেন আবার; প্রতিকৃতির সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘি-রঙা মোটা সিল্কের পর্দা ভেদ করে যেটুকু আলো প্রতিকৃতিটির ওপরে এসে পড়েছিল সেই আলোতেই সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মনে হল কিছুটা যেন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রতিকৃতিটির আগেকার চাহনি আর নেই। মুখের ওপরে নিষ্ঠুরতার একটা ছাপ পড়েছে। ছাপটা স্পষ্ট; যে-কোনো লোকের চোখেই তা ধরা পড়ার কথা। নিশ্চয়, ওটা নিষ্ঠুরতার ছাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন, পর্দাটা দিলেন সরিয়ে। ভোরের উজ্জ্বল আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, ঘরের রহস্যময় অন্ধকার একপা<Hard copy issue> ছিটকে পড়ল। কিন্তু প্রতিকৃতিটির মুখের ওপরে যে অদ্ভুত ছাপটি তিনি প্রথমে লক্ষ করেছিলেন, আলোর জ্যোতিতেও তা অপসারিত হল না; মনে হল, সেটি আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আরশির সামনে দাঁড়ালে মানুষ যেমন তার মুখের প্রতিটি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে পায়, প্রভাতের আলোর দ্যুতিতেও সেই রকম পরিচ্ছন্নভাবে দেখতে পেলেন তিনি—প্রতিকৃতির মুখের ওপরে যে ছাপটা পড়েছে সেটা নিষ্ঠুরতার; মনে হচ্ছে, এইমাত্র সে কোনো পাপ করে এসেছে।

ভ্রুকুটি করলেন ডোরিয়েন। লর্ড হেনরি তাঁকে অনেক উপহার দিয়েছিলেন; তার মধ্যে একটা ছিল ডিম্বাকৃতি গ্লাস। তারই মসৃণ গায়ের ওপরে তিনি তাড়াতাড়ি নিজের মুখ দেখতে লাগলেন। না, তাঁর লাল ঠোঁট দুটির ওপরে তো কোনো চিহ্ন পড়েনি। তাহলে, এর অর্থ কী?

চোখ দুটো রগড়ে নিলেন তিনি? ছবিটির খুব কাছে এসে আবার পরীক্ষা করতে লাগলেন। ছবিটার ওপরে সত্যিকার কোনো দাগ পড়েনি, তবু মনে হচ্ছে ছবিটির মুখের চেহারাটা যেন

পালটিয়ে গিয়েছে। এটা তাঁর নিছক কল্পনা নয়। পরিবর্তনটা স্পষ্ট—ভীষণভাবে স্পষ্ট।

একটা চেয়ারের ওপরে বসে ভাবতে লাগলেন।

ছবিটা শেষ হওয়ার দিন বেসিলের স্টুডিয়োতে বসে একটা কথা বলেছিলেন। সেই কথাটা হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে রয়েছে তাঁর। তিনি একটি উন্মত্ত আশা পোষণ করেছিলেন। আশাটা হচ্ছে, তিনি চিরকাল তরুণ থাকবেন; বৃদ্ধ হোক ছবিটা। তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্য যেন নষ্ট না হয়; তাঁর সমস্ত পাপ আর উচ্ছ্বাসের ছাপ ওই ক্যানভাসের বুকে প্রতিফলিত হোক। তাঁর সমস্ত দুঃখ আর চিন্তার রেখায় জর্জরিত হোক ছবিটা। তিনি যৌবনের সমস্ত রসে চিরকাল সঞ্জীবিত থাকুন। নিশ্চয় তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। এ-আশা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর সামনের ওই ছবিটির মুখে নিষ্ঠুরতার ছাপ পড়ল কী করে?

নিষ্ঠুরতা! সত্যিই কি তিনি নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন? অপরাধ মেয়েটির; তাঁর নয়। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন মেয়েটি একজন বিরাট আর্টিস্ট, প্রতিভাময়ী ভেবেছিলেন বলেই তো তিনি তাকে ভালোবেসেছিলেন। সে তাঁকে নিরাশ করেছে। মেয়েটি সাধারণ; তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই। তবু মেয়েটি যে একটা শিশুর মতো তাঁর পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল—এই দৃশ্যটা মনে পড়তেই তিনি দুঃখ আর তীব্র অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন। তিনি যে কতটা নিরাসক্তভাবে সেই দৃশ্য দেখেছিলেন সেকথাটা তাঁর মনে পড়ে গেল। ভগবান তাঁকে কেন এমন করে সৃষ্টি করলেন? কেন তিনি তাঁকে ওই ধরনের আত্মা দিয়েছেন? কিন্তু তিনিও কম যন্ত্রণা ভোগ করেননি। অভিনয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনটি ঘণ্টা তাঁর মনে হয়েছিল তিনটি শতাব্দী; আর তাদের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাঁকে পাওয়া তো সাইবিলের পক্ষে কম পাওয়া ছিল না। তিনি তাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছেন এই কথাটা স্বীকার করে নিলেও তো অস্বীকার করা যায় না যে সেও তাঁকে মুহূর্তের জন্যে বিয়ে করেছিল। তাছাড়া, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা দুঃখভোগে বেশি অভ্যস্ত। প্রেমিকদের সঙ্গে কলহ করতেই মেয়েরা ভালোবাসে; একথা লর্ড হেনরি তাঁকে বলেছেন এবং মেয়েরা কী ধাতু দিয়ে গড়া তা লর্ড হেনরি ভালোভাবেই জানেন। সাইবিল ভেনের কথা চিন্তা করে তিনি এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন? এখন থেকে সাইবিল ভেন তাঁর কাছে কেউ নয়।

কিন্তু তাঁর ছবি? ওটার সম্বন্ধে কী বলার রয়েছে তাঁর? ওই ছবিটাতেই তো তাঁর জীবনের রহস্য লুকিয়ে রেখেছে; ওই ছবিটাই তাঁর জীবনের আলেখ্য। এই ছবিটাই তাঁকে তাঁর নিজের সৌন্দর্যকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। নিজের আত্মাকে ঘৃণা করতেও কি ওই ছবি তাঁকে শেখাবে? আবার কি তিনি ছবিটিকে দেখবেন?

না। যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তিনি কাটিয়েছেন তারই জন্যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে তাঁর। যে ভয়ানক রাত্রিটি তিনি অতিক্রম করে এসেছেন সেই রাত্রিটিই তাঁর পিছনে ভৌতিক ছায়াগুলিকে লেলিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ তাঁর মাথার মধ্যে এমন একটা দুশ্চিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছে সে দুশ্চিন্তা মানুষকে উন্মাদ করে দেয়। প্রতিকৃতিটির কোনো পরিবর্তন হয়নি; পরিবর্তন হয়েছে একথাটা ভাবাই তাঁর পক্ষে মূর্খতা হয়েছে।

তবু তার সুন্দর অথচ বিকৃত মুখ আর নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে ছবিটি তাঁকে লক্ষ করছে। প্রভাতের সূর্যরশ্মিতে তার উজ্জ্বল চুলগুলি চিকচিক করছে। তার নীল চোখ দুটির সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। তাঁর নিজের জন্যে নয়, তাঁর ওই প্রতিকৃতিটির জন্যে তাঁর একটা অদ্ভুত মায়া হল। ছবিটির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে; ভবিষ্যতে আরো দেখা দেবে। তার গোলাপী রঙটা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে তার লাল আর সাদা গোলাপগুলি। তিনি যে সব পাপ কাজ

করবেন তার প্রতিটি ছাপ ওই সুন্দর মুখের ওপরে পড়ে তাকে বিকৃত করবে। কিন্তু তিনি কোনো পাপ কাজ করবেন না। পরিবর্তন হোক আর নাই হোক, তাঁর বিবেকের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ছবিটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রলোভন তিনি এড়িয়ে চলবেন। লর্ড হেনরির সঙ্গে আর তিনি দেখা করবেন না; অন্তত, আর কোনোদিনই তাঁর কথায় কান দেবেন না। এবং এই কথাগুলিই বেসিল হলওয়ার্ডের বাগানে প্রথম তিনি তাঁর মুখ থেকে শুনেছিলেন; এবং এইগুলিই বিষাক্ত নীতির মতো তাঁর অসম্ভব বাসনা-কামনাগুলিকে নাড়া দিয়েছিল। তিনি সাইবিল ভেনের কাছেই ফিরে যাবেন, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তাকে বিয়ে করবেন, আবার তাকে ভালোবাসতে চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, এটাই তাঁর কর্তব্য হবে। তিনি যত কষ্ট ভোগ করেছেন তার চেয়ে সাইবিল নিশ্চয় অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছে। হতভাগ্য শিশু! স্বার্থপরের মতো তিনি তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। সাইবিলের ওপরে তাঁর যে আকর্ষণ জন্মেছিল সে-আকঙ্ক্ষণ আবার ফিরে আসবে। তাকে নিয়ে সুখী হবেন তিনি। তাকে বিয়ে করে তাঁর জীবন সুন্দর আর পবিত্র হয়ে উঠবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি; প্রতিকৃতির সামনে যে বিরাট পর্দাটা ঝুলছিল সেটাকে একপাশে টেনে দিলেন, তার দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠলেন। "কী ভয়ঙ্কর!"—বিড়বিড় করে বলতে-বলতে তিনি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলেন। ঘাসের ওপরে বেরিয়ে এসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস তাঁর মনের সমস্ত অবসাদ দূর করে দিল। কেবল সাইবিলের কথাই তিনি ভাবতে লাগলেন। ভালোবাসার একটা ক্ষীণ রশ্মি আবার তাঁর চোখে পড়ল। সাইবিলের নাম তিনি বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন। শিশিরভেজা বাগানের মধ্যে পাখিরা যে গান গাইছিল সেই গান সাইবিলের কথাই তাঁকে শোনাচ্ছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তাঁর ঘুম যখন ভাঙল তখন দুপুর অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে। তিনি জেগেছেন নাকি জানার জন্যে তাঁর চাকর অনেকবারই নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে; তার যুবক মনিব এত ঘুমোচ্ছেন কেন বুঝতে না পেরে অবাক হয়েছে যথারীতি। শেষ পর্যন্ত একসময় তাঁর ঘুম ভাঙল; তিনি বেল বাজালেন। ভিকটর এক কাপ চা আর পুরনো চিনেমাটির ট্রে-তে করে একগাদা চিঠি নিয়ে ধীরে-ধীরে ঘরে এসে ঢুকল; তিনটি জানালার ওপরে যে ওলিভ-সাটিনের পর্দাগুলি ঝুলছিল সেগুলি সে টেনে একপাশে সরিয়ে দিল।

ভিকটর হেসে বলল: মঁসিয়ে আজ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।

ঘুমচোখে ডোরিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন: কটা বেজেছে, ভিকটর?

সওয়া একটা মঁসিয়ে।

সত্যিই বড়ো দেরি হয়েছে। উঠে বসলেন তিনি; চা খেয়ে তিনি চিঠিগুলি টেনে নিলেন। একটা চিঠি এসেছে লর্ড হেনরির কাছ থেকে। সেদিনই সকালে একটি পত্রবাহক এসে সেটি দিয়ে গিয়েছে। খুলবেন কি খুলবেন না—একটু ইতস্তত করে তিনি সেটিকে সরিয়ে রাখলেন। অন্যগুলিকে তিনি খুললেন বটে কিন্তু পড়ার আগ্রহ তাঁর একেবারে ছিল না। চিঠিগুলির মধ্যে ছিল কার্ড, ডিনারের নিমন্ত্রণ, সিনেমা, কনসার্টের টিকিট; এই সময়টা লন্ডনের কর্মহীন ফ্যাশানেবল যুবকদের কাছে এই জাতীয় চিঠিপত্র প্রায়ই আসে। একটা অনেক টাকা দামের বিল-ও এসেছিল। তিনি একটা রুপোর লুই কুইনজ টয়লেট সেট কিনেছিলেন। এই কথাটা তখনো পর্যন্ত তিনি তাঁর অভিভাবকদের জানাতে সাহস করেননি। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর অভিভাবক একেবারে সেকেলে। তিনি কিছুতেই বুঝতে চান না আধুনিক যুগে আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসের। জারমিন স্ট্রিটের উত্তমর্ণদের কাছ থেকে চিঠিও এসেছিল অনেকগুলি। তারা বেশ বিনীতভাবে জানিয়েছিল যে এক মিনিটের নোটিশে এবং সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত অথবা নামমাত্র সুদ নিয়ে তারা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পাবে। ঘুম থেকে ওঠার প্রায় মিনিট দশেক পরে, সিল্কের পাড় বসানো দামি একটা বড়ো কাশ্মীরি উলের তৈরি ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে তিনি স্নানের ঘরে ঢুকলেন। দীর্ঘ নিদ্রার পরে ঠান্ডা জল তাঁর অবসাদ অনেকটা দূর করে দিল। আগের দিন রাত্রি থেকে যে সব যন্ত্রণা আর হতাশার মধ্যে দিয়ে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল, স্নানের পরে সে সমস্ত তাঁর মন থেকে মুছে গেল। দু'একবার অবশ্য বিয়োগান্ত নাটকের অদ্ভুত স্মৃতিগুলি তাঁর মনের কোণে উঁকি দেয়নি সেকথা সত্যি নয়; কিন্তু তাঁর মনে হল সেগুলি সব স্বপ্ন, তাদের মধ্যে বাস্তবের কোনো ছোঁয়াচ নেই।

স্নান সেরে তিনি লাইব্রেরিতে গেলেন। এই ঘরেই খোলা জানালার ধারে ছোটো একটি টেবিলের ওপরে তাঁর জন্যে অল্প পরিমান ফ্রেঞ্চ ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছিল। সেই টেবিলের পাশে গিয়ে তিনি বসলেন। দিনটি বড়ো চমৎকার। মনে হল, গরম বাতাসের মধ্যে সুগন্ধি মশলার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। গুনগুন করতে-করতে একটা মৌমাছি ঘরের মধ্যে ঢুকে এল; তাঁর সামনে নীল ভেস-এর মধ্যে রাখা বেগনে গোলাপ ফুলের চারপাশে ঘুরতে লাগল। আর তাঁর কোনো দুঃখ নেই। মন তাঁর আনন্দে ভরে উঠেছে।

প্রতিকৃতির সামনে যে পর্দা ঝোলানো ছিল হঠাৎ তাঁর চোখ দুটো তার ওপরে গিয়ে পড়ল। চমকে উঠলেন তিনি।

টেবিলের ওপরে একটা ওমলেটের প্লেট দিয়ে তাঁর পরিচারক জিজ্ঞাসা করল: খুব ঠান্ডা লাগছে, মঁসিয়ে? জানালাটা বন্ধ করে দেব?

মাথা নাড়লেন ডোরিয়েন; বললেন: না, না, ঠান্ডা লাগছে না।

ব্যাপারটা কি সত্যি? সত্যিই কি প্রতিকৃতিটার ওপরে পরিবর্তন দেখা দেয়েছে? প্রতিকৃতিটির মুখের যে জায়গাটায় আগে আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠেছিল সেইখানে একটা কলঙ্কের রেখা দেখা দিয়েছে। এটা কি সত্যি, না, তাঁর মতিভ্রম? ক্যানভাসে আঁকা চেহারার মধ্যে নিশ্চয় কোনো পরিবর্তন দেখা দিতে পারে না। ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব ঘটনা। বেসিলকে তিনি গল্প বলার ছলে এ-কাহিনি একদিন বলতে পারেন। গল্প শুনে নিশ্চয় তিনি হাসবেন।

কিন্তু তবু কত স্পষ্টই না তাঁর সব মনে রয়েছে। প্রথমে প্রত্যুষের অস্পষ্ট আলোতে তারপরে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোতে ওই ছবিটির ঠোঁটের ওপরে নিষ্ঠুরতার একটি বাঁকা ভ্রূভঙ্গি তিনি দেখেছেন। তাঁর পরিচারক ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে ঘরে একা থাকলেই ওই প্রতিকৃতিটিকে পরীক্ষা করার জন্যে আবার তাঁকে উঠতে হবে। পরীক্ষা করতে তাঁর আপত্তি নেই; কিন্তু সেই নির্মম ব্যঙ্গের ছায়াটি যে তিনি দেখতে পাবেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না তাঁর। কফি আর সিগারেট দিয়ে লোকটি যখন চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল তখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না যাওয়ার জন্যে তাকে অনুরোধ জানানোর একটা উদগ্র কামনা জাগল তাঁর। লোকটি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজানোর সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাকে ডাকলেন। তাঁর নির্দেশ কী শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল লোকটি। ডোরিয়েন তার দিকে একটু তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন: কেউ এলে বলে দিয়ো আমি বাড়িতে নেই।

মাথাটা একটু নুইয়ে বেরিয়ে গেল লোকটি।

তারপরে তিনি উঠলেন, একটা সিগারেট ধরালেন, পর্দার দিকে মুখ করে যে ভালো গদি দিয়ে মোড়া সোফাটি পাতা ছিল তার ওপরে বসে পড়লেন। পর্দাটা পুরনো, স্পেনদেশীয় চামড়া দিয়ে তৈরি; তার ওপরে লুই কোয়টজ জাতীয় চকচকে স্ফটিক মণির নক্সা কাটা। বিশেষ কৌতূহল নিয়ে তিনি পরীক্ষা করলেন সেটিকে। সত্যিই কি মানুষের হৃদয়ের গোপন কোনো রহস্য এর আগে কোনোদিন সে লুকিয়ে রেখেছে?

যাই হোক, এটাকে কি তিনি সরিয়ে রাখবেন? কী দরকার? ওখানেই থাক না। ও-কথা জেনে লাভ কী? ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয় তাহলে নিশ্চয় তা ভয়ানক; যদি সত্যি না হয়, তাহলে বিষয়টা নিয়ে এত চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আর কারো চোখে যদি হঠাৎ এই পরিবর্তনটি ধরা পড়ে? বেসিল হলওয়ার্ড এসে যদি এই ছবিটির দিকে তাঁকে তাকিয়ে দেখতে বলেন তাহলে তিনি কী করবেন? বেসিল সেকথা যে তাঁকে বলবেন সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। না; জিনিসটাকে ভালো করে দেখতে হবে, এবং এখনই। এই ভয়ঙ্কর সন্দেহ মনের মধ্যে পুষে রাখার চেয়ে অন্য যে কোনো কাজ করা ভালো।

এই ভেবে তিনি উঠে পড়লেন; বন্ধ করে দিলেন দুটি দরজা। এই লজ্জার কালিমা একমাত্র তিনি নিজেই দেখবেন। তারপরে তিনি পর্দাটাকে সরিয়ে দিলেন, প্রতিকৃতিটির মুখোমুখি দাঁড়ালেন। না, ব্যাপারটা সত্যি—যাকে বলে নির্ভেজাল। প্রতিকৃতিটির চেহারায় পরিবর্তন এসেছে।

ভবিষ্যতে ঘটনাটিকে নিয়ে মনে-মনে তিনি অনেকবারই আলোচনা করেছেন এবং আলোচনা করতে-করতে কম অবাক হননি। প্রথমে ছবিটির দিকে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়েই তাকিয়ে ছিলেন। এইরকম একটা পরিবর্তন যে ঘটতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু তবু ঘটনাটা সত্যি। রাসায়নিক অণু-পরমাণুগুলির মধ্যে কি চোখে দেখা যায় না এমন কোনো সংযোগ রয়েছে? তার তারই ফলে কি ক্যানভাসের ওপরে প্রতিকৃতির অবয়ব, রঙ, আর তার আত্মাটি প্রতিফলিত হয়? এটা কি সম্ভব যে সেই আত্মা যা চিন্তা করে সেইটাই পরমাণুগুলি বাইরে প্রকাশ করে? সেই আত্মা যা স্বপ্ন দেখে সেইটাকেই তারা পরিণত করে সত্যে? অথবা, এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে এবং সে কারণগুলি ভয়ঙ্কর? ভাবতে-ভাবতে তিনি ভয়ে কেঁপে উঠলেন; তারপরে, সোফার ওপরে ফিরে গিয়ে তিনি বিহ্বল নেত্রে ছবিটির দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ।

একটি জিনিস অবশ্য ছবিটি তাঁর কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। সেটা সাইবিল ভেনের ওপরে তিনি কী অত্যাচার করেছেন, তার সঙ্গে কত নির্মম ব্যবহার করেছেন সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। এই অন্যায়ের প্রতিকার করার সময় যায়নি এখনো। সাইবিল তাঁর স্ত্রী হতে পারে। তাঁর এই অবাস্তব আর স্বার্থপরের মতো ভালোবাসা কোনো মহৎ আদর্শের কাছে মাথা নীচু করবে; বেসিল হলওয়ার্ড তাঁর যে প্রতিকৃতিটি তৈরি করেছেন সেটি ভবিষ্যতে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে; সন্মার্গ বলতে কিছু লোকে যা বোঝে, বিবেক বলতে কিছু লোকের কাছে যা মনে হয় এবং ভগবৎ-ভীতি বলতে সকলের কাছে যা প্রতীয়মান, ছবিটিকে সেইভাবে মেনে নিয়ে তিনি চলার পথে এগিয়ে যাবেন। অনুশোচনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আফিঙ রয়েছে, নৈতিক প্রবৃত্তিগুলিকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে রয়েছে ওষুধ। কিন্তু পাপের জন্যে তাঁর যে অধঃপতন ঘটেছে তা এখানে স্পষ্ট। তিনি যে তাঁর আত্মাটিকে ধ্বংস করে ফেলেছেন তারই চির ভাস্বর নিদর্শন এইখানে জলজ্বল করে জ্বলছে।

তিনটে বাজল, চারটে বাজল; সাড়ে চারটে বাজার দ্বৈত সংকেত শোনা গেল ঘড়িতে। কিন্তু একইভাবে বসে রইলেন গ্রে। বসে বসে জীবনের পীতাভ-লালচে সুতোগুলিকে একসঙ্গে গুটিয়ে তিনি একটি নতুন প্যাটার্ন তৈরি করছিলেন। আশা আর আবেগের যে অন্ধ গলির মধ্যে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তারই মধ্যে থেকে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এর পরে কী তিনি করবেন সে সম্বন্ধে কিছুই তিনি ভেবে পেলেন না। ভাবতে-ভাবতে তিনি টেবিলের ধারে উঠে গেলেন; যে-মেয়েটিকে তিনি ভালোবাসতেন তাকে উদ্দেশ্য করে একটি দীর্ঘ আবেগমাখা প্রেমপত্র লিখলেন; তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালেন যে সেদিন তিনি তার সঙ্গে অপ্রকৃতিস্থের মতো ব্যবহার করছেন। দুঃখ, যন্ত্রণা, আর অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দিয়ে তিনি পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুললেন। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত চিঠিটি আত্ম-তিরস্কারে ভরাট হয়ে গেল। নিজেরাই যখন আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলি তখন আমরা ভাবি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আর কারো অধিকার নেই। পাদরী নয়, এই স্বীকারোক্তিই আমাদের মুক্তি দেয়। চিঠিটি শেষ করার পরে ডোরিয়েন সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন তিনি যে অন্যায় করেছেন সেই অন্যায়ের প্রতিকার সুসম্পন্ন হয়েছে।

হঠাৎ দরজায় একটা টোকা পড়ল; বাইরে থেকে লর্ড হেনরির কথা শোনা গেল: ডোরিয়েন, তোমার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে। দরজা খোল। এইভাবে দরজা বন্ধ করে তুমি বসে থাকবে এটা আমি সহ্য করতে পারব না।

প্রথমে কোনো উত্তর দিলেন না তিনি; চুপচাপ বসে রইলেন। দরজার ওপরে ধাক্কার পর ধাক্কা পড়তে লাগল; ঠিক, ঠিক—তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়াই ভালো। তিনি যে নতুন জীবনের

পরিকল্পনা করেছেন সেটা তাঁকে খুলে বলতে হবে; তিনি যদি তার বিরোধিতা করেন তাহলে প্রয়োজনবোধ কলহের আসরেও নামতে হবে তাঁকে; আর সেই কলহের ফলে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ যদি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেই বিচ্ছেদকেও তাঁকে মেনে নিতে হবে। এই ভেবে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং তাড়াতাড়ি পর্দাটি ছবির সামনে টেনে দিয়ে তিনি দরজাটা খুলে দিলেন।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে লর্ড হেনরি বললেন: যা ঘটেছে তার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, ডোরিয়েন; কিন্তু ও-সম্বন্ধে বেশি কিছু চিন্তা করো না তুমি।

ডোরিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি সাইবিল ভেনের কথা বলছ?

চেয়ারের ওপরে বসে ধীরে-ধীরে হাতের দস্তানাগুলি খুলতে-খুলতে লর্ড হেনরি বললেন: হ্যাঁ, নিশ্চয়। একদিন থেকে ঘটনাটা ভয়ঙ্কর, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার জন্যে তুমি দায়ী নও। বল দেখি, অভিনয় শেষ হওয়ার পরে তুমি কি নীচে নেমে তার সঙ্গে দেখা করেছিলে?

করেছিলাম।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। তার সঙ্গে কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি তোমার হয়েছিল?

আমি খুব নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করেছিলেম হ্যারি—পশুর মতো ব্যবহার করেছিলেম। কিন্তু সে সব এখন মিটে গিয়েছে। যা ঘটে গিয়েছে তার জন্যে আমি দুঃখিত নই। এই ঘটনার মাধ্যমে নিজেকে আমি ভালো করে বোঝার সুযোগ পেয়েছি।

বাঁচালে ডোরিয়েন। গোটা ব্যাপারটাকেই তুমি যে এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে পেরেছ এতেই আমি খুশি হয়েছি। তুমি হয়তো গভীর অনুশোচনায় ডুবে নিজের মাথার সুন্দর চুলগুলি ছিঁড়ছ এই ভেবে আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেম।

মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে এবং একটু হেসে ডোরিয়েন বললেন: সে অবস্থা আমি পেরিয়ে এসেছি। এখন আমি খুশি। প্রথম কথাটা হচ্ছে, বিবেক বলতে কী বোঝায় তা আমি বুঝতে পেরেছি; তুমি আমাকে যেভাবে বুঝিয়েছিলে বিবেক তা নয়; আমাদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে বিবেক হচ্ছে তাদের সকলের চেয়ে স্বর্গীয়। নাক সিঁটকিয়ো না, হ্যারি; অন্তত আমার কাছে না; আমি ভালো হতে চাই; আমার আত্মা ভয়ঙ্কর হবে, বিকৃত হবে তা আমি সহ্য করতে পারব না।

নীতির ভিত্তি হিসাবে তোমার কথাটি কেবল মনোরমই নয়, সত্যিকার কলাবিদের মতো ডোরিয়েন। এই কথা বলার জন্যে তোমাকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কিন্তু শুরু করবে কোথায়?

সাইবিল ভেনকে বিয়ে করে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন লর্ড হেনরি; হতভম্বের দৃষ্টি তাকিয়ে তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন: কী, কী বললে? সাইবিল ভেনকে বিয়ে করে! কিন্তু প্রিয় ডোরিয়েন...

হ্যাঁ, হ্যারি; এর পরে তুমি কী বলবে তা আমি জানি। বিয়ের বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোনো ভয়ঙ্কর কথা। না, না, ওসব কথা বলো না। আমার কাছে আর কোনোদিন বিয়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার

করো না তুমি। দু'দিন আগে সাইবিলকে বলেছিলেম আমাকে বিয়ে করতে। সে কথা ভাঙতে আমি রাজি নই। সেই আমার স্ত্রী হবে।

তোমার স্ত্রী হবে! ডোরিয়েন...তুমি কি আজ সকালে আমার চিঠি পাওনি? নিজের হাতে সেই চিঠি আমি তোমার বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি।

তোমার চিঠি! হ্যাঁ, হ্যাঁ; মনে পড়ছে বটে। আমি সেটা এখনো পড়িনি। ভয় হচ্ছিল হয়তো সেই চিঠিতে এমন কিছু রয়েছে যা আমার পড়ে ভালো লাগবে না। তোমার বক্রোক্তিগুলি একটা আস্তো জীবনকে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলে।

তাহলে তুমি কিছুই জান না?

কী বলছ তুমি?

লর্ড হেনরি ঘরের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ডোরিয়েন গ্রে-র পাশে গিয়ে বসলেন; তারপরে তাঁর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে শক্ত করে ধরে বললেন: ডোরিয়েন, ভয় পেয়ো না; আমার চিঠিতে লেখা ছিল সাইবিল ভেন মারা গিয়েছে।

যন্ত্রণার একটা তীব্র আর্তনাদ ডোরিয়েনের ঠোঁটের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল; চট করে দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি; লর্ড হেনরির মুঠো থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন—মারা গিয়েছে! সাইবিল আর নেই! না, এ সত্যি নয়; এ একটা জঘন্য মিথ্যা কথা। একথা বলতে তোমার সাহস হল কেমন করে?

লর্ড হেনরি গম্ভীরভাবে বললেন: কথাটা সত্যি, ডোরিয়েন। সকালের কাগজেই এই সংবাদটা বেরিয়েছে। আমার সঙ্গে দেখা করার আগে আর কারো সঙ্গে তুমি দেখা করো না—বিশেষ করে এই কথাটাই সেখানে লেখা ছিল এবং অবশ্যই একটা অনুসন্ধান এর হবে—যাকে বলে ময়না তদন্ত; সেই তদন্তের সঙ্গে তোমার জড়িয়ে পড়া চলবে না। এই রকম ব্যাপার ফ্রান্সে মানুষকে ফ্যাশানেবল করে তোলে, কিন্তু লন্ডনে সাধারণ লোকেরা ছি-ছি করে। দুর্নাম রটনা হতে পারে এমন কোনো কাজকেই এখানে আমাদের প্রচারযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিচারণার সঙ্গে ওগুলিকে সঞ্চয় করে রাখা উচিত। আমার মনে হয়, থিয়েটার কেউ তোমার নাম জানে না। যদি না জেনে থাকে তো ভালোই। তার ঘরের দিকে যেতে কেউ কি তোমাকে দেখেছিল? এইটিই একটা জরুরি জিনিস।

কয়েক মিনিট কোনো কথা বললেন না ডোরিয়েন; মনে হল, হতভম্ব হয়ে পড়েছেন তিনি; তাঁর চোখ আর মুখের ওপরে ভয়ের একটা ছায়া পড়েছে। অবশেষে রুদ্ধ কন্ঠের ভেতর থেকে একটা জড়ানো, অস্পষ্ট স্বর বেরিয়ে এল তাঁর: ও, হ্যারি, ময়না তদন্তের কথা তুমি বলবে না? কেন ময়না তদন্ত? সাইবিল কি তাহলে...ও, হ্যারি, আমি সহ্য করতে পারছিনে। তাড়াতাড়ি; কী ঘটেছে সব আমাকে তাড়াতাড়ি বল।

ডোরিয়েন, আমার ধারণা ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা নয়; যদিও সেইভাবেই বাইরের লোকের কাছে ঘটনাটা সাজাতে হবে। মনে হচ্ছে রাত্রি সাড়ে বারোটা অথবা তারই কাছাকাছি কোনো এক সময়ে তার মা যখন তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে থিয়েটারে এসেছিলেন সেই সময় কিছু একটা জিনিস আনার জন্যে সাইবিল দোতলায় যায়। জিনিসটা নাকি ভুলে সে সেখানে ফেলে এসেছিল। কিছুক্ষণ তাঁরা নীচে অপেক্ষা করেছিলেন; কিন্তু সাইবিল আর নীচে নামেনি। খুঁজতে-খুঁজতে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সাজঘরের মেঝের ওপরে তার মৃতদেহটিকে পড়ে

থাকতে দেখেন। ভুল করে বিষ জাতীয় কিছু একটা সে খেয়ে ফেলেছিল। ওই জাতীয় কিছু জিনিস থিয়েটারের কাজে লাগে। ঠিক জানিনে বস্তুটি কী; হয়তো প্রুশিক অ্যাসিড; শ্বেত পারা-ও হতে পারে।আমার বিশ্বাস প্রুশিক অ্যাসিড-ই হবে; কারণ, খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছিল।

চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন ডোরিয়েন: হ্যারি, হ্যারি, ভয়ঙ্কর এই সংবাদ!

হ্যাঁ, ঘটনাটা অবশ্যই বড়ো করুণ। কিন্তু এর সঙ্গে তোমার জড়িয়ে পড়লে চলবে না। স্ট্যান্ডার্ড কাগজ পড়ে বুঝলাম মেয়েটির বয়স সতের। আরো কম বয়স বলেই মনে হয়েছিল আমার। দেখতে মেয়েটি ছিল বাচ্চা; আর অভিনয় করতে সে কিছুই জানত না। ডোরিয়েন, এটা নিয়ে তুমি বেশি ভেবো না। তুমি আমার সঙ্গে চল; রাত্রির খাওয়াটা আমরা দুজনে একসঙ্গে সারব; তারপরে আমরা অপেরাতে যাব। আজকে পার্টির সম্মানার্থে সেখানে অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। গণ্যমান্য সবাইকেই সেখানে তুমি দেখতে পাবে। আমার বোনের আসনে তুমি বসবে; তার সঙ্গে কিছু অভিজাত ঘরণী রয়েছে। তার টিকিট পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।

অনেকা নিজের মনে-মনে বিড়বিড় করতে-করতে ডোরিয়েন গ্রে বললেন: সুতরাং সাইবিল ভেনকে আমি খুন করলাম। তার ছোটো কণ্ঠটি ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মতন করেই তাকে আমি হত্যা করে ফেললাম। তবুও গোলাপ ফুলকে এখনো আমরা কম ভালোবাসছিনে। আমার বাগানে পাখিরা এখনো সেই আগের মতোই মিষ্টি সুরে গান করছে এবং আজ রাত্রিতে তোমরা সঙ্গে আমি ডিনার খেতে চলেছি, সেখান থেকে যাব অপেরাতে; অপেরা ভাঙলে আর কোনো জায়গায় খেতে যাব। জীবন কি অসম্ভব রকমেরই না নাটকীয়। হ্যারি, এই কাহিনি কোনো বই-এ পড়লে নিশ্চয় আমি কাঁদতাম। যে-কোনো কারণেই হোক ঘটনাটি সত্যি-সত্যি ঘটেছে বলেই, অথবা, আমাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে বলেই হয়তো চোখের জল ফেলার চেয়েও অনেক বেশি চমৎকার বলে মনে হচ্ছে। জীবনে এই প্রথম আমি একটি উচ্ছল প্রেমপত্র লিখেছিলাম। সত্যিই এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমার প্রথম প্রেমপত্র একটি মৃতা প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। আমি অবাক হয়ে ভাবি, ওই শ্বেত পোশাক পরা মানুষগুলি, যাদের আমরা মৃত বলি, তাদের কি অনুভব করার শক্তি রয়েছে? সাইবিল সে কি অনুভব করতে পারে, জানতে পারে, শুনতে পায়? হায় হ্যারি, তাকে আমি কত ভালবাসতাম! মনে হচ্ছে সে যেন কত বছর আগেকার কথা। আমার সমস্ত মন আর প্রাণ জুড়ে বসেছিল সে। তারপরে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটি হাজির হল। সেটই কি সত্যিই গত রাত্রি? সে খারাপ অভিনয় করল; সেই দেখে আমার হৃদয় গেল ভেঙে। খারাপ অভিনয় সে কেন করেছিল সে-কথা সে আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল। কী করুণ সেই দৃশ্য! কিন্তু আমার হৃদয় তাতে একবিন্দু-ও গলেনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম অভিনয় করার ক্ষমতা তার নেই। অকস্মাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কী যে ঘটল তা ঠিক জানি নে; কিন্তু এটা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি যে সেটি ভয়ঙ্কর। আমি বললাম তার কাছে আমি ফিরে যাব। আমি বুঝতে পারলাম তার ওপরে আমি অন্যায় করেছি এবং এখন সে মৃতা। ভগবান, এখন আমি কী করব? তুমি জান না কী বিপদে আমি পড়েছি। নিজেকে শক্তি করে ধরে রাখার মতো অন্য কোনো অবলম্বন্ আমার নেই। আমাকে একমাত্র সেই ধরে রাখতে পারত। আত্মহত্যা করার কোনো অধিকার তার ছিল না। সে নিতান্ত স্বার্থপরের মতো কাজ করেছে।

সিগারেটের বক্স থেকে একটা সিগারেট বার করলেন লর্ড হেনরি, সোনালি দেশলাই-এর খোল থেকে কাঠি বের করে সেটি ধরালেন, তারপরে বললেন: প্রিয় ডোরিয়েন, পুরুষকে সৎপথে আনার একটি কৌশলই নারীদের জানা রয়েছে; সেটি হচ্ছে তাদের তিতিবিরক্ত করে

তোলা; তাতেই বাঁচার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পুরুষদের নষ্ট হয়ে যায়। এই মেয়েটিকে বিয়ে করলে নিজেকে তুমি হতভাগ্য বলে মনে করতে। অবশ্য তার সঙ্গে তুমি সদয় ব্যবহার করতে পারতে। কিন্তু কার সঙ্গে মানুষ সদয় ব্যবহার করে জান? যার ওপরে তার বিন্দুমাত্র দরদ নেই। কিন্তু মেয়েটির বুঝতে দেরি হত না যে তুমি তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। কোনো মহিলা যদি বুঝতে পারে যে তার স্বামী তার প্রতি উদাসীন তাহলে সে কী করে বল তো? হয় সে ভয়ঙ্কর রকমের কদর্য হয়ে যায়, নতুবা, সে এমন জাঁকালো পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায় যার খরচ অন্য মহিলাদের স্বামীদের যোগান দিতে হয়। সামাজিক ভুলভ্রান্তিগুলির কথা আমি অবশ্য এখানে তুলছিনে—কারণগুলি মানুষের নীচতা প্রকাশ করে, এবং ওগুলিকে কোনোদিনই আমি ক্ষমার চোখে দেখতে পারিনে; কিন্তু একটা বিষয়ে আমি তোমাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি যে বিয়ে করলে তোমার সারা জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যেত।

ঘরের মধ্যে বিবর্ণ মুখে পায়চারি করতে-করতে ডোরিয়েন বললেন: সম্ভবত, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু ভেবেছিলেম এটাই আমার কর্তব্য। এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু যে আমার সেই কর্তব্যের পথে বাধার সৃষ্টি করল তার জন্যে আমার কোনো অপরাধ নেই। আমার মনে রয়েছে তুমি একবার বলেছিলে সমস্ত সৎ পরিকল্পনার মধ্যেই কোথায় যেন ধ্বংসের একটা উপকরণ লুকিয়ে রয়েছে। তুমি আরো বলেছিলে সৎ প্রচেষ্টাগুলিকে কার্যকরী করতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে যায়। আমার পক্ষে সেটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

সৎ সংকল্পগুলি সব সময় বৈজ্ঞানিক নীতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তাদের উৎসই হচ্ছে নির্ভেজাল দাম্ভিকতা। সেইজন্যে আমদানির ঘরটা তাদের একেবারে শূন্য থাকে। মাঝে-মাঝে তারা অবশ্য কিছু দান করে; সেগুলি হচ্ছে বন্ধ্যা উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য। সেই দেখে দুর্বলরা কখনো কখনো যে মুগ্ধ হয় সেকথা মিথ্যা নয়। এছাড়া সৎ সংকল্পের পক্ষে আর কিছুই বিশেষ বলার নেই। ব্যাঙ্কে টাকা না থাকা সত্ত্বেও চেক কাটলে ব্যাপারটা যে রকম দাঁড়ায় এও অনেকটা সেই জাতীয় ব্যাপার।

লর্ড হেনরির কাছে এসে পাশে বসলেন ডোরিয়েন; তারপরে বললেন: হ্যারি, বলতে পার দুঃখটাকে যতটা গভীরভাবে আমি অনুভব করতে চাই ততটা অনুভব করতে পারছিনে কেন? আমি যে হৃদয়হীন সেকথা তো আমার মনে হয় না। তোমার কী মনে হয়?

মিষ্টি সুরে এবং বিষণ্ণ হাসি হেসে লর্ড হেনরি বললেন: বিগত পনেরোটি দিন ধরে তুমি এত বোকার মতো কাজ করেছ যার ফলে ওই বিশ্লেষণটি অর্জন করার যোগ্যতা তোমার হয়নি।

ভ্রূকুটি করে ডোরিয়েন বললেন: হ্যারি, তোমার বিশ্লেষণটা আমার ভালো লাগছে না; কিন্তু আমি নির্মম নই একথাটা যে তুমি স্বীকার করেছ এতেই আমি খুশি। সত্যিই আমি নির্মম নই। আমি তা জানি। তবু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে যতটা আঘাত করা উচিত ছিল দুর্ঘটনাটি ততখানি আঘাত আমাকে করেনি। মনে হচ্ছে একটি অপরূপ সুন্দর নাটকের একটি অপরূপ সুন্দর সমাপ্তি ঘটেছে। গ্রীক ট্র্যাজিডির সব কিছু ভয়াল সৌন্দর্যই এখানে রয়েছে; মনে হচ্ছে, সেই নাটকে অনেকটা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে আমাকে; অথচ, একটুকুও আহত হইনি আমি।

যুবকটির অবচেতন মনের দাম্ভিকতা নিয়ে খেলা করতে বেশ মজা লাগল লর্ড হেনরির; তিনি বললেন: সমস্যাটা কৌতূহলোদ্দীপক, সন্দেহ নেই, সত্যিই বড়ো কৌতূহলোদ্দীপক। আমার ধারণা তুমি যে প্রশ্নটি রেখেছ তার যে প্রশ্নটি রেখেছ তার আসল উত্তর হচ্ছে এই: জীবনের সত্যিকারের ট্রাজিডিগুলি প্রায়ই এমন অশিল্পীসুলভ প্রক্রিয়ায় ঘটে যে তাদের নগ্নতায়

আমরা আহত হই, আহত হই তাদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীনতায়, তাদের হাস্যকর অর্থহীনতায় এবং আঘাত করার অসুন্দর আঙ্গিকে। অশ্লীলতা যেভাবে আমাদের আঘাত করে ঠিক সেইভাবেই আঘাত করে এই ট্রাজিডিগুলি। তাদের সেই আক্রমণে পশুশক্তির গন্ধ পাই বলেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। মাঝে-মাঝে অবশ্য অতি সুন্দর ভাবেই আমাদের জীবনে ট্র্যাজিডি দেখা দেয়; এই সৌন্দর্যের অবদানগুলি বাস্তব হলে তারা আমাদের নাটকীয় অনুভূতিগুলিকে স্পর্শ করে। হঠাৎ আমাদের মনে হয় আমরা আর অভিনেতা নয়, দর্শকমাত্র। অথবা, আমরা দুইই। নিজেদের লক্ষ করি আমরা এবং দৃশ্যাবলির চমৎকারিত্ব আমাদের দাসত্বে পরিণত করে; অর্থাৎ একেবারে সম্মোহিত করে ফেলে আমাদের। বর্তমান ক্ষেত্রে আসল ঘটনাটা কী বল তো? তোমার ভালোবাসা হারানোর ভয়ে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এরকম একটা অভিজ্ঞতা আমার হলে খুব খুশি হতাম। তাহলে আমার বাকি জীবনটার সঙ্গে আমি নিজেই প্রেমে পড়ে যেতাম। যারা আমাকে ভালোবাসত, আমার সঙ্গে মেলামেশা না করলে যারা অস্থির হয়ে উঠত—যদিও তাদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়—সামান্য—তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমি ছিন্ন করার পরে-ও, অথবা, আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তারা শেষ করে দেওয়ার পরে-ও অনেকদিন তারা বেঁচে রয়েছে, আত্মহত্যা অথবা আত্মনির্যাতনের কথা তারা কল্পনাও করেনি। তাদের স্বাস্থ্য ফিরেছে—একঘেয়েমি বেড়েছে তাদের। হঠাৎ দেখা হলে তারা সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে শুরু করেছে। নারীদের স্মৃতিশক্তি কি ভয়ানক! কি ভয়ঙ্কর! চিন্তার জগতে তারা একেবারে স্থবির। জীবনের সৌন্দর্যে মানুষের ডুবে থাকা উচিত, জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে মেতে থাকা উচিত নয়। খুঁটিনাটি সবসময়েই অশ্লীল।

ডোরিয়েন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন: আমার বাগানে 'পপি' বুনতেই হবে।

লর্ড হেনরি বললেন: কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের হাতে সব সময়েই পপি অর্থাৎ আফিঙ রয়েছে। মাঝে-মাঝে অবশ্য কিছু স্মৃতি বেশিদিন ধরে বেঁচে থাকে। একটি রোমান্সের মৃত্যু না হওয়ায় শিল্পীসুলভ দুঃখ প্রকাশ করার জন্যে পুরো একটা ঋতু ধরে ভায়লেট ছাড়া অন্য কোনো ফুলই আমি ব্যবহার করিনি। শেষ পর্যন্ত সেই রোমান্সের অবশ্য মৃত্যু হয়নি; মৃত্যু কী করে হল সেকথা আজ আর আমার মনে নেই। আমার ধারণা যেদিন মেয়েটি ঘোষণা করল যে আমার জন্যে সে পৃথিবীর সব কিছু পরিত্যাগ করতে রাজি সেই দিনই আমাদের রোমান্সের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এই সময়টাই মানুষের জীবনে সবচেয়ে সঙ্কটময়; কারণ, অনন্তের ভীতি আমাদের তখন গ্রাস করে ফেলে। এক সপ্তাহ আগে লেডি হ্যাম্পশায়ারের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল আমার। ভদ্রমহিলার পাশেই আমি খেতে বসেছিলাম। তুমি কি বিশ্বাস করবে ভদ্রমহিলা আবার সেই পুরনো দিনগুলির কথা তুলে ভবিষ্যতের অসহনীয় দিনগুলির সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য কাহিনি কপচাতে শুরু করলেন। অ্যাসফোডল ফুলের বিছানায় আমাদের রোমান্স আগেই আমি কবর দিয়ে ফেলেছিলেম; তিনি আবার তাকে খুঁড়ে বার করে আমাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে আমি তাঁর জীবন নষ্ট করে দিয়েছি। আমি একথা বলতে বাধ্য যে সেদিন ডিনারে তাঁর কিছু অরুচি আমার চোখে পড়েনি; সোজা কথায় ভূরিভোজনই তিনি সেদিন করেছিলেন। সেই জন্যে তাঁর সেই অভিযোগে আমার মনে কোনো আশঙ্কা জাগেনি। কিন্তু কী কুরুচির পরিচয়ই সেদিন তিনি দিয়েছিলেন বল তো! অতীতের একমাত্র সৌন্দর্য এই যে সে অতীত। কিন্তু কখন যে যবনিকা পড়ে সে-সংবাদ নারীরা রাখে না। তারা সব সময় নাটকে ষষ্ঠ অংকের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে এবং নাটকের অভিনয় যখন শেষ হয়ে যায় তখনো তারা সেটিকে চায় আরো টেনে নিয়ে যেতে। তাদের যদি সে-সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সব কমেডিই ট্র্যাজিডিতে পরিণত হবে; আর সব ট্র্যাজিডি পরিণত হবে ফার্স-এ। কৃত্রিমতার দিক থেকে তারা সত্যিই বড়ো চমৎকার,

'আর্টিস্টিক সেনস' বলতে সত্যিই তাদের কিছু নেই। আমার চেয়ে এদিক থেকে তুমি অনেক ভাগ্যবান। আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ডোরিয়েন, যে সাইবিল ভেন তোমার যে উপকার করেছে সেরকম উপকার আমার কোনো প্রেমিকাই আমার করতে পারেনি। সাধারণ মহিলারা সব সময়েই নিজেদের সান্ত্বনা দেয়। কিছু মহিলা রয়েছে যারা নিজেদের সান্ত্বনা দেয় রেগে হইচই করে। যে মহিলা ফিকে লাল রঙের পোশাক পরে, তাদের বয়স যাই হোক, কোনোদিন তাদের বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো না সেই সব মহিলাদের যাদের বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে, যারা ফিকে লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধতে ভালোবাসে। এই জাতীয় মহিলাদের দেখলেই ভেবে নিয়ো যে তাদের প্রত্যেকের কিছু ইতিহাস রয়েছে। আর একদল মহিলা রয়েছে যারা হঠাৎ তাদের স্বামীদের সদগুণগুলি আবিষ্কার করতে পেরেছে বলে নিজেদের সান্ত্বনা দেয়। লোকের নাকের ডগায় তারা তাদের বিবাহিত জীবনের সুখ এবং আড়ম্বরের সঙ্গে প্রকাশ করে যে মনে হবে জিনিসটা চমৎকার একটা পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ-কেউ আবার ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পায়। একটি মহিলা একবার আমাকে বলেছিলেন যে রঙিন বাক-চাতুর্যের মধ্যেই নারীদের সান্ত্বনা পাওয়ার রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে এবং কথাটা যে সত্যি তা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। তা ছাড়া নিজেকে পাপী বলে চিহ্নিত করার মধ্যে মানুষের দম্ভ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পায় না। বিবেক বলে বস্তুটা আমাদের সবাইকেই আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। হ্যাঁ, আধুনিক জগতে সান্ত্বনার উপায় খুঁজে পাওয়ার সত্যিই কোনো শেষ নেই মহিলাদের। সত্যি কথা বলতে কি এখনো আমি সবচেয়ে দামি কথাটাই বলিনি।

ডোরিয়েন কিছুটা অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: সেটা কী হ্যারি?

ওই সান্ত্বনার সম্বন্ধেই বলছি। নিজের প্রেমিককে হারিয়ে ওরা সব সময় অপরের প্রেমিককে ছিনিয়ে নেয়। সভ্য সমাজে ছিনতাইকারিণীদের চরিত্র চকচকে করে তোলে ব্যাপারটা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ডোরিয়েন, আমাদের পরিচিতা মহিলাদের কাছ থেকে সাইবিল ভেনের পার্থক্য কত। তার মৃত্যুর মধ্যে এমন একটা জিনিস রয়েছে যা আমার চোখে বড়ো সুন্দর লাগছে। এই শতাব্দীতে যে এমন সুন্দর এবং আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে তা জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। রোমান্স, কামনা আর ভালোবাসা যা নিয়ে আমরা খেলা করি সেগুলি যে কতখানি বাস্তবএই থেকে তা প্রমাণিত হয়।

তুমি ভুলে যাচ্ছ, তার সঙ্গে আমি খুব নির্মম ব্যবহার করেছি।

কিছু মনে করো না, আমি বলতে বাধ্য যে পুরুষের কাছ থেকে নির্মম ব্যবহার নারীরা বেশ উপভোগ করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রবৃত্তিগুলি তাদের মধ্যে অদ্ভুতভাবে সতেজ রয়েছে। দাসত্ব থেকে আমরা তাদের মুক্তি দিয়েছি বটে; কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে দাসত্বটাই তারা পছন্দ করে বেশি; তাইতো তারা সব সময় মনিব খুঁজে বেড়ায়। অপরের কর্তৃত্বে থাকতে তারা ভালোবাসে। তোমার ব্যবহার যে চমৎকার সেদিক থেকে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সত্যিকার রাগতে তোমাকে আমি কোনোদিনই দেখিনি। কিন্তু তোমার ব্যবহারটা যে কত আমেজি তা আমি লক্ষ করেছি। তাছাড়া গতকালের আগের দিন তুমি আমাকে একটা কথা বলেছিলে। তখন আমি বিশেষ গুরুত্ব দিইনি কথাটার ওপরে। কিন্তু এখন দেখছি তুমি যা বলেছিলে তা সত্যি; আর সেইটাই হচ্ছে তোমার সব।

কী কথা, হ্যারি?

তুমি বলেছিলে বিশ্বের সমস্ত রোমান্টিক নায়িকাকে একসঙ্গে করলে যা দাঁড়ায় তোমার কাছে

সাইবিল তাই। এক রাত্রিতে সে দেসদিমনা, আর এক রাত্রিতে সে ওফিলিয়া; যদি জুলিয়েট হয়ে সে মারা যায়, ইমোজেন হয়ে সে বেঁচে ওঠে।

দুটি হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে ডোরিয়েন বললেন: এখন আর সে বেঁচে উঠবে না।

না; আর কোনোদিনই সে বেঁচে উঠবে না। সে শেষবারের মতো তার ভূমিকা অভিনয় করেছে। কিন্তু সেই নোংরা সাজঘরে তার নিঃসঙ্গ মৃত্যুকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে হবে তোমাকে। ভাবতে হবে জ্যাকবিয়াল কোনো ট্রাজিডির বিবর্ণ কোনো দৃশ্যের অভিনয় দেখছ তুমি, ওয়েবস্টার, ফোর্ড অথবা সিরিল টুরনারের কোনো নাটকের কোনো একটি অপরূপ দৃশ্য তুমি অভিনীত হতে দেখছ। তাছাড়া, কোনোদিনই মেয়েটি বেঁচে থাকেনি; সুতরাং তার মারা যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তোমার কাছে অন্তত সে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না; তোমার কাছ তাকে অশরীরী বলে মনে হত—যে শেকসপীয়রের নাটকের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে পদসঞ্চারে ঘুরে বেড়াত—যার উপস্থিতিতে নাটকগুলি সুন্দর হয়ে উঠত; তোমার কাছে সে ছিল একটি শর গাছের মতো, যার ভেতর দিয়ে শেকসপীয়রের সঙ্গীত হয়ে উঠত মধুক্ষরা এবং আনন্দময়। যে মুহূর্তে সে বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সেই মুহূর্তেই সে সেই জীবনটাকে করে তুলল বিকৃত আর সেই জন্যেই সে মারা গেল। ইচ্ছে হলে ওফিলিয়ার জন্যে তুমি শোক করতে পার। কর্ডিলিয়াকে কন্ঠরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল বলে মাথার ওপরে ছাই ঢেলে তুমি শোকদিবস পালন করতে পার; ব্রাবনসিয়োর কন্যা মারা গিয়েছিল বলে তুমি ভগবানের বিরুদ্ধে চিৎকার করে অভিযোগ জানাতে পার; কিন্তু সাইবিল ভেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তোমার চোখের জল বৃথা নষ্ট করো না। তাদের চেয়ে সে অনেক বেশি অবাস্তব।

কিছুক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। ঘরের মধ্যে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। নিঃশব্দে আর খালি পায়ে বাগান থেকে এগিয়ে এল ছায়ারা। দৃশ্যমান জিনিসগুলি ধীরে ধীরে তাদের জেল্লা হারিয়ে ফেলল।

কিছুক্ষণ পরে ডোরিয়েন গ্রে মুখ তুললেন, তারপরে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছেন এই ধরনের একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: হ্যারি, যে কথাটা নিজেকে আমি নিজে বলতে চেয়েছিলেম সেটা তুমিই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলে। তুমি যা বললে সেই সব কথা আগেই আমি ভেবেছিলেম; কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক নিজের কাছে প্রকাশ করার সাহস আমার হয়নি। আমার চরিত্রটা কী সুন্দরই না তুমি বুঝতে পেরেছ। কিন্তু যা ঘটে গিয়েছে তা নিয়ে তুমি আর আলোচনা করো না কখনো। এ থেকে একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হল আমার। এই-ই যথেষ্ট। আমি জানি নে আমার জন্যে এই রকম চমৎকার আরো কোনো অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে কি না।

ডোরিয়েন, তোমার জন্যে জীবন অনেক কিছু নিয়েই অপেক্ষা করছে। তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে করতে পারবে না পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই।

কিন্তু ধর হ্যারি, আমি যদি কুৎসিত, বৃদ্ধ হয়ে যাই, আমার দেহের ওপরে যদি বার্ধক্যের ছাপ পড়ে? তখন কী হবে?

বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে লর্ড হেনরি বললেন: আ, তখন! প্রিয় ডোরিয়েন, তখন লড়াই করে পাওনাগণ্ডা ছিনিয়ে নিতে হবে তোমাকে। বর্তমানে, তারাই তোমার কাছে এগিয়ে আসবে। না না। এই সুন্দর চেহারাটি বজায় রাখতে হবে তোমাকে। আমরা এমন একটা যুগে

বাস করি যখন মানুষ বিজ্ঞ হওয়ার জন্যে অতিরিক্ত পড়াশুনা করে, সুন্দর হওয়ার জন্যে চিন্তা করে বেশি। আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারিনে। এখন ভালো পোশাক পরে ক্লাবে যাই চল। এমনিতেই আমাদের দেরি হয়ে গিয়েছে।

হ্যারি, তোমার সঙ্গে বরং আমি অপেরাতেই দেখা করব। বড়ো ক্লান্ত আমি, খাবার বিশেষ ইচ্ছে নেই আমার। তোমার বোনের 'বক্স' নম্বরটা কত?

সম্ভবত সাতাশ। গ্র্যানড টায়ার-এর ওপরে তার বক্স। দরজার ওপর তার নাম লেখা থাকবে। কিন্তু আমার সঙ্গে বেরোতে আর ডিনার খেতে পারছ না বলে সত্যিই আমি দুঃখিত।

ডোরিয়েন ক্লান্তভাবে বললেন: ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তুমি আমাকে যা বললে তার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। নিঃসন্দেহে তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তোমার মতো আজ পর্যন্ত আর কেউ আমাকে বুঝতে পারেনি।

তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে লর্ড হেনরি বললেন: ডোরিয়েন, আমাদের বন্ধুত্ব সবে শুরু হয়েছে। বিদায়। আশা করি, রাত্রি সাড়ে নটার আগেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। মনে রেখ, প্যাটি আজ গান করছেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন লর্ড হেনরি। দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডোরিয়েন বেল টিপলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভিকটর একটা বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল; তারপরে ঘরের পর্দাগুলি সব নামিয়ে দিল। ভিকটরের চলে যাওয়ার জন্যে অস্থিরভাবে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। সব কাজেই লোকটা কেমন যেন মাঠো।

লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পর্দার দিকে দৌড়ে গেলেন; তারপরে একপাশে টেনে দিলেন সেটি। না, ছবির ওপরে আর কোনো পরিবর্তনের ছাপ পড়েনি। তাঁর আগেই সাইবিল ভেনের মৃত্যুসংবাদ ও জানতে পেরেছে। জীবনের ঘটনাগুলি কী ভাবে ঘটছে সে বিষয়ে ও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ঠিক যে-সময়ে সাইবিল বিষ অথবা ওই জাতীয় কিছু খেয়েছিল ঠিক সেই সময়ের নিষ্ঠুরতার সেই বিশেষ ছাপটি ওর মুখের ওপরে পড়েছিল। অথবা ফলাফলের বিষয়ে ও সম্পূর্ণ উদাসীন? আত্মার ভিতরে যা ঘটে ও কি কেবল সেইটুকুই গ্রাহ্য করে? তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন হয়তো একদিন তিনি চোখের ওপরেই ওর ওপরে পরিবর্তন দেখতে পাবেন; সেই সম্ভাবনায় তিনি ভয়ে পিছিয়ে এলেন।

হতভাগিনী সাইবিল! তাঁদের দুজনের মধ্যে কী অদ্ভুত রোমান্সই না গড়ে উঠেছিল! স্টেজের ওপরে প্রায়ই সে মৃতের অনুকরণ করত। তারপরে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তাকে ছুঁয়ে গেল, সঙ্গে করে নিয়ে গেল তাকে। তার জীবননাট্যের সেই ভয়ঙ্কর শেষ দৃশ্যটি সে কী ভাবে অভিনয় করল? মৃত্যুর সময় সে কি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছে? না; তাঁর প্রতি ভালোবাসা নিয়েই সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং এখন থেকে ভালোবাসা তাঁর কাছে পবিত্র জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে সে সব কিছুর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছে। থিয়েটারে সেই বীভৎস রাত্রিটিতে তার জন্যে তিনি কত কষ্ট পেয়েছেন সে-সব কথা আর তিনি মনে রাখবেন না। তার কথা যখন তিনি চিন্তা করবেন তখন মনে হবে একটি নির্ভেজাল প্রেমের প্রতীক করে ভগবান তাকে সংসার রঙ্গমঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেই প্রতীকটি সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাজিক। মেয়েটির শিশুর মতো সরল চাহনি, তার চিত্তাকর্ষক রোমান্টিক চালচলন আর ভীরু লাবণ্যের কথা মনে হতেই তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। সেই জল তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে তিনি ছবির দিকে আবার তাকিয়ে দেখলেন।

তাঁর মনে হল এখন থেকে তাঁর চলার পথটা তাঁকেই ঠিক করে ফেলতে হবে। অথবা তা কি আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছে? হ্যাঁ, জীবনই তা ঠিক করে দিয়েছে—জীবন, আর জীবন সম্বন্ধে তাঁর অনন্ত কৌতূহল। অনন্ত যৌবন, অনন্ত কামনা, ইঙ্গিতময় এবং গোপন আনন্দ, উদ্দাম, উদ্দামতর পাপ—এই সব কটির সঙ্গে মোলাকাৎ করতে হবে তাঁকে। তাঁর লজ্জা আর অপমানের সমস্ত জ্বালা আর যন্ত্রণা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ছবিটিকে। এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি তিনি।

ক্যানভাসের ওপরে আঁকা ছবিটির সুন্দর মুখের ওপরে ভবিষ্যতে যে কলঙ্করেখাগুলি পড়ে সেটিকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে একথা ভাবতে গিয়েই তিনি আতঙ্কিত হলেন। একবার নার্সিসাসকে ব্যঙ্গ করার শিশু-চাপল্যে যে ঠোঁট দুটি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছিল সেই ঠোঁট দুটিকে তিনি চুম্বন করলেন, অথবা চুম্বন করার ভান করলেন। অনেকদিন প্রভাতে এই ছবিটির দিকে তাকিয়ে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকতেন। এখন থেকে তাঁর প্রতিটি কাজের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে কি ছবিটির পরিবর্তন হবে? এই ছবিটা কি শেষ পর্যন্ত দানবীর আর সেই সঙ্গে ঘৃণ্য হয়ে দাঁড়াবে? শেষ পর্যন্ত কি ছবিটিকে সূর্যকিরণ থেকে সরিয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে হবে? হায়রে, কী দুর্ভাগ্য, কী দুর্ভাগ্য।

ছবি আর তাঁর মধ্যে যে ভয়ানক একটি আত্মিক সংযোগ দেখা দিয়েছে সেটি ছিঁড়ে ফেলার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার কথা একবার তিনি চিন্তা করলেন। প্রার্থনা করার ফলে ছবিটির ওপরে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সম্ভবত সেই প্রার্থনার ফলেই ছবিটি আর ভোল পালটাবে না। কিন্তু তবু যতই আজগুবি হোক, অথবা যত ভয়ানক পরিণতিই আসুক, জীবন সম্বন্ধে এতটুকু জ্ঞান আছে এমন মানুষ কে রয়েছে যে চির যৌবন ভোগ করার সুযোগ ছাড়তে পারে? তা ছাড়া, ছবির প্রকৃতিটি নিয়ন্ত্রিত করার সত্যিই কি কোনো ক্ষমতা রয়েছে তাঁর? প্রার্থনা করার জন্যেই কি ছবিটি তার প্রথম পরিবর্তনকে বর্জন করেছে? এর পেছনে কি অদ্ভুত কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ নেই? জীবজগতের ওপরে চিন্তার যদি কোনো প্রভাব থাকে, তাহলে মৃত আর জড়ের ওপরেও কি তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না? অর্থাৎ, গভীরভাবে চিন্তা অথবা কামনা করলে বাইরের কোনো বস্তু কি আমাদের মনের গভীরে নিহিত বাসনা-কামনার অজস্র স্পন্দনের মধ্যে তার অণু-পরমাণুগুলিকে সমান তালে নাচাতে পারে না? কিন্তু কারণটা নিয়ে চুলচেরা বিচার করার প্রয়োজন নেই তাঁর। আর কখনো ভয়ঙ্কর কোনো শক্তির কাছে তিনি প্রার্থনা জানাবেন না, প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করবেন না। প্রতিকৃতিটা যদি তার মর্জিমেতো রঙ বদলায় তো বদলাক। তাঁর কিছু করার নেই। অত খুঁটিয়ে দেখে লাভ কী?

কারণ এটিকে লক্ষ করার মধ্যেই তো আসল আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে। একেই অনুসরণ করে তিনি তাঁর মনের গভীরে লুকানো অনেক কিছুই জানতে পারবেন। ঐন্দ্রজালিক আরশীর মতো ছবিটি তাঁকে সাহায্য করবে। এটি যেমন তাঁর দেহটাকে ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি প্রকাশ করে দেবে তাঁর আত্মাটিকে। এবং যখন ওর ওপরে শৈত্যের জড়তা এসে দেখা দেবে তখনো তাঁর দেহের ওপরে বসন্তের হিল্লোল থাকবে জেগে। যখন ওর মুখের ওপর থেকে রক্ত শুকিয়ে যাবে, যখন ওর চোখ দুটি তাদের জ্যোতি হারিয়ে কোটরের মধ্যে আশ্রয় নেবে তখনো তিনি ভরা যৌবনের জোয়ারে ভেসে বেড়াবেন। তাঁর সৌন্দর্যের একটি কণাও নষ্ট হবে না; তাঁর ধমনীর একটি স্পন্দনও গতিহীন হবে না; গ্রীক দেবতাদের মতো তিনি শক্তিবান হয়ে থাকবেন, গতি আর আনন্দের আমেজে থাকবেন মেতে। ক্যানভাসের ওপরে আঁকা ওই রঙিন প্রতিকৃতিটার কী হবে তাতে তাঁর কী আসে যায়? তিনি তো নিরাপদে থাকবেন। এ-ছাড়া, আর কিছু ভাববার নেই তাঁর।

হাসতে-হাসতে ভারী পর্দাটা আবার তিনি প্রতিকৃতির মুখের ওপরে টেনে নিলেন; তারপরে, শোওয়ার ঘরে ঢুকলেন। সেইখানে তাঁর পরিচারক ভিকটর তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। এক ঘণ্টা পরে তিনি অপেরাতে হাজির হলেন; লর্ড হেনরি তাঁর চেয়ারের ওপরে ঝুঁকে বসেছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকালে-সকালে তিনি বসে-বসে প্রভাতকালীন জলযোগ করছিলেন এমন সময় বেসিল হলওয়ার্ড ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই গম্ভীরভাবে বললেন: তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশি হয়েছি, ডোরিয়েন। কাল রাত্রিতে এসে শুনলাম তুমি অপেরাতে গিয়েছ। অবশ্য আমি জানতাম কথাটা সত্যি নয় তবু তুমি ঠিক কোথায় গিয়েছ সে-সম্বন্ধে যদি স্পষ্ট ভাবে বলে যেতে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। আর একটা বিপদ ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় কাল সন্ধেটা আমার খুব খারাপ গিয়েছিল। সংবাদটা প্রথম পাওয়ার পরে আমাকে তোমার টেলিগ্রাফ করা উচিত ছিল। ক্লাবে 'গ্লোব' কাগজের শেষ সংস্করণটার ওপরে চোখ বুলোতে-বুলোতে হঠাৎ সংবাদটা আমার নজরে পড়ে গেল। সংবাদটা পড়েই আমি এখানে ছুটে এসেছিলেম। তোমাকে না পেয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। সমস্ত ঘটনাটা পড়ে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছিলেম তা আর তোমাকে কী বলব? আমি জানি নিশ্চয় তোমার কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তুমি কি মেয়েটির মায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাড়ি গিয়েছিলে? একবার ভাবলাম সেই দিকে আমিও এগিয়ে যাই। কাগজেই তাদের বাড়ির ঠিকানাটা দেওয়া ছিল। এসটোন রোডের কাছাকাছি একটা জায়গা, তাই না? কিন্তু যে দুঃখকে আমি এতটুকু কমাতে পারব না সেখানে অনাবশ্যক যেতে আমার কেমন সঙ্কোচ লাগছিল। হতভাগিনী নারী! নিশ্চয় তাঁর মনের অবস্থা খুব খারাপ। ওই তাঁর একমাত্র সন্তান। এ বিষয়ে তিনি কী বললেন?

ভেনিশিয়ান গ্লাস থেকে ফিকে বেগনে রঙের মদ চাকতে-চাকতে ডোরিয়েন আস্তে-আস্তে বললেন: প্রিয় বেসিল, তা জানব কেমন করে?

তারপর অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে বললেন: আমি অপেরাতেই গিয়েছিলেম। তোমারও সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। কালই প্রথম হেনরির বোন লেডি গিনদোলেন-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হল, আমরা দুজনে একটা বক্স-এ বসেছিলেম। ভদ্রমহিলা সত্যিকার সুন্দরী। প্যাটিও অদ্ভুত সুন্দর গান গাইলেন। ভয়ানক ঘটনা নিয়ে আর আলোচনা করো না। কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা না করলেই সেটা যে সত্যিই ঘটেছে তা আমাদের মনে হবে না। হ্যারি বলে, আলোচনা করলেই যে-কোনো জিনিসই বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। আমি কেবল তোমাকে এইটুকুই জানাতে পারি যে ভদ্রমহিলার ওই একমাত্র সন্তান নয়। একটি ছেলেও রয়েছে। সেটি-ও বড়ো চমৎকার ছেলে। কিন্তু সে অভিনয় করে না। পেশার দিক থেকে সে নাবিক বা ওই জাতীয় কিছু একটা হবে। এখন তোমার কথা, আর বর্তমানে তুমি কী আঁকছ তাই আমাকে বল।

ধীরে-ধীরে এবং বেদনার্ত স্বরে হলওয়ার্ড বললেন: অপেরাতে গিয়েছিলে? একটা নোংরা ঘরে সাইবিল ভেনের মৃতদাহটা যখন পড়েছিল তখন তুমি বসেছিলে অপেরাতে! যে মেয়েটিকে তুমি ভালোবাসতে সেই মেয়েটিকে নির্বিঘ্নে কবরস্থ করার আগেই অন্য মহিলারা যে কত সুন্দরী, প্যাটি যে কেমন স্বর্গীয় গান গাইলেন সেই সব কথা আমাকে তুমি বলতে পারলে? তুমি কি জান না, সাইবিলের শ্বেতশুভ্র সেই শরীরটা নিয়ে এখনো অনেক ঝামেলা পোয়াতে হবে?

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলেন ডোরিয়েন: বেসিল, চুপ কর, চুপ কর! ওসব কথা শুনতে চাই নে। আমাকে ওসব কথা তুমি বলো না। যা হয়েছে তা হয়ে গিয়েছে। যা অতীত তা অতীতেই মিলিয়ে যাক।

গতকাল যা ঘটেছে তাকে তুমি অতীতে বলতে চাও?

ঘণ্টা-মিনিট ধরে সময়ের প্রকৃতি ঠিক করা যায় না; যারা মূর্খ, মনের নদীতে যাদের চড়া পড়ে গিয়েছে, বিশেষ কোনো অনুভূতিকে ভুলে যেতে তাদেরই অনেক বছর সময় লাগে। নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে যে আয়ত্তে রাখতে পেরেছে সে যেমন অতি সহজে নতুন আনন্দের আয়োজন করতে পারে তেমনি সহজে ভুলে যেতে পারে দুঃখ। প্রবৃত্তির দাস হতে আমি রাজি নই। আমি চাই তাদের খাটাতে, আনন্দ পেতে এবং তাদের ওপরে প্রভুত্ব করতে।

ডোরিয়েন, তুমি যে কথা বলছ সেগুলি নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। এমন কিছু ঘটেছে যা তোমার চরিত্রকে একেবারে পালটিয়ে দিয়েছে। যে অদ্ভুত সুন্দর ছেলেটি দিনের পর দিন আমার স্টুডিয়োতে এসে বসে থাকত, এখনো বাইরে থেকে সেইরকমই সুন্দর তুমি দেখতে। কিন্তু তখন তুমি ছিলে সাদামাঠা, স্বাভাবিক এবং স্নেহশীল। সারা দুনিয়ায় তোমার মতো নিষ্পাপ মানুষ আমার চোখে আর পড়েনি। কিন্তু এ কী কথা শুনছি! জানি না, কী হল তোমার। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে হৃদয় বলতে কোনো পদার্থ তোমার নেই। নেই কোনো দয়া, মায়া, অনুভূতি। বেশ বুঝতে পারছি, হ্যারির প্রভাব তোমার ওপরে পড়েছে।

লাল হয়ে উঠল ডোরিয়েনের মুখ, তিনি জানালার ধারে গিয়ে সূর্যকরোজ্জ্বল বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ; তারপরে বললেন: বেসল, হ্যারির কাছে আমি অনেক ঋণী; তোমার চেয়েও বেশি। তুমি আমাকে কেবল অনাবশ্যকভাবে দাম্ভিক হতে শিখিয়েছিলে।

সেই জন্যে আমি শাস্তি পেয়েছি, ডোরিয়েন—অথবা ভবিষ্যতে পাব।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডোরিয়েন বললেন: তোমার কথাটা আমার মাথায় ঢুকছে না বেসিল। তুমি কী চাও তাও আমি বুঝতে পারছি না। কী চাও বল তো?

দুঃখের সঙ্গে আর্টিস্ট বললেন: আমি চাই সেই ডোরিয়েন গ্রে-কে যার ছবি আমি এঁকেছি।

তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে এবং একটি হাত তাঁর কাঁধের ওপরে রেখে ডোরিয়েন বললেন: বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে বেসিল। গতকাল যখন আমি শুনলাম সাইবিল আত্মহত্যা করেছে...

তাঁর দিকে তাকিয়ে বিহ্বল নেত্রে হলওওয়ার্ড বললেন; আত্মহত্যা! হায় ভগবান! এ বিষয়ে আমারও কোনো সন্দেহ নেই।

প্রিয় বেসিল, এটা যে একটা নিছক দুর্ঘটনা তা নিশ্চয় তুমি মনে করনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আত্মহত্যাই সে করেছে।

বয়স্ক মানুষটি নিজের হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে বললেন: ওঃ, কী ভয়ানক!

দেহটা তাঁর কাঁপতে লাগল।

ডোরিয়েন গ্রে বললেন: না, না। ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই এতে। এ-যুগের এটাই হচ্ছে একটি বড়ো রোমান্টিক ট্রাজিডি। যারা অভিনয় করে তারা সাধারণত সাধারণ ভাবেই বেঁচে থাকে। তাদের স্বামী থাকে, থাকে বিশ্বাসী স্ত্রী; জীবনটা তাদের একঘেয়ে, গতানুগতিকের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আমি কী বলতে চাই তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ? আমি বলতে চাই শ্রেণি আর সাংস্কৃতির দিক থেকে তারা সবাই মধ্যবিত্ত—ধর্ম, আচার-ব্যবহার—সব দিক থেকেই। তাদের

সঙ্গে সাইবিলের পার্থক্য কত। তার জীবনটাই হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর, মধুর একটি ট্র্যাজিডি। সব সময়েই সে নায়িকা। গত রাত্রিতে, অর্থাৎ তোমরা তাকে যেদিন দেখেছিলে—সে খুব খারাপ অভিনয় করেছিল, কারণ সত্যিকার ভালোবাসা বলতে কী বোঝায় তা সে বুঝতে পেরেছিল। যখন সে বুঝতে পারল এটা কতখানি অবাস্তব তখনই সে মারা গেল। ঠিক এই ভাবেই জুলিয়েট মারা গিয়েছিল। সত্যিকার আর্টের জগতে প্রবেশ করল সে। তার মৃত্যুর মধ্যে আমি কী দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি শহিদ হওয়ার করুণ ব্যর্থতা, বিনষ্ট সৌন্দর্যের ব্যর্থতা। কিন্তু যা তোমাকে বলছিলাম, ভেব না যে আমি কম দুঃখ ভোগ করেছি। গতকাল যদি বিশেষ একটি মুহূর্তে তুমি এখানে আসতে—ধর সাড়ে পাঁচটা অথবা পৌনে ছটার কাছাকাছি—তাহলে আমার চোখ ভরা জল তুমি দেখতে পেতে। হ্যারি-ই এই সংবাদটা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। খবরটা পেয়ে আমার মনের কী অবস্থা হয়েছিল এমন কি সেও তা বুঝতে পারেনি। দুঃখ আর অনুশোচনায় সাময়িকভাবে ভেঙে পড়েছিলেম আমি। তারপরে সেই অবস্থাটা আমার কেটে গেল। সেই অনুভূতিকে আর আমি ফিরিয়ে আনতে পারব না; একমাত্র ভাবপ্রবণ মূর্খ ছাড়া কেউ তা পারে না। সেদিক থেকে, বেসিল, আমার ওপরে সত্যিই তুমি অবিচার করছ। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তুমি এখানে এসেছ। খুব ভালো কথা। তুমি দেখলে আগেই আমি শান্ত হয়ে গিয়েছি। দেখেই তুমি ক্ষেপে উঠলে। এই কি তোমার সহানুভূতির নমুনা? হ্যারি আমাকে একটা গল্প বলেছিল। তুমি আমাকে সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে। গল্পটা হচ্ছে, একজন পরোপকারী ব্যক্তির একটি অন্যায়ের প্রতিকার করার। অথবা কোনো একটি আইনের ধারা পালটানোর জন্যে, ব্যাপারটা আমার ঠিক মনে নেই, তাঁর জীবনের কুড়িটি বছর তিনি নষ্ট করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছিল; তার পরেই কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন; আর কিছু করার ছিল না তাঁর; মনের এই বেকারত্ব সহ্য করতে পারলেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত অপরের ক্ষতি করার উৎসাহে মেতে উঠলেন। তা ছাড়া প্রিয় বেসিল, তুমি যদি সত্যিই আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাও তাহলে কেমন করে ওই তিক্ত ঘটনাটিকে আমি ভুলে যেতে পারি সেই পথটাই তুমি আমাকে বাতলিয়ে দাও; অথবা, কেমন করে সমস্ত জিনিসটাকে আমি আর্টিস্টের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে পারি সেই উপদেশই আমাকে দাও। সেদিন 'মারলো' হোটেলে একটি যুবকের সঙ্গে তুমি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে; তিনি সেদিন কথায়-কথায় বলেছিলেন জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট পীতাভ সাটিন ভুলিয়ে দিতে পারে। আমি অবশ্য সে-মতে বিশ্বাসী নই। আমি সুন্দর জিনিস ভালোবাসি; সুন্দর আর বাস্তব—যেগুলিকে আমি স্পর্শ করতে পারি। পুরনো ব্রোকেড, সবুজ ব্রোঞ্জের জিনিস, ল্যাকারের কাজ, খোদাই-করা হাতির দাঁত, সুন্দর পারিপার্শ্ব, প্রাচুর্য, উচ্ছ্বাস, আর আনন্দ—এদের সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু পাওয়ার রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে আর্টিস্টিক মানসিকতা রয়েছে, অথবা, যে আর্টিস্টিক রুচি তারা প্রকাশ করে, আমার বেশি আকর্ষণ সেই দিকে। হ্যারির মতে নিজের জীবনটাকে মানুষ যদি দর্শকের ভূমিকা থেকে দেখতে পারে তাহলেই সে নিজের জীবনের দুঃখ ভুলে যায়।

কেমন করে আমি হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠলাম তা তুমি জান না। তুমি যখন আমায় চিনতে তখন আমি ছিলাম স্কুলের ছাত্র। এখন আমি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। কিন্তু তার জন্যে আমাকে তুমি কম পছন্দ করতে পারবে না। আমি এখন অন্য জগতের; আমার ভাবনা নতুন, চিন্তা নতুন, আদর্শ নতুন। এক কথায় খোল-নলচে আমার পালটিয়ে গিয়েছে। পরিবর্তন আমার যে হয়েছে সেটা ঠিকই; কিন্তু তুমি সব সময়েই আমার বন্ধু থাকবে—ঠিক আগের মতনই। অবশ্য হ্যারিকে আমার খুবই ভালো লাগে; কিন্তু বন্ধু হিসাবে হ্যারির চেয়ে তুমি অনেক উঁচু স্তরের। শক্তির দিক থেকে তার মতো সবল তুমি নও, জীবনটাকে বেশি ভয় কর তুমি; কিন্তু তুমি তার চেয়েও উঁচু মনের। আমরা দুজনে কী সুখেই না ছিলাম। বেসিল, আমাকে তুমি পরিত্যাগ করো না; আমার সঙ্গে ঝগড়া করো না তুমি। এখন আমাকে যা তুমি দেখছ, আমি তাই।

এছাড়া আর কিছু আমার বলার নেই।

চিত্রকরকে অদ্ভুতভাবে বিচলিত হতে দেখা গেল। ছেলেটিকে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন এবং তাঁর চিত্রকরের জীবনে ওই ছেলেটিই বিরাট একটি সাফল্য এনে দিয়েছে। তাকে বেশি তিরস্কার করতে কেমন যেন কষ্ট হল তাঁর। তাছাড়া, জীবনের ওপরে তার যে বিরাট নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে সাময়িক; কিছুক্ষণের ভেতরেই তার এই মনোভাব নষ্ট হয়ে যাবে। তার মধ্যে অনেক ভালো জিনিস রয়েছে, এমন অনেক কিছু রয়েছে যাদের মহতের পর্যায়ে ফেলা যায়।

শেষ পর্যন্ত একটা বিষণ্ন হাসি হেসে তিনি বললেন: ঠিক আছে, ডোরিয়েন, আজকের পর এই ভয়াবহ ঘটনা নিয়ে আর কোনোদিনই আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করব না। আশা করি, এর মধ্যে তোমাকে কেউ জড়াবে না। আজ বিকেলেই হত্যার তদন্ত শুরু হবে। তারা কি তোমাকে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে ডেকেছে?

মাথা নাড়লেন ডোরিয়েন; তদন্ত কথাটা শুনে তাঁর মুখের ওপরে বিরক্তির রেখা ফুটে বেরোল; সেই রেখার মধ্যে ফুটে উঠল একটা রুক্ষ ভাব, একটা অশ্লীল অনুভাব। তিনি শুধু বললেন: তারা আমার নাম জানে না।

কিন্তু মেয়েটি নিশ্চয় জানত?

শুধু আমার খৃশ্চান নামটাই সে জানত। আমি নিশ্চিত যে এ কথাটাও সে কাউকে বলেনি। সে একবার আমাকে বলেছিল আমার আসল পরিচয় জানার জন্যে ওখানে অনেকেই বিশেষ কৌতূহলী ছিল। সে তাদের সবাইকেই বলেছিল আমার নাম "প্রিন্স চার্মিং", ভালোই করেছিল। বেসিল, সাইবিলের একটা ছবি এঁকে দিও আমাকে। কয়েকটি চুম্বন, করুণ কয়েকটি ভাঙা-ভাঙা কথার স্মৃতি ছাড়া তার আরো কিছু আমি সঞ্চয়ের ঘরে জমা করে রাখতে চাই।

তুমি চাইলে কিছু করার চেষ্টা করব, ডোরিয়েন। কিন্তু তুমি এসে আবার আমার কাছে বস। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।

হঠাৎ চমকে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে ডোরিয়েন চিৎকার করে বললেন: না; আর আমি তোমার মডেল হতে পারব না—না, না; অসম্ভব।

চিত্রকর তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন: কী পাগলের মতো কথা বলছ! তুমি কি বলতে চাও তোমার জন্যে আমি যা করেছি তা তোমার ভালো লাগেনি? দেখতে পাচ্ছি, ছবিটার সামনে তুমি একটা পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছ। দেখতে দাও আমাকে। আজ পর্যন্ত আমি যা এঁকেছি এটি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ডোরিয়েন, পর্দাটাকে সরিয়ে দাও। আমার ছবিকে এইভাবে ঢেকে রাখাটা তোমার চাকরদের খুব অন্যায় হয়েছে। ভেতরে ঢোকার সময় তোমার ঘরের চেহারাটাও যেন কেমন-কেমন লাগছে।

ওর সঙ্গে আমার চাকর-বাকরদের কোনো সম্পর্ক নেই, বেসিল। ভেব না, আমার ঘর কী ভাবে সাজানো হবে সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমি কোনো পরামর্শ করি না। এক কিছু ফুল সাজিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছুতে হাত দেয় না তারা। না; ছবিটাকে আমিই ঢেকে রেখেছি। ছবিটার ওপরে বেশি আলো পড়ছিল।

বেশি আলো! নিশ্চয় নয়। এই জায়গাটাই ছবিটা রাখার সবচেয়ে ভালো জায়গা। দেখি

ছবিটা।

এই বলে হলওয়ার্ড ঘরের সেই বিশেষ কোণটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ ডোরিয়েনের কন্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। তিনি দৌড়ে ছবি আর চিত্রকরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিবর্ণ মুখে তিনি বললেন: বেসিল, ছবিটাকে তুমি দেখো না। আমি চাইনে তুমি দেখ।

হলওয়ার্ড হাসতে হাসতে বললেন: বল কী হে! আমার নিজের আঁকা ছবি আমি দেখব না? তুমি সিরিয়াস নও, কেন দেখব না?

আমার দিব্যি, যদি তুমি ছবিটা দেখ তাহলে জীবনে আর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না। এদিক থেকে আমি তোমাকে খাঁটি কথাই বলছি। এর কোনো কৈফিয়ৎ তোমাকে আমি দেব না; তুমিও তা চেয়ো না। কিন্তু মনে রেখ, পর্দাটা একবার ছুঁয়েছ কি আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।

বজ্রাহাতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন হলওয়ার্ড। অবাক বিস্ময়ে ডোরিয়েনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। ডোরিয়েনের এই রকম মানসিক অবস্থার সঙ্গে তাঁর আগে কোনোদিন পরিচয় ছিল না। ডোরিয়েন সত্যি-সত্যিই রাগে টগবগ করে ফুটছিলেন। তাঁর হাত দুটি ছিল মুষ্টিবদ্ধ; দুটো চোখ আগুনের গোলার মতো বনবন করে ঘুরছিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক কাঁপছিলেন তিনি।

ডোরিয়েন!

কোনো কথা নয়।

কিন্তু ব্যাপারটা কী বল তো?

পিছু ঘুরে জানালার দিকে ফিরে যেতে-যেতে বেশ বিরক্তির সঙ্গেই তিনি বললেন: অবশ্য তোমার আপত্তি থাকলে আমি ছবিটা দেখব না। কিন্তু আমার নিজের হাতে আঁকা ছবিটা আমি দেখতে পাব না—ব্যাপারটা নেহাতই হাস্যকর, বিশেষ করে এই শরৎ কালে প্যারিসের চিত্র প্রদর্শনীতে ছবিটা যখন আমি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। পাঠানোর আগে সম্ভবত ছবিটার ওপরে আর এক পোঁচ রঙ বুলাতে হবে। সেইজন্যেই ছবিটা একবার আমার দেখা দরকার। আজকে দেখার আপত্তিটা কী?

এই ছবিটাকে তুমি প্রদর্শনীতে পাঠাবে!

চিৎকার করে উঠলেন ডোরিয়েন। একটা অদ্ভুত ভীতির ছায়া তাঁর সারা শরীরের ওপরে গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তাঁর জীবনের গোপন রহস্যটি সকলের কাছে দেখানো হবে? সারা বিশ্ব সেই রহস্যের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে? না না; সে অসম্ভব। ঠিক কী তাঁর করা উচিত তা তিনি বুঝতে পারলেন না বটে; কিন্তু এটা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হল না যে একটা কিছু তাঁর করা দরকার এবং এখনই।

হ্যাঁ। আমার ধারণা তাতে তোমার কোনো আপত্তি হবে না। র‍্যু দ্য সিজের বিশেষ প্রদর্শনীতে

দেখানোর জন্যে জর্জ পেটিন্ট আমার শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিকে সংগ্রহ করছেন। প্রদর্শনীটা শুরু হচ্ছে অকটোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে। মাত্র একমাসের জন্য ছবিটা আমি নিয়ে যাব। আমার ধারণা, এই কটা দিন ছবিটাকে যদি সব সময় তুমি পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখ তাহলে ওর উপরে যত্ন নেওয়াও তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কপালের ওপরে হাত বুলোলেন ডোরিয়েন। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সেখানে। তাঁর মনে হল একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির একেবারে শেষ ধাপে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তিনি বেশ জোর গলাতেই বললেন: ছবিটা তুমি কোনোদিনই প্রদর্শনীতে পাঠাবে না এই রকম একটা কথা মাসখানেক আগে আমাকে তুমি বলেছিলে। তোমার মত পরিবর্তন করলে কেন? তোমাদের মতো যারা নিজেদের এক কথার মানুষ বলে মনে করে তাদের সঙ্গে অন্য লোকদের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে এই যে তোমাদের উচ্ছ্বাস অর্থহীন। তুমি যে আমাকে বলেছিলে যে পৃথিবীর কোনো কিছুর লোভেই তুমি ছবিটি প্রদর্শনীতে পাঠাবে না সেকথাটা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি। হ্যারিকেও তুমি ঠিক ওই কথাই বলেছিলে।

এই বলেই হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন। হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিছুটা সিরিয়াস আর কিছুটা উপহাসের ভঙ্গিতে লর্ড হেনরি একবার তাঁকে বলেছিলেন: যদি মিনিট পনেরো সময় পাও তো বেসিলকে বলতে বলো কেন সে ছবিটি প্রদর্শনীতে পাঠাবে না। সে আমাকে বলেছিল সে পাঠাবে না। কথাটা শুনে অবাক লেগেছিল আমার। হ্যাঁ, তাই। বেসিলেরও তাহলে কোনো গোপন রহস্য রয়েছে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, জানার চেষ্টা করবেন কারণটা।

তাঁর কাছে এগিয়ে এসে এবং সোজাসুজি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরিয়েন বললেন: বেসিল, আমাদের দুজনেরই একটা গোপন রহস্য রয়েছে। তুমি যদি তোমার কথা আমাকে বল...আমার কথা আমি তোমাকে বলব। কেন তুমি আমার ছবিটা প্রদর্শনীতে পাঠাতে চাওনি তখন?

নিজেরে অজান্তে চিত্রকর একটু কেঁপে উঠলেন; বললেন: ডোরিয়েন, সে কথা বললে তুমি হয়তো আগের মতো আর আমাকে পছন্দ করবে না; চাই কি উপহাস-ও করতে পার। ও দুটির একটাও যদি তুমি কর আমি তা সহ্য করতে পারব না। তুমি যদি ওই ছবিটি আর কোনোদিনই আমাকে দেখাতে না চাও তাতেও আমি খুশি। আমি চাই তুমিই ওটিকে সব সময় দেখ। তুমি যদি মনে কর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবিটিকে তুমি লুকিয়ে রাখবে তাতেও আমি সন্তুষ্ট। যশ বা খ্যাতি—দুটোর কোনোটাকেই আমি তোমার বন্ধুত্বের ওপরে স্থান দিইনে।

ডোরিয়েন গো ছাড়লেন না; বললেন: না বেসিলি; তোমাকে বলতেই হবে। মনে হয় সেকথা জানার অধিকার আমার রয়েছে।

তাঁর আতঙ্ক সরে গেল; তার জায়গা দখল করল একটা কৌতূহল। বেসিল হলওয়ার্ডের রহস্যটা কী তা জানার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন।

হলওয়ার্ডের চোখমুখের চেহারা দেখে মনে হল তিনি বেশ একটা অসুবিধায় পড়েছেন।

ডোরিয়েন, এস আমরা বসি। আমি তোমাকে একটি মাত্র প্রশ্ন করব। তার উত্তর দাও। ছবির

ভেতরে কোনো অদ্ভুত জিনিস কি তুমি লক্ষ করেছ? এমন একটা জিনিস যা প্রথমে তোমার নজরে পড়েনি; কিন্তু হঠাৎ একদিন ধরা পড়েছে তোমার কাছে?

কম্পিত হাতে চেয়ারের একটা হাতল জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলেন তিনি: বেসিল!

চমকে উঠে ভয়-বিহ্বল চোখে তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বুঝতে পারছি তোমার চোখে তা ধরা পড়েছে। চুপ কর। এ-বিষয়ে আমি যা বলতে চাই তা তুমি মন দিয়ে শোন, ডোরিয়েন। তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পর থেকেই, তুমি অদ্ভুতভাবে আমাকে প্রভাবান্বিত করেছিলে। আমার আত্মা, মস্তিষ্ক আর শক্তি সকলের ওপরেই প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলে তুমি। অনবদ্য স্বপ্নের মতো অদৃশ্য আদর্শের যে স্মৃতিটি আমাদের মতো আর্টিস্টদের অস্থির করে তোলে তুমি আমার কাছে ছিলে তার একটি মূর্ত প্রতীক। আমি তোমাকে পূজা করতাম। তুমি কারো সঙ্গে কথা বললে আমি তাকে করতাম হিংসা। আমি তোমার সমস্ত সত্তাকে নিজের মধ্যে পেতে চেয়েছিলাম। তুমি যখন আমার কাছে বসে থাকতে কেবলমাত্র তখনই আমি সুখী হতাম। তুমি যখন চলে যেতে, আমার শিল্পের মধ্যে তখনও তোমার উপস্থিতির স্পর্শ পেতাম। অবশ্য এ-ব্যাপারটা তোমাকে কখনো আমি জানতে দিইনি। জানতে দেওয়াটা সম্ভব ছিল না। তুমি তা বুঝতে পারতে না। আমি নিজেও কি তা পেরেছিলাম? আমি কেবল বুঝতে পেরেছিলাম, একটি নিখুঁত বাস্তব সৌন্দর্যের মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং পৃথিবীটা আমার চোখে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। সম্ভবত এটাও আমি জানতাম যে এই যুক্তিহীন পূজায় বিপদ লুকিয়ে রয়েছে—সেই বিপদটা হচ্ছে হারানোর, ঠিক যেমন বিপদ রয়েছে সেটিকে নিজস্ব করে ধরে রাখার মধ্যে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল; তোমার মধ্যে নিজেকে আমি হারিয়ে ফেললাম। বিশ্বের সমস্ত রোমান্টিক নায়কের বেশে তোমাকে আমি কল্পনা করে সাজিয়ে দিলাম। সমস্ত আর্টেরই শেষ করা তাই; অবচেতন মনের সমস্ত সৌন্দর্য আর রসবোধকে রঙ-তুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপরে ধরে রাখা। একদিন এল, যে দিনটি আমার মতে বিপজ্জনক, আমি তোমার ছবি আঁকতে মনস্থ করলাম—প্রাচীন মৃত যুগের রঙে নয়, তোমার আসল রঙে। তুমি যা সেই ভাবে। এটাই শিল্পকলার বাস্তব রীতি। না, তোমার অপরূপ ব্যক্তিত্বের কোনো প্রভাব আমাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা আমি জানিনে। কিন্তু এটা আমি জানি যে তোমার প্রতিকৃতি আঁকার সময় প্রতিটি রঙ আর তুলির আঁচড় আমার মনের গোপন রহস্যটি আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল। পাছে অন্য লোকে আমার এই মূর্তিপূজার কথা জানতে পারে এই ভয়ে শঙ্কিত ছিলাম আমি। ডোরিয়েন, আমার মনে হয়েছিল প্রতিকৃতিটির মধ্যে আমার নিজস্ব সত্তার অনেকখানি আমি ঢেলে দিয়েছিলেম। তখনই আমি ঠিক করে ফেলেছিলেম এ-ছবি কোনোদিনই আমি কোনো প্রদর্শনীতে পাঠাব না। তুমি কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলে কিন্তু ছবিটা আমার কাছে কী জিনিস তা তুমি তখন জানতে না। হ্যারিকে বলেছিলেম। সে আমাকে উপহাস করেছিল। সেই উপহাসে আমি কিছু মনে করিনি। ছবিটি শেষ হওয়ার পরে যখন আমি একা সেটির কাছে বসে থাকতাম তখন আমার মনে হত আমি ঠিকই করেছি। ছবিটি আমার স্টুডিয়ও থেকে চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরে আমার মোহ কেটে গেল। আমার মন হল ছবিটির মধ্যে অপরূপ কিছুর সন্ধান পাওয়াটা আমার পক্ষে মূর্খতা হয়েছে; আমার কেবলই মনে হতে লাগল যে অপরূপ অঙ্গসৌষ্ঠভ ছাড়া আর কিছু নেই তোমার। কেবল এইটুকু ভেবেই সান্ত্বনা পেলাম যে ছবি আঁকার ক্ষমতা আমার রয়েছে। এমন কি এখনো আমার মনে হয় যে কল্পনায় আমরা যা ভাবি তা কোনোদিন বাস্তবে রূপায়িত হয় না। আমাদের কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি অবাস্তব হচ্ছে আর্ট। আঙ্গিকটা আঙ্গিক ছাড়া আর কিছু নয়। আমার ধারণা, আর্ট যতখানি আর্টিস্টকে লুকিয়ে রাখে ততটা প্রকাশ

করে না। সেই জন্যে প্যারিস থেকে ছবি পাঠানোর যখন আমন্ত্রণ পেলাম তখনই আমি ঠিক করলাম ওই ছবিটাকেই আমি প্রদর্শনীতে পাঠাব। তুমি যে রাজি হবে না সে কথা আমি ভাবিনি। এখন বুজতে পারছি তুমিই ঠিক। প্রতিকৃতিটাকে লোকচক্ষুতে প্রকাশ করা উচিত হবে না। আমি তোমাকে যা বলেছি তার জন্যে রাগ করো না ডোরিয়েন। হ্যারিকে যা বলেছি তোমাকেও তাই বলছি—বিশ্বের পূজা পাওয়ার জন্যেই তোমার সৃষ্টি হয়েছে।

দীর্ঘ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডোরিয়েন গ্রে। তাঁর দেহের স্বাভাবিক রঙ ফিরে এল; মুখের ওপরে ফুটে উঠল হাসি। যাক, বিপদটা কেটে গিয়েছে; আপাতত তিনি নিরাপদ। কিন্তু তবু ওই যে চিত্রকরটি তাঁর কাছে একটি স্বীকারোক্তি করলেন, তারই জন্যে বেসিলের ওপরে তাঁর বড়ো মায়া হল। তাঁর ওপরেও কি তাঁর কোনো বন্ধুর এতখানি প্রভাব রয়েছে? প্রশ্নটা অবাক হয়েই ভাবতে লাগলেন তিনি। লর্ড হেনরির প্রভাবের মধ্যে মনোহারিত্ব রয়েছে এবং সেই প্রভাবটি নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। কিন্তু তাঁকে নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই। সত্যিকার ভালোবাসা বলতে কিছু তাঁর ভেতরে নেই। মানুষের ওপরে অনাস্থাও তাঁর যথেষ্ট। এমন কেউ কি রয়েছে যে তাঁকে পূজা করে? ভাগ্য কি তাঁর জন্যে পূজার উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে?

হলওয়ার্ড বললেন: ছবির ওপরে এই বিশেষ জিনিসটা যে তোমার চোখে পড়েছে তাতেই আমি খুব আশ্চর্য হচ্ছি, ডোরিয়েন। সত্যিই কি তুমি দেখতে পেয়েছ?

তিনি বললেন: দেখেছি। এমন একটা জিনিস দেখেছি যা আমাকে অবাক করে দিয়েছে।

যাই হোক, এখন ছবিটা একবার দেখতে দিতে নিশ্চয় তোমার আপত্তি নেই?

ডোরিয়েন মাথা নেড়ে বললেন: আর ওকথা নয়, বেসিল। ছবিটার সামনে দাঁড়াতে তোমাকে আমি দেব না।

আজ না দাও, আর একদিন নিশ্চয় দেবে?

কোনোদিন দেব না।

হয়তো তুমি ঠিকই করছ। এখন আমি চলি ডোরিয়েন। আমার জীবনে একমাত্র তুমি এসেছ যে আমার চিত্রকলাকে প্রভাবান্বিত করেছে। যত ভালো ছবি আমি এঁকেছি সেগুলির জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমাকে আমি যা বললাম সেটা বলতে আমাকে কত খেসারৎ দিতে হয়েছে তা হয়তো তুমি জান না।

ডোরিয়েন বললেন: প্রিয় বেসিল, কীই বা তুমি আমাকে বলেছ? শুধু বলেছ, আমাকে তোমার খুব ভালো লাগে। শালীনতার দিক থেকে ওটা এমন একটা উঁচুদরের নয়।

ভদ্রতা দেখানোর জন্য ওকথা আমি বলিনি। ওটাই আমার স্বীকারোক্তি। ওই স্বীকারোক্তি করার পরে মনে হচ্ছে আমি কিছু হারিয়ে ফেলেছি। পূজা করার কথাটা সম্ভবত মুখ ফুটে বলতে নেই।

এই স্বীকারোক্তি মানুষের মনে আশা জাগায় না বন্ধু।

তা ছাড়া আর কী তুমি আশা কর, ডোরিয়েন? ছবির মধ্যে আর কিছু তুমি দেখনি। দেখেছ কি? আরো কিছু দেখার জিনিস সেখানে রয়েছে?

না। আর কিছু নেই। একথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন? কিন্তু পূজার কথা বলো না। কথাটাই বোকার মতো। আমরা পরস্পরের বন্ধু বেসিল, চিরকাল আমরা বন্ধুই থাকব।

বিষণ্ণ সুরে চিত্রকর বললেন: বন্ধু হিসাবেই তুমি হ্যারিকে পেয়েছ।

ছোটো-ছোটো হাসির ঢেউ-এ ভেঙে পড়ে, ডোরিয়েন বললেন: ও, হ্যারির কথা বলছ? অবিশ্বাস্য কথা বলে সে সারাদিন কাটায়, রাত্রিতে এমন সব কাজ করে যেগুলি অবাস্তব, আমিও ঠিক ওই রকম জীবনই যাপন করতে চাই। তবু আমার মনে হয়, বিপদে পড়লে কোনোদিনই আমি হ্যারির কাছে যাব না; তার আগে যাব তোমার কাছে।

আবার তুমি আমার মডেল হবে?

অসম্ভব।

আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমার চিত্রকরের জীবনটা তুমি নষ্ট করে দিলে, ডোরিয়েন। কোনো মানুষের জীবনে দু'বার আদর্শ আসে না; একবারই খুব কম মানুষই তার আদর্শের সংবাদ পায়।

কারণটা তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, বেসিল। কিন্তু তোমার ছবির মডেল হতে আর আমি পারব না। ছবিটার মধ্যে বিপজ্জনক কিছু রয়েছে। মনে হচ্ছে ছবিটা জীবন্ত। চল, তোমার সঙ্গে চা খাইগে। এ আলোচনা মধুরেণ সমাপয়েৎ করা যাক।

হলওয়ার্ড বললেন: তোমার দিক থেকে মধুরেণ হতে পারে। এখন চলি। ছবিটা যে আর তুমি আমাকে দেখতে দেবে না এই কথা শুনে দুঃখই পেয়েছি। কিন্তু উপায় নেই। ছবিটার সম্বন্ধে তোমার মনোভাব কী তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন হলওয়ার্ড। মনে-মনে হাসলেন ডোরিয়েন গ্রে। হতভাগ্য বেসিল। ছবিটা দেখতে না দেওয়ার আসল কারণটা তিনি জানতেই পারলেন না। আর কী আশ্চর্যের কথা, তাঁর নিজের রহস্য ফাঁস না করে কী অদ্ভুত উপায়েই না তিনি বেসিলের মনের গোপন কথাটি বার করে নিলেন; চিত্রকরের হাস্যোদ্দীপক হিংসা, তাঁর উদ্দাম ভক্তি, অনাবশ্যক স্তুতি,—বেসিলের মনের অনেক অবচেতন মনের রহস্যই তিনি জানতে পারলেন। বেসিলের জন্যে দুঃখ হল তাঁর। রোমান্সের রঙে রঙিন বন্ধুত্বের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হল তাঁর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'বেল' টিপলেন তিনি। যেমন করেই হোক প্রতিকৃতিটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আর কেউ এটিকে দেখতে পারে এ-ঝুঁকি আর তিনি নিতে চাইলেন না। যে ঘরে তাঁর বন্ধুরা আসা-যাওয়া করেন সেই ঘরে ছবিটাকে এক ঘণ্টার জন্যেও রাখাটা তাঁর পাগলামি হয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদ

চাকরটি ঘরে এসে ঢুকতেই একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটা কি পর্দার পেছনে আড়ি পেতে শুনছিল এতক্ষণ? লোকটির মুখের ওপরে কোনোরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। সে নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আরশীর দিকে এগিয়ে গেলেন ডোরিয়েন। তাকিয়ে দেখলেন। ভিকটরের মুখটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল আরশীর ওপরে। চাকরের মুখের মতনই সে মুখ নিবাত-নিষ্কম্প। ভয় করার মতো কিছু নেই সেখানে। তবু তাঁর মনে হল সাবধানে থাকাই ভালো।

ধীরে-ধীরে কথা বললেন ডোরিয়েন: রাঁধুনিকে পাঠিয়ে দাও, তারপরে তুমি ছবির যারা ফ্রেম তৈরি করে সেই দোকানে দুজন মিস্ত্রিকে এখনই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বল।

তাঁর মনে হল, লোকটি চলে যাওয়ার সময় পর্দার দিকে একবার তাকিয়ে গেল। অথবা এটা তাঁর মতিভ্রম?

কিছুক্ষণ পরে কালো পোশাক পরে মিসেস লিফ লাইব্রেরিতে হাজির হল, স্কুলঘরের চাবিকাঠিটা তিনি চাইলেন।

মিসেস লিফ বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করল: পুরনো স্কুলঘরের চাবি চাইছেন, মিঃ ডোরিয়েন? ঘর তো একেবারে ধুলোয় বোঝাই হয়ে রয়েছে। আপনি ঢোকার আগে ঝেড়ে-মুছে ঘরটাকে চলনসই করতে হবে। ওঘরে এখনই আপনি ঢুকতে পারবেন না। স্যার; না, না, নিশ্চয় না।

ঘর ঝাড়-পোঁচ করতে আমি চাইনে, লিফ, আমি যা চাই সেটা হচ্ছে চাবিকাঠি।

কিন্তু স্যার, ঘরের মধ্যে মাকড়শার জাল গিজ গিজ করছে। ঢুকলেই আপনার গোটা গা ভর্তি হয়ে যাবে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে ঘরটা খোলা হয়নি, সেই যেদিন হিজ লর্ডশীপ দেহত্যাগ করেছেন।

দাদামশায়ের কথা উঠতেই তিনি ভ্রূ কুঞ্চিতত করলেন। দাদামশায়ের সম্বন্ধে তাঁর যে স্মৃতি রয়েছে তার মধ্যে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি বললেন: তাতে কিছু যাবে আসবে না। জায়গাটা আমি কেবল দেখতে চাই। চাবিটা আমাকে দাও।

কাঁপা হাতে চাবির বান্ডিল ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা চাবি বার করে বৃদ্ধা লিফ বলল: এই যে গোছা থেকে এখনই এটা আমি বার করে দিচ্ছি। কিন্তু ওখানে আপনি থাকবেন ঠিক করেননি তো? এ ঘরে তো আপনি ভালোই রয়েছেন।

না, না, রাত্রিবাস করার কোনো পরিকল্পনা আমার নেই। ধন্যবাদ, এবার তুমি এস।

কিন্তু তখনই সে চলে গেল না; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সাংসারিক ব্যপার নিয়ে কিছুটা বক-বক করল। তিনি মনে-মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: বেশ তো; তোমার যেটা ভালো মনে হবে সেইভাবেই সংসার চালাও।

মিসেস লিফ চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। চাবিকাঠিটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন ডোরিয়েন; ঘরের ভেতরে চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখলেন।

দেখতে-দেখতে লাল সাটিনের বিরাট একটা চাদরে তাঁর চোখ এসে পড়ল, চারপাশটা তার সোনালি বুটির কাজ, সপ্তদশ শতাব্দীর ভেনিসিয় কারুকলার একটি অপূর্ব নিদর্শন। বোলোগনার কনভেনট থেকে তাঁর দাদামশায় সেটি সংগ্রহ করেছিলেন। হ্যাঁ; সেই ভয়ানক বস্তুটাকে ওই চাদর দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঢাকা দেওয়া যাবে। ওটা দিয়ে প্রায় মৃতদেহগুলিকে ঢাকা দেওয়া হত। এখন ওটা দিয়ে এমন একটা জিনিসকে চাপা দেওয়া হবে যেটা আপনা থেকে বিকৃত হয়ে ওঠে; মৃতদেহের বিকৃতির চেয়েও যার বিকৃতি অনেক বেশি ভয়ঙ্কর—যে নিজে না মরেও চারপাশে মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে দেয়। মৃতদেহের ওপরে পোকারা যে বিকৃতি ঘটায়, তাঁর পাপ ক্যানভাসের ছবিটির ওপরেও সেই রকম বিকৃতি ঘটাবে। তাঁর পাপগুলি ছবিটির সৌন্দর্য নষ্ট করবে, ধ্বংস করে দেবে তার লাবণ্য। একেবারে কদর্য হয়ে যাবে জিনিসটা তবু তর মৃত্যু হবে না; তবু সে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

ভাবতে-ভাবতে তিনি শিউরে উঠলেন। প্রতিকৃতিটাকে ঢেকে রাখার আসল কারণটা তিনি যে বেসিলকে বলেননি সে-জন্যে অনুশোচনা হল তাঁর। লর্ড হেনরির প্রভাব অথবা তাঁর নিজে প্রবৃত্তি থেকে যে সব পঙ্কিল চিন্তাগুলি বেরিয়ে তাঁকে পাপের পথে ঠেলে নিয়ে যেতে চায় সেগুলির প্রভাব থেকে বেসিল হয়তো তাঁকে বাঁচাতে পারতেন। তাঁর ভালোবাসার মধ্যে এমন কিছু নেই যা মহৎ নয়, মননশীলতা যার মধ্যে নেই। কারণ, কোনো খাদ নেই বেসিলের ভালোবাসার ভেতরে। এই ভালবাসা দেহজ নয়। প্রবৃত্তিগুলি ক্লান্ত হয়ে উঠলেই দেহজ ভলোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। মাইকেল এঞ্জেলো, মনতেন উইনকিলম্যান এবং শেকসপীয়র—এঁরা সবাই সেই আসল ভালোবাসারি পূজারী। হ্যাঁ, বেসিলই তাঁকে বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে। এখন আর সে সময় নেই। অতীতকে সব সময় বিনষ্ট করা যায়। অনুশোচনা, আত্মাহুতি আর বিস্মৃতির মধ্যেই কবরস্থ করা যায় অতীতকে। কিন্তু ভবিষ্যতকে এড়ানো যায় না। তাঁর কামনা আর ভোগের উচ্ছ্বাসই তাঁর সামনে বিপদের নতুন পথ খুলে দেবে, আজ যে বিপদ অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে একদিন তাই রূপায়িত হবে ভয়ঙ্কর বাস্তব সত্যে।

সোফার ওপর থেকে তিনি সোনালি কারুকার্য করা বিরাট চাদরটিকে হাতে করে তুলে নিলেন; তারপরে সেটি নিয়ে পর্দার পেছনে চলে গেলেন। ক্যানভাসের ওপরে যে মুখটি আঁকা রয়েছে, আগের সেটি কি আরো কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে? দেখে তো মনে হল কোনোরকম পরিবর্তন দেখা দেয়নি; কিন্তু ছবিটির ওপরে তাঁর ঘৃণার মাত্রাটা যেন আরো বেড়ে গেল। সোনালি চুল, নীল চোখ, গোলাপ-রাঙা দুটি ঠোঁট—সবই সেই আগের মতোই রয়েছে। নেই যা তা হচ্ছে মুখের ভাবটা। একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার ছাপ মুখের ওপরে পড়েছে। সাইবিল ভেনকে নিয়ে বেসিল তাঁকে যে তিরস্কার করেছেন তার তুলনায় এই মুখের তিরস্কার কত বেশি, কত তীব্র। এই ছবির ভেতর থেকে তাঁর নিজের আত্মাই যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছে—এই অন্যায়ের বিচার চাই। একটা যন্ত্রণায় তিনি আর্তনাদ করে চাদরটা ছবির ওপরে ছুঁড়ে দিলেন। ঠিক এমনি সময়ে দরজায় টোকা পড়ল। তিনি বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঘরে চাকরটি ঢুকে এসে বলল: জনকয়েক লোক এসেছেন মঁসিয়ে।

তাঁর মনে হল চাকরটিকে এখনই কোথাও সরিয়ে দিতে হবে। ছবিটা কোথায় রাখা হবে সে সংবাদ তাকে জানতে দেওয়া হবে না। এই উদ্দেশ্যে একটু চালাকি খেলতে হল তাঁকে। লেখার টেবিলে ধীরে সুস্থে বসে তিনি একখানা পত্র লেখার কাগজ টেনে নিলেন; লর্ড হেনরিকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটি লাইন খস-খস করে লিখেও ফেললেন; সেই চিঠিতে পড়ার জন্যে কিছু বই তাঁকে পাঠাতে বললেন, সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন সেদিন রাত আটটা পনেরোর সময় তাঁদের বিশেষ একটি জায়গায় মিলিত হওয়ার কথা রয়েছে।

চিঠিটা চাকরের হাতে দিয়ে বললেন: এটা তুমি লর্ড হেনরির কাছে নিয়ে যাও। তাঁর উত্তরটা নিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করো। ভদ্রোলোকদের আসতে বলে যাও।

দু'তিন মিনিটের মধ্যে আর একটা টোকা পড়ল। হাজির হলেন সাউথ অডলি স্ট্রিটের মিঃ হুবার্ড স্বয়ং। পেশার দিক থেকে বেশ নামকরা ফটো ফ্রেম বাঁধাইকারী। তিনি একলা আসেননি; সঙ্গে এসেছেন রুক্ষ চেহারার একটি যুবক সহকারীকে। চেহারার দিকে ভদ্রলোক বেঁটে; গোঁফ জোড়াটি লাল; পোশাক বেশ জাঁকালো আর্টের ওপরে। তাঁর যে শ্রদ্ধা তার উৎস হচ্ছে যে সব আর্টিস্টের সঙ্গে তাঁর লেনদেনের ব্যাপার ছিল তাঁদের অনেকেরেই চরম দারিদ্র্য। নীতিগতভাবে কোনোদিনই তিনি দোকান ছেড়ে বেরোতেন না। খরিদ্দার বা অন্য লোকদের জন্যে তিনি দোকানেই অপেক্ষা করতেন। কিন্তু ডোরিয়েন গ্রের ব্যাপারে সব সময়েই তিনি এই নিয়ম ভেঙে চলতেন। ডোরিয়েন গ্রে-র মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা মানুষকে মুগ্ধ না করে পারত না। তাঁকে চোখে দেখেও আনন্দ পেত মানুষ।

তাঁর স্থূল হাত দুটিকে কচলিয়ে তিনি বললেন: আপনার জন্যে কী করতে পারি মিঃ গ্রে? ভেবেছিলেম আপনার এখানে আমি একাই আসব। আমার দোকানে অদ্ভুত সুন্দর একটা ছবির ফ্রেম রয়েছে, স্যার। এটাকে একটা সেল-এ কিনেছি আমি। মনে হয়, ফ্লন্টহিল থেকে আমদানি হয়েছে। ধর্ম সংক্রান্ত কোনো কিছু ছবির পক্ষে এই ফ্রেম খুব জুৎসই, স্যার।

মিঃ হুবার্ড, আপনি যে কষ্ট করে নিজেই এসেছেন তার জন্যে আমি দুঃখিত। যদিও ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো আর্ট নিয়ে বর্তমানে আমি মাথা ঘামাইনে তবু আপনার দোকানে একদিন গিয়ে নিশ্চয় আমি ফ্রেমটি দেখে আসব,—কিন্তু আজকে আমার একটি ছবিকে বাড়ির ওপরতলায় নিয়ে যেতে হবে। ছবিটা বেশ ভারী, আপনি যদি জন দুই লোক পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়।

তাতে আর অসুবিধে কী রয়েছে, মিঃ গ্রে? আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারলে আমি খুশিই হব। কোন ছবিটার কথা বলছেন, স্যার?

পর্দাটাকে সরিয়ে ডোরিয়এন বললেন: এইটা। চাপালসুদ্ধু, ঠিক যেমনটি রয়েছে, এটাকে নিয়ে যেতে পারবেন? ওপরে নিয়ে যাওয়ার সময় এর গায়ে কোথাও কোনো ঠোক্কর লাগুক তা আমি চাইনে।

কোনো অসুবিধে হবে না স্যার।

এই বলে সেই লোকটি তাঁর সহকারীকে নিয়ে যে পেতলের শেকল দিয়ে ছবিটি টাঙানো ছিল তার পেরেকটা খুলতে লাগলেন।

এখন কোথায় এটিকে নিয়ে যাব, মিঃ গ্রে?

আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন। জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, মিঃ হুবার্ড। তার চেয়ে আপনিই বরং আগে-আগে চলুন। যেতে হবে বাড়ির একেবারে ওপরতলায়। চলুন আমরা সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাই। সিঁড়িটা বেশ চওড়া।

তাঁদের যাতে বেরিয়ে যেতে অসুবিধে না হয় সেইজন্যে দরজাটা তিনি ফাঁক করে দিলেন। হলঘরের মধ্যে ঢুকে তাঁরা সিঁড়িতে উঠতে লাগলেন। বিশেষ এবং বিশদ খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ রাখার ফলে ছবিটা বেশ ভারী হয়ে পড়েছিল। পাছে সেটা ঠোক্কর লেগে ভেঙে যায় এই

ভয়ে মাঝে-মাঝে ডোরিয়েন ছবিটাকে ধরছিলেন। কিন্তু মিঃ হুবার্ড বিনয়-নম্রভাবে নিষেধ করছিলেন তাঁকে; তাঁর বোধ হয় কারণটা এই যে সত্যিকার ব্যবসাদারের মতো তিনি চাইতেন না কোনো ভদ্রলোক কোনো প্রয়োজনীয় কাজ করুক।

সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে সেই খুদে লোকটি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন: সত্যিকাল ভারী, স্যার।

এই বলে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি।

ঘরের চাবি খুললেন ডোরিয়েন; এই ঘরেই তিনি তাঁর জীবনের একটি অদ্ভুত গোপন রহস্যকে লুকিয়ে রাখতে এসেছেন। সেই সঙ্গে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখবেন নিজের আত্মাটিকেও। দরজাটা খুলে দিয়ে তিনি বললেন: হ্যাঁ, তা বেশ ভারীই বটে।

এই ঘরে জীবনে তিনি বারো বছরের মধ্যে ঢোকেননি। শৈশবে এই ঘরে তিনি খেলতেন; কিছুটা বড়ো হওয়ার পরে এখানে তিনি পড়াশুনা করতেন। ঘরটি বিরাট এবং উপযুক্ত মাপের। বাচ্চা নাতির জন্যেই মৃত লর্ড কেলসো ঘরটিকে তৈরি করিয়েছিলেন। ছেলেটির মধ্যে তার মায়ের চেহারার ছাপ থাকায় এবং অন্যান্য কারণে, ছেলেটিকে সব সময় তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। বিশেষ করে সেইজন্যেই ছেলেটিকে তিনি তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। ডোরিয়েনের মনে হল ঘরটির কিছুই পরিবর্তন হয়নি। তার গঠন, আসবাবপত্র—সব একইরকম রয়েছে। সাটিনের তৈরি বুককেসের মধ্যে এখনো তাঁর স্কুলের বইগুলি সাজানো রয়েছে। তার পেছনে দেওয়াল। সেই দেওয়ালের ওপরে অপরিচ্ছন্ন একটা পর্দা। পর্দায় গায়ে একটি রাজা আর রানির অস্পষ্ট ছবি; বাগানে বসে তাঁরা দাবা খেলছেন। পাশের রাস্তা দিয়ে কয়েকটি ফিরিওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। তাদের কব্জির ওপরে শেকল বাঁধা কয়েকটা ঝুঁটিওয়ালা পাখি। সব মনে রয়েছে তাঁর—স্পষ্ট মনে রয়েছে। ঘররে চারপাশে তিনি তাকিয়ে দেখলেন। শৈশবের প্রতিটি নিঃসঙ্গ মুহূর্ত তাঁর মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল তাঁর শৈশবের নিষ্পাপ দিনগুলির কথা। সেই ঘরের মধ্যে এই ধরনের যে একটা বিষাক্ত ছবিকে লুকিয়ে রাখতে হবে এটা ভাবতেই তাঁর মনটা আঁতকে উঠল। তাঁর কপালে এই লেখা রয়েছে—একথা কি কোনোদিন তিনি ভাবতে পেরেছিলেন?

কিন্তু কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখার মতো এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। চাবিটা তাঁর কাছে রয়েছে। সেই জন্যে অন্য কেউ সেখানে ঢুকতে পারবে না। এই লাল চাদরের নীচে প্রয়োজন মনে করলে ছবির মুখটা তার খুশি মতো পাশবিক মূর্তি গ্রহণ করতে পারে। তাতে কার কী যায় আসে? কেউ তা দেখতে আসবে না। নিজেও তিনি তা দেখবেন না। তাঁর আত্মার এই ভয়ঙ্কর বিকৃতি কেনই বা তিনি লক্ষ করবেন? তাঁর যৌবন বেঁচে থাকবে এইতো যথেষ্ট। তাছাড়া, তাঁর চরিত্র কি শেষ পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে না? তাঁর ভবিষ্যৎটাও যে এই রকমেরই ক্লেদাক্ত থেকে যাবে এর পেছনেও তো কোনো কারণ নেই। নতুন কোনো প্রেম তাঁর ভেতরে দেখা দিতে পারে; সেই প্রেম তাঁকে পবিত্র করে তুলবে এং যে পাপ তাঁর দেহ আর মনকে এমনভাবে ঝাঁকানি দিয়েছে—সেই অদ্ভুত অদৃশ্য পাপ যাকে আমরা বুঝতে পারিনি বলেই মনোহর বলে মনে করি—সেই পাপ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারে। সেই রক্তিমাভ স্পর্শকাতর মুখ থেকে হয়তো একদিন সেই নির্মম চাহনিটি মুছে যাবে এবং বেসিল হলওয়ার্ডের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিটিকে তিনি বিশ্বকে দেখাতে পারবেন।

না, সে অসম্ভব। ঘন্টার পর ঘন্টা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, ছবিটির ওপরে বার্ধক্যের ছাপ পড়বে। পাপের ভয়ঙ্কর বিকৃতি থেকে ও মুক্তি পেতে পারে; কিন্তু বয়সের বিকৃতি থেকে ওর কোনো মুক্তি নেই। গাল দুটি চুপসে যাবে, হবে থলথলে; হলদে রঙের ছায়া নেমে নিঃশব্দে ছড়িয়ে

পড়বে নিষ্প্রভ দুটি চোখের কোটরে, বীভৎস দেখাবে তাদের। চুলগুলি হারিয়ে ফেলবে তাদের উজ্জ্বল বর্ণ, মুখের চোয়াল পড়বে ঝুলে, বৃদ্ধদের মুখের মতো সেই মুখ বোকাটে-বোকাটে দেখাবে। কন্ঠে জাগবে কুঞ্চন, ঠান্ডা হাত দুটির ওপরে নীল শিরাগুলি জেগে উঠবে; দেহটা ভেঙে কুঁজো হয়ে যাবে। শৈশবে যে দাদামশায় তাঁর চোখে অত কঠোর প্রকৃতির ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে তিনিও ঠিক ওই জাতীয় প্রাণীতে পরিণত হয়েছিলেন। বেশ মনে রয়েছে তাঁর। সুতরাং ছবিটাকে লুকিয়ে ফেলতেই হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই তাঁর।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ ক্লান্ত স্বরেই তিনি বললেন: ওটাকে ভেতরে নিয়ে আসুন, মিঃ হুবার্ড, আপনাদের অনর্থক দাঁড় করিয়ে রাখরা জন্যে দুঃখিত, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

মিঃ হুবার্ড পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছিলেন; তিনি বললেন: একটু বিশ্রাম পেয়ে ভালোই হয়েছে, মিঃ গ্রে। এটাকে কোথায় রাখব বলুন তো?

যে কোনো জায়গায়। এখানে, এখানে-ও রাখা যেতে পারে। আমি এটাকে ঝুলিয়ে রাখতে চাই নে। দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখুন। ধন্যবাদ।

কিন্তু ছবিটা কেউ দেখতে চাইতে পারে স্যার!

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন মিঃ ডোরিয়েন; লোকটির দিকে চোখ রেখে বললেন: ওটা দেখতে আপনার ভালো লাগবে না।

যে জাঁকালো পর্দাটা তাঁর জীবনের একটি গোপন রহস্যকে ঢেকে রেখেছে, লোকটি যদি সেই পর্দাটা একটু সরিয়ে ছবিটি দেখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে তাহলে তাঁকে আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়ার একটা বাসনা তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল।

আর আপনাকে কষ্ট দেব না। আপনি যে দয়া করে এসেছেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোটেই না, মোটেই না, মিঃ গ্রে। আপনার জন্যে সব সময়ে সব কাজ করতে আমরা প্রস্তুত।

এই বলে মিঃ হুবার্ড তাঁর সহকারীকে পেছনে নিয়ে নামার পথ ধরলেন। নামার পথে সহকারীটি তার সেই রুক্ষ আর বিশ্রী মুখ ঘুরিয়ে লজ্জা আর সেই সঙ্গে কিছুটা বিস্ময় মখানো দৃষ্টি দিয়ে পেছনে ফিরে ডোরিয়েনের দিকে একবার তাকাল। এমন অপরূপ চেহারার মানুষ, আর কোনো দিন তার চোখে পড়েনি।

তাদের পদশব্দ নীচে মিলিয়ে যাওয়ার পরে, দরজায় চাবি দিয়ে চাবিকাঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন ডোরিয়েন। এখন অনেকটা নিরাপদ মনে হল তাঁর। এই ভয়ঙ্কর জিনিসটা আর কারও চোখে পড়বে না। নিজের ছাড়া আর কারও চোখ তাঁর এই লজ্জার ওপরে পড়বে না।

লাইব্রেরিতে নেমে আসার পরে তিনি দেখলেন পাঁচটা বেজে গিয়েছে। টেবিলের ওপরে চা-এর সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক দিয়ে গাঁথা সুগন্ধী কাঠের তৈরি ছোট্ট একটা টেবিলের ওপরে লর্ড হেনরির একটা চিঠি চাপা রয়েছে। তাঁর অভিভাবকের পত্নী লেডি ব্যাডলে টেবিলটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা গত শীতে কায়রোতে ছিলেন। লর্ড হেনরির চিঠির পাশে হলদে কাগজে মোড়া একখানা বই রয়েছে। বইটির মলাট সামান্য ছেঁড়া, বাঁধাইটা নোংরা। চা-এর ট্রের ওপরে দি সেন্ট জেমস গেজেটের তৃতীয় সংস্করণের একটি কপি চাপা দেওয়া। স্পষ্টতই বোঝা গেল যে ভিকটর ফিরে এসেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে দুজনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কিনা এবং হলে তাদের কাছ থেকে সে কোনো তথ্য সংগ্রহ করেছে কি না এটাই তিনি ভাবতে লাগলেন। ঘরের মধ্যে চা-এর সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখার সময় সম্ভবত ছবিটিকে সে দেখতে পায়—সম্ভবত নয়, নিশ্চয়। পর্দাটাকেও সে ঠিক করে রাখেনি। ফলে দেওয়ালের সামনের জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। হয়তো কোনো রাত্রিতে লোকটা গুঁড়ি দিয়ে ওপরে গিয়ে দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করবে। ঘরের ভেতরে গুপ্তচর রাখাটা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। তিনি এমন কিছু ধনী মানুষদের কথা শুনেছেন যাদের বাড়ির চাকর চিরকাল তাঁদের ব্ল্যাকমেইল করেছে; কারণ তাঁদের কোনো গোপন চিঠি তারা পড়ে ফেলেছিল, অথবা, মনিবের কিছু কথা তারা আড়ি পেতে শুনেছিল, অথবা ঠিকানা লেখা কোনো কার্ড তাদের হাতে পড়েছিল, অথবা বালিশের তলায় পাক বাঁধা কোনো চুলের ফিতে আবিষ্কার করে ফেলেছিল। এই জন্যে চাকরদের অনেক ঘুষ খাওয়াতে হয়েছে তাঁদের।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপরে চা ঢেলে লর্ড হেনরির চিঠিটা খুললেন। চিঠিতে কেবল লেখা ছিল যে সন্ধ্যার কাগজটা তিনি পাঠিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে পড়তে যদি ভালো লাগে এই আশায় একখানি বই-ও পাঠালেন। তিনি যে তাঁর জন্যে ক্লাবে আটটা পনেরোতে অপেক্ষা করবেন সেকথা লিখতেও ভোলেননি তিনি। খবরের কাগজের পাতাগুলি উদাসীনভাবেই উলটোচ্ছিলেন তিনি; হঠাৎ পঞ্চম পৃষ্ঠার একটি কলামে লাল পেনসিলের দাগ কাটা থাকায় তাঁর কৌতূহল কেমন বেড়ে গেল। তিনি সেটা পড়ে গেলেন।

"একটি অভিনেত্রীর মৃত্যুর সম্বন্ধে তদন্ত: হক্সটন রোডে বেল ট্র্যাভার্ন-এ ডিস্ট্রিক্ট করোনার মিঃ ডানবি আজ সকালে সাইবিল ভেন নাম্নী একটি যুবতী অভিনেত্রীর মৃত্যুর কারণ বার করার জন্যে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। অভিনেত্রীটি হলবর্ন-এ রয়্যাল থিয়েটারে অভিনয় করতেন। নিছক একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এই মতই তিনি দিয়েছেন। মৃতার মা যখন সাক্ষী দিতে এসেছিলেন তখন এই বিয়োগের জন্যে অনেকেই তাঁর দুঃখে

সহানুভূতি দেখান। ডঃ বিরেল ময়না তদন্ত করেন। তাঁর সাক্ষী দেওয়ার সময়েও শ্রোতারা গভীর দুঃখে ভেঙে পড়েন।"

লেখাটা পড়ে ভ্রূকুটি করলেন তিনি, কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন, তারপরে জানালার বাইরে সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কী কুৎসিত! কী ভয়ঙ্কর রকমের কদর্য! সংবাদটা তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে লর্ড হেনরির ওপরে তাঁর রাগ হল। তাছাড়া সংবাদটার চারপাশে লাল পেনসিল দিয়ে দাগ কেটে দেওয়াটাও নেহাৎ বোকামো হয়েছে। ভিকটর নিশ্চয় তা পড়েছে। ওটা পড়ে বোঝার চেয়ে অনেক বেশি ইংরেজি সে জানে।

সম্ভবত সে ওটি পড়েছে; এবং পড়ে কিছু সন্দেহ করতে শুরু করেছে। কিন্তু তাতেই বা কী আসে যায়? সাইভিল ভেনের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? না, কোনো ভয় নেই। ডোরিয়েন গ্রে তাকে মারেননি।

লর্ড হেনরি যে হলদে বইটা পাঠিয়েছেন। সেই বইটার ওপরে নজর পড়ল তাঁর। বস্তুটা কী? তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন। ধূসর বর্ণের ছোটো অষ্টভুজ দাঁড়ানো বই রাখার জায়গাটার দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। দেখে সব সময় তাঁর মনে হত ইজিপ্টের কোনো শ্রমশীল মিস্ত্রি ওটিকে তৈরি করেছেন। গ্রন্থটিকে তুলে নিয়ে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি, তারপরে পড়ায় গেলেন ডুবে। ওরকম অদ্ভুত বই জীবনে আর কখনো তিনি পড়েননি। তাঁর মনে হল বাঁশীর মিষ্টি সুরের সঙ্গে তাল দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত পাপ নির্বাকভাবে নাচতে-নাচতে তাঁর সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে জিনিসগুলি তিনি কল্পনায় দেখতেন সেগুলি যেন হঠাৎ রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর সামনে উপস্থিত হল। যে জিনিসটা কোনোদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি সেই জিনিস ধীরে-ধীরে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল।

ওটি একটি উপন্যাস; কিন্তু প্লট বলে কিছু ওর নেই। চরিত্র বলতে একটিই—সেটি হচ্ছে প্যারিসের একটি যুবকের। ওটিকে একটি মনস্তত্ত্বমূলক গ্রন্থ বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই যুবকটি একমাত্র তার নিজের যুগ ছাড়া অন্য সমস্ত যুগের ভাবধারা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ সেই সব কৃত্রিম আত্মত্যাগ যেগুলিকে মানুষ চিরকাল পুণ্য বলে ভুল করেছে অথবা মানুষের সেই সব স্বাভাবিক বিদ্রোহ যাদের মানুষ অবিবেচকের মতো পাপ বলে প্রচার করেছেন সেইগুলি আসলে কী তাই নিয়ে সে সারাজীবনটা গবেষণা করেছিল। ভাষাটি গুরুগম্ভীর, মুক্তোর ঝালরের মতো তা প্রাচীন ব্যঞ্জনা আর আঙ্গিকে খোদাই করা। মাঝে-মাঝে বিশেষ অর্থে বিশেষ শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা বেশ স্পষ্ট। সেই সঙ্গে রয়েছে বিশদ ব্যাখ্যা। জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকরা বিশেষ করে ফ্রান্সে যাঁদের সিম্বোলিস্ট বলা হয়, এই জাতীয় দুর্বোধ্য রচনার ভেতর দিয়েই স্বীকৃতি লাভ করেছেন। অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে দিয়ে রক্তমাংসের প্রবৃত্তিগুলিকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে এখানে। পাঠক বুঝতে পারে না সে মধ্যযুগের কোনো সাধুর আধ্যাত্মিক কোনো বক্তৃতা পড়ছে, না আধুনিক কোনো রুগ্ন পাপীর স্বীকারোক্তি পড়ছে। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বিষাক্ত। ঘরের মধ্যে ধূপের ভারী গন্ধ বইটির পাতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর চিন্তাধারাটিকে কিছুটা বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ভাষার ছন্দ আর বর্ণনার ঝঙ্কার তাঁর মনে এমন একটি সুর জাগিয়ে তুলেছিল যে তিনি সব ভুলে একটি পরিচ্ছেদের পর আর একটি পরিচ্ছেদ অবলীলাক্রমে পড়ে যেতে লাগলেন।

মেঘমুক্ত আকাশ থেকে ধীরে-ধীরে অন্ধকার নেমে এল, জানালার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। সেই অস্পষ্ট আলোতে তিনি আরো কিছুক্ষণ পড়তে চেষ্টা করলেন; শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। এর মধ্যে তাঁর চাকরটি বারবার এসে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে সচেতন করে দিয়ে গিয়েছে। শেষকালে একসময় তিনি উঠে পড়লেন এবং বইটি তাঁর শোওয়ার ঘরে রেখে

ডিনারের জন্যে তৈরি হলেন।

ক্লাবে গিয়ে পৌঁছতে তাঁর প্রায় রাত নটা বেজে গেল। তিনি দেখলেন লর্ড হেনরি যথারীতি সেখানে বসে রয়েছে। মুখে তাঁর বেজারের চিহ্ন।

তিনি বললেন: দেরি হওয়ার জন্যে আমি সত্যিই বড়ো দুঃখিত, হেনরি। কিন্তু তুমি যে বইটা আমাকে পাঠিয়েছ সেটি পড়তে গিয়ে আমি কেমন যেন মশগুল হয়ে পড়েছিলাম। সময়ের জ্ঞান আমার ছিল না।

চেয়ার থেকে উঠে লর্ড হেনরি বললেন: আমি জানতাম, বইটি তোমার ভালো লাগবে।

ভালো লেগেছে সেকথা আমি বলিনি, হ্যারি; বলেছি আমাকে বইটি একেবারে অভিভূত করে তুলেছিল। দুটি কথার মধ্যে প্রভেদ রয়েছে।

দুজনে ডাইনিং রুমের দিকে যেতে-যেতে লর্ড হেনরি বললেন: তাই বুঝি! তুমি তাহলে তফাৎটা বুঝতে পেরেছ?

একাদশ পরিচ্ছেদ

তারপরে দীর্ঘ কয়েকটি বছর বইটির প্রভাব থেকে ডোরিয়েন গ্রে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি; নিজেকে মুক্ত করতে চাননি বললেই হয়তো কথাটা ঠিক বলা হবে। বইটির প্রথম সংস্করণের বড়ো-বড়ো প্রায় নটি কাগজের মোড়াই কপি তিনি প্যারিস থেকে আনলেন; বিভিন্ন রঙের কভার দিয়ে সেগুলিকে বাঁধালেন। যে-সব বাসনা-কামনার হাতে নিজেকে তিনি বন্দী করে ফেলেছিলেন, বিভিন্ন ঋতুতে তাদেরই খুশি করার জন্যে তাঁর এই প্রচেষ্টা তাঁকে বেশ কিছুদিন একেবারে মশগুল করে রেখেছিল। প্যারিসের অধিবাসী সেই নায়কের রোমান্টিক এবং বৈজ্ঞানিক ভাবধারার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর জন্মের অনেক আগে থাকতেই তাঁরই জীবনের কাহিনি নিয়ে কে যেন উপন্যাসটি রচনা করে গিয়েছেন।

উপন্যাসের সেই অদ্ভুত নায়কের চেয়ে একদিন থেকে তিনি বেশি ভাগ্যবান ছিলেন। আয়না, পালিশকরা চকচকে ধাতব জিনিস, অথবা শান্ত পরিষ্কার জল খুব অল্প বয়স থেকেই ওই নায়কের মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভীতির সৃষ্টি করেছিল। তাঁর দেহের সৌন্দর্য হঠাৎ নষ্ট হয়ে যাওয়াটাই এই ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এসব দিক থেকে ডোরিয়েন নির্ভয় ছিলেন। বইটির শেষ দিকের অংশটি তিনি একটা নির্দয় আনন্দের সঙ্গে পড়তেন—সম্ভবত, প্রতিটি আনন্দে আর আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই কিছু-না-কিছু নির্মমতা রয়েছে; অথচ, কিছুটা আতিশয্য থাকা সত্ত্বেও, এই অংশটিই সত্যিকার বড়ো করুণ। এইখানেই নায়ক একটি অবশ্যম্ভাবী বস্তুর সত্যের সামনা-সামনি এসে পড়েছেন; সেই সত্যটি হচ্ছে সৌন্দর্যের মৃত্যু। বিশ্বের সকলেই যে বস্তুটিকে সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করে সেই বস্তুটিই তিনি যে দিন-দিন হারিয়ে ফেলছেন এই নিষ্ঠুর সত্যটা নায়ককে নৈরাশ্যের অন্ধকারে দিশেহারা করে তুলেছে।

কারণ, যে অপরূপ সৌন্দর্য বেসিল হলোয়ার্ড এবং অনেক মানুষকেই মুগ্ধ করেছিল সেই সৌন্দর্য তাঁর অটুট ছিল। কুৎসাই বলুন অথবা ফিসফিসানিই বলুন, লন্ডন শহরে, ক্লাবে, বারে তাঁকে নিয়ে যারা দিনরাত মুকরোচক আলোচনা করত, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র সেই সব মানুষরা সব ভুলে যেত; তারা ভাবতেই পারত না যে এমন একটি অপরূপ মানুষ কোনোরকম নিন্দনীয় কাজ করতে পারেন। তাঁর চেহারা দেখলে মনে হত তিনি একটি নিষ্পাপ কুসুম ছাড়া আর কিছু নন। কালিমার কোনো ছাপই তাঁর মুখের ওপরে পড়েনি। বরং একটা পবিত্রতার ছায়া তাঁর মুখটিকে স্নিগ্ধ করে রেখেছিল। সেই দেখেই কুৎসা রটনাকারীরা লজ্জিত হত, কেমন করে ওই রকম অপরূপ চেহারার একটি যুবক পৃথিবীর হাজার ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত থাকতে পারে একথা ভেবেই তারা অবাক হয়ে যেত।

মাঝে-মাঝে অনেক দিন ধরে শহর থেকে টানা তিনি অনুপস্থিত থাকতেন। কোথায় যেতেন, কী করতেন সে-বিষয়ে কেউ কিছু জানত না। ওই নিয়ে নানান লোকে নানান গুজব ছড়াত, বিশেষ করে তাঁর বন্ধু আর বান্ধবীরা। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি ফিরে আইসতেন, প্রায় নিঃশব্দে ওপরে উঠে দরজার চাবি খুলতেন। তারপরে একটা আয়না নিয়ে তিনি বেসিলের আঁকা সেই প্রতিকৃতিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। প্রতিকৃতিটির মুখের ওপরে পাপের যে ক্লেদাক্ত চিহ্নগুলি ফুটে উঠেছে, একবার তিনি সেইগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতেন, একবার দেখতেন আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত নিষ্পাপ সুন্দর তাঁর নিজের মুখটাকে। দেখে হাসতেন। দুটির মধ্যে তীব্র পার্থক্য তাঁর আনন্দ বাড়িয়ে দিত। ক্রমশ তিনি যেমন নিজের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়লেন, তেমনি আগ্রহী হলেন নিজের আত্মার অধঃপতনে। পাপের এবং

বয়সের যে ছাপগুলি প্রতিকৃতিটির কুঞ্চিত কপালের ওপরে বীভৎস হয়ে ফুটে উঠেছিল, বিকৃত করেছিল মুখের আদলটিকে সেইগুলি তিনি বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন, দেখে মাঝে-মাঝে একটা পাশবিক আনন্দে তাঁর মন নেচে উঠত। ছবিটির খসখসে মোটা হাতের পাশে নিজের পরিচ্ছন্ন হাত রেখে তিনি হাসতেন। সেই বিকৃত দেহ এবং বিবশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে বিদ্রূপ করতেন তিনি।

রাত্রিতে মাঝে-মাঝে তাঁর ঘরে সুন্দর বিছানায় যখন তিনি একা শুয়ে থাকতেন অথবা ডকের পাশে নোংরা ছোটো বস্তীর ঘরে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে এবং গোপনে যখন তিনি রাত্রিবাস করতেন, প্রায়ই বেশ্যালয়ে যাওয়াটা যখন তাঁর কেমন একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তখন মাঝে-মাঝে আত্মার অধঃপতনে তাঁর কেমন যেন একটা দুঃখ হত; এই দুঃখে তাঁর একান্ত ব্যাক্তিগত বলেই তা এত তিক্ত। কিন্তু এ রকম চিন্তাও তাঁর মনে খুব একটা বেশি আসত না। বেসিলের বাগানে বসে লর্ড হেনরি তাঁর মনে জীবনের যে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিলেন সেই কৌতূহলই তাঁর বাড়তে লাগল আর সেই কৌতূহল যত তাঁর মিটতে লাগল ততই তিনি খুশি হতে লাগলেন। যতই তিনি জানতে লাগলেন ততই তাঁর জানার আগ্রহ বাড়তে লাগল। সেই বাসনার পূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে নতুন বাসনা দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল।

কিন্তু তবু সত্যি কথা বলতে কি সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার দিক থেকে তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। শীতকালে মাসে দু'বার কি একবার এবং বুধবার সন্ধ্যার সময় বাড়িতে তাঁর গানের জলসা বসত; সেই জলসায় কেবল বিদগ্ধ মানুষদেরই তিনি আপ্যায়িত করতেন না, সে-যুগের বিখ্যাত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতকারদেরও নিমন্ত্রণ জানাতেন; তাঁরা তাঁদের সঙ্গীতে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করতেন। মাঝে-মাঝে তিনি ছোটোছোটো ভোজ দিতেন। এই কাজে লর্ড হেনরি অবশ্য সব সময়েই তাঁকে সাহায্য করতেন। এখানেও সেই একই ব্যাপার; নিমন্ত্রিত থেকে শুরু করে খাবার টেবিল, ঘর সাজানো এবং খাদ্যের তালিকা প্রস্তুতিতে তিনি যথেষ্ট সুরুচি এবং শিল্পকলার পরিচয় দিতেন। সেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায় তাঁর মধ্যে ইটন অথবা অক্সফোর্ডের আভিজাত্য খুঁজে পেতেন।

এবং একথা বললে অযৌক্তিক হবে না যে জীবনটাই তাঁর কাছে ছিল প্রথম আর শ্রেষ্ঠ—সকল কলার শ্রেষ্ঠ কলা; অন্য সমস্ত কলা সেই জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করার প্রস্তুতি মাত্র। সত্যিকার আজগুবি জিনিস ফ্যাশানের মাধ্যমেই সর্বজনীন হয়ে দাঁড়ায়; আধুনিক সৌন্দর্যকে জোর করে জাহির করাকেই বলা হয় বাবুগিরি। এই দুটি জিনিসই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর পোশাকের গঠন এবং পোশাক পরার রীতিটি তখনকার "মেফেয়ার বল" এবং "পল মল" ক্লাবের যুবক সম্প্রদায়ের মনে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তারা সবাই তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত।

জনসাধারণের দেওয়া এই সম্মান তিনি গ্রহণ করেছিলেন। লন্ডনের বিভিন্ন ক্লাবে তিনি যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এই ভেবে তিনি বেশ আনন্দ পেতেন। জীবনের সম্বন্ধে তিনি কিছু নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন, প্রচার করেছিলেন কিছু নতুন নীতি এবং এদেরই মাধ্যমে পূর্ণ সম্ভোগের প্রয়োজনে কী করে প্রবৃত্তিগুলিকে আধ্যাত্মিকতার পথে পরিচালিত করা যায় সে পথও বাতলে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেছিলেন।

প্রায় এবং ন্যায়তভাবেই প্রবৃত্তির পূজাকে মানুষ প্রশ্রয় দেয়নি; কারণ, ভোগলালসা মানুষকে

তার দাসে পরিণত করে, খর্ব করে তাদের ব্যক্তিত্বকে। এরই জন্যে তার ওপরে মানুষের একটা ভীতি জন্মেছে। তাছাড়া, তারা মনে করে সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনযাপনের পথে এই ভোগলালসা বিপজ্জনক একটা অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু ডোরিয়েনের মতে প্রবৃত্তির আসল রূপ আর চরিত্র বলতে ঠিক কী বোঝায় তা অনেকেই জানে না। অভুক্ত রেখে পৃথিবী মানুষকে তার দাস করতে চায় বলেই সে চিরকালই বন্য পশুই রয়ে গেল; তার মনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো না জ্বালিয়ে, সৌন্দর্য উপভোগ করাটাই যে মানুষের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত এই শিক্ষা না দিয়ে পৃথিবী তাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করতে চায় বলেই না তার পাশবিক প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাস আলোচনা করে তিনি ক্ষতির অনুভূতিতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কত অর্থহীন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কত বড়ো জিনিসই না মানুষকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। ইচ্ছা করে মানুষ উন্মাদের মতো অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, অনেক নির্যাতন করেছে নিজেকে; তাদের মধ্যে সুস্থ কোনো জীবনবেদ অথবা বোধ নেই; যে-সব কাজ করলে তার অধঃপতন ঘটতে পারে বলে সে মনে করে তার চেয়ে অনেক বড়ো অধঃপতনকে সে মেনে নিয়েছে জীবনের এই নেতিবাচক উপলব্ধিতে। যে অজ্ঞতাকে সে এড়াতে চেয়েছে জীবনের বিরাট ভাঁওতাকে পাকে-প্রকারে তাকে সেই অজ্ঞতার কূপে নিক্ষেপ করেছে। যারা ঘরে থাকতে চায় প্রকৃতি তাদের পাঠিয়েছে মরুভূমিতে—সেইখানে তারা বন্য জন্তুদের সঙ্গে বাস করেছে; আবার সঙ্গীর অভাব পূর্ণ করার জন্যে ঋষির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বন্য প্রাণীদের। একে প্রকৃতির এক নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যায়?

হ্যাঁ, পূর্ণ উপভোগরে জন্যে, লর্ড হেনরিও সেই রকমই আশা করেন, জীবনটাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে; সেই নির্মম, অশোভনীয় কৃচ্ছ্রসাধনা, আধুনিক যুগে যে আবার মানুষের সমাজে কায়েমী হয়ে বসেছে, তাকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। বোধের দিক থেকে, যুক্তিবাদের দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা কিছুটা স্বীকৃতি পেলেও, এমন কোনো নীতি মানুষের থাকা উচিত নয় যা তার স্বাভাবিক কামানাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়; সেই সঞ্চয়ের ফল ভালো কি মন্দ তা যাচাই করা নয়। কৃচ্ছ্রসাধন মানুষের প্রবৃত্তিগুলিকে বিনষ্ট করে বলেই, অথবা ব্যভিচার মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে ভোঁতা করে দেয় বলেই, ওই দুটি জিনিসকেই মানুষের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। জীবন নশ্বর—মহাকালের একটি মুহূর্ত। সত্যিকার সুস্থ জীবনবোধের নীতি হবে এই সহজ কথাটা তাকে জানিয়ে দেওয়া। দান্তের মতে সৌন্দর্যের পূজা করে যাঁরা পূর্ণতা অর্জন করেছেন তিনি নিজেকে জনসাধারণের কাছে সেইভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। গয়তিয়ারের মতো দৃশ্যমান জগৎটিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি।

আমাদের মধ্যে এমন কেউ-কেউ রয়েছেন যাঁরা প্রভাতের আগে জাগেন না। জাগেন না যে তার কারণ হচ্ছে হয় তাঁরা স্বপ্নহীন অবস্থায় সারা রাত মরার মতো ঘুমোন, অথবা সারা রাতই তাঁরা ভীতির আতঙ্ক মাঝে-মাঝে আঁতকে ওঠেন, বিকৃত আনন্দে মুষড়ে থাকেন। এই সময়ে তাঁদের মাথার মধ্যে বাস্তবের চেয়ে অনেক বিপজ্জনক ভৌতিক ছায়ারা ঘুরে বেড়ায়, প্রবৃত্তিগুলি সারা রাত ধরে তৈরি করে কল্পনার মিনার। দিবাস্বপ্ন দেখার নেশা যাঁদের রেয়েছে তাঁদেরই মন এইভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। সাদা আঙুলগুলি ধীরে-ধীরে মশারির ভেতর দিয়ে নড়তে থাকে; ভয়ে-আশঙ্কায় কাঁপতে থাকেন তাঁরা। কিম্ভূতকিমাকার কালো-কালো চেহারার ছায়াগুলি ঘরের এক কোণে গুঁড়ি দিয়ে ঢোকে, চুপচাপ বসে অপেক্ষা করে। বাইরে তখন পাখির কাকলি জেগে ওঠে, মানুষ কাজকর্ম শুরু করে, পাহাড়ের গা বেয়ে মৃদু বাতাসের তরঙ্গে কার যেন ফোঁপানির শব্দ শোনা যায়; নিস্তব্ধ ঘরটির চারপাশে তারা ঘুরে বেড়ায়; যেন ঘুমন্ত মানুষটিকে জাগিয়ে দিতে তারা ভয় পাচ্ছে। তবু তাকে জাগাতেই হবে। কর্মমুখর জগতে আর বেশিক্ষণ তাদের ঘুমিয়ে থাকাটা ভালো দেখায় না। ধীরে-ধীরে চারপাশের কুয়াশা কেটে যায়;

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে জেগে ওঠে প্রকৃতি; প্রাচীন ঢঙে পৃথিবীটাকে আমরা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। নিষ্প্রভ আয়নার বুকে জীবনের প্রতিবিম্ব ফুটে বেরোয়। নিবে-যাওয়া বাতিগুলি যে জায়গায় আমরা রেখেছিলেন ঠিক সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের পাশে অনাদরে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বই। ঘুমিয়ে পড়ার আগে এই বই হয়তো তাঁরা পড়ছিলেন। রাত্রির আসরে যে ফুলগুলি নিয়ে আমরা আনন্দ করেছিলেম সেই ফুলগুলি শুকিয়ে গিয়েছে, যে চিঠি আমরা পড়তে ভয় পাই অথবা অনেকবার পড়েছি সেটি হয়তো বিছানার ওপরে পড়ে রয়েছে। রাত্রির অবাস্তব ছায়ার মধ্যে থেকে আমাদের পরিচিত জগৎটি ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে। যেখান থেকে আমরা চলে এসেছিলেম আবার সেখান থেকে শুরু করি। আবার আগের মতোই গতানুগতিকভাবে দৈনন্দিন জীবন আমাদের যাপন করতে হবে এই অনস্বীকার্য সত্যটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় অথবা আমরা এই ভেবে চোখ খুলি যে নতুন একটি পৃথিবী নতুন আশা নিয়ে আমাদর কাছে প্রতিভাত হবে অথবা আমাদের আনন্দের জন্যেই সেই পুরনো আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি নতুন রঙে সাজিয়ে তুলবে নিজেদের।

এই রকম একটি জগৎই ডোরিয়েনের কাছে সত্য ছিল অথবা জীবনে যা-যা আমরা পেতে চাই তাদের মধ্যে ছিল একটি এবং এই নতুন অথচ মেজাজি অনুভূতির সন্ধানে তিনি এমন কয়েকটি চিন্তার আশ্রয় নিলেন যেগুলি তাঁর কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল। তিনি তা জানতেনও কিন্তু তাদের প্রভাবের মধ্যে তিনি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপরে কৌতূহল চরিতার্থ হওয়ার পরে তিনি সেগুলিকে চরম ঔদাসীন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। মানসিক অবস্থার দিক থেকে এইটাই ছিল তাঁর মতো চরিত্রের মানুষের কাছে একমাত্র স্বাভাবিক জিনিস; অন্তত কিছু আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা সেই কথাই বলেন।

একবার গুজব রটে গেল যে তিনি রোমান ক্যাথলিক প্রার্থনায় আসা-যাওয়া করছেন। সত্যি কথা বলতে কি রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় রীতিনীতিগুলি তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিল। কেন? কারণ একানকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে প্রতিদিন যে আহুতি দেওয়া হত, প্রাচীন যুগের সমস্ত নির্মম বলিদানের চেয়েও ত কঠোর; তাছাড়া, এখানে যাতায়াত করার পেছনে আরো একটা উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। সেটাই হচ্ছে, মানুষের জীবনের যে অনন্ত ট্র্যাজিডি প্রকাশ করার জন্যে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে—এখানে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। এখানে গিয়ে তিনি মার্বেলে বাঁধাই মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে ভালোবাসতেন; ভালোবাসতেন পাদরীদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করতে। ফুলের নক্সা কড়া ইস্ত্রিকরা ঢিলে জামা পরে পাদরী তাঁর সাদা হাত নেড়ে-নেড়ে মন্দিরের পর্দার পাশে ঘুরে বেড়ান; মাঝে-মাঝে যিশুকে উদ্দেশ্য করে নিজের পাপের জন্যে নিজের বুকের ওপরে তিনি আঘাত করেন—এই সব দেখতে তিনি ভালোবাসতেন। গির্জা থেকে বেরিয়ে আসার সময় কখনো বা কালো পোশাক পরা মানুষদের অবাক হয়ে তিনি দেখতেন, কখনো-কখনো ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় তাদেরই পাশে বসে তাদের জীবনের অসংলগ্ন টুকরো-টুকরো কাহিনি শুনতেন।

কিন্তু কোনো বিশেষ নীতি অথবা রীতির পরিপোষক হয়ে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে নষ্ট করার মতো ভুল তিনি করতেন না। নিজের বাড়িটিকে কিছুতেই তিনি দু'দণ্ডের পান্থশালা বলে ভাবতে পারতেন না; অতি সাধারণ বস্তুকে আমাদের কাছে অদ্ভুতভাবে প্রকাশ করার পরমাশ্চর্য ক্ষমতা অতীন্দ্রিয়বাদরে রয়েছে। কিছুদিনের জন্যে তিনি এর কবলে পড়েছিলেন; আবার কখনো-কখনো বা ডারউইনের বস্তুতান্ত্রিক নীতির পরিপোষক হয়ে মানুষের চিন্তা আর উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটা অপরূপ সামঞ্জস্য খুঁজে বার করার চেষ্টায় তিনি মশগুল হয়ে থাকতেন। তবু যে কথা আগেই বলেছি, কোনো বিশেষ নীতিকেই তিনি বাস্তব জীবনের চেয়ে

বড়ো করে দেখতে চাইতেন না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে মানুষের সমস্ত ধীশক্তি যে কতটা মূল্যহীন তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন আধ্যাত্মিক রহস্য উন্মোচনের ব্যাপারে আত্মার চেয়ে প্রবৃত্তির অবদান কম নেই।

আর সেই জন্যেই তিনি সুগন্ধী জিনিসের প্রকৃতি আর গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করতেন। এই গবেষণার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মনের এমন কোনো অনুভূতি নেই আত্মিক জীবনের অনুভূতির সঙ্গে যার অমিল রয়েছে; বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তাদের আসল রূপটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করতেন; বার করার চেষ্টা করতেন কেন বিশেষ একটি উপাদান আমাদের কাছে বিশেষ একটি ভাবের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়।

অন্য সময় নিজেকে তিনি গানের জলসার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিতেন। লম্বা জাফরি টানা ঘরের মধ্যে মাঝে-মাঝে তিনি অদ্ভুত ধরনের কনসার্ট-এর আয়োজন করতেন। এই ঘরের ভেতরে ছাদটির রঙ সোনালি; দেওয়ালগুলি অলিভ-সবুজ বার্নিশ করা। এখানে বসে উন্মত্ত জিপসিরা ছোটো-ছোটো তারের যন্ত্রে উদ্দাম ঝংকার তুলে গান করত, আবার কখনো বা সবুজ শাল জড়িয়ে গম্ভীর মেজাজের টিউনিশিয়ান গায়করা বিরাট বীণাযন্ত্রের কানে মোচড় দিয়ে গান গাইত; সেই সঙ্গে নিগ্রোরা দাঁতে দাঁত চিপে তামার ঢাকের ওপরে একটানা কাঠি পিটিয়ে যেত; আর ঘন লাল মাদুরের ওপরে হাঁটু মুড়ে বসে মাথায় পাগড়ি বেঁধে রোগাটে ইন্ডিয়ানরা পেতল অথবা শরকাঠির তৈরি লম্বা সানাই ফুঁকত; মনে হত বিরাট ফণাওয়ালা সাপও যেন তাদের সেই গান শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। সেই অনার্য সঙ্গীতের রুক্ষ বিরতি আর কর্কশ অসঙ্গ তি মাঝে-মাঝে তাঁ মন বিরক্তিতে ভরিয়ে দিত; তখন স্কুবার্ট, চোপিন অথবা বিটোফেন-এর বিরাট সুর-সঙ্গতিও তাঁর কাছে নেহাৎ জলো বলে মনে হত। প্রাচীন অবলুপ্ত জাতির কবরখানা থেকে অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে যে-সব জাতির সম্পর্ক তখনো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি তাদের কাছ থেকে অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই যন্ত্রগুলিকে বাজাতে বেশ ভালো লাগত তাঁর। বায়ো নিগ্রো ইনডিয়ানদের অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এই যন্ত্রটির দিকে চোখ মেলে তাকানো কোনো অধিকার ওদের মহিলাদের ছিল না; এমন কি রীতিমতো উপবাস এবং বিশুদ্ধ না হয়ে ওখানকার যুবকরাও ওই বাদ্যযন্ত্রটি স্পর্শ করতে পারত না; পেরুভিয়া থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন মাটির পাত্র যেগুলি থেকে পাখির কর্কশ কণ্ঠের স্বর শোনা যেত; অথবা চিলিতে আলফনসো মানুষের হাড় দিয়ে তৈরি যে ফ্লুটের সুর শুনেছিলেন সেই ফ্লুট সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। কুমড়োর খোলের মধ্যে ছোটো-ছোটো নুড়ি বোঝাই করে সেই খোলগুলিকে তিনি রঙ মাখিয়ে দিয়েছিলেন। এগুলি ছাড়া আরো কত রকমের যে অদ্ভুত আর অপরিচিত, অর্ধ-পরিচিত বাদ্যযন্ত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাদের একটি নিখুঁত তালিকা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। মেকসিকো থেকে লম্বা 'ক্ল্যারিন', আমাজন থেকে কর্কশ 'তুরে', সাপের চামড়ায় মোড়া লম্বা সিলিন্ডারের মতো ঢাক—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই বাদ্যযন্ত্রগুলির অদ্ভুত চরিত্র তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এই সব দেখে তাঁর কেমন যেন মনে হয়েছিল প্রকৃতির মতো আর্টের জগতেও দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্কস রয়েছে। তাদের স্বরও বেশ ভয়ঙ্কর। তবু কিছুদিনের মধ্যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। সেই ক্লান্তি দূর করার জন্যে তিনি ছুটে যেতেন অপেরাতে; কখনো একা, আবার কখনো বা লর্ড হেনরির সঙ্গে। তানহাউসাররে নাটক দেখে কেমন যেন তন্ময় হয়ে যেতেন; সেই মহান নাটকের প্রস্তাবনায় নিজের জীবনের ট্র্যাজিডি দেখতে পেতেন।

একবার তিনি রত্ন আহরণে মনোযোগী হলেন; ফ্রান্সের অ্যাডমিরাল আনে দ্য জয়েয়্যূ যেমন তাঁর পোশাকে পাঁচশো ষাটটি রত্ন বসিয়েছিলেন সেই রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি

একবার একটি নাচের পোশাক তৈরির কারখানায় হাজির হলেন। এই বাতিকটা তাঁকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল যে শেষ পর্যন্ত এটা থেকে মুক্তি পাননি তিনি। সারাদিন ধরে রত্নগুলিকে নানান ভাবে তিনি সাজাতেন, গুছোতেন, খুলতেন, আবার বসাতেন; এগুলির মধ্যে ছিল অলিভ রঙের ক্রিসোবেরিল মণি; আলোর সামনে ধরলে এগুলি লাল হয়ে যায়; সিমোফেন; গোলাপ-রঙা বা মদের মতো হলুদ রঙের পোখরাজ; লাল টকটকে দারুচিনি পাথর; কমলা আর বেগনে রঙের স্পাইনেল, সেই সঙ্গে ছিল নীলকান্ত আর পদ্মরাগ মণি। সানস্টোনের রক্তিমাভা, আর মুনস্টোনের মুক্তার মতো শ্বেত আভা অত্যন্ত ভালোবাসতেন তিনি। আমস্টার্ডাম থেকে বিরাট মাপের তিনটি পান্না তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

এই রত্নগুলির সম্পর্কে অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্পও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। অ্যালফেনসোর 'ক্লেরিক্যালিস ডিসিপ্লিনা'তে একটি সাপের উল্লেখ রয়েছে। তার চোখের মণি দুটি সত্যিকারের মণি দিয়ে তৈরি; রঙ তার লালচে-কমলালেবুর মতো, ইমাথিয়া-বিজয়ী আলেকজান্দারের যে রোমান্টিক কাহিনি প্রচলিত রয়েছে তাতে শোনা যায়, জর্ডন উপত্যকায় এই ধরনের সাপ দেখা যায়—'সত্যিকারের পান্না দিয়ে তাদের পিঠগুলি মোড়া'। ফিলোট্র্যাটাসের কাহিনি থেকে জানা যায় একরকমের ড্রাগন রয়েছে যাদের মাথায় সত্যিকারের হিরে বসানো রয়েছে। সোনালি অক্ষর আর লাল পোশাক দেখিয়ে এদের ঘুম পাড়িয়ে হত্যা করা হয়। প্রখ্যাত অপরসায়নবিদ পেয়ারে দ্য বোনিফেস-এর মতে ওই হিরে মানুষকে অদৃশ্য করে দেয়; আর ভারতে অকীক নামে যে একরকম কঠিন আর মূল্যবান পাথর পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা তিনি করেছেন। কর্নেলিয়ান নামে একরকম দামি পাথর রয়েছে যা মানুষের ক্রোধ নষ্ট করে, আর ঘুমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে হায়াসিনথ। সুরার মাদকতা নষ্ট করে পদ্মরাগ মণি। গারনেট জাতীয় মণি দৈত্য-দানোদের তাড়িয়ে দেয়, হাইড্রোপিকাসের ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় চাঁদ। চাঁদের তিথি অনুযায়ী সেলেনাইট পাথরের বাড়া-কমা চলে। মেলোসিয়াস নামে একরকমের পাথর রয়েছে চোর খুঁজে বার করার ক্ষমতা যার অদ্ভুত; বাচ্চাদের রক্ত গায়ে লাগলে এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। সদ্য নিহত একটা কোলাব্যাঙের মাথার খুলি থেকে লিওনার্ডাস ক্যামিলাস একটা দামি পাথর বার করতে দেখেছিলেন; বিষের ক্রিয়া প্রতিহত করার ক্ষেত্রে এর শক্তি যথেষ্ট। আরব দেশের হরিণের বুকের ভেতরে একজাতীয় পাথরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যার স্পর্শেই প্লেগ সেরে যায় আরব দেশের পাখির বাসায় একরকমের পাথর রয়েছে, ডেমোক্রিটাসের মতে যা ধারণ করলে আগুন থেকে পোড়ার কোনো ভয় মানুষের থাকে না।

রাজ্যাভিষেকের সময় সিলেন-এর রাজা বড়ো একটা রুবি হাতে পরে শহরের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিলেন। জন দি প্রিস্ট-এর প্রাসাদের তোরণ দুটি ছিল সার্ডিয়াস পাথরের তৈরি। কোনো মানুষ যাতে বিষ নিয়ে ভেতরে আসতে না পারে এই জন্যে তাদের গায়ে শিংওয়ালা সাপের ছবি আঁকা রয়েছে। ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা দেওয়ালের ওপরে ঝুলত দুটো সোনার আপেল, তাদের গায়ে বসানো ছিল দুটো পদ্মরাগ মণি। এর ফলে দিনের বেলায় চকচক করত সোনা; রাত্রিতে শোভা পেত নীলকান্ত মণি। 'এ মার্গারাইট অফ অ্যামেরি' নামে লজ-এর একটি নামকরণ রোমান্টিক গ্রন্থে লেখা আছে যে রানির অন্তঃপুরে ক্রোসিলাইট, কারবাঙ্কালস প্রভৃতি যে সব মূল্যবান পাথর অথবা ধাতুর আয়না রয়েছে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে পৃতিবীর সতী-সাবিত্রীদের দেখতে পাওয়া যায়। জিপাংগুর অধিবাসীরা মৃতদের মুখের মধ্যে গোলাপী রঙের মুক্তো গুঁজে দেয়। মার্কো পোলো তা দেখেছেন। একটি ডুবুরি একটা সামুদ্রিক দৈত্যের কাছ থেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটা মুক্তো সংগ্রহ করে রাজা পেরোজকে দেয়। সেই মুক্তো চুরি হয়ে গেলে রাজা চোরকে হত্যা করে সাতদিন শোক করেন। প্রোকোপিয়াসের কাহিনি থেকে বোঝা যায় হুনেরা সেই মুক্তো ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে

রাজাকে ভুলিয়ে বিরাট একটা গর্তের সামনে নিয়ে আসে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সেই মুক্তোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সেইটাকে খুঁজে বার করার জন্যে সম্রাট আলাস-টেসিয়াস পাঁচশ সোনার মোহর পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন; কিন্তু সেটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মালাবারের রাজাকে একজন ভেনিসবাসী একটা মুক্তোর মালা দেখিয়েছিলেন। সেই মালাতে তিনশ চারটি মুক্তো ছিল। প্রতিটি মুক্তোর দেবতা ছিল একটি। রাজা সেই সব দেবতাদের পূজা করতেন।

ব্রাঁতোর মতে ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই-এর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় ষষ্ঠ আলেকজান্দারের পুত্র ডিউক দ্য ভ্যালেনটিনয়-এর ঘোড়ার পিঠ সোনার পাত দিয়ে মোড়া ছিল। তাঁর মাথার টুপিতে গাঁথা ছিল দু'সার রুবি। সেই রুবিগুলি থেকে আলোর রোশনাই ফুটে বেরোত। ইংলন্ডের চার্লস-এর ঘোড়ার পাদানি থেকে চারশ কুড়িটা হিরে ঝুলত। তিরিশ হাজার মার্কস দামের দ্বিতীয় রিচার্ড-এর একটি কোট ছিল; তার চারধারে বসানো ছিল রুবি। রাজ্যাভিষেকের পূর্বে টাওয়ারে যাওয়ার পথে অষ্টম হেনরি যে সোনার ঝালর দেওয়া, অসংখ্য হিরে আর দামি-দামি পাথরে চুমকি বসানো পোশাক পরেছিলেন সেকথা 'হল' সাহেব আমাদের জানিয়েছেন। প্রথম জেমস-এর প্রিয়পাত্রেরা কানে সোনার তারের সঙ্গে পান্না বসানো দুল পরতেন। দ্বিতীয় এডওয়ার্ড পিয়ারস গ্যাভেস্টোনকে টকটকে লাল সোনার তৈরি কিছু যুদ্ধাস্ত্র দান করেছিলেন। সেই অস্ত্রগুলির গায়ে নীলকান্ত মণি বসানো। দ্বিতীয় হেনরি কব্জি পর্যন্ত যে দস্তানা পরতেন তাতে বসানো থাকত দামি-দামি পাথর, তাঁর একটি বিশেষ রকমের দস্তানা ছিল যার সঙ্গে গাঁথা ছিল বারোটি রুবি আর বাহান্নটি বেশ দামি পাথর। বার্গেন্ডি বংশের শেষ ডিউক চার্লস দি র‍্যাশ-এর টুপিতে গাঁথা ছিল নাশপাতির গড়নের মুক্তো; তার মধ্যে বসানো ছিল অনেকগুলি নীলকান্ত মণি।

সেযুগের জীবনযাত্রা কী অপরূপই না ছিল! কত প্রাচুর্য আর আড়ম্বরই না ছিল সে যুগে! এমন কি মৃতদের বিলাস—বৈভবের কাহিনি পড়তেও ভালো লাগে কত।

তারপরে তিনি সূচীশিল্পের দিকে ঝুঁকলেন। উত্তর ইওরোপ দেশগুলির ঠান্ডা ঘরের দেওয়ালে যে-সমস্ত প্রাচীরচিত্র আঁকা রয়েছে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। গুণই বলুন আর অপগুণটি বলুন তাঁর চরিত্রের একটা অসামান্য বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে কোনো কিছু ধরার সঙ্গে-সঙ্গে সেটার একেবারে ভেতরে তিনি তলিয়ে যেতেন। সূচীশিল্পের মধ্যেও তিনি ঠিক তেমনিভাবেই ডুবে গেলেন। দেখলেন সেই অপরূপ প্রাচীরচিত্রগুলিকে মহাকাল কী ভাবেই না নষ্ট করে দিয়েছে। দেখে, মনে-মনে বেশ কষ্ট পেলেন তিনি। যে কোনোরকমেই হোক, তিনি কালের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্ম আসছে; ড্যাফোডিল ফুলগুলি ফুটছে আর বারবার শুকিয়ে যাচ্ছে। রাত্রির বিভীষিকা বারবার তার ঘৃণ্য কাহিনির পুনরাবৃত্তি করছে। কিন্তু তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই। কোনো শীতই তাঁর মুখের আদল বিকৃত করতে পারেনি, ম্লান করতে পারেনি তাঁর ফুলের মতো দেহ-লাবণ্যকে। বাস্তব জগতের সঙ্গে তাঁর প্রার্থক্য কত! কোথায় তারা বিলীন হয়ে গিয়েছে? এথেলাকে খুশি করার জন্যে অপ্সরীরা নব-বসন্তের রঙে ছুপিয়ে যে বিখ্যাত পোশাকটি তৈরি করেছিল, যার জন্যে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল দেবতাদের—সেই পোশাকটা আজ কোথায়? সেই বিরাট ফিকে লাল নৌকার পালটি কোথায়? রোমের কলোসিয়ামে নেরো এই পালটিকে বিছিয়ে রেখেছিলেন। এর গায়ে আঁকা ছিল তারকা খচিত আকাশ আর ছিল রথী অ্যাপোলোর ছবি; সোনালি লাগাম গলায় পরে সাতটি ঘোড়া সেই রথ টানছিল, সূর্যের খাবার টেবিলে পাতা সেই অদ্ভুত রুমালগুলি তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এই টেবিলের ওপরে বিশ্বের সেরা রসালো খাবার পরিবেশন করা হত। রাজা কিলপেরিকের শবাধারের ওপরে তিনশ সোনার মৌমাছি বসানো যে আচ্ছাদনটি

সেইটাই বা আজ কোথায়? এই অদ্ভুত পোশাক দেখে পনটাসের বিশপ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এর ওপরে আঁকা ছিল সিংহ, ময়াল সাপ, ভালুক, কুকুর, অরণ্য, ছোটো-ছোটো পাহাড়া, শিকারি—এক কথায় চিত্রকর প্রকৃতির যা কিছু অনুকরণ করতে পারেন—সেগুলির সব ছবি। আর সেই কোট—যে কোট অরলিনস-এর চার্লস একবার পরেছিলেন—যার হাতের ওপরে সুন্দর একটি গান লেখা ছিল। শুদু গানই নয়, তার স্বরগ্রামও। প্রতিটি স্বরগ্রাম লেখা ছিল সোনালি সুতো দিয়ে—প্রতিটির ছেদের মধ্যে গাঁথা ছিল চারটি করে মুক্তা। রানি যোয়ান অফ বারগেনডির ব্যবহারের জন্যে রিমস-এ যে প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল সেই প্রাসাদের একটি ঘরের কথা তিনি পড়লেন। সুতোয় বোনা তেরোশ একুশটা টিয়াপাখি দিয়ে এই ঘরটি সাজানো ছিল, সাজানো ছিল রাজার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, আর ছিল একুশটি প্রজাপতি; তাদের প্রতিটি ডানায় আঁকা ছিল রানির হাত; এই সব নকশাগুলি আগাগোড়া সোনা দিয়ে তৈরি। ক্যাথারিন দ্য মেডিসির কালো ভেলভেটের একটি শোকশয্যা ছিল, তার ওপরে আঁকা ছিল অসংখ্য বাঁকা চাঁদ আর সূর্য। বুটিদার কাপড় দিয়ে তৈরি ছিল এর মশারি। সোনা আর রুপোর জমির ওপরে লতা আর ফুলের মালা ছিল আঁকা; তাদের ধারে-ধারে বসানো ছিল মুক্তোর চিকন। রানির রুচিমতো রুপোর ঝালরের ওপরে কালো ভেলভেটের সারি-সারি পর্দার মধ্যে বিছানাটি পাতা ছিল। চতুর্দশ লুই-এর ঘরে পনেরো ফুট উঁচু অনেকগুলি নারীমূর্তি ছিল। তাদের ওপরে ছিল সোনার কারুকার্য। পোলান্ডের রাজা সোবিয়েস্কির রাজকীয় শয্যাটি তৈরি হয়েছিল নীলকান্ত মণির নকশা দিয়ে সঙ্গে সুতো দিয়ে লেখা ছিল কোরানের বাণী। এর পাগুলো ছিল রুপোর; পা-দানিগুলি হিরে দিয়ে মোড়া। এটা নিয়ে আসা হয়েছিল তুর্কীদের শিবির থেকে; এর বিরাট মশারির ছাউনির নীচে মহম্মদের পতাকা ছিল আঁটা।

এইভাবে পুরো একটি বছর ধরে তন্তুজ আর সূচীশিল্প নিয়ে তিনি অনেক গবেষণা করলেন, সংগ্রহ করলেন অনেক প্রাচীন স্মারক চিহ্ন, দিল্লির সূক্ষ্ম মসলিন থেকে ঢাকার সুচারু ফিলফিনে বস্ত্র—প্রতীচ্যে যার নাম ছিল 'বাতাসবয়ন' এবং সন্ধ্যার শিশির'—অদ্ভুত ছবি আঁকা জাভার কাপড়; চিনদেশের বেগনে পর্দা, সিসিলির বুটি, স্পেনের ভেলভেট, সবুজ সোনার জাপানি বয়ন শিল্প আর চমৎকার পালকের পাখি।

গির্জা সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই ধর্মী সাজপোশাক সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ একটা আগ্রহ জন্মেছিল। তাঁর বাড়ির পশ্চিম দিকের গ্যালারিতে অনেকগুলি সিডার কাঠের বাক্স সারিবন্দিভাবে সাজান ছিল। সেইখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য আর সুন্দর প্রাচীন স্মারক চিহ্ন তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি ওগুলি ব্রাইড অফ ক্রায়েস্ট-এর পোশাকের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর উপবাসসক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ এবং স্ব-নির্বাচিত দুঃখ আর ক্ষত যে দেহটিকে জর্জরিত করে ফেলেছিল সেই দেহটিকে ঢেকে রাখার জন্যে কালো আর সাদায় মেশানো লাল রঙের পোশাক পরার প্রয়োজনীয়তা ছিল তাঁর; শুধু তাই নয়; সেই পোশাকটি সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়ে তৈরি এবং হীরামণিমুক্তা খচিত। পাদরীরা ধর্মীয় শোভাযাত্রার সময় যে রকম ফিকে লাল সিল্ক আর গোলাপী রঙের সোনার সুতো দিয়ে কাজ করা জমকালো ঢিলে জামা পরতেন সেই জাতীয় কিছু পোশাকও সংগ্রহশালায় তাঁর ছিল। সেই সব ঢিলে জামার ধারে-ধারে ভার্জিনের জীবন থেকে নেওয়া কিছু-কিছু টুকরো ঘটনার ছবিও ছিল আঁকা। মাথার টুপিতে রঙিন সিল্ক দিয়ে আঁকা ভার্জিনের অভিষেকের ছবিটিও সুচারুরূপে আঁকা ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি ইতালিয়ান ভাস্কর্য এটি। আর একটি ওই জাতীয় জামার ধারে সবুজ ভেলভেটের আঁকা অ্যাকানথাস পাতরা কয়েকটি ছবিও ছিল। এই সব পাতার বিশদ নকশা আঁকা হয়েছিল রূপালি সুতো আর রঙিন ক্রিসট্যাল দিয়ে। লাল আর সোনালি সিল্কের সুতো দিয়ে ঢিলে জামাগুলি বোনা হয়েছিল; তাদের ওপরে আঁকা ছিল অনেক সাধু-সন্তের ছবি। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে সেন্ট সিবাসটিনের। প্যাশন এবং

ক্রায়েস্টের ক্রুশিফিকেশন-এর প্রতীক চিহ্ন হিসাবে তিনি যে ধর্মীয় পোশাকটি পরেছিলেন সেটি সবুজ রঙের সিল্ক দিয়ে তৈরি, তার সঙ্গে মেশানো ছিল নীল সিল্ক, সোনার বুটি, পীত রঙের দামাস্কাস সিল্ক আর সোনার জাজিম। সেই সঙ্গে ছিল সিংহ, ময়ূর এবং অন্যান্য প্রতীক্ চিহ্ন।

এই সমস্ত এবং আরো অনেক অধুনা দুষ্প্রাপ্য বস্ত্রগুলি তিনি যে সংগ্রহ করেছিলেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর নিজের মানসিক বিপর্যয় ভুলে যাওয়ার চেষ্টা। মাঝে-মাঝে যে আতঙ্কটা তাঁর পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত সেই আতঙ্ক থেকে তাঁকে সাময়িকভাবে মুক্তি দিত ওই বস্ত্রগুলি। তালাবন্ধ যে নির্জন ঘরটিতে তিনি তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন সেই ঘরের দেওয়ালে নিজের হাতে তিনি সেই ভয়ানক প্রতিকৃতিটিকে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর জীবনের সত্যিকারের অধঃপতন পরিবর্তনশীল ওই প্রতিকৃতিটির ওপরেই প্রতিফলিত হত। এরই সামনে তিনি সেই সোনালি পর্দাটা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। পরপর কয়েকটি সপ্তাহ তিনি ও-ঘরে ঢুকতেন না। না ঢোকার ফলেই তিনি তাঁর সহজ, আনন্দময় জীবনযাত্রায় ফিরে আসতেন। তারপরে হঠাৎ একদিন রাত্রিতে তিনি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে "ব্লু গেট ফিলড"-এর কাছাকাছি সেই সব ভয়ানক পাড়ায় গিয়ে ঢুকতেন, বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন। ফিরে এসে তিনি সেই প্রতিকৃতিটির সামনে বসতেন; মাঝে-মাঝে ছবিটিকে তিনি নিজের মতোই ঘৃণা করতেন; অন্য সময়, ব্যক্তিত্বের গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠত; পাপের অর্ধেক মোহই বোধ হয় এই গর্বে। যে বিকৃতি তাঁকে সহ্য করতে হত সেই বিকৃতির সমস্ত জ্বালা আর যন্ত্রণা যে ওই প্রতিকৃতিটাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে এই দেখে গোপনে আনন্দে তিনি হাসতেন।

কয়েক বছর পরে ইংলন্ডের বাইরে বেশি দিন থাকাটা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। ত্রোভিল আর আলজিয়ার্সে লর্ড হেনরির সঙ্গে যৌথভাবে তিনি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা একসঙ্গে কয়েকবার শীতকালে বাস করেছিলেন। সেই দুটি বাড়ি তিনি ছেড়ে দিলেন। যে ছবিটি তাঁরই জীবনের একটি অঙ্গ তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে তাঁ ভালো লাগত না। তাছাড়া, একটা কেমন ভয়ও জন্মেছিল তাঁর মনে। যদিও দরজাটিকে সুরক্ষিত করার জন্যে তিনি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, দরজার গায়ে শক্ত মজবুত লোহার বেড়া দিয়েছিলেন, তবু তাঁর ভয় হচ্ছিল কেউ যদি তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

একথা তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে ঘরে ঢুকেও কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। কথাটা সত্যি যে মুখের চেহারাটা কুৎসিত এবং কদাকার হওয়া সত্ত্বেও, ছবিটার ওপরে তাঁর চেহারাটাই প্রতিফলিত হয়েছিল; কিন্তু ছবিটা দেখে কী বুঝবে তারা? কেউ তাঁকে এ নিয়ে বিরক্ত করার চেষ্টা করলে তিনি উপহাস করে তাদের উড়িয়ে দেবেন। তিনি এ ছবি আঁকেননি। সুতরাং সেটা কদাকার দেখালেই বা তাঁর কী? তাছাড়া সত্যি কথাটা বললেও কি তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে?

তবু তিনি ভয় পেয়েছিলেন। নটিংহামশায়ারে তাঁর নিজস্ব প্রাসাদে সমগোত্রীয় যুবকদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করতে-করতে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর জীবনযাত্রার সেই অহেতুক উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা আড়ম্বর দেখে সবাই যখন অবাক হয়ে তাঁ দিকে তাকিয়ে থাকত ঠিক সেই সময় হয়তো তিনি অতিথিদের পরিত্যাগ করে তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন; তাঁর ভয় হত হয়তো বা কেউ দরজার তালা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে ছবিটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কেউ যদি ওটিকে চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে কী হবে? এই চিন্তা করার

সঙ্গে তিনি ভয়ে হিম হয়ে যেতেন। তাহলে নিশ্চয় পৃথিবীর লোক তাঁর জীবনের গোপন রহস্যটি জেনে যাবে। হয়তো তারা তাঁকে সন্দেহ করতে শুরুই করে দিয়েছে।

কারণ, তাঁকে অনেকেরই খুব ভালো লাগত—এই কথাটা সত্যি বলে ধরে নিলেও, তাঁকে অবিশ্বাস করত এমন মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁর জন্ম এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে 'ওয়েস্ট এনড' ক্লাবে প্রবেশাধিকার পাওয়ার পূর্ণ অধিকার তাঁর ছিল, সেখানে একবার প্রায় তিনি ধাক্কা খেয়েছিলেন। শোনা যায় একবার তাঁর একটি বন্ধু ধূমপান করার জন্যে তাঁকে নিয়ে 'চার্চচিল' ঘরে ঢোকেন। তাঁদের ঢুকতে দেখেই বারউইক-এর ডিউক এবং আর একটি ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা তাঁর চোখ এড়ায়নি। পঁচিশ বছর অতিক্রম করার পরে তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত-অদ্ভুত কাহিনি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। গুজব রটল হোয়াইট চ্যাপল-এর মতো দূরে একটা ভাটিখানায় কতকগুলি বিদেশি নাবিকের সঙ্গে মদ খেয়ে হুল্লোড় করতে তাঁকে দেখা গিয়েছে। গুজব রটল, চোর-ডাকাত আর মুদ্রা জালকারীদের সঙ্গে তাঁর নাকি দোস্তি রয়েছে এবং তাদের ব্যবসার গোপন রহস্য কী তা তিনি জানেন। শহর থেকে দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি তাঁর চরিত্রে কলঙ্কলেপন করেছিল; যখন তিনি ফিরে আসতেন তখন তাঁকে নিয়ে চারপাশে বেশ কানাঘুষা চলত, দেখা হলে তারা একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে যেত। ভাবখানা এই যে তাঁর গোপন রহস্যটা বার তারা করবেই।

অবশ্য এই সব ঔদ্ধত্য আর পরিকল্পিত উপহাসকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না; এবং অধিকাংশ লোকের মতে তাঁর সহজ চালচলন, তাঁর পরিচ্ছন্ন নিরপরাধ হাসি, তাঁর অনবদ্য শাশ্বত যৌবন তাঁর সমস্ত কুৎসার উপযুক্ত জবাব বলে মনে হত। লোকের মুখে শোনা যেত যে যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁরাও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে মেলামেশার পরে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। যে সমস্ত মহিলারা তাঁকে পাগলের মতো পছন্দ করত এবং তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেশার জন্যে কোনো সামাজিক কুৎসাকেই গ্রাহ্য করেনি এবং সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেনি, কিছুদিন পরে ডোরিয়েন গ্রে তাদের ঘরে ঢুকলে তারাও আতঙ্ক কিম্বা অপমানে বিবর্ণ হয়ে যেত।

তবু এই চাপা কুৎসা অনেকের চোখে তাঁর অদ্ভুত এবং বিপজ্জনক আকর্ষণটিকে বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রচুর সম্পদ তাঁর অর্থনৈতিক জীবনে কিছুট নিশ্চয়তা এনেছিল। সমাজ, অন্তত যাকে আমারা সভ্য সমাজ বলি, যাঁরা ধনী এবং সেই সঙ্গে অপরকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা যাঁদের রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা শুনতে খুব বেশি একটা রাজি নয়। স্বভাবতই সে মনে করে যে চালচলনটাই যে কোনো মানুষের কাছে তার নীতির চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। তার মতে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রম তার একটা ভালো রাঁধুনি থাকার চেয়ে কম দামি। আর তা ছাড়া, মানুষকে খারাপ খানা আর খারাপ মদ খাওয়ানোর পরেও কাউকে সমাজে তিরস্কার করা যাবে না। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার সময় লর্ড হেনরি একবার বলেছিলেন অনেক ভালো গুণ থাকা সত্ত্বেও, মানুষ যদি নিমন্ত্রিতদের গরম খাবার দিতে না পারেন তাহলে তাঁর দোষ ক্ষমার্হ নয়। কারণ আর্টের নীতি আর সৎ সমাজের নীতি একই; অন্তত তাই হওয়া উচিত। এর প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে আঙ্গিক। যা কিছু আমরা করি তার মধ্যে চাই নিখুঁত আয়োজনের মর্যাদা; সেই সঙ্গে চাই একটা অবাস্তব আবহাওয়া। কপটতা, সৌন্দর্য আর বুদ্ধি যেগুলির দৌলতে রোমান্টিক নাটক আমাদের আনন্দে দেয়—এর মধ্যেও সেগুলি থাকা চাই। প্রবঞ্চনা কি এতই বিপজ্জনক? আমার মনে হয় তা নয়। আমাদের বহুমুখী ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার এটা একটা আঙ্গিক মাত্র।

অন্তত ডোরিয়েন গ্রে-র মতবাদ সেই রকমই। যারা মানুষের অহং বোধকে সহজ, সাধারণ, শাশ্বত এবং একই ধাতু দিয়ে গঠিত মনে করে তাদের সেই অগভীর মনস্তত্ত্বর কথা ভেবে তিনি অবাক হয়ে যেতেন। তাঁর মনে হত মানুষ নিজের মধ্যেই বহু জীবন যাপন করে, তার অনুভূতির সীমা নেই—তার চিন্তাধারা অদ্ভুত, তার উচ্ছ্বাস বাঁধনহারা; তার দেহ মৃতের বিপজ্জনক রুগ্ন বীজাণু দিয়ে গড়া। দেশের বিভিন্ন জনহীন শীতল ছবির গ্যালারিতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁর ধমনীতে যে সব বংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল সেই সব বংশের বিরাট-বিরাট প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতেন। "রানি এলিজাবেত এবং রাজা জেমেস-এর রাজত্বের স্মৃতিচারণ" গ্রন্থে ফ্র্যান্সিস অসবর্ন ফিলিপ হারবার্ট-এর যে বিবরণ দিয়েছেন, সেই হারবার্টের প্রতিকৃতি সেখানে রয়েছে। এই সুন্দর যুবক ফিলিপ হারবার্টের জীবনই কি তিনি যাপন করছেন? কোনো বিষাক্ত বীজাণু কি দেহ থেকে দেহে সংক্রামিত হয়ে তাঁর শরীরে এসে উপস্থিত হয়েছে? সোনার জল দিয়ে আঁকা আঁটো জামার ওপরে আর হীরার বুটি দেওয়া বর্ম পরে স্যার অ্যানথনি শেরাড দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সাদা আর কালো রঙের অস্ত্রশস্ত্রের স্তূপ তাঁর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। এই মানুষটি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে কী রেখে গিয়েছেন? নেপলস-এর জিয়োভানার প্রেমিক কি তাঁর জন্যে পাপ আর লজ্জা গিয়েছেন দিয়ে? এই মৃত ব্যক্তিটি সাহস করে যা চিন্তা করতে পারতেন না, তাঁর নিজস্ব কাজগুলি কি তারই স্বপ্ন? এইখানে রঙ-চটা ক্যানভাসের ওপরে লেডি এলিজাবেথ দেবারু তাঁর জমকালো পোশাক আর মুক্তাখচিত কাঁচুলি পরে হাসছেন। তাঁর ডান হাতে একটি ফুল, বাঁ হাতে দামাস্কাস গোলাপের বন্ধনী। পাশে একটি টেবিল। সেই টেবিলের ওপরে একটি ম্যানডোলিন এবং একটি আপেল। সবুজ ফিতে দিয়ে তৈরি করা কয়েকটি বড়ো-বড়ো গোলাপ ফুল তাঁর সূচলো জুতোর ওপরে সেলাই করা ছিল। তাঁর জীবনের কথা তিনি জানতেন; তাঁর প্রেমিকদের সম্পর্কে যে অদ্ভুত কাহিনি লোকের মুখে-মুখে ঘুরে বেড়াত তাও তাঁর অজানা ছিল না। এলিজাবেথের চঞ্চল মানসিকতার কিছুটা কি তিনি নিজেও পেয়েছেন? সেই অণ্ডাকৃতি ভারী-ভারী চোখ দুটি গভীর কৌতুকের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। জর্জ উইলোবির প্রতিকৃতির কথাই ধরা যাক। কী ভয়ঙ্কর দেখতে মানুষটি! চুলে তাঁর পাউডারের প্রলেপ; মুখের ওপরে তাঁর অদ্ভুত ধরনের দাগ। তাঁর মুখের চেহারা ক্রুর; রঙ কালো। কামনায় ভরা তাঁর ঠোঁট দুটি ঘৃণায় বঙ্কিম হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মার্কনি বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। যৌবনে তিনি ছিলেন লর্ড ফেরারস-এর দোস্ত। দ্বিতীয় লর্ড বেকেনহাম-এর সম্বন্ধেই বা তিনি কী বলবেন! প্রিন্স রিজেন্টের উদ্দাম উচ্ছল দিনের বন্ধু ছিলেন তিনি; মিসেস ফিটজারবার্ট-এর সঙ্গে যুবরাজের গোপনে যে বিবাহ হয়েছিল তারও সাক্ষী ছিলেন তিনি। কী গর্বিত, সুন্দর চেহারা তাঁর। কী উদ্ধত তাঁর ভঙ্গিমা! তাঁর সেই উচ্ছ্বাসের কিছু অংশ কি তিনি ডোরিয়েনকে উইল করে দিয়ে গিয়েছেন? বিশ্বের লোক তাঁকে দুষ্ট চরিত্রের বলে জানে। কার্লটন হাউস-এ তিনিই রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পাশে কালো পোশাক পরা বিশীর্ণ চেহারার আর একটি প্রতিকৃতি। এটি তাঁর স্ত্রীর। তাঁর রক্তের শিহরনও ডোরিয়েনের শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। কী অদ্ভুত! আর তাঁর মায়ের ছবি! ভদ্রমহলির মুখটি ছিল লেডি হ্যামিলটনের মুখের মতো। তাঁর কাছ থেকে কী পেয়েছেন তিনি তা জানেন। তিনি পেয়েছেন দেহের সৌন্দর্য; আর পেয়েছেন অপরের সৌন্দর্য উপভোগ করার তীব্র কামনা। ব্যাকানন্টি পোশাক পরে তিনি যেন তাঁকে উপহাস করছেন। তাঁর চুলে আঙুলের পাতা জড়ানো। ছবির রঙটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু তাঁর অদ্ভুত চোখ দুটি তাঁর পিছু-পিছু এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবু নিজের জাতের মতো সাহিত্যেও মানুষ তার পূর্বপুরুষদের সন্ধান পেত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্ভবত বেশি নৈকট্য অনুভব করত সে এবং নিশ্চয় তাদের প্রভাব যে তার ওপরে পড়ত সেকথা সে জানত। মাঝে-মাঝে ডোরিয়েন গ্রের মনে হত যে সমস্ত

ইতিহাসটাই যেন তাঁর জীবনের কর্মতালিকা—যা তিনি করতেন সেগুলির নয়; যা তিনি করবেন বলে মনে করতেন। যে সমস্ত অদ্ভুত এবং বিপজ্জনক অভিনেতারা পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পাপকে এমন রমণীয় করে তুলেছে, অমঙ্গল করেছে সূক্ষ্ম কারুকার্যের সামিল যাকে ব্যাখ্যা করা সত্যিকার দুরূহ, তাঁর মনে হত তিনি যেন তাদের বেশ ভালোভাবেই চেনেন। তিনি ভাবতেন কোনো এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মাধ্যমে তাঁর জীবন তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

অনবদ্য উপন্যাসের যে নায়ক তাঁর জীবনের ওপরে অতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনি তাঁর সেই অদ্ভুত খেয়ালের কথা জানতেন। উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদ তিনি বলেছেন—বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ভয়ে, ফুলের মুকুট পরে তাইবেরিয়াস-এর মতো তিনি ক্যাপ্রিয় বাগানে বসেছিলেন, বসে-বসে এলিফ্যানটিস-এর জঘন্য বইগুলি পড়ছিলেন। বামন আর ময়ূরের দল তাঁর চারপাশে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর বাঁশীর সুরের রেশ সুগন্ধী ধূপের বক্রগতিকে উপহাস করছিল। তার পরে ক্যালিগুলার মতো আস্তাবলে সবুজ শার্ট পরা জকিদের আদর করে জাগিয়ে দিলেন এবং হিরে বসানো জিন দিয়ে মোড়া ঘোড়াটার সঙ্গে হাতির দাঁতের তৈরি গামলায় তিনি ভোজন করলেন। মার্বেল পাথরে বাঁধানো সারি-সারি আয়ানার ধার দিয়ে ডোমিতিয়েনের মতো লম্বা বারান্দার ভেতর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; ভোগের আয়োজনে জীবনের পাত্র উপচে পড়ার ফলে যার জীবনে বাঁচার সমস্ত আনন্দে নষ্ট হয়ে যায় সেই রকম মানুষের মতো নিজের দেহটাকে নষ্ট করার জন্যে শীর্ণ দুটো চোখ দিয়ে সেই সারিবদ্ধ আয়নাগুলির মধ্যে তিনি ছোরার ছায়া খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পরিষ্কার পান্নার ভেতর দিয়ে সার্কাসের রক্তাভ ধ্বংসাবশেষের দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেন; তারপরে সাদা খচ্চরবাহিত লাল মুক্তাখচিত পালকিতে চড়ে পমে গ্র্যানেটের রাস্তার ওপর দিয়ে তিনি স্বর্গ মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইলেগাব্যালাস-এর মতো নিজের মুখ তিনি রঙ দিয়ে ছাপিয়ে নিলেন, মহিলাদের মধ্যে বার বার অবিশ্বাস ছড়ালেন, কার্থেজ থেকে চাঁদ নিয়ে এসে সূর্যের সঙ্গে বিয়ে দিলেন তাঁরা। কী করে দিলেন সে রহস্য আজও কেউ বুঝতে পারেনি।

এই আজগুবি পরিচ্ছেদটি ডোরিয়েন বার-বার পড়তেন; তার ঠিক পরের দুটি পরিচ্ছেদ তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিল। পরিচ্ছেদ তো নয়; সূক্ষ্ম কারুকার্য করা জাজিমের মতো। তার ওপরে নিপুণ চাতুর্যের সঙ্গে আঁকা ছিল কতকগুলি ভীতিপ্রদ আর সেই সঙ্গে সুন্দর মূর্তি; সেই মূর্তিগুলিকে পাপ, রক্ত, আর ক্লান্তি দানবীয় অথবা উন্মত্ত করে তুলেছিল: সেই মূর্তিগুলির, চরিত্রগুলির বলাই ভালো, একটি হচ্ছে মিলানের ডিউক ফিলিপোর। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে তাঁর ঠোঁটের ওপরে লাল রঙের বিষ মাখিয়ে রঙিন করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য যে দেহটিকে তিনি আদর করতেন সেই স্ত্রীর মৃত ঠোঁট দুটি চুম্বন করে তাঁর প্রেমিক যেন মৃত্যু বরণ করেন। আর একটি চরিত্র হচ্ছে ভেনিসবাসী পিয়াত্রো বারবি—ইনি পরিচিত ছিলেন দ্বিতীয় পল নামে। দম্ভের বশবর্তী হয়ে তিনি ফরমোসাস-এর খেতাব গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মুকুটের দাম দু'হাজার ফ্লোরিন। ওই মুকুটটি সংগৃহীত হয়েছিল ভয়ঙ্কর পাপের পথে। আর একটি চরিত্র হচ্ছে গিয়াঁ মারিয়া ভাইকোঁতি। জীবন্ত মানুষের পেছনে তিনি ডালকুত্তা ছেড়ে দিতেন। তাঁর নিহত দেহটিকে তাঁর প্রেমিকা বারবনিতা গোলাপ ফুলে ঢেকে দিয়েছিলেন। সাদা ঘোড়ার পিঠে বর্জিয়াকেও দেখা যাবে সেখানে। তাঁর পাশে ঘোড়ার পিঠে চলেছেন ফ্র্যাট্রিসাইড। তাঁর বড়ো ঢিলে জামাটি পেরোত্তোর রক্তে ভেজা। আর রয়েছেন ফ্লোরেনস-এর যুবক কার্ডিনেল আর্কবিশপ পিয়েত্রা রিয়েরিয়ো—ইনি হচ্ছেন চতুর্থ সিক্সতাস-এর পুত্র এবং প্রিয়পাত্র। তাঁর সৌন্দর্য যেমন অপরূপ, লাম্পট্যও তেমনি সীমাহিন। সাদা এবং গাঢ় লাল সিল্কের তাঁবুতে আরাগনের লিওনোরাকে তিনি অভ্যর্থনা

জানিয়েছিলেন। সেই তাঁবুতে ছিল অপ্সরীর দল, আর ছিল একরকমের জীব—প্রাচীন গ্রীক কাহিনিতে যারা ছিল অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক ঘোড়া। গ্যানিমিড অথবা হাইলাস-এর মতো ভোজের সভায় উৎসর্গ করার জন্য একটি ছেলেকে তিনি সাজিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন এজেলিন। মৃত্যুর দৃশ্য ছাড়া তাঁর বিষাদকে নষ্ট করা যেত না। মানুষের যেমন লাল মদের দিকে ঝোঁক থাকে তাঁর তেমনি ঝোঁক ছিল লাল রক্তের ওপরে। শয়তানের বাচ্চা বলে পরিচিত ছিলেন তিনি; আরো শোনা যায় নিজের আত্মার সদগতির জন্যে নিজের বাবাকে পাশা খেলায় তিনি হারিয়ে দিয়েছিলেন। সেই জন্যে ছিলেন গিয়ামবাতিস্তা সিবো। মানুষটি রসিকতা করে নিজের নাম নিয়েছিলেন 'ইনোসেন্ট' বলে। তাঁর অসাড় শিরার মধ্যে একজন জুইস ডাক্তার তিনটি ছেলের দেহের রক্ত ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ইসোতার প্রেমিক এবং রামিনির লর্ড সিগিসমনদো মালাতেস্তাকেও দেখা যাবে সেখানে। দেবতার শত্রু হিসাবে রোমে তাঁর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। গলায় একখানা রুমাল বেঁধে তিনি পলিসেনাকে হত্যা করেছিলেন, পান্নার কাপে করে বিষ দিয়েছিলেন জিনেভ্রাকে এবং লজ্জাকর ভাবের আবেশে খৃশ্চানদের পূজা করার জন্যে একটি অখৃশ্চান ধর্মমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। ষষ্ঠ চার্লসকেও সেখানে আপনারা খুঁজে পাবেন। তিনি তাঁর ভাই-এর স্ত্রীকে এমন উন্মত্তের মতো ভালোবাসতেন যে তাই দেখে একজন কুষ্ঠরোগী তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল এই বলে যে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হওয়ার বেশি দেরি তাঁর নেই। সেই চার্লস যখন সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন তখন তাকে সান্ত্বনা দিতে পারত একমাত্র সারাসেন তাস; সেই তাসের ওপরে আঁকা থাকত প্রেম, মৃত্যু, আর উন্মাদের ছবি। সেই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে ফিটফাট পোশাক পরা গ্রিফোনেতো ব্যাগলিয়োনির ছবি; মাথায় তাঁর মণিমুক্তা খচিত টুপি, অ্যাকানথাসের মতো কোঁকড়ানো চুলের স্তবক। তিনি সস্ত্রীক অ্যাসটোরিকে খুন করেছিলেন, সিমোনেতোকে হত্যা করেছিলেন তাঁর চাকর সমেত। সিমোনেতে তাঁর মৃত্যুকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে পেরুগিয়ায় মৃত্যুশয্যায় তাঁকে নির্লিপ্তভাবে শুয়ে থাকতে দেখে কেউ চোখের জল না ফেলে পারেনি; আর যে আটালানটা তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনিই শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ করেছিলেন তাঁকে।

এঁদের সকলেরই একটা ভয়ঙ্কর আকর্ষণ ছিল। রাত্রিতে ডোরিয়েন এঁদের ছবি দেখতেন; দিনের বেলায় এঁরা তাঁর কল্পনাকে বিব্রত করে তুলত। রেনাসাঁর যুগে অদ্ভুত-অদ্ভুত উপায়ে মানুষকে বিষ খাইয়ে মারা হত; কোথাও শিরস্ত্রাণে বিষ মাখিয়ে, কোথাও জ্বলন্ত টর্চ বিষাক্ত করে, কোথাও নকশাকাটা দস্তানা; কোথাও মুক্তাখচিত পাখা দিয়ে। ডোরিয়েন গ্রে বিষাক্ত হয়েছিলেন বই পড়ে। এমন মুহূর্তও তাঁর এসেছিল যখন নিছক সৌন্দর্য উপভোগের উপায় হিসাবেই অমঙ্গলকে তিনি গ্রহণ করতেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দিনটা হল নভেম্বর মাসের ন'তারিখ। যেদিন তিনি আটতিরিশ বছরে পড়লেন তার আগের রাত্রি। পরে এই দিনটির কথাই তাঁর বেশি মনে ছিল।

রাত্রি প্রায় এগারোটা হবে। লর্ড হেনরির বাড়ি থেকে ডিনার খেয়ে ফিরছিলেন তিনি। রাত্রিটা ঠান্ডা কনকনে। ঘন কুয়াশা জমেছিল আকাশে। মোটা ফারের কোট ছিল তাঁর গায়ে। গ্রসভেনর স্কোয়ার আর সাউথ অডলি স্ট্রিটের কোণে সেই অন্ধকারে একটি লোক তাঁর পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলেন। লোকটি বেশ দ্রুতই হাঁটছিলেন; ধূসর রঙের আলেস্টারের কলারটা তাঁর ওলটানো ছিল। তাঁর হাতে ছিল একটা ব্যাগ। চিনতে পারলেন ডোরিয়েন। পথচারী হচ্ছেন বেসিল হলওয়ার্ড। হঠাৎ কী জানি কেন ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। পথচারীকে চেনার কোনো লক্ষ্মণ না দেখিয়ে তিনি নিজের বাড়ির দিকে হন-হন করে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু হলওয়ার্ড তাঁকে দেখতে পেলেন। ডোরিয়েন বেশ বুঝতে পারলেন হলওয়ার্ড ফুটপাতের ওপরে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তারপরেই তিনি দ্রুতগতিতে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর হাত ডোরিয়েনের হাত স্পর্শ করল।

ডোরিয়েন, কী ভাগ্য! প্রায় ন'টা থেকে তোমার লাইব্রেরিতে তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত তোমার চাকরের ওপরে কেমন যেন দয়া হল আমার। বেরিয়ে আসার সময় সে দরজা খুলে দিল। আমি তাকে শুয়ে পড়তে বললাম। আজ রাত্রির ট্রেনেই আমি প্যারিসে চলে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে বিশেষ করে তোমার সঙ্গেই আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম। আমার পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতে মনে হল তোমাকে আমি দেখেছি—অথবা, তোমার ওই ফার কোটটাকে। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি কি চিনতে পারনি আমাকে?

প্রিয় বেসিল, এই কুয়াশায়? কী যে বল! গ্রসভেনর স্কোয়ারটাকেও চিনতে পারছি নে। মনে হচ্ছে আমার বাড়িটা এরই কাছাকাছি একটা জায়গায় হবে; কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় সেটা ঠাহর হচ্ছে না। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই তুমি চলে যাচ্ছ বলে বেশ কষ্ট হচ্ছে আমার। কিন্তু মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়িই ফিরে আসছ তুমি!

না, ছ'মাসের জন্যে ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। ঠিক করেছি প্যারিসে একটা স্টুডিয়ো নেব, সত্যিকার বিরাট একটা কিছু কাজ করার ইচ্ছে হয়েছে আমার। যতদিন না সে-কাজ শেষ হয় ততদিন পর্যন্ত স্টুডিয়ো ছেড়ে আমি বাইরে বেরোব না। যাই হোক, নিজের কোনো কথা তোমাকে আমি বলতে চাই নে। তোমার বাড়ির সামনে এসে গিয়েছি আমরা। চল, একটু বসে যাই, তোমাকে কিছু বলার রয়েছে আমার।

খুব খুশি হব আমি। কিন্তু তুমি ট্রেন ফেল করবে না?

সিঁড়িতে উঠে "ল্যাচ কী" দিয়ে দরজাটা খুলতে-খুলতে বেশ ক্লান্ত স্বরেই প্রশ্ন করলেন ডোরিয়েন।

ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে বাতির আলো বেশ কষ্ট করেই বেরিয়ে এল বাইরে। সেই আলোতে হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হলওয়ার্ড বললেন: এখনো অনেক সময় রয়েছে। বারোটা পনেরোর আগে ট্রেন ছাড়ছে না। সত্যি কথা বলতে কি তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই

আমি ক্লাবের দিকে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ রাস্তায় তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখতেই পাচ্ছ ভারী লাগেজ পাঠাতে আমার দেরি হবে না; সেগুলি আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে রয়েছে কেবল এই ব্যাগটা। ভিকটোরিয়া স্টেশনে পৌঁছতে আমার কুড়ি মিনিটের বেশি সময় যাবে না।

তাঁর দিকে তাকিয়ে ডোরিয়েন একটু হাসলেন।

তোমার মতো একজন শৌখিন চিত্রকরের এইভাবে বেড়াতে যাওয়ার রীতিটি নিঃসন্দেহে চমৎকার। একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ আর একখানা আলেস্টার। ভেতরে এস; দরজা খুলে রাখলে কুয়াশা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ। কোনো সিরিয়াস আলোচনা তুমি করবে না। আজকাল সিরিয়াস বলে কোনো জিনিসেরই অস্তিত্ব নেই। অন্তত, থাকা উচিত নয়।

ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে হলওয়ার্ড নিজের মাথাটা নাড়লেন; তারপরে ডোরিয়েনের পিছু-পিছু লাইব্রেরিতে হাজির হলেন। বড়ো খোলা উনুনে কাঠের আগুন গনগন করছিল। বাতি জ্বালানো হল। একটা রুপোর ডাচ স্পিরিট কেস-এর ওপরে সোডার বোতল, বড়ো গ্লাস কয়েকটা বসানো ছিল।

ডোরিয়েন, তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার চাকর আমার যথেষ্ট সেবা করেছে। আমার সব কিছু প্রয়োজন সে স্বেচ্ছাতেই মিটিয়েছে; এমন কি তোমার সবচেয়ে দামি সিগারেট পর্যন্ত আমাকে দিতে সে কোনোরকম কুণ্ঠাবোধ করেনি। অতিথিবৎসল হিসাবে সে পয়লা নম্বরী। তোমার আগের সেই ফরাসি চাকরের চেয়ে একে আমার বেশি ভালো লেগেছে। আচ্ছা, সেই লোকটি কোথায়?

কাঁধ কুঁচকে ডোরিয়েন বললেন: মনে হচ্ছে, সে লেডি ব্র্যাডিলির ঝিকে বিয়ে করেছে। বৌকে সে প্যারিসে ইংরেজ দর্জি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে; ওখানে এই জাতীয় ফ্যাশনের বেশ দাম রয়েছে। ফরাসিরা কী বোকা, তাই না? কিন্তু তুমি কি জান, চাকর হিসাবে লোকটি মোটেই খারাপ ছিল না। আমি তাকে কোনোদিনই পছন্দ করতাম না সত্যি কথা; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কিছু আমার ছিল না। মানুষে প্রায় এমন অনেক জিনিস কল্পনা করে থাকে যেগুলি চরিত্রের দিক থেকে উদ্ভট। সেও আমার খুব অনুরক্ত ছিল। চলে যাওয়ার সময় বেশ কষ্টই হয়েছিল তার। আর একটু ব্র্যানডি আর সোডা নাও। না, "হক আর সেলট্‌জার" নেবে? আমার কিন্তু হক আর সেলট্‌জারই ভালো লাগে বেশি। পাশের ঘরে নিশ্চয় কেউ রয়েছে।

টুপি আর ওভারকোট খুললেন চিত্রকর; সেগুলিকে ব্যাগের ওপরে রাখলেন, ব্যাগটিকে তিনি আগেই একটা কোণে রেখেছিলেন। তারপরে বললেন: ধন্যবাদ। না; আর কিছু আমার চাই নে। এখন বন্ধু, তোমার সঙ্গে কিছু সিরিয়াস আলোচনা আমি করতে চাই। ওভাবে ভ্রূকুটি করো না। ওইরকম করার জন্যেই সত্যি কথাটা তোমাকে বলা আমার কাছে বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

সোফার ওপরে বসে তাঁর স্বাভাবিক খিটখিটে মেজাজের সঙ্গেই ডোরিয়েন বললেন: ব্যাপারটা কী বল তো? আশা করি, আমার বিষয়ে কিছু নয়। আজ রাত্রিতে আমি বড়ো ক্লান্ত, মেজাজটা বেশ ভালো নেই।

বেশ গম্ভীর ভাবেই হলওয়ার্ড বললেন: কথাটা তোমারই সম্বন্ধে; আর সে-কথা তোমাকে আমার বলতেই হবে। আধঘণ্টার বেশি সময় তোমার আমি নেব না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন ডোরিয়েন; তারপরে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন: আধঘণ্টা!

ডোরিয়েন, বেশি কিছু বলার নেই আমার। তবে আমি যা বলছি সেটা তোমার নিজেরেই ভালোর জন্যে। লন্ডনে তোমার সম্বন্ধে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। গুজবগুলি নোংরা। আমার মনে হয় সেগুলি কী তা তোমার জানা উচিত।

সেগুলি কী তা জানার কোনো আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। অন্য লোকের কুৎসা শুনতে আমার ভালো লাগে; কিন্তু নিজের কুৎসা শোনার কোনো আগ্রহ নেই আমার। এদের মধ্যে নতুন কিছু নেই।

সেগুলি জানার আগ্রহ তোমার থাকা উচিত ডোরিয়েন। সুনাম বজায় থাকুক এটা প্রতিটি ভদ্রলোকই চায়। লোকে তোমাকে নোংরা অশ্লীল ভাবুক এটা নিশ্চয় তুমি চাও না। অবশ্য সমাজে তোমার প্রতিষ্ঠা রয়েছে, রয়েছে সম্পদ—অভিজাত সম্প্রদায়ের আরো অনেক কিছু রয়েছে সম্ভবত। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর সম্পদই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনে রেখো, এসব গুজবে আমি কান দিই নে। তোমাকে দেখলে সে-সব গুজব বিশ্বাস করতে পারি নে আমি। পাপ এমন একটা জিনিস যা মানুষের মুখের ওপরে নিজের অস্তিত্বের সমস্ত চিহ্ন ফুটিয়ে তোলে। পাপকে লুকিয়ে রাখা যায় না। অনেক সময় মানুষে গোপন পাপের কথা বলে;

কিন্তু ওরকম কোনো বস্তু নেই। চোখ, মুখ, এমন কি হাতের বলিরেখার ওপরেও পাপের সমস্ত চিহ্ন ফুটে ওঠে। একটি ভদ্রলোক—তাঁর নাম আমি করব না—কিন্তু তুমি তাঁকে জান—গত বছর আমার কাছে এসেছিলেন তাঁর একটি প্রতিকৃতি এঁকে দেওয়ার জন্যে। ওর আগে কোনোদিনই তাঁকে আমি দেখিনি। দেখা দূরের কথা, কোনোদিন নামও পর্যন্ত শুনিনি তাঁর; যদিও তার পরে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা আমার কানে এসেছে। প্রতিকৃতিটি তৈরি করার পারিশ্রমিক হিসাবে অনেক টাকা তিনি আমাকে দিতে চাইলেন। রাজি হইনি আমি। তাঁর আঙুলের ওপর এমন একটা চিহ্ন ফুটে উঠেছিল যা দেখতে আমার ভালো লাগেনি। এখন আমি জানি তাঁর সম্বন্ধে তখন আমি যা সন্দেহ করেছিলাম সেগুলি সব সত্যি। মানুষটির ব্যবহারিক জীবন ক্লেদাক্ত, পঙ্কিল। কিন্তু ডোরিয়েন, তোমার কথা স্বতন্ত্র। তোমার চরিত্র পবিত্র, উজ্জ্বল, নিষ্পাপ, তোমার যৌবন বিকৃত নয়। তোমার বিরুদ্ধে কোনো কুৎসাই বিশ্বাস করতে আমি রাজি নই। তবু তোমার সঙ্গে আজকাল আমার খুব কমই দেখা হয়; তুমি আজকাল আমার স্টুডিয়োতে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছ। ঠিক এইকম একটি পরিস্থিতিতে তোমার বিরুদ্ধে যে-সব কুৎসা রটছে তাদের জবাব যে আমি কী দেব তা আমি নিজেই বুঝতে পারছিনে। আচ্ছা ডোরিয়েন, তুমি ক্লাবে ঢুকলে ডিউক অফ বারউইকের মতো ভদ্রলোক কেন ঘর ছেড়ে, বেরিয়ে যান বলতে পার? লন্ডনের এতগুলি ভদ্রলোক কেন তোমাকে তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন না, বা কেন তোমার বাড়িতে আসেন না সেকথা কি তুমি জান? লর্ড স্টেভিলির বন্ধু ছিলে তুমি। গত সপ্তাহে একটা ডিনারে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ডাডলির প্রদর্শনীতে তুমি যে কিছু টুকরো ছবি ধার দিয়েছিলে সেই প্রসঙ্গেই তোমার কথা উঠেছিল। স্টেভিলি তাঁর ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন—কিছু আর্টিস্টিক রুচি হয়তো তোমার রয়েছে; কিন্তু কোনো নিরপরাধ যুবতীর তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়; অথবা, তোমার সঙ্গে একই ঘরে বসে থাকাট কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষেই শোভনীয় দেখাবে না। তাঁকে আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম যে তুমি আমার বন্ধু; তাঁর মন্তব্যের গূঢ় অর্থ কী সেটাও জানতে চাইলাম আমি। কেন তিনি ওই মন্তব্য করলেন সেকথা তিনি আমাকে বললেন; কেবল আমাকেই নয় সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের সামনেই তিনি বললেন। তাঁর বক্তব্য শুনে আমার খুব খারাপ লাগল। যুবকদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব এতটা মারাত্মক কেন? সেপাই দলের সেই হতভাগ্য ছেলেটা সেদিন আত্মহত্যা করে বসল। তুমি তার খুব প্রিয় বন্ধু ছিলে। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে স্যার হেনরি অ্যাসটনকে ইংলন্ড ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তোমরা দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলে। আড্রিয়ান সিঙ্গ লটন আর তাঁর ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাই বা কেন না জানে? লর্ড কেন্টের একমাত্র পুত্র আর তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ওই একই কথা খাটে। সেন্ট জেমেস স্ট্রিটে তার বাবার সঙ্গে গতকাল আমার দেখা হয়েছিল। লজ্জা আর দুঃখে, মনে হল ভদ্রলোক ভেঙে পড়েছেন। পার্থ-এর যুবক ডিউকের কথাই বা কী বলব? কী ভাবে সে জীবন কাটাচ্ছে তা তুমি জান? কোন ভদ্রলোক তার সঙ্গে মেলামেশা করবে?

দুটো ঠোঁট কামড়িয়ে ঘৃণার সঙ্গে ডোরিয়েন বললেন: বেসিল, চুপ কর। এমন সব বিষয় নিয়ে তুমি আলোচনা করছ যাদের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। আমি ঘরে ঢুকলে বারউইক সেই ঘর ছেড়ে উঠে যায় কেন সে প্রশ্ন তুমি আমাকে করেছ। তার কারণ এই নয় যে সে আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে; তার কারণ হচ্ছে এই যে তার সম্বন্ধে আমি সব কিছু জানি। ধমনীতে তার যে বিষাক্ত রক্ত বইছে তারপরেও সে কেমন করে পরিষ্কার থাকবে? হেনরি অ্যাসটন আর যুবক পার্থের কথা তুমি আমাকে বলেছ। আমি কি প্রথম লোকটিকে পাপ কাজ করতে শিখিয়েছি, না, লম্পট হওয়ার মদত দিয়েছি দ্বিতীয় মানুষটিকে? যদি কেন্টের মূর্খ ছেলে বস্তীর মেয়েকে বিয়ে করে তাতে আমার কী যায় আসে? যদি আড্রিয়ান সিঙ্গলটন বিলের ওপরে তার বন্ধুর নাম জাল করে তার জন্যে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কথা কি আমার? ইংলন্ডের লোকেরা সব বিষয়েই কী রকম হইচই করে তা আমি জানি। নোংরা খাবার

টেবিলের ধারে বসে এখানকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের নৈতিক কুসংস্কার নিয়ে মহা আড়ম্বরে ঢাক-ঢোল পেটায়; অভিজাত সম্প্রদায়ের লাম্পট্য নিয়ে তারা দেদার আলোচনা করে এইটা প্রমাণ করার জন্যে যে তারা অতিশয় চতুর, আর যাদের তারা কুৎসা করছে তাদের সঙ্গে তারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এদেশে পরের কুৎসা কুড়ানোর যোগ্যতা তাদেরই রয়েছে যারা অভিজাত আর বুদ্ধিমান। যারা নিজেদের নীতি নিয়ে এত বড়াই করছে তাদের দৈনন্দিন জীবনটাই বা কী? বন্ধুবর, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমরা সবাই কপট মানুষের সমাজে বাস করছি।

হলওয়ার্ড একটু জোরেই বললেন: ডোরিয়েন, কথাটা তা নয়। সেদিক থেকে ইংলন্ড যে যথেষ্ট খারাপ, আর এখানকার সমাজ যে ভুল ছাড়া কিছু ঠিক করে না তা আমি জানি। সেই জন্যেই আমি চাই তুমি পরিচ্ছন্ন হও। কিন্তু তুমি তা হতে পারনি। প্রভাব বিস্তারের ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করার অধিকার আমাদের রয়েছে। মনে হচ্ছে সম্ভ্রমবোধ, সততা, আর চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সবই তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি তাদের ভোগের উন্মাদনায় উন্মত্ত করে তুলেছ, অধঃপাতের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে তারা। তুমি তাদের সেই পথে পরিচালিত করেছ। হ্যাঁ, তুমি তাদের পরিচালক। তবু তুমি হাসতে পার, ঠিক এখন যেমন তুমি হাসছ। কিন্তু বিপদটা এখানেই শেষ নয়। আমি জানি তুমি আর হেনরি অচ্ছেদ্য। অন্য কোনো কারণ না থাকলেও, ঠিক সেই কারণেই তার বোনের কলঙ্ক রটনা করাটা তোমার উচিত হয়নি।

সাবধান বেসলি; তোমার কথার ঝাঁঝটা বড়ো বেশি তীব্র হয়ে পড়ছে।

তাহলেও, আমাকে তা বলতেই হবে; আর তোমাকে সেকথা শুনতেই হবে। শুনতে তুমি বাধ্য। তোমার সঙ্গে লেডি গিয়েনদোলেনের যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসার একটি বাণীও কারও মুখ থেকে বেরোয়নি। আজকে লন্ডনে এমন একটি ভদ্রমহিলাকেও কি খুঁজে পাওয়া যাবে যিনি তাঁর সঙ্গে গাড়িতে পাশাপাশি বসে পার্কে বেড়াতে যেতে রাজি হবেন? অপরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত তাঁর কাছে থাকতে দেওয়া হয় না। তাছাড়া, তোমার সম্বন্ধে আরো অনেক কুৎসিত কথা প্রচারিত হয়েছে সেগুলির সম্পর্কেই বা বলার কী রয়েছে তোমার? শোনা যায় খুব সকালে নাকি বেশ্যাবাড়ি থেকে গা ঢাকা দিয়ে তুমি বেরিয়ে আস; আবার সন্ধের পরে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে তুমি বারবনিতাদের বাড়িতে ঢুকে পড়। এসব কথা কি সত্যি? এসব কাহিনি কি সত্যি হতে পারে? এসব কথা যখন প্রথম আমার কানে এল তখন আমি হেসেছিলাম। এখন সে-সব কথা শুনে আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। শহরের বাইরে তোমার যে বাগানবাড়ি রয়েছে সেটাই বা কী? সেখানে তুমি যে জীবন যাপন কর তার সম্বন্ধেই বা বলার কী রয়েছে তোমার? ডোরিয়েন, লোকে তোমার নামে কী বলে তা তুমি জান না। তোমার কাছে আমি সৎ ভাষণ দেব না এমন কোনো কথা আমি বলব না। মনে আছে হেনরি একবার বলেছিল দু'দিনের যোগীরা সব সময়েই ওইরকম কথা বলেই এগিয়ে আসে; তারপরে প্রথম চোটেই সেটা তারা ভেঙে ফেলে। আমি তোমাকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে চাই। আমি চাই তুমি এমন জীবন যাপন কর যাতে সবাই তোমাকে সম্মান করতে পারে। তোমার নামের সঙ্গে যে কলঙ্ক জড়িয়ে রয়েছে, আমি চাই সেই কলঙ্ক মুছে ফেলে তুমি একটি পরিচ্ছন্ন জীবনের পথে এগিয়ে এস। যে সমস্ত লোংরা লোকের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছ, আমি চাই তাদের সঙ্গ তুমি পরিত্যাগ কর। ওভাবে উপহাস করো না আমাকে। নিজের সম্বন্ধে অতটা উদাসীন হয়ো না। মানুষের ওপরে তোমার প্রভাব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য; কিন্তু সেই প্রভাব কুপথে পরিচালিত না করে মানুষকে সুপথে পরিচালিত করুক। লোকে বলে যাদের সঙ্গেই

তোমার হৃদ্যতা জন্মায় তাদেরই তুমি খারাপ পথে নিয়ে যাও; আর কারও বাড়িতে তুমি পা দিলেই লোকে ধরে নেবে যে এবারে সেখানে একটা নোংরা জিনিস ঘটবে। এটা সত্যি কি না তা আমি জানি নে; কী করেই বা জানব? কিন্তু তোমার সম্বন্ধে এই রকমেরই একটা ধারণা জন্মেছে সকলেরই মনে। আমি এমন সব ঘটনার কথা শুনেছি যেগুলিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। সেই অক্সফোর্ড থেকেই লর্ড গ্লসেস্টার আমার একজন প্রিয় বন্ধু। তিনি আমাকে একটি চিঠি দেখালেন। চিঠিটি তাঁর স্ত্রীর। মেনটোন-এর বাগানবাড়িতে নিঃসঙ্গ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে সেই চিঠিটি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি যে স্বীকারোক্তি করেছেন তার মধ্যে তোমার নাম কুৎসিত ভাবে জড়ানো রয়েছে। এরকম ভয়ানক স্বীকারোক্তি জীবনে আর কখনো আমি পড়িনি। আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম—এ কথা অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি নে; আমি তাকে ভালোভাবেই জানি; এরকম কাজ সে কোনোদিন করতে পারে না। তোমাকে কি আমি জানি? আমার অবাক লাগে ভাবতে তোমাকে সত্যিই আমি জানি কি না। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তোমার আত্মাটাকে আমার দেখা উচিত।

সোফা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ডোরিয়েন; ভয়ে মুখটা তাঁর প্রায় সাদা হয়ে উঠল, তিনি বিড়বিড় করে বললেন: আমার আত্মাকে দেখা!

গম্ভীরভাবে আর বেশ গভীর দুঃখের সঙ্গে হলওয়ার্ড বললেন: হ্যাঁ, তোমার আত্মাকে আমি দেখতে চাই; কিন্তু একমাত্র ভগবানই তা পারেন।

ডোরিয়েনের ঠোঁটের ভেতর থেকে উপহাসের একটা তিক্ত হাসি বেরিয়ে এল।

তুমি নিজেই তা দেখবে এস, আজই, আজ রাত্রেই—টেবিল থেকে বাতিটা নিয়ে চিৎকার করে বললেন তিনিঃ এস। এটা তোমার নিজের হাতেই তৈরি হয়েছে। তুমি তা দেখতে পাবে না কেন? ইচ্ছে হলে পরে একথা তুমি বিশ্ববাসীকে জানাতে পার। কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না। যদি তারা তা করে তাহলে তারা আমাকে আরো বেশি পছন্দ করবে। এই যুগের পক্ষ যত সাফাই-ই তুমি গাও না কেন আমি একে ভালো করেই চিনি। আমি বলছি, আমার সঙ্গে তুমি এস। ব্যভিচারের বিরুদ্ধে অনেক বকবক করেছ তুমি। এবার তুমি তা নিজের চোখে দেখতে পাবে।

তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে একটা গর্বের আবেগ ঝরে পড়ল। ছেলেমানুষের মতো দম্ভভরে তিনি মাটিতে পা ঠুকলেন। দ্বিতীয় কেউ তাঁর জীবনের গোপন রহস্যের অংশীদার হবে এই চিন্তায় তিনি একটা ভয়ঙ্কর আনন্দ পেলেন। তাঁর লজ্জা আর অপমানের মূলাধার সেই প্রতিকৃতিটি যিনি নিজের হাতে এঁকেছেন সেই কীর্তির ভয়ঙ্কর স্মৃতিটা তাঁকেও যে বাকি জীবনটা বয়ে বেড়াতে হবে এই ভেবে ডোরিয়েনের মন পৈশাচিক উল্লাসে নেচে উঠল।

তাঁর কাছে সরে এসে এবং তাঁর কঠোর চোখ দুটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডোরিয়েন আগের কথারই পুনরুক্তি করলেন: হ্যাঁ। আমার আত্মা আমি তোমাকে দেখাব। যা একমাত্র ভগবানের দেখার কথা বলে তোমার মনে হয়েছিল সেই জিনিসটাই নিজের চোখে তুমি দেখতে পাবে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন হলওয়ার্ড বললেন: ডোরিয়েন, ভগবানের কুৎসা করছ তুমি। ওরকম কথা বলা তোমার উচিত নয় কথাগুলি কেবল বিপজ্জনকই নয়, অর্থহীন।

আবার হাসলেন ডোরিয়েন: তাই মনে হচ্ছে তোমার?

হ্যাঁ। আজ রাত্রে তোমাকে যে-সব কথা বললাম সেগুলি তোমারই মঙ্গলের জন্যে। তুমি জান, আমি চিরদিনই তোমার সত্যিকার বন্ধু।

আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার বলা শেষ কর।

চিত্রকরের মুখের ওপরে বেদনার একটা জ্বালা তড়িৎগতিতে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। একটু থামলেন তিনি। কেমন যেন মায়া হল তাঁর। ঘটনা যাই হোক, ডোরিয়েন গ্রের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামানোর কী অধিকার তাঁর রয়েছে! তাঁর সম্বন্ধে যে-সব কুৎসা ছড়িয়েছে তার কিছুটাও যদি সত্যি হয় তাহলেই কি কম কষ্ট তিনি পেয়েছেন? তারপরেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন ফায়ার প্লেসের কাছে; তাকিয়ে রইলেন জ্বলন্ত কাঠ, কুয়াশার মতো ছাই, আর কেঁপে-কেঁপে ওঠা আগুনের শিখাগুলির দিকে।

শক্ত এবং পরিচ্ছন্ন সুরে ডোরিয়েন বললেন: আমি অপেক্ষা করছি, বেসিল।

ঘুরে দাঁড়ালেন বেসিল, বললেন: তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে সেগুলির উপযুক্ত জবাব তুমি আমাকে দেবে আমি কেবল এইটুকুই বলতে চাই। তুমি যদি বল গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অভিযোগগুলি একেবারে মিথ্যা, আমি তাই বিশ্বাস করব। ডোরিয়েন, অভিযোগগুলি অস্বীকার কর তুমি, কী গভীর উৎকন্ঠায় আমি ভুগছি তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ভগবানের দিব্যি, তুমি আমাকে বলো না যে তুমি খারাপ, ব্যভিচারী, আর ঘৃণ্য।

ডোরিয়েন গ্রে হাসলেন। তাঁর ঠোঁটের ওপরে ঘৃণার বাঁকা রেখা ফুটে বেরোল। তিনি শান্তভাবে বললেন: ওপরে চল বেসিল। প্রতিদিনের রোজনামচা আমি লিখে রাখি। যে-ঘরে এটি লিখি সে-ঘরের বাইরে সেটি যায় না। আমার সঙ্গে এলে আমি সেটি তোমাকে দেখাব।

তুমি যদি তাই চাও, আমি যাব ডোরিয়েন। মনে হচ্ছে ট্রেন ফেল করেছি আমি। তাতে কিছু যায় আসে না। কাল যেতে পারি। কিন্তু আজ রাত্রিতে কিছু পড়তে আমাকে বলো না। আমি যা চাই তা হচ্ছে আমার প্রশ্নগুলির সোজা উত্তর।

উত্তর আমি ওপরেই দেব। এখানে সে উত্তর আমি দিতে পারব না। বেশি পড়তে হবে না তোমাকে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি; সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। তাঁর পিছু-পিছু চললেন বেসিল হলওয়ার্ড। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো ধীরে-ধীরে হাঁটতে লাগলেন তাঁরা। জ্বলন্ত বাতি থেকে বেরিয়ে ভূতুড়ে ছায়াগুলি সিঁড়ি আর দেওয়ালের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বাইরের ঝড়ো বাতাসে জানালার খড়খড়িগুলো খট-খট করে শব্দ করতে লাগল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে ডোরিয়েন বাতিটাকে মেঝের ওপরে নামিয়ে রাখলেন; তারপর চাবি বার করে তালাটা খুলে ফেললেন। দরজা খুলে আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি: তুমি জানতে চাও, এই না বেসিল?

চাই।

হেসে বললেন ডোরিয়েন: তোমার কথা শুনে আমি খুশি হয়েছি।

তারপরে একটু রূঢ়ভাবেই তিনি বললেন: পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র মানুষ আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানার যার অধিকার রয়েছে। তুমি যতটুকু ভাবছ আমার জীবন নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করার প্রয়োজন তোমার রয়েছে।

এই পর্যন্ত বলে বাতিটা তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি। একতাল ঠান্ডা বাতাস তাঁদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিশ্রী রকমের লাল হয়ে শিখাটা হঠাৎ কেঁপে একবার উঁচু হয়ে উঠল। শিউরে উঠলেন তিনি। বাতিটা টেবিলের ওপরে রেখে তিনি ফিসফিস করে বললেন: দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হলওয়ার্ড তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। চারপাশে বন্ধ ঘরটার অবস্থা দেখে মনে হল অনেক দিন সেখানে কেউ বাস করেনি।

একটি বিবর্ণ ফ্লেমিশ গালচে, পর্দা দিয়ে ঢাকা একখানা বড়ো ছবি, একটি পুরনো ইটালিয়ান ক্যাসোনি, আর প্রায় খালি একটা বুক-কেস—ঘরের আসবাবপত্র বলতে মোটামুটি এই; তা ছাড়া রয়েছে একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। কুলুঙ্গির ওপরে আধপোড়া একটা বাতি ছিল; ডোরিয়েন সেটা জ্বালানোর সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল সারা ঘরটার ওপরে পুরু ধুলো জমেছে, মাঝে-মাঝে কার্পেটটা ফুটো হয়ে গিয়েছে। তাঁদের শব্দ পেয়েই একটা ইঁদুর ছুটে পর্দার পেছনে লুকিয়ে পড়ল। ব্যাঙের ছাতার ভিজে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

বেসিল, তোমার ধারণা একমাত্র ভগবানই মানুষের আত্মা দেখতে পান? তাই না? ওই পর্দাটা একপাশে টেনে দাও; তুমি আমার আত্মাটা দেখতে পাবে।

স্বরটা কেবল নিরুত্তাপই নয়, যথেষ্ট নিষ্ঠুর।

তাঁর দিকে ভ্রূকুটি করে হলওয়ার্ড বললেন: ডোরিয়েন, হয় তুমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছ; না হয় তো, অভিনয় করছ।

ডোরিয়েন বললেন: পর্দাটা তুমি সরাতে চাও না? তাহলে আমি নিজেই তা সরিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে একটা হেঁচকা টান দিয়ে পর্দাটা খুলে ফেললেন তিনি; তারপরে মেঝের ওপরে ছুঁড়ে

দিলেন সেটাকে।

ভয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন হলওয়ার্ড। সেই স্বল্প আলোতে মনে হল ক্যানভাসের ওপর থেকে একটা বীভৎস মুখ তাঁর দিকে কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সেই দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তাঁর মন ঘৃণা আর বিরক্তিতে ভরিয়ে তুলল। হায় ভগবান, যা তিনি দেখছেন তা কি ডোরিয়েন গ্রের মুখ? খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। সেই বীভৎসতার মধ্যে, চেহারা তার যত বিকৃতই হোক, সেই অপরূপ সৌন্দর্যকে একেবারে নষ্ট করতে পারেনি। ক্ষীয়মান কেশগুলির ওপরে এখনো কিছু রঙিন আভা ছড়িয়ে রয়েছে। ঠোঁট দুটির রঙ এখনো বিবর্ণ হয়ে যায়নি। ব্যভিচারে নিষ্প্রভ চোখ দুটি থেকে নীলাঞ্জন ছায়াটুকু এখনো একেবারে মুছে যায়নি; পাথরে কুঁদাই করার মতো সুন্দর নাক আর মসৃণ কন্ঠ থেকে বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গিটির সৌন্দর্য এখনো নষ্ট হয়নি। হ্যাঁ, ডোরিয়েনের প্রতিকৃতিই বটে। কিন্তু কে একাজ করলে? এই রঙ-তুলি তো তাঁরই নিজের; প্রেমের পরিকল্পনাও তো তাঁরই নিজস্ব। জ্বলন্ত বাতিটা তুলে নিয়ে প্রতিকৃতিটির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ফ্রেমের বাঁ দিকের কোণে তাঁর নিজেরেই নাম খোদাই করা রয়েছে।

ব্যাপারটা কেবল নিম্নশ্রেণির প্রহসনই নয়, ঘৃণ্য, নীচ বিদ্রূপও বটে। ঠিক এইরকম একটি ছবি তিনি আঁকতে পারেন না। তবু এ ছবি তাঁরই। তিনি তা জানতেন। মনে হল, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর শরীরের সমস্ত গরম রক্ত জমে বরফ হয়ে গেল। এই কি তাঁর নিজের আঁকা ছবি? এর অর্থ কি? এর পরিবর্তন হল কেন? রুগ্ন মানুষের দৃষ্টি দিয়ে ডোরিয়েন গ্রের দিকে তিনি ফিরে তাকালেন। তাঁর মুখ বিকৃত হল; শুকিয়ে এল জিব। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোতে চাইল না তাঁর। কপালের ওপরে তিনি হাত বুলোলেন। চিটচিটে ঘামে ভিজে গিয়েছে কপালটা।

কোনো বড়ো অভিনেতার অভিনয় দেখার সময় মানুষে যেরকম একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকে, কুলুঙ্গিতে ঠেস দিয়ে ডোরিয়েনও সেইভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে সত্যিকার কোনো দুঃখ অথবা আনন্দ বলে কিছু ছিল না। দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখছিলেন; সেই দৃষ্টির মধ্যে বিজয় অভিযানের কিছু ইঙ্গিতও যে একেবারে ছিল না সে কথাও সত্যি নয়। কোটের বোতাম থেকে একটা গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে তিনি তা দেখছিলেন অথবা মনে হল যেন শুঁকছিলেন।

শেষ পর্যন্ত হলওয়ার্ডই চিৎকার করে উঠলেন: এ সবের অর্থ কী?

সেই তীক্ষ্ণ স্বর তাঁরই কানে কেমন যেন বেখাপ্পা শোনাল।

ফুলটা হাতের ভেতরে চটকে ডোরিয়েন বললেন: অনেক দিন আগে, আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, তোমার সঙ্গে যখন আমার প্রথম আলাপ হল সেই সময় আমার নিজের দেহের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সজাগ থাকতে তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলে। একদিন তোমার একটি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। যৌবনের বিস্ময় বলতে কী বোঝায় সে-কথা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তুমি আমার প্রতিকৃতি শেষ করলে। আমি যে কত সুন্দর সে কথা তখনই আমি বুঝতে পারলাম। মুহূর্তের উত্তেজনায়, আমি এখনো জানি নে তার জন্যে আমি দুঃখিত কি না, আশা করেছিলেম, তুমি সেটাকে প্রার্থনাও বলতে পার...

আমার তা মনে আছে। খুব ভালোভাবেই মনে রয়েছে। না, না, সে অসম্ভব। এই ঘরটা স্যাঁতসেঁতে। ক্যানভাসের ওপরে ব্যাঙের ছাতার মতো একটা আবরণ পড়েছে। যে রঙ দিয়ে আমি এটা এঁকেছিলাম নিশ্চয় তার ভেতরে কিছু ধাতব বিষ মেশানো ছিল। আমি তোমাকে

বলছি—এ অসম্ভব ঘটনা।

জানালার ধারে এগিয়ে গিয়ে শিশির-ভেজা শার্সির গায়ে মাথাটা চেপে ডোরিয়েন বললেন: অসম্ভব ঘটনাটা কী?

ছবিটাকে তুমি নষ্ট করে ফেলেছ—এই কথাই তুমি আমাকে বলেছিলে।

সেটা মিথ্যে কথা। ছবিটাই আমাকে নষ্ট করেছে।

আমি বিশ্বাস করি নে এটা আমার আঁকা ছবি।

ডোরিয়েন তিক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার আদর্শ এর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছ না?

আমার আদর্শ, যা তুমি বলছ...

যা তুমি বলতে।

তার মধ্যে কোনো নোংরামি ছিল না, ছিল না ঘৃণা করার মতো কিছু জিনিস। তুমি আমার কাছে এমন একটি আদর্শ ছিলে ঠিক যেরকমটি আর কোনোদিনই আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু এই মুখটা তো দেখছি ছাগলের।

এটি হচ্ছে আমার আত্মার মুখ।

হায় ভগবান, এই জিনিসটাকে আমি এতদিনে পুজো করে এসেছি? এর চোখ দুটো তো শয়তানের।

নৈরাশ্যের ভঙ্গি করে ডোরিয়েন বললেন: আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই স্বর্গ আর নরক দুইই রয়েছে, বেসিল।

আবার প্রতিকৃতিটির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন বেসিল; তাকিয়ে রইলেন তার দিকে; তারপরে চিৎকার করে বললেন: হায় ভগবান, এটাই যদি সত্যি হয়...তোমার জীবন নিয়ে যদি এইরকম খেলাই তুমি সত্যি-সত্যিই খেলে থাক থাহলে লোকে তোমার সম্বন্ধে যা ভাবে তার চেয়ে তো দেখছি তুমি অনেক বেশি খারাপ, অধঃপাতের আরও অনেক নীচে তুমি নেমে গিয়েছ।

এই বলে বাতিটি তুলে আবার তিনি ক্যানভাসটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ওপরটা মোটেই বিকৃত হয়নি। যেমন তিনি রেখেছিলেন ঠিক তেমনিই রয়েছে; বিকৃতি যা ঘটেছে তার সবটাই ওই ভেতর থেকে। অবচেতন মনের কোনো একটি বিশেষ আর রহস্যময় চোরা পথ দিয়ে পাপের কুষ্ঠ বাইরে বেরিয়ে এসে ছবিটিকে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলছে। জলে বোঝাই কবরের মধ্যে মৃতদেহের পচনও এর মতো ভয়ঙ্কর নয়।

হাত কাঁপতে লাগল তাঁর; বাতিটা হাত থেকে মাটির ওপর পড়ে গেল; শিখাটা ছিটকে পড়ল চারপাশে। পা দিয়ে মাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলেন তিনি তারপরে টেবিলের পাশে যে সরু একটা চেয়ার ছিল সেইখানে বসে দুটো হাত দিয়ে মুখটাকে ঢেকে দিলেন।

হায় ভগবান, ডোরিয়েন; এ কী শিক্ষা, এ কী ভয়ঙ্কর শিক্ষা!!

কোনো উত্তর এল না ডোরিয়েনের কাছ থেকে। জানালার কাছ থেকে একটা চাপা আর্তনাদে ফোঁপাতে লাগলেন তিনি।

হলওয়ার্ড বললেন: ডোরিয়েন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। শৈশবে আমাদের কী কণ্ঠস্থ করতে হয় বল তো? "হে ভগবান, পাপের পথে আমাদের পরিচালিত করো না; আমাদের পাপ তুমি ক্ষমা কর; আমাদের পবিত্র কর তুমি।" এস, আমরা দুজনে মিলে সেই প্রার্থনাই করি। তোমার দম্ভের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে; তোমার অনুতাপ করার প্রার্থনাও ভগবান পূর্ণ করবেন। তোমার সৌন্দর্যকে আমি খুব বেশি পূজা করতাম। শাস্তি পেয়েছি যথেষ্ট।

ধীরে-ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন ডোরিয়েন; অশ্রুসিক্ত লোচনে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে; বললেন: অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, বেসিল।

প্রার্থনার সময়-অসময় নেই, ডোরিয়েন; এস, আমরা দুজনে একসঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে চেষ্টা করে দেখি প্রার্থনার কোনো পদ আমাদের মনে আসে কি না। "যদিও তোমার পাপ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, তবু তাকেই আমি বরফের মতো সাদা করে দেব"—এই ধরনের একটা প্রার্থনা রয়েছে না?

ও-পদ বর্তমানে আমার কাছে অর্থহীন, বেসিল।

চুপ! ওকথা বলো না। জীবনে অনেক পাপ তুমি করেছ। হায় ভগবান, ওই হতভাগা জিনিসটা আমাদের যে ব্যঙ্গ করছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?

ছবিটির দিকে তাকালেন ডোরিয়েন গ্রে। বেসিলের ওপরে একটা অদম্য আক্রোশ হঠাৎ চেপে বসল তাঁর। মনে হল, ক্যানভাসের ওপরে আঁকা প্রতিকৃতিটা ঠোঁট বিকৃত করে বেসিলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল তাঁকে। বিরাট একটা উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন তিনি। একটা আহত পশুর উন্মত্ত জিঘাংসা তাঁকে অস্থির করে তুলল। ওই চেয়ারে যে মানুষটি বসে রয়েছে তাঁর ওপরে প্রচণ্ড একটা ঘৃণা এল তাঁর। মনে হল এত ঘৃণা জীবনেআর কাউকেই তিনি করেননি। পাগলের মতো তিনি চারপাশে তাকাতে লাগলেন। তাকের ওপরে একটা জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। চকচক করছিল জিনিসটা। এটা কী তা তিনি জানতেন। এটা একটা ছোরা। কয়েকদিন আগে একটা দড়ি কাটার জন্যে তিনি এটাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন; তারপরে সরিয়ে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। ধীরে-ধীরে হলওয়ার্ডের পাশ দিয়ে তিনি সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পেছনে গিয়ে ছোরাটা তুলে নিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। হলওয়ার্ড একটু নড়লেন; মনে হল তিনি এবারে উঠবেন। দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে ডোরিয়েন সেই ছোরা বেসিলের কানের পেছনে যে বড়ো শিরাটা রয়েছে তার মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ঢুকিয়ে দিলেন। মাথার ওপরে জোরে আঘাত করে ফেলে দিলেন মেঝেতে; তারপরে বারবার ছুরিকাঘাত করতে লাগলেন তাঁকে।

একটা চাপা গোঙানি শোনা গেল; মনে হল, চাপ-চাপ রক্তে কারও যেন কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বেসিলের অসহায় দুটি হাত বার তিনেকের মতো কাঁপতে-কাঁপতে ওপরে উঠে শেষবারের মতো মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়ল। আরো দু'বার তাঁর বুকে ছোরাটা বসিয়ে দিলেন ডোরিয়েন। মৃত বেসিলের কাছ থেকে কোনো প্রতিবাদ এল না। মেঝের ওপর জলীয় একটা কিছু ঝির-ঝির করে গড়িয়ে পড়ল। বেসিলের মাথাটা নীচের দিকে চেপে রেখে একটু অপেক্ষা করলেন তিনি; তারপর টেবিলের ওপরে ছোরাটা ছুঁড়ে দিয়ে কান পেতে রইলেন।

কার্পেটের ওপরে ঝির-ঝির করে রক্ত পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই তাঁর কানে এল না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। চারপাশ নির্জন, চুপচাপ। আশেপাশে কাউকেই দেখা গেল না। কয়েক সেকেন্ড চারপাশের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তিনি বারান্দার রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে চাবিটা বার করে আবার তিনি ভেতরে ঢুকলেন; তারপরে খিল দিয়ে দিলেন ঘরে।

মূর্তিটা তখনো চেয়ারের ওপরেই বসে রয়েছে; মাথাটা তার টেবিলের ওপরে নামানো; পিঠটা উঁচু হয়ে উঠেছে—হাত দুটি অদ্ভুতভাবে রয়েছে ছড়ানো। তার পিঠের ওপর গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন না থাকলে, আর তার ওপরে কালো রক্ত জমাট বেঁধে না উঠলে, সবাই ভাবত লোকটি ঘুমোচ্ছেন।

কত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ হয়ে গেল! অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে গেলেন তিনি; জানালার ধারে এসে খুলে দিলেন শার্সিগুলো; তারপরে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। বাতাসে কুয়াশা উড়ে গিয়েছে; অজস্র সোনালি নক্ষত্রে খচিত হয়ে আকাশটাকে একটা দানবীয় ময়ূরের পেখমের মতো দেখাচ্ছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন পুলিশ রোঁদে বেরিয়ে নিস্তব্ধ বাড়িগুলির বন্ধ দরজার ওপরে তার লম্বা লন্ঠন ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আলো ফেলছে। এক কোণে লাল রঙের একটা পুলিশের গাড়ি চকিতে দেখা দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লম্বা আলোয়ান জড়িয়ে একটি মহিলা রেলিং-এর ধার দিয়ে সন্তর্পণে স্খলিতপদে এগিয়ে এল। মাঝে-মাঝে সে থামল, ফিরে তাকাল পেছনের দিকে। পুলিশম্যান তার সামনে এগিয়ে এসে কী যেন বলল। হাসতে-হাসতে মেয়েটি টলতে-টলতে চলে গেল। যাওয়ার সময় হেঁড়ে গলায় অপ্রকৃতিস্থের মতো গানের কয়েকটা কলিও আওড়াল। একটা ঠান্ডা হাওয়া পার্কের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। গ্যাসের আলোগুলি কাঁপতে লাগল, কাঁপতে-কাঁপতে নীলচে হয়ে গেল তারা। পত্রহীন গাছগুলি তাদের সেই কালো-কালো লোহার মতো শক্ত ডালগুলি এপাশে-ওপাশে নাড়াতে লাগল। কাঁপতে-কাঁপতে পিছিয়ে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

দরজার সামনে গিয়ে চাবি দিয়ে তালাটা খুললেন তিনি। নিহত মানুষটির দিকে তিনি একবার ফিরেও তাকালেন না। তাঁর মনে হল ব্যাপারটা নিয়ে কোনোরকম চিন্তা না করাটাই হল আসল কথা। ওই ছবিটাই হল তাঁর সমস্ত দুঃখ আর দুর্দশার মূল কারণ। যে বন্ধুটি ওই বিপজ্জনক ছবি এঁকেছেন তিনি আজ মৃত। সেটাই যথেষ্ট।

তারপরে বাতিটার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। মুর দেশের কারুকার্য করা অদ্ভুত সেই বাতিদান; মরা রুপো দিয়ে তৈরি; তার গায়ে নীলকান্তমণির বুটি। সেটাকে যথাস্থানে দেখতে না পেয়ে চাকরটা হয়তো খোঁজাখুঁজি করবে। একটু ইতস্তত করলেন তিনি। তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে সেটি তুলে নিলেন। মৃত মানুষটির দিকে একবার চোখ না ফিরিয়ে তিনি পারলেন না। কী চুপচাপ পড়ে রয়েছে দেহটা। দীর্ঘ হাত দুটি কী ভয়ঙ্কর সাদাই না দেখাচ্ছে! মনে হল যেন একটা ভয়াল মোমের মূর্তি চেয়ারের ওপরে বসে রয়েছে।

দরজায় চাবি দিয়ে চুপি-চুপি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন তিনি। কাঠের সিঁড়িগুলি মচমচ করল; মনে হল, তারা যেন যন্ত্রণায় গোঙিয়ে উঠছে। কয়েকবারই তিনি থামলেন; উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। না। চারপাশ নিস্তব্ধ। যে শব্দ তাঁর কানে ঢুকেছিল সেটা তাঁরই পায়ের।

লাইব্রেরিতে ঢুকে এলেন তিনি, ঘরের এক কোণে ব্যাগ আর কোটটা পড়ে রয়েছে। ওগুলিকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। ঘরের দেওয়ালের ভেতরে একটা গোপন কুঠরি ছিল। তার মধ্যে তিনি তাঁর গোপন জিনিসগুলি রাখতেন। সেই দেরাজটা খুলে ব্যাগ আর কোট তার ভেতর

ঢোকালেন। পরে যথাসময়ে ওগুলিকে সহজেই পুড়িয়ে ফেলা যাবে। তারপরে তিনি ছোটো ঘড়িটা বার করে দেখলেন। দুটো বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

বসে পড়ে ভাবতে লাগলেন তিনি। যা তিনি করেছেন তার জন্যে ইংলন্ডে প্রতিটি মাসে প্রতিটি বছরে মানুষকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। আকাশে-বাতাসে হত্যার উন্মত্ততা ছড়িয়ে পড়েছে। কোনো ধূমকেতু পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।...তবু, তিনিই যে হত্যাকারী তার প্রমাণ কী? রাত্রি এগারোটার সময় বেসিল হলওয়ার্ড তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে ফিরে আসতে কেউ দেখেনি। অধিকাংশ চাকরই সেলবি রয়্যালে গিয়েছে। তাঁর নিজস্ব পরিচারক গিয়েছে ঘুমোতে। প্যারিস! হ্যাঁ। বেসিল প্যারিসেই গিয়েছেন। তাঁরই সময়সূচী অনুযায়ী মাঝরাতের ট্রেনেই তিনি প্যারিসের পথে রওনা হয়েছেন। নিজেকে লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখার স্বভাব যে তাঁর রয়েছে একথা কে না জানে। সুতরাং, তিনি যে মারা গিয়েছেন সে-সন্দেহ মানুষের হতে কয়েক মাস সময় লাগবে। দীর্ঘ কয়েকটি মাস। তার ভেতরে তাঁর সমস্ত পশ্চাৎ চিহ্ন একেবারে নষ্ট করে ফেলা সম্ভব হবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। ফার-এর কোট আর টুপি চড়িয়ে তিনি হলঘরে বেরিয়ে এলেন। একটু থাকলেন। ফুটপাতের ওপরে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। সে-শব্দ তাঁর কানে এল। তাদের লন্ঠনের আলো গোল হয়ে শার্সির কাচের ওপরে পড়েছে তাও তিনি দেখলেন। নিঃশ্বাস টিপে অপেক্ষা করলেন তিনি।

তারই একটু পরে চাবিটা টেনে নিয়ে তিনি পকেটের মধ্যে ফেলে দিলেন; তারপরে খুব আস্তে-আস্তে দরজাটা বন্ধ করে, তিনি বেলটা বাজাতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারক গায়ে কোনোরকমে পোশাকটা জড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। চোখেমুখে তখনো তার বেশ ঘুম জড়িয়ে রয়েছে।

দু'পা এগিয়ে এসে তিনি বললেন: ফ্রান্সিস, তোমাকে ঘুম থেকে টেনে তোলার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি "ল্যাচ কী"টা আনতে ভুলে গিয়েছি। কটা বাজে বল তো?

চোখ দুটো মিটমিট করে লোকটি বলল: দুটো বেজে দু'মিনিট হয়েছে স্যার।

দুটো বেজে দু'মিনিট! বল কী! বড্ড রাত হয়ে গিয়েছে তো তাহলে। তুমি কিন্তু কাল বেলা ন'টার সময় আমাকে তুলে দিয়ো। কিছু কাজ রয়েছে আমার।

দেব স্যার।

সন্ধের দিকে কেউ আমার খোঁজ করছিল?

মিঃ হলওয়ার্ড, স্যার। তিনি এখানে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত বসেছিলেন। তারপরে ট্রেন ধরতে হবে বলে উঠে গেলেন।

তাঁর সঙ্গে দেখা হল না বলে আমি দুঃখিত। কিছু বলে গিয়েছেন তিনি; অথবা কোনো চিঠি দিয়েছেন?

না স্যার। তিনি বলে গিয়েছেন ক্লাবে যদি আপনার সঙ্গে আজ দেখা না হয় তাহলে প্যারিস থেকে তিনি আপনাকে চিঠি দেবেন।

ঠিক আছে ফ্রান্সিস। কাল আমাকে সকাল ন'টায় ডেকে দিতে ভুলো না।

না স্যার।

চটি পায়ে দিয়ে লোকটি টলতে-টলতে ঘুমের ঘোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টুপি আর কোটটা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে ডোরিয়েন লাইব্রেরিতে ঢুকলেন। ভাবতে-ভাবতে আর ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে প্রায় মিনিট পনেরো ধরে তিনি পায়চারি করলেন। তারপরে একটি ব্যাগ থেকে তিনি "ব্লু বুকটা" টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। "অ্যালেন ক্যাম্পবেল, ১৫২, হার্ট ফোর্ড স্ট্রিট, মে ফেয়ার"। হ্যাঁ; এই লোকটিকেই তাঁর দরকার।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকাল ন'টার সময় চাকরটি ট্রেতে করে এক কাপ চকোলেট নিয়ে ঘরে ঢুকে জানালার শার্সিগুলি খুলে দিল। ডান দিকে পাশ ফিরে একটা হাত গালের নীচে রেখে বেশ আরাম করেই ঘুমোচ্ছিলেন ডোরিয়েন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখলে মনে হবে যেন খেলা অথবা পড়ার পরে ক্লান্ত হয়ে একটা শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে।

লোকটি তাঁর কাঁধে বার দুই ঠেলা দেওয়ার পরে তাঁর ঘুম ভাঙল। চোখ খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঠোঁট দুটির ওপরে একটি মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। মনে হল যেন একটা মিষ্টি স্বপ্নে এতক্ষণ তিনি বিভোর হয়ে ছিলেন। তবু স্বপ্ন তিনি মোটেই দেখেননি। আনন্দ বা দুঃখ কোনোটাই তাঁর রাত্রিটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলেনি। কিন্তু অকারণেই যৌবন হাসে। এটাইটাই হচ্ছে তার সেরা সৌন্দর্য।

ঘুরে বালিশের ওপর কনুইটা রেখে চকোলেটে চুমুক দিলেন তিনি। নভেম্বর মাসের মিষ্টি রোদ তাঁর ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরিচ্ছন্ন আকাশ; বাতাসে মিষ্টি রোদের আমেজ। দিনটা মে মাসের প্রভাতের মতোই উজ্জ্বল।

ধীরে-ধীরে নিঃশব্দ রক্তাক্ত পদক্ষেপে গতরাত্রির ঘটনাগুলি তাঁর মাথার মধ্যে ভিড় করে দাঁড়াল; পরিস্ফুট করে তুলল সেই বিপজ্জনক নাটকটিকে। তিনি যে দুঃখ পেয়েছেন সেই দুঃখ আর বেদনার স্মৃতি হঠাৎ তাঁকে ভারাক্রান্ত করে তুলল; তারই উত্তেজনায় চেয়ারের ওপরে উঠে বসলেন তিনি এবং যে ঘৃণা বেসিল হলওয়ার্ডকে হত্যা করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল। সেই নিদারুণ ঘৃণা আবার এসে দেখা দিল; তাঁর সমস্ত সহানুভূতি হিমশীতল হয়ে জমাট বেঁধে গেল। মৃত লোকটি এখনো সেইখানে একইভাবে বসে রয়েছে, তবে বর্তমানে রোদ এসে তার গায়ের ওপরে পড়েছে। কী ভয়ঙ্কর! এইরকম ভয়ঙ্কর কাজের দোসর রাত্রির অন্ধকার, দিনের পরিচ্ছন্ন আলো নয়। তাঁর মনে হল গতরাত্রির কথা আবার যদি তিনি ভাবতে শুরু করেন তাহলে হয় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, আর না হয়, পাগল হয়ে যাবেন। এমন অনেক পাপ রয়েছে যাদের স্মৃতি সত্যিকারের কাজের চেয়ে অনেক বেশি মানুষকে মুগ্ধ করে। সত্যিকার ভোগ মানুষের প্রবৃত্তির আকাঙক্ষা মেটায় সন্দেহ নেই; তাকে আনন্দ দেয়; কিন্তু এই সব কাল্পনিক বিজয়, যাকে আমরা পাপের মনোচারণ বলি, তারা আমাদের আনন্দ দেয় অনেক বেশি, আমাদের কল্পনাকে অনেক বেশি রাঙিয়ে তোলে। কিন্তু বর্তমান স্মৃতিটা ঠিক সেই জাতীয় নয়। এই স্মৃতি ভয়াবহ, বিপজ্জনক—মানুষকে আফিঙের নেশায় আচ্ছন্ন, একেবারে ধ্বংস করে ফেলে তাকে—। সেই ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে একে নষ্ট করে দিতে হবে।

আধঘণ্টা এইভাবে বসে থাকার পরে, কপালের ওপর হাতটা বুলালেন তিনি; তারপরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন; পরিপাটি করে পোশাক পরলেন, অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশি যত্ন নিলেন প্রসাধনে; পছন্দমতো নেকটাই পরলেন, বাছাই করে নিলেন একটা আংটি। অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রাতরাশ খেলেন, চাকরদের এবারে কী ধরনের পোশাক তৈরি করিয়ে দেবেন তাই নিয়ে চাকরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন; চিঠিপত্র খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। কয়েকটি চিঠি পড়ে তিনি হাসলেন; তিনটি চিঠি পড়ে বিরক্ত হলেন। একখানা চিঠি বারবার তিনি পড়লেন; তারপরে, ভ্রূ কুঁচকে সেটিকে ছিঁড়ে ফেললেন। এই জাতীয় চিঠির সম্বন্ধেই লর্ড হেনরি একবার বলেছিলেন: একেই বলে মহিলাদের স্মৃতিচারণ। বাপরে বাপ, কী ভয়ানক!!

এক কাপ কালো কফি খাওয়ার পরে তোয়ালে দিয়ে ধীরে-ধীরে মুখ মুছলেন তিনি; চাকরকে অপেক্ষা করতে বলে লেখার টেবিলের দিকে উঠে গেলেন; সেখানে গিয়ে চিঠি লিখলেন দুটি। একটা তিনি নিজের পকেটে ঢুকালেন আর একটা তাঁর চাকরের হাতে দিয়ে বললেন: ফ্রান্সিস, এটা নিয়ে তুমি ১৫২ নং হার্ট ফোর্ড স্ট্রিটে যাও। মিঃ ক্যাম্পবেল যদি এখন শহরের বাইরে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর ঠিকানাটা নিয়ে এস।

আবার তিনি একা, নিঃসঙ্গ। চাকরটি চলে যাওয়ার পরেই তিনি একটা সিগারেট ধরালেন; তারপরে এক টুকরো কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসলেন; প্রথমে আঁকলেন ফুলের ছবি, তারপরে ঘর-বাড়ির, তারপরে মানুষের মুখের। আঁকতে-আঁকতে হঠাৎ তিনি মন্তব্য করে বসলেন—বেসিল হলওয়ার্ডের মুখের সঙ্গে এই সব কটিরই কোথায় যেন একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ভ্রূকুটি করে উঠে পড়লেন তিনি, বুক-কেস-এর দিকে এগিয়ে গেলেন; সেখান থেকে একখানা বই তুলে নিলেন। বাধ্য না হলে যা ঘটেছে তা নিয়ে আর তিনি আলোচনা করবেন না বলে মনোস্থির করে বসলেন।

সোফার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে তিনি গিটারের লেখা একখানা বই, জাপানি কাগজে ছাপানো ছবি জ্যাকিমার্ট-এর; সবুজ চামড়া দিয়ে বাঁধাই। বইটি আদ্রিয়েন সিঙ্গলটন তাঁকে দিয়েছিলেন। বইটির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে ল্যাসিনেয়ার-এর ঠান্ডা সবুজ হাতের ওপরে লেখা একটি কবিতার ওপরে তাঁর চোখ পড়ে গেল। কবিতাটি পড়ে নিজের সাদা সূচালো আঙুলগুলির দিকে তিনি একবার তাকিয়ে দেখলেন; দেখে, নিজের অজান্তেই কেমন যেন শিউরে উঠলেন। তারপরে পড়লেন ভেনিস-এর ওপরে লেখা সুন্দর একটি কবিতা।

কী সুন্দর বর্ণনা ভেনিস-এর। কবিতাটা পড়তে-পড়তে পাঠকের মনে হবে সে যেন পাটল বর্ণের মুক্তার মতো শহরে নদীর ওপর দিয়ে পাল তুলে রূপালি দাঁড় লাগানো কালো গনডোলার ওপরে বসে ভেসে চলেছে; শরৎকালে ভেনিসে তিনি যে দিনগুলি কাটিয়েছিলেন সেইগুলির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। কী আনন্দেই না কেটেছিল দিনগুলি—অজস্র আনন্দ আর ভুলের উত্তেজনায় মাতোয়ারা হয়ে ছিলেন তিনি। প্রতিটি জায়গায় রোমান্স একেবারে থই-থই করছে সেখানে; কিন্তু অক্সফোর্ডের মতো, ভেনিসও তার সমস্ত রোমান্সকে পেছনে সরিয়ে রেখেছে। আর সত্যিকার রোমান্টিক চিন্তাধারার মানুষের কাছে পটভূমিকাটাই আসল অথবা একমাত্র সত্য। কিছুদিন বেসিলও তাঁর সঙ্গে ওখানে কাটিয়েছিলেন। হতভাগ্য বেসিল! মানুষে যে এভাবে মারা যেতে পারে সেকথা ভাবতেও তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বইটা তুলে নিলেন তিনি। সব কিছু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। একটার পর একটা পাতা ওলটাতে লাগলেন তিনি। দেশ-বিদেশের পাখির কাহিনি পড়লেন; স্মার্নার ছোটো কাপের জানালার ভেতর দিয়ে চড়াই পাখিরা উড়ে বেড়ায়—সেখানে হ্যাজিসরা বসে-বসে হলদে রঙের মালা গণে, পাগড়িওয়ালা বণিকদের দল তাদের লম্বা-লম্বা পাইপ টানে; আর মাঝে-মাঝে গম্ভীরভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। সব পড়লেন তিনি। আরো অনেক কিছু পড়লেন তিনি: সূর্যহীন প্যালেস দ্য লা কনকোর্ড-এর ওবেলিসক পাখির কথা, নীল নদের ধারে স্পিনিকস-এর কথা, ইজিপ্টের শকুন আর কুমিরের কথা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বইটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি; বিরাট ভয় এসে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অ্যালেন ক্যাম্পবেল যদি ইংলন্ডের বাইরে চলে যায়? তাঁর ফিরে আসতে অনেকদিন লাগবে। তিনি নাও আসতে পারেন। তাহলে তিনি কী করবেন? প্রতিটি মুহূর্ত এখন জরুরি। পাঁচ-ছ' বছর আগে তাঁদের মধ্যে অগাধ বন্ধুত্ব ছিল—যাকে বলে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। তারপরেই হঠাৎ তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এখন মাঝে-মাঝে

কোনো জায়গায় যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তাহলে ডোরিয়েনই পরিচিতির হাসি হাসেন; অ্যালেন পরিচয়কে অগ্রাহ্য করে যান।

মানুষ হিসাবে অ্যালেন সত্যিকারের বুদ্ধিমান যুবক। কিন্তু বাস্তব কলার সৌন্দর্য তাঁকে কোনোদিনই আকর্ষণ করতে পারেনি; আর কাব্যিক সৌন্দর্য বলতে যেটুকু তিনি বুঝতেন বলে মনে হত তার সবটুকুই তাঁর ডোরিয়েন-এর কাছ থেকে নেওয়া। বিজ্ঞানের দিকেই তাঁর ঝোঁকটা ছিল প্রবল। কেম্ব্রিজে পড়ার সময় বেশিরভাগ সময়টাই তিনি ল্যাবরেটরিতে কাটাতেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি ভালোই ছিলেন। এখনো পর্যন্ত তিনি রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করতেন; নিজের একটি পরীক্ষাগারও তিনি তৈরি করেছেন এবং সেইখানেই দিনের অধিকাংশ সময় দরজা বন্ধ করে দিয়ে গবেষণায় ডুবে থাকতেন অ্যালেন। তাঁর মা তাঁর এবম্বিধ ব্যবহারে বড়ো ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি মনে করতেন কেমিস্টরা কেবল রোগীর প্রেসক্রিপশন লেখে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র পার্লামেন্টের নির্বাচনে দাঁড়াক। গায়ক হিসাবেও অ্যালেনের যথেষ্ট নাম ছিল। অনেক শখের বাজিয়েদের চেয়ে অনেক ভালো তিনি বেহালা আর পিয়ানো বাজাতে পারতেন। সত্যি কথা বলতে কি এই গান-বাজনার মধ্যে সেই ডোরিয়েন-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়; আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যা ঘটেছে—ডোরিয়েন-এর অদ্ভুত সৌন্দর্য আর সম্মোহনী শক্তিই তাঁকে তাঁর কাছে টেনে এসেছিল। লেডি বার্কশায়ারের বাড়িতে যে রাত্রিতে রুবিনস্টেন বাজনা বাজিয়েছিলেন সেই রাত্রিতেই ওঁদের দুজনের পরিচয় হয়; তারপরেই তাঁরা একসঙ্গে অপেরায় যেতে শুরু করেন; শুরু করেন গানের মজলিসে যোগ দিতে। আঠারো মাস ধরে তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়। এই সময় সেলবিরয়্যাল অথবা গ্রসভেনর স্কোয়ারে প্রায় অ্যালেনকে দেখা যেত। তাঁদের মধ্যে কী কারণে কলহ হয়েছিল, অথবা কলহ কোনো আদৌ হয়েছিল কি না সে কথা কেউ জানে না। কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে; আর কোনো জায়গায় ডোরিয়েন হাজির হলে অ্যালেন অনেক আগেই সেখান থেকে চলে যান। অ্যালেন-এর ভেতরেও অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সেই হাসিখুশি ভাবটা তাঁর আর নেই; সব সময়েই কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকেন। গান-বাজনার জলসায় বিশেষ দেখা যায় না তাঁকে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি এতই ব্যস্ত থাকেন যে ও-সব দিকে মন দেওয়ার মতো সময় তাঁর আর নেই। কথাটা সত্যি। দিনদিন তিনি শরীরতত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। মাঝে-মাঝে অদ্ভুত ধরনের গবেষণাও তিনি করতেন। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকপত্রে তাঁর নামও মাঝে-মাঝে দেখা যেত।

এই মানুষটির জন্যেই ডোরিয়েন গ্রে অপেক্ষা করে বসেছিলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটি একটি মিনিট গুনে যাচ্ছিলেন তিনি। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাওয়ার পরেই তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। খাঁচায় পোরা একটি রমণীয় বস্তুর মতো তিনি উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। দুটি হাত অদ্ভুতভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে তিনি লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘুরতে লাগলেন।

প্রতীক্ষা অসহ্য হয়ে উঠল তাঁর। মনে হল, সময় যেন আর কাটে না। প্রতিটি মুহূর্তে একটি কালো ঝড়ো হাওয়া যেন তাঁকে ঠেলে-ঠেলে চড়াই-এর একেবারে কিনারের দিকে নিয়ে চলেছে। তারপরেই নীচে বিরাট অন্ধকার তলহীন গহ্বর। সেখানে তাঁর জন্যে কী অপেক্ষা করে বসে রয়েছে তা তিনি জানতেন। সেই ভয়ে দুটি হাত দিয়ে জোরে-জোরে তিনি তাঁর চোখ দুটো ঘষতে লাগলেন; মনে হল তিনি তাঁর নিজের মাথাটা ভেঙে ফেলবেন, দুটি চোখকে ঢুকিয়ে দেবেন কোটরের ভেতরে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলেন না তিনি। দুশ্চিন্তার পঙ্গপাল তাঁরই চোখের সামনে নেচে-নেচে বেড়াতে লাগল। তারপরে হঠাৎ

স্থবির হয়ে গেল সময়। সেই মরা সময় কবরখানা থেকে লঘুগতিতে তাঁর চোখের ওপরে যে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎটিকে টেনে নিয়ে এল তা দেখেই আঁৎকে উঠলেন তিনি। ফ্যাল-ফ্যাল করে তার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। আতংকে পাথর হয়ে গেলেন তিনি।

অবশেষে দরজা খুলে গেল; ঘরে ঢুকল চাকর। তার দিকে চকচকে চোখে চেয়ে দেখলেন ডোরিয়েন।

লোকটি বলল: মিঃ ক্যাম্পবেল এসেছেন স্যার।

তাঁর সেই শুকনো ঠোঁট দুটির ভেতর থেকে একটা স্বস্তির স্বর ফুটে বেরল। বিবর্ণ গণ্ড দুটি ধীরে-ধীরে আবার তাদের পুরনো রঙ ফিরে পেল। কিছুটা সহজ হয়ে এলেন ডোরিয়েন।

তাঁকে এখনই পাঠিয়ে দাও ফ্রানসিস।

তাঁর মনে হল, আবার যেন স্বস্থানে ফিরে এসেছেন তিনি। তাঁর দেহ-মন থেকে ভীরুতা, দুর্বলতার সব চিহ্ন তখন অপহৃত হয়েছে।

মাথাটা নীচু করে লোকটি চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতরেই অ্যালেন ক্যাম্পবেল ভেতরে ঢুকে এলেন। আগন্তুকের মেজাজ বেশ রুক্ষ, কিন্তু মুখের রঙটি বিবর্ণ। ঘন কালো চুল আর ভুরু দুটির জন্যে তাঁর মুখের পাণ্ডুরতা আরো বেশি করে চোখে পড়ল।

অ্যালেন! তুমি যে দয়া করে এসেছ তার জন্যে ধন্যবাদ।

গ্রে, তোমার বাড়িতে আর কোনোদিন আসার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আমি চিঠিতে লিখেছিলে যে জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ।

তাঁর স্বরটি যে কেবল কঠোর তাই নয়; রীতিমতো নিরুত্তাপ। ধীরে-ধীরে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাগুলি বললেন তিনি। ডোরিয়েন গ্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন; সেই দৃষ্টি ঘৃণার, অবহেলার। হাত দুটি কোটের পকেটে ঢুকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন; ডোরিয়েন গ্রের সাগ্রহ অভ্যর্থনাকে কোনোরকম আমল দিলেন না।

হ্যাঁ; সত্যিই তাই—জীবন-মৃত্যুই বটে; আর আমার একারই নয়; আরো অনেকের। বস।

টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন ক্যাম্পবেল; তাঁর মুখোমুখি বসলেন ডোরিয়েন। চোখাচোখি হল দুজনের। একটু করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডোরিয়েন। তিনি জানতে যা তিনি বলতে যাচ্ছেন তা সত্যিই ভয়ঙ্কর।

কয়েক মুহূর্ত বিক্ষুব্ধ নিস্তব্ধতার পরে তিনি অ্যালেনের দিকে একটু ঝুঁকে শান্তভাবে বললেন; প্রতিটি কথা কী ভাবে তাঁর ওপরে প্রভাব বিস্তার করছে তাও লক্ষ করলেন তিনি: অ্যালেন, এই বাড়ির ছাদে একটা বন্ধ ঘর রয়েছে। সেই ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ ঢোকে না। সেইখানে টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের ওপরে একটি মৃত মানুষ বসে রয়েছে। এখন থেকে ঘণ্টা দশেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে। উঠো না; আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থেকো না। লোকটি কে, কেন সে মারা গেল, কী ভাবে মারা গেল—সে-সব বিষয়ে জানার কোনো প্রয়োজন তোমার নেই। তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে এই যে...

গ্রে, তুমি চুপ কর। আর কিছু আমি জানতে চাইনে। তুমি যা বললে তা সত্যি কি না তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। আসল কথা, তোমার জীবনের কোনো ঘটনার সঙ্গে নিজেকে আর জড়িয়ে রাখতে আমি নারাজ। যদি কোনো ভয়ঙ্কর গোপন কাহিনি তোমার থাকে তা তুমি নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখ। সেটা জানার কোনো কৌতূহল আমার নেই।

অ্যালেন, তোমাকে তা জানতেই হবে; বিশেষ করে এই গোপন কথাটা তোমার জানা চাই। তোমার জন্যে সত্যিই আমার বড়ো দুঃখ হয়, অ্যালেন। কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই। একমাত্র তুমিই আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পার। সেই জন্যে বাধ্য হয়েই তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। তাছাড়া অন্য কোনো পথ আমার ছিল না। অ্যালেন তুমি বৈজ্ঞানিক। রসায়ন আর ওই জাতীয় কিছু বিষয়ে তোমার জ্ঞান রয়েছে। এই সব বিষয়ে অনেক পরীক্ষা তুমি করেছ। ওপরে যে জিনিসটি পড়ে রয়েছে সেটিকে একেবারে লোপাট করে দিতে হবে; এমনভাবে পুড়িয়ে ফেলতে হবে যেন তার কোনো চিহ্নটুকু পর্যন্ত আর না থাকে। এ বাড়িতে ঢুকতে লোকটিকে কেউ এখানে দেখেনি। সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক এই সময় তার প্যারিসে থাকার কথা। বেশ ক'টা মাস তার প্যারিসে থাকার কথা। বেশ ক'টা মাস তার কেউ খোঁজখবর নেবে না। যখন লোকে তাকে খুঁজবে তখন তার কোনো চিহ্ন যেন এখানে না থাকে। অ্যালেন, তুমি তাকে আর তার সমস্ত চিহ্নগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দাও; সেই ছাই আমি বাতাসে ছড়িয়ে দেব।

ডোরিয়েন, তুমি উন্মাদ।

তুমি আমাকে ওই নামে ডাকবে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম এতদিন অ্যালেন।

তুমি উন্মাদ হয়েছ; উন্মাদ না হলে ভাবতে পারতে না যে যা তুমি চাইছ তাই আমি করব; উন্মাদ না হলে, এ প্রস্তাব তুমি আমাকে দিতে পারতে না। ঘটনাটা যাই হোক, তার মধ্যে আমি আর নেই। তুমি কি মনে কর, তোমাকে বাঁচানোর জন্যে একটি মিথ্যে দুর্নামের বোঝা আমি মাথায় তুলে নেব? তুমি যদি কিছু শয়তানি করে থাক তার দায়িত্ব আমার নয়।

অ্যালেন, লোকটি আত্মহত্যা করেছে।

শুনে খুশি হলাম। কিন্তু কে তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে? সম্ভবত, তুমি।

আমার জন্যে এতটুকু করতে কি তুমি এখনো নারাজ?

নিশ্চয়। তোমার জন্যে আমি কিছুই করতে রাজি নই। এর জন্যে তোমার কী দুর্নাম ঘটবে তার দায়িত্ব আমার নেই। সেইটাই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। দশজনের কাছে তুমি যদি হেয় প্রতিপন্ন হও, সমাজে সবাই যদি তোমাকে দূর-ছাই করেতাহলেও তোমার জন্যে আমার কোনো দুঃখ হবে না। পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে তোমার দুষ্কর্মের ভাগীদার হতে তুমি আমার শরণাপন্ন হয়েছ দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভেবেছিলেম অন্য মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কিছু জ্ঞান জন্মেছে। তোমার বন্ধু লর্ড হেনরি ওটন তোমাকে যাই শিখিয়ে থাকুন মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই শেখাননি। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে একটা আঙুলও আমি তুলতে রাজি নই। তুমি ভুল লোকের কাছে এসেছ। সাহায্যের জন্যে তুমি তোমার বন্ধুদের কাছে যাও—আমার কাছে এস না।

অ্যালেন, ব্যাপারটা হচ্ছে হত্যা। আমি তাকে হত্যা করেছি। তুমি জান না তারই জন্যে জীবনে আমি কত যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আমি আজ যে-অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তার জন্যে

হ্যারির অবদান যত তার চেয়ে অনেক বেশি অবদান ছিল তার; ভালোর জন্যেও বটে, খারাপের জন্যেও বটে।তার ইচ্ছে হয়তো তা ছিল না; কিন্তু হরে-দরে জিনিসটা একই দাঁড়িয়েছে।

হত্যা! হায় ভগবান! শেষ পর্যন্ত ডোরিয়েন, তুমি এতটা নীচে নেমে এসেছ? এদিক থেকে কোনো সাহায্য আমার তুমি পাবে না। ও কাজ আমার নয়। তা ছাড়া, আমার সাহায্য ছাড়াই পুলিশ তোমাকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করবে। মূর্খ ছাড়া কেউ কোনো পাপ কাজ করে না। কিন্তু এবিষয়ে আমার কিছুই করণীয় নেই।

তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে। থাম, থাম; অস্থির হয়ো না। আমার কথা শোনো, শোনো না অ্যালেন। তুমি একটু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কর; এ ছাড়া আর কিছু আমি চাইনে। তুমি হাসপাতালেও যাও, মর্গে যাও; সে-সব জায়গায় তুমি যে বীভৎস মৃতদেহ দেখ সেগুলি তোমার ওপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কোনো নোংরা শব-ব্যবচ্ছেদাগারের টেবিলের ওপরে যদি তুমি এই মানুষটিকে শায়িত অবস্থায় দেখতে তাহলে বস্তুটিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপযুক্ত আধার ভেবে তুমি কেবল খুশিই হতে। এতটুকু দ্বিধা করতে না তুমি। তোমার একবারও মনে হত না যে তুমি কিছু অন্যায় করতে যাচ্ছ; বরং তোমার মনে হত মনুষ্য জাতির একটা উপকার তুমি করছ। বিশ্বের জ্ঞান বাড়িয়ে দিচ্ছ অথবা চিন্তার কিছুটা কৌতূহল মেটাচ্ছ বা ওই জাতীয় কোনো সৎ কাজে তুমি নিজেকে উৎসর্গ করেছ। যে কাজ আগেও তুমি অনেকবারই করেছ সেই রকম একটা কাজই আমি তোমাকে আজ করতে বলছি। বরং, যে-কাজ করতে তুমি অভ্যস্ত, এ কাজ তার চেয়ে অনেক কম ভয়ঙ্কর—এই পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়াটা। মনে রেখ, আমার বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র সাক্ষী। এই মৃতদেহ যদি কেউ আবিষ্কার করে ফেলে তাহলেই আমরা শেষ; আর তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর, তাহলে আমি ধরা পড়ে যাবই।

তোমাকে সাহায্য করার কোনো বাসনা আমার নেই। সেই কথাটাই তুমি ভুলে যাচ্ছ। এই ব্যাপারটাতেই কোনো আগ্রহ নেই আমার। এর সঙ্গে নিজেকে আমি জড়াতে চাই নে।

অ্যালেন, তোমাকে আমি অনুরোধ করছি। আমি কী গাড্ডায় পড়েছি সেকথাটা একবার ভেবে দেখ। তুমি এখানে আসার ঠিক আগে পর্যন্ত ভয়ে আমি আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকেও হয়তো একদিন এই অবস্থায় পড়তে হতে পারে। না, তা ভেব না। গোটা ব্যাপারটিকে তুমি কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখ। পরীক্ষা করতে গিয়ে কোথা থেকে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছে সেই অনুসন্ধান কি তুমি কোনোদিন কর? সুতরাং এখনো তা জানতে চেয়ো না। তোমাকে আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি। তোমাকে অনুরোধ করছি এই কাজটি তুমি করে দাও। অ্যালেন, আমরা একদিন বন্ধু ছিলেম।

ডোরিয়েন, সে-সব দিনের কথা আর তুলো না; সেগুলি আজ মৃত।

মাঝে-মাঝে মৃতেরাও বেঁচে থাকে। ওপরে যে-মানুষটি রয়েছে সে চলে যাবে না। মাথা নীচু করে হাত দুটি ছড়িয়ে সে টেবিলের ওপরে বসে রয়েছে। অ্যালেন, অ্যালেন—তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আস তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। বুঝতে পারছ না। যা করে ফেলেছি, তার জন্যে ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে।

এ নিয়ে আর বেশি কচকচি করে লাভ নেই। এ বিষয়ে কিছু করতে আমি রাজি নই। উন্মাদ না হলে এ অনুরোধ তুমি আমাকে করতে না।

রাজি নও তুমি?

না।

অ্যালেন, আমার অনুরোধ।

অনর্থক অনুরোধ করো না।

ডোরিয়েন-এর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। তারপরেই তিনি হাত বাড়িয়ে এক টুকরো কাগজ টেনে নিলেন; তার ওপরে একটা কী যেন লিখলেন। বার দুই পড়লেন; ভালো করে ভাঁজ করলেন; তারপরে সেটিকে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলেন।

চিঠিটা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ক্যাম্পবেল; তারপরে কাগজটা টেনে নিয়ে পড়লেন, পড়তে-পড়তে তাঁর মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠল; তিনি চেয়ারের ওপরে বসে পড়লেন। একটা ভয়াবহ অস্থিরতা গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। মনে হল, একটা শূন্য গুহার দেওয়ালে তাঁর হৃৎপিণ্ডটা যেন অনবরত মাথা ঠুকে চলেছে।

দু'তিন মিনিটের মতো একটা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপরে, ডোরিয়েন ঘুরে দাঁড়ালেন, ক্যাম্ববেলের পেছনে এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন।

আস্তে-আস্তে বললেন ডোরিয়েন: তোমার জন্যে আমি দুঃখিত, অ্যালেন, কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো পথ আমার জন্যে তুমি খোলা রাখনি। আমি আগেই চিঠি লিখে রেখেছি।এই দেখ, কোথায় পাঠানোর কথা তাও তুমি দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি আমাকে সাহায্য না কর তাহলে এ চিঠি আমি যথাস্থানেই পাঠিয়ে দেব। এর ফল কী হবে তা তুমি জান। কিন্তু তুমি আমাকে সাহায্য করবে; বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহায্য না করাটা তোমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে তোমাকে আমি বাঁচতেই চেয়েছিলেম। কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছ। তুমি আমাকে যে-ভাবে অপমান করেছ ঠিক সেই ভাবে অপমান করার দুঃসাহস আজ পর্যন্ত কোনো জীবন্ত মানুষের হয়নি। আমি সব সহ্য করেছি। এখন বদলা নেওয়ার পালা আমার।

দু'হাতের মধ্যে মুখটাকে লুকিয়ে ফেললেন ক্যাম্পবেল; তাঁর শরীরটা কাঁপতে লাগল।

হ্যাঁ, অ্যালেন, এখন তুমি আমার হাতের মুঠোয়। তোমাকে কী করতে হবে তা তুমি জান। কাজটা খুব সহজ। এস; অনর্থক উত্তেজিত হয়ো না. দুর্বল করে ফেল না। নিজেকে। কাজটা করতেই হবে। সুতরাং আর দেরি করো না।

ক্যাম্পবেলের ঠোঁটের ভেতর দিয়ে একটা মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল। সারা শরীরটা তাঁর কেঁপে কেঁপে উঠল। সেলফ-এর ওপরে ঘড়ির টিক-টিক শব্দ মনে হল সময়টাকে যেন অসংখ্য টুকরো-টুকরো যন্ত্রণার অণুতে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলছে। সেই যন্ত্রণা সহ্য করা কষ্টকর। তাঁর মনে হল যেন একটা লোহার সাঁড়াশি ধীরে-ধীরে তাঁর কপালের ওপরে চেপে বসছে; যে-কলঙ্কের ভয় তাঁকে দেখানো হয়েছে, তাঁর মনে হল সেই কলঙ্কের কালি ইতিমধ্যেই যেন তাঁর শরীরের ওপরে ছিটকে পড়েছে। তাঁর কাঁধের ওপরে যে হাতটি এসে পড়েছে সেটি সীসের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। এ অসহ্য মনে হল, তিনি যেন গুঁড়িয়ে যাবেন।

অ্যালেন, কী করবে তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেল।

আমি করতে পারব না।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কথাটা বলে গেলেন অ্যালেন; নিছক কথা যেন সব কিছু ওলট-পালট করে দিতে পারে!

করতে তোমাকে-হবেই। অন্য কোনো পথ খোলা নেই তোমার। দেরি করো না। এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন অ্যালেন; জিজ্ঞাসা করলেন: ওপরে আগুন রয়েছে? রয়েছে। গ্যাসের আগুন।

আমাকে বাড়ি যেতে হবে; ল্যাবরেটরি থেকে কয়েকটা জিনিস আনতে হবে।

না অ্যালেন। এ ঘর ছেড়ে যাওয়া তোমার চলবে না। তোমার কী দরকার একটা কাগজে লিখে দাও।আমার চাকর গাড়িতে করে এখনই সে সব জিনিস নিয়ে আসবে।

কয়েকটা লাইন লিখলেন ক্যাম্ববেল; তারপর ব্লটিং পেপার চিপে একটা খামের ভেতরে পুরলেন; খামের ওপরে নাম লিখলেন তাঁর সহকারী। ডোরিয়েন চিঠিটি ভালো করে পড়ে বেল বাজালেন। চাকর ঢুকতে তাকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাম্পবেল থর-থর করে কাঁপতে শুরু করলেন; তারপরে চেয়ার ছেড়ে উঠে চিমনি রাখার জায়গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। মনে হল তাঁর জ্বর এসেছে। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে কেউ কারোর সঙ্গে কথা কইলেন না। একটা মাছি ভনভন করে ঘুরতে লাগল; ঘড়ির টিকটিক শব্দ হাতুড়ির ঘা বলে মনে হল।

একটা বাজল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পবেল ডোরিয়েন-এর দিকে তাকালেন; দেখলেন তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে। সেই মুখের ওপরে এমন একটা পবিত্র বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছিল। যে অ্যালেন না রেগে পারেননি। তিনি ফিসফিস করে বললেন: জঘন্য, নক্কারজনক তোমার জীবন।

চুপ অ্যালেন। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।

তোমাকে! হায় ভগবান! কী জঘন্য জীবন তোমার! একটা পাপ আর একটা পাপের মধ্যে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়েছ। তার শেষ পরিণতি হল নরহত্যায়। যা আমি করতে যাচ্ছি অথবা যা করতে তুমি আমাকে বাধ্য করছ—সেটি কিন্তু তোমার জীবন বাঁচানোর জন্যে নয়। সে কথা আমি চিন্তাও করছিনে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ডোরিয়েন বললেন: তোমার ওপরে আমার যে করুণা রয়েছে তার একশ ভাগের এক ভাগও আমার ওপরে করুণা যদি তোমার থাকত!

এই বলেই ডোরিয়েন ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোনো উত্তর দিলেন না ক্যাম্পবেল।

আরো মিনিট দশেক পরে দরজায় একটা টোকা পড়ল; বিরাট একটা মেহগনি কাঠের বাক্স নিয়ে চাকর ঘরে ঢুকল; সেই বাক্সের মধ্যে ছিল কেমিকেল, লম্বা ইস্পাত আ প্ল্যাটিনাম তার; আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত দেখতে দুটি লোহার আঁকশি।

ঘরে ঢুকেই সে ক্যাম্পবেলকে জিজ্ঞাসা করল: এগুলি কি স্যার এইখানেই রেখে যাব?

ডোরিয়েন বললেন: হ্যাঁ। তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে ফ্রান্সিস। রিচমনড-এর সেই লোকটির নাম কী বল তো—ওই যে, যে লোকটি সেলবিতে অরকিড দেয় হে।

তার নাম হার্ডেন, স্যার।

হ্যাঁ হ্যাঁ; হার্ডেন। তুমি এখনই রিচমনড-এ যাও; হার্ডেন-এর সঙ্গে দেখা করো; তাকে বলবে আমি যে ক'টা অরকিড পাঠাতে বলেছি তার যেন দ্বিগুণ পাঠায়; সাদা অরকিড যত কম হয় ততই ভালো—অন্তত, যতগুলি সম্ভব। সত্যি কথা বলতে কি, সাদা অরকিড আমি চাই নে! দিনটা বড়ো সুন্দর ফ্রান্সিস; রিচমনড জায়গাটাও ভারী চমৎকার। তা না হলে আমি তোমাকে কষ্ট করে যেতে বলতাম না।

না, না। আমার কোনো কষ্ট হবে না স্যার। কখন আমি ফিরব?

ক্যাম্পবেল-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডোরিয়েন: পরীক্ষাটা শেষ করতে তোমার কত সময় লাগবে ক্যাম্পবেল?

স্বর তাঁর শান্ত, উদাসীন। ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তাঁকে অদ্ভুত রকমের সাহসী করে তুলেছিল।

ভ্রূ কোঁচকালেন ক্যাম্পবেল; একটা ঠোঁট কামড়ালেন, বললেন: ঘণ্টা পাঁচেক।

সাড়ে সাতটার কাছাকাছি তোমার ফিরে এলেই চলবে, ফ্রান্সিস। কিম্বা দাঁড়াও আমার জিনিসপত্র তুমি টেবিলের ওপরেই সাজিয়ে রেখে দাও। আজ তোমার ছুটি। আজ রাত্রিতে আমি বাড়িতে খাচ্ছি নে। তোমাকে আজ আর কোনো দরকার হবে না।

ধন্যবাদ, স্যার।—ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লোকটি।

অ্যালেন, একটি মুহূর্তও নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। বাক্সটা তো বেশ ভারী দেখছি। আমিই বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। অন্য জিনিসগুলি তুমি নিয়ে এস।

নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি কথাগুলি বললেন তিনি। প্রতিবাদ করার মতো শক্তি ছিল না ক্যাম্পবেল-এর। তাঁরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওপরের সিঁড়িতে এসে ডোরিয়েন চাবি বার করে তালা খুললেন; একটু থামলেন; একটা বিষণ্ণ দৃষ্টি তাঁর চোখের মধ্যে ফুটে বেরোল। কেঁপে উঠলেন তিনি; বিড়বিড় করে বললেন: অ্যালেন, ভেতরে ঢুকতে বড়ো অস্বস্তি লাগছে আমার।

ক্যাম্পবেল বেশ নীরস ভাবেই বললেন: আমার কাছে ব্যাপারটা কিছুই নয়। তোমাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

দরজা অর্ধেকটা ফাঁক করলেন ডোরিয়েন; খোলার সময় প্রতিকৃতিটা চোখে পড়ল তাঁর। সূর্যের আলোতে সেটা আড়চোখে তাকিয়ে ছিল। তারই সামনে মেঝের ওপরে পড়ে ছিল ছেঁড়া পর্দাটা। তাঁর মনে পড়ল আগের রাত্রিতে তিনি সেই বিপজ্জনক ছবিটাকে ঢাকতে ভুলে গিয়েছিলেন; জীবনে সেই তাঁর প্রথম ভুল। দৌড়ে তিনি ভেতরে ঢুকতে গেলেন; কিন্তু

তারপরেই ভয় পেয়ে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ছবিটার হাতের ওপরে নোংরা লাল ফোঁটার মতো কী ওটা রোদে চকচক করছে? মনে হচ্ছে তার হাতের ঘাম যেন রক্ত হয়ে ঝরে পড়ছে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ওই যেন মূর্তিটি টেবিলের ওপর আড় হয়ে পড় রয়েছে এবং কার্পেটের ওপরে যার ছায়া দেখে মনে হচ্ছে সে একটুও নড়েনি, কিন্তু সেই একইভাবে পড়ে রয়েছে তার চেয়ে ভয়ানক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি; দরজাটা একটু ফাঁক করলেন; তারপরে মৃতদেহটির দিকে আদৌ তাকাবেন না এই রকম একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তিনি দৌড়ে ভেতরে ঢুকে নীচু হয়ে পর্দাটা তুলে ছবিটাকে ঢেকে দিলেন।

তারপরেই তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লেন; ঘুরে দাঁড়াতেই ভয় হল তাঁর। শব্দ শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, ক্যাম্পবেল সেই ভয়ঙ্কর কাজটি শুরু করার জন্যে তাঁর জিনিসপত্রগুলি গোছাচ্ছেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন কোনোদিন কি সত্যি-সত্যিই তাঁর সঙ্গে বেসিল হলওয়ার্ড-এর দেখা হয়েছিল; হয়ে থাকলে, পরস্পরের সম্বন্ধে দুজনের কী ধারণা জন্মেছিল?

তাঁর পেছন থেকে একটা কর্কশ স্বর শোনা গেল: তুমি এখানে থেকে চলে যাও।

ডোরিয়েন ঘুরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার সময় তিনি বুঝতে পারলেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সাতটার অনেক পরে ক্যাম্পবেল লাইব্রেরিতে নেমে এলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ; কিন্তু একেবারে শান্ত তিনি; কোনোরকম উত্তেজনা দেখা গেল না তাঁর ভেতরে।

তিনি বিড়বিড় করে বললেন: আমাকে যা করতে বলেছিলে সে-কাজ আমি শেষ করেছি। বিদায়। আর যেন কোনোদিন আমাদের দেখা না হয়।

ডোরিয়েন কেবল বললেন: ধ্বংসের হাত থেকে আমাকে তুমি বাঁচিয়েছে, অ্যালেন। একথা আমি ভুলতে পারিনে।

ক্যাম্বেল চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ওপরে উঠে গেলেন। ঘরের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিডের ভয়ানক রকমের একটা উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু যে জিনিসটা টেবিলের ধারে এতক্ষণ বসেছিল সেটি আর নেই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সেই দিনই রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় অপরূপ সুন্দর পোশাকে সেজে আর কয়েকটি "পারমা" ভায়লেট ফুল কোটের বুকে গুঁজে ডোরিয়েন গ্রে লেডি নরবোরোর বাড়িতে এসে হাজির হলেন; ভদ্রমহিলার চাকররা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে তাঁর বসার ঘরে নিয়ে গেল। তাঁর কপালের শিরাগুলি তখন ধকধক করছে; একটা ভীষণ উত্তেজনা বুকের মধ্যে নাচানাচি করছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন তিনি গৃহস্বামিনীর হাতটি চুম্বন করার জন্যে ঝুঁকে পড়লেন তখন মনে হল সেই চিরাচরিত, সুন্দর, নিষ্পাপ ডোরিয়েন গ্রে ছাড়া আর কিছুই তিনি নন। সম্ভবত, কোনো অভিনেতাই অভিনয় করার সময় এতটা সাবলীল হতে পারেন না। সেদিন রাত্রিতে কেউ যদি ডোরিয়েন গ্রেকে ভালোভাবে লক্ষ করতে তাহলে সে কিছুতেই বুঝতে পারত না যে তাঁর জীবনে কিছুক্ষণ আগেই এমন একটি ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিডি নেমে এসেছে যাকে আমাদের আধুনিক যুগের যে কোনো ট্র্যাজিডির সঙ্গেই তুলনা করা যায়। ওই সুন্দর আঙুলগুলি পাপ কাজ করার জন্যে কখনো ছুরি ধরতে পারে, অথবা ওই সুস্মিত ঠোঁট দুটি কখনো ভগবানের বিরুদ্ধে, সত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে পারে একথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইত না। নিজের শান্ত ভাব দেখে তিনি নিজেই কেমন যেন বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং এই দ্বৈত জীবনের জন্যে মুহূর্তের জন্যে তিনি যে একটা নির্মম আনন্দও পেলেন না সেকথাও সত্যি নয়।

পার্টিটা খুব ছোটোই ছিল। লেডি নরবোরো খুব তাড়াতাড়িই আয়োজনটি করেছিলেন। অত্যন্ত চতুর ছিলেন লেডি নরবোরো। লর্ড হেনরির ভাষায় এই জাতীয় মহিলারা হচ্ছেন সত্যিকার কুৎসিত আদর্শের উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যবহারিক জীবনে একটি অসামাজিক রাষ্ট্রদূতের তিনি ছিলেন সুযোগ্য পত্নী। স্বামীর কবরের ওপরে তিনি একটি মর্মর সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন; এই সৌধের পরিকল্পনা তাঁর নিজেরেই। তাঁর মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন বয়স্ক ভদ্রলোকদের সঙ্গে। এইভাবে আদর্শ পত্নী আর জননীর কর্তব্য শেষ করে বর্তমানে তিনি সময় কাটান ফরাসি উপন্যাস পড়ে, ফরাসি রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে, আর সুযোগ পেলে ফরাসি মদ্যপান করে।

তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্রদের মধ্যে ডোরিয়েন ছিলেন বিশেষতম এবং ভদ্রমহিলা তাঁকে সব সময়েই বলতেন যে যৌবনে যে তাঁদের পরিচয় হয়নি এতে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। তিনি বলতেন: আমি জানি, তোমার সঙ্গে দেখা হলে উন্মাদের মতো তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলতাম; আর তোমার জন্যে সব কিছু ছাড়তাম আমি। খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে তখন তোমরা কথা আমার মনে হয়নি। আসল কথা হচ্ছে, আমাদের যুগটা এতই অখাদ্য আর শাসন এতই কড়া ছিল যে কারো সঙ্গে যে একটু প্রেম করব সে-সুযোগও আসেনি আমার। অবশ্য সবটাই নরবোরোর দোষ। তার দৃষ্টির প্রসারতা ছিল না; আর যে স্বামী কিছুই দেখে না তাকে বিয়ে করার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কেউ প্রায় প্রাণ খুলে আসর জমাতে পারেননি। এর কারণটা নোংরা ফ্যান-এর আড়ালে তিনি অবশ্য ডোরিয়েনকে বলেছিলেন। কারণটা হচ্ছে সেদিনই তাঁর একটি বিবাহিতা কন্যা হঠাৎ তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে; তার চেয়েও খারাপ ব্যাপারটা হচ্ছে সেই কন্যাটি তার স্বামীটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

ঠিক এই সময় মেয়েটার এখানে আসাটা ঠিক হয়নি, বুঝতে পারছি; অবশ্য আমি হামবার্গ থেকে ফিরে প্রতিটি গ্রীষ্মে ওদের বাড়িতে গিয়ে ক'টা দিন কাটিয়ে আসি; কিন্তু আমার মতো

বৃদ্ধা মহিলার মাঝে-মাঝে ফাঁকায় থাকাটা দরকার; আর তা ছাড়া, আমি তাদের কিছুটা চাঙ্গাও করে তুলি। ওরা যে কী ভাবে দিন কাটায় তা তুমি জান না। যাকে বলে একেবারে নির্ভেজাল গ্রাম্য জীবন। সংসারে অনেক কাজই ওদের করতে হয়; তাই ওরা খুব সকালে উঠে পড়ে; গভীর কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা ওদের নেই। তাই ওরা সন্ধে-সন্ধে ঘুমিয়ে পড়ে। রানি এলিজাবেথের সময় থেকে ও অঞ্চলে কারো কোনো কলঙ্ক রটেনি; ফলে ডিনার খেয়েই সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের কারো পাশেই তোমার বসার দরকার নেই; তুমি বসবে আমার পাশে, আনন্দ দেবে আমাকে।

একটু হেসে ডোরিয়েন তাঁর বদান্যতার স্বীকৃতি জানালেন; তারপরে, ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ভদ্রমহিলা সত্যি কথাই বলেছেন। আসরটা মোটেই জমাট বাঁধেনি। আগন্তুকদের মধ্যে দুজন তাঁর অপরিচিত; অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে আর্নেস্ট হ্যারোডেন; মধ্যবয়সী অতি সাধারণ মানুষ; লন্ডনের ক্লাবগুলিতে এই জাতীয় নিরপরাধ শান্তশিষ্ট অনেক গোবেচারা দেখা যায়; এরা হল অজাতশত্রু; কিন্তু এদের বন্ধুরা মোটেই এদের পছন্দ করে না। আর রয়েছেন অনাবশ্যক বেশভূষায় শরীর-ঢাকা সাতচল্লিশ বছর বয়সের লেডি রাক্সটন, সূচোল নাক; অন্য লোকে যা বলে সব সময়েই তিনি তা মেনে নেন; কোনো প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু এত সাদাসিধে যে তাঁর বিরুদ্ধে কারও কোনো অভিযোগ নেই, থাকলে যেন তিনি একটু খুশিই হতেন। আর আছেন মিসেস আরলিন; মিষ্টি ঠোঁট আর ভেনিস দেশের মতো লাল তাঁর চুলের গোছা। রয়েছেন লেডি অ্যালিস চ্যাপম্যান। ইনি হচ্ছেন লেডি নরবোরোর কন্যা। চেহারা কদাকার; বোকা-বোকা মুখের আদল; ব্রিটেনের জাতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর মুখ—এ মুখ একবার দেখার পরে আর কারও মনে থাকে না। রয়েছেন তাঁর স্বামী, গল দুটি লাল; সাদা গোঁফ জোড়া, আচারে-ব্যবহারে তাঁরই সমগোত্রীয়দের মতো। তাঁর ধারণা অনাবশ্যক উজ্জ্বলতা উঁচু আদর্শের পরিপন্থী।

এইরকম একটি ভোজে আসার জন্যে ডোরিয়েন-এর আপসোস হল। লেডি নরবোরো শেলফ-এর ওপরে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বেশ চেঁচিয়েই বললে: কী আশ্চর্য! হেনরির এত দেরি হচ্ছে কেন? আজ সকালে সে আসবেই।

সান্ত্বনার কথা এই যে হেনরির আসার কথা রয়েছে। তারপর দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে যখন মিথ্যা অজুহাতের সঙ্গে তাঁর মিষ্টি গলার স্বর শোনা গেল তখনই ডোরিয়েন-এর মন থেকে অবসাদ কেটে গেল; তিনি কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ডিনারের সময় কিছুই খেতে পারলেন না তিনি। প্লেটের পর প্লেট নিয়ে ফিরে চলে গেল বেয়ারা। লেডি নরবোরো মৃদু ধমক দিলেন তাঁকে; বললেন: বেচারা অ্যাডোলফকে তুমি অপমান করছ ডোরিয়েন। তুমি যা ভালোবাস সেই খাবারই বেছেবেছে ও রান্না করেছে।

লর্ড হেনরিও মাঝে-মাঝে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ ভাব আর বিভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। মাঝে-মাঝে বাটলার খালি গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিতে লাগল। সেইটাই তিনি আগ্রহের সঙ্গে খেতে লাগলেন; তৃষ্ণা যেন বাড়তে লাগল তাঁর।

শেষ পর্যন্ত লর্ড হেনরি প্রশ্ন না করে পারলেন না: কী ব্যাপার বল তো ডোরিয়েন; আজ যেন কেমন-কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে।

লেডি নরবোরো বললেন: মনে হয় ছেলেটা প্রেমে পড়েছে। পাছে আমি হিংসে করি এই জন্যে

ওর প্রেমিকার নামটা আমাকে বলতে ভয় পাচ্ছে। না বলে ভালোই করেছে। আমি হিংসাই করতাম।

হাসতে-হাসতে ডোরিয়েন বললেন: প্রিয় লেডি, গোটা একটা সপ্তাহ আমি কারো প্রেমে পড়িনি; বিশেষ করে মাদাম দ্য ফেরোল শহর ছাড়ার পর থেকে।

বৃদ্ধা একটু চেঁচিয়ে মন্তব্য করলেন: বুঝতে পারিনে ওই মহিলাটির সঙ্গে প্রেমে পড় কী করে?

লর্ড হেনরি বললেন: তার একমাত্র কারণ, আপনি যখন শিশু ছিলেন তখনকার কথা তাঁর মনে রয়েছে। আপনার ছোটো ফ্রক আর আমাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র যোগসূত্র।

আমার ছোটো ফ্রকের কথা মোটেই তাঁর মনে নেই, লর্ড হেনরি; কিন্তু তিরিশ বছর আগে তাঁকে যে অবস্থায় আমি ভিয়েনাতে দেখেছিলাম সে-কথা আমার এখনো মনে রয়েছে। সেই সময় তিনি কাঁধ আর গলা খোলা জামা আর অস্বাভাবিক রকমের ছোটো স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়াতেন।

তাঁর লম্বা আঙুলের ভেতরে একটা অলিভ ফুল ধরে তিনি বললেন: এখনো তিনি সেইভাবেই ঘুরে বেড়ান; যখন তিনি চৌকস গাউন পরে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করেন তখন তাঁকে দেখলে মনে হবে একটা অখাদ্য ফরাসি উপন্যাসকে যেন মরক্কো চামড়া দিয়ে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে। সত্যিই তিনি বড়ো অদ্ভুত; কখন যে তিনি কী ভাবে মানুষকে চমকে দেবেন সে-কথা কেউ জানে না। আত্মীয়স্বজনদের ভালোবাসতে তাঁর জোড়া আর নেই। তৃতীয় স্বামী মারা যাওয়ার পরে শোকে-দুঃখে তাঁর মাথার চুলগুলি একেবারে রক্তবর্ণ ধারণ করল।

ডোরিয়েন চেঁচিয়ে বললেন: এসব কথা কী বলছ, হ্যারি?

লেডি নরবোরো হেসে বললেন: নিঃসন্দেহে খুব রোমান্টিক ব্যাখ্যা। কিন্তু তৃতীয় স্বামীর কথাটা কী বললেন, লর্ড হেনরি? ফেরোল কি তাহলে তার চতুর্থ স্বামী?

হ্যাঁ, লেডি—চতুর্থ।

আপনার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করিনে।

ঠিক আছে; মিঃ গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন। ও তাঁর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মিঃ গ্রে, কথাটা কি সত্যি?

ডোরিয়েন বললেন: সেই কথাই তিনি আমাকে বলেছেন। মারগিরাইট দ্য নাভারার মতো তিনি মৃত স্বামীদের হৃদয়গুলি সুগন্ধী পুষ্পাধারে রেখে দিয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বললেন: না। কারণ হৃদয় বলে কোনো পদার্থ তাদের কারুরই ছিল না।

চার-চারটে স্বামী! তবে যে কোনো কাজ করার মতো দুর্দান্ত মানসিক অবস্থা তার রয়েছে। কিন্তু ফেরোল কেমন দেখতে? তার সঙ্গে তো আমার কোনো আলাপ নেই।

মদের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে লর্ড হেনরি হেসে বললেন: সুন্দরী মহিলাদের স্বামীদের জাত একটাই—তারা হচ্ছে ক্রিমিন্যাল।

লেডি নরবোরো হাত-পাখার খোঁচা দিলেন তাঁকে; বললেন: লর্ড হেনরি, বিশ্বের লোক যে আপনাকে পয়লা নম্বরের দুষ্টু বলে অভিহিত করে তাতে আমি মোটেই অবাক হইনে।

চোখ দুটো ওপরে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন লর্ড হেনরি: কিন্তু কোন বিশ্বের লোকেরা বলে? নিশ্চয় অন্য বিশ্ব; কারণ এই বিশ্বের সঙ্গে আমার যথেষ্ট সৌহার্দ্য রয়েছে।

লেডি নরবোরো ঘাড় নেড়ে বললেন: উহুঁ। আমার সঙ্গে যাদের পরিয় রয়েছে তারা সবাই ওই কথা বলে।

কয়েক মুহূর্ত গম্ভীরভাবে থেকে লর্ড হেনরি বললেন: এইভাবে মানুষে যে আজকাল অপরের সম্বন্ধে নির্ভেজাল সত্যিকথাটা তাদের পেছনে বলে চলেছে তা সত্যিই বড়ো ভয়ঙ্কর।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ডোরিয়েন বললেন: ওর সঙ্গে কথায় আপনি পারবেন না।

লেডি নরবোরো হেসে বললেন:আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু আপনারা সবাই যদি মাদাম দ্য ফেরোলের এইভাবে স্তুতি করেন তাহলে বাজারে বিকোবার জন্যে দেখছি আমাকেও আবার বিয়ে করতে হবে।

লর্ড হেনরি বললেন: বিয়ে আর আপনি করবেন না। আপনি অনেক সুখী। কোনো মহিলা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তখন ধরে নিতে হবে যে প্রথম স্বামীকে তিনি ঘৃণা করতেন। পুরুষ যখন দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন তখন বুঝতে হবে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসতেন। মহিলারা ভাগ্যকে যাচাই করেন; পুরুষরা নেন ঝুঁকি।

বৃদ্ধাটি বললেন: নরবোরো খাঁটি ছিল না।

তিনি খাঁটি হলে আপনি তাঁকে ভালোবাসতে পারতেন না। খুঁত থাকে বলেই মহিলারা আমাদের ভালোবাসে। আমাদের দোষ যত বেশি থাকবে ততই মহিলারা আমাদের ক্ষমা করবে, এমন কি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পর্যন্ত। এই কথা শোনার পরে ভবিষ্যতে নিশ্চয় আর আপনি আমাকে ডিনারে আসতে নিমন্ত্রণ করবেন না; কিন্তু কথাটা সত্যি।

লর্ড হেনরি, আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। আপনাদের দোষের জন্যেই যদি মহিলারা আপনাদের ভালো না বাসত তাহলে আপনাদের অবস্থা কী হত? আপনাদের একজনেরই বিয়ে হত না। ঝাঁকে-ঝাঁকে আপনারা অবিবাহিত থেকে যেতেন। তাতে অবশ্য আপনাদের অবস্থার কোনো হেরফের হত না। আজকাল সব বিবাহিত পুরুষরাই অবিবাহিত পুরুষদের মতো দিন কাটায়; আর সব অবিবাহিত পুরুষরাই দিন কাটায় বিবাহিতদের মতো।

লর্ড হেনরি বললেন: একেই বলে জীবনের উচ্ছ্বাস।

লেডি নরবোরো বললেন: একেই বলে জীবনের পরিহাস।

ডোরিয়েন বললেন: জীবন একটা বিরাট ধোঁকা।

দস্তানাগুলি হাতে পরে লেডি নরবোরো বললেন: জীবনটা যে তোমার শেষ হয়ে গিয়েছে একথা নিশ্চয় তুমি আমাকে বলতে চাইছ না। মানুষ যখন তোমার মতো কথা বলে তখন মনে হয় সে বুঝতে পেরেছে যে তার জীবন, শেষ হয়ে এসেছে। লর্ড হেনরি দুষ্ট প্রকৃতির;

মাঝে-মাঝে মনে হয় আমিও যদি ওই রকম হতাম। কিন্তু ভগবান তোমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন—এত সুন্দর তুমি দেখতে। তোমার জন্যে একটি সুন্দর পাত্রী খুঁজে দেব আমি। লর্ড হেনরি, আপনার কী মনে হয় মিঃ গ্রের বিয়ে করা উচিত নয়?

লর্ড হেনরি বললেন: সেকথা আমি ওকে অনেকবার বলেছি, লেডি নরবোরো।

বিয়ের যোগ্য পাত্রীদের একটা তালিকা আজই আমি তৈরি করে ফেলব।

তাদের বয়সসুদ্ধুও তো?—জিজ্ঞাসা করলেন ডোরিয়েন।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। একটু রদবদল করে আর কী! কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছু করব না। আমি চাই তোমরা দুজনেই সুখী হও।

লর্ড হেনরি বললেন: বিয়ে করে সুখ! কী আলতু-ফালতু কথাই না মানুষ বলে! পুরুষ যে-কোনো নারীকে নিয়েই সুখী হতে পারে যদি না সে তাকে ভালোবেসে ফেলে।

চেয়ারটাকে সরিয়ে লেডি রাক্সটনের দিকে চেয়ে লেডি নরবোরো বললেন: দেখেছ—একেবারে পাকা সিনিক। তোমাকে তাড়াতাড়ি আমার এখানে একদিন আসতেই হবে; আর ডিনার-ও খেতে হবে। টনিক হিসাবে সত্যিই তোমার তুলনা নেই; স্যার অ্যানড্রু আমাকে যে টনিক দেন তার চেয়েও অনেক বেশি উপাদেয়। সেদিন এখানে কার-কার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাও তাও তুমি আমাকে বলবে কিন্তু। মজলিসটা জমজমাট হোক আমিও তাই চাই।

তিনি বললেন: আমি সেই সব পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই যাদের ভবিষৎ রয়েছে; আর আলাপ করতে চাই সেই সব মহিলাদের সঙ্গে যাদের রয়েছে অতীত; আপনার কি মনে হয় এরকম মজলিস বেশ জমাটি হবে না?

দাঁড়িয়ে হাসতে-হাসতে লেডি নরবোরো বললেন: আমার তাই মনে হয়। ক্ষমা করবেন লেডি রাক্সটোন, আপনার যে এখনো সিগারেট খাওয়া শেষ হয়নি তা আমি বুঝতে পারিনি।

কিছু না, কিছু না; লেডি নরবোরো, সিগারেটটা আমি খুব বেশি খাই। ভবিষ্যতে সিগারেট আমি কম খেতে মনস্থ করেছি।

লর্ড হেনরি বললেন: আমার অনুরোধ, লেডি রাক্সটোন, ও-কাজটি আপনি করবেন না। পরিমিত ব্যবহারের মতো জঘন্য, মারাত্মক জিনিস আর নেই। মিতাচার জিনিসটা হচ্ছে দৈনন্দিন খাওয়ার মতো খারাপ; অমিতাচার ভোজন-উৎসবের মতো উপাদেয়।

তাঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে লেডি রাক্সটোন বললেন; লর্ড হেনরি, একদিন বিকালে আমার বাড়িতে এসে ব্যাপারটা আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন তো! আপনার মতবাদ বড়োই চমৎকার।

এইটুকু বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লেডি নরবোরো বেশ চেঁচিয়েই বললেন; মনে রেখ, তোমরা রাজনীতি আর কুৎসা নিয়ে বেশিক্ষণ মেতে থেক না; থাকলে তোমাদের ভেতরে একটা হট্টগোল বেঁধে যাবে।

পুরুষ অতিথিরা হাসলেন। মিঃ চ্যাপম্যান গম্ভীরভাবে টেবিলের ধার থেকে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। ডোরিয়েন গ্রে স্থান পরিবর্তন করে লর্ড হেনরির পাশে এসে বসলেন। হাউস অফ কমনস-এর ঘটনা নিয়ে মিঃ চ্যাপম্যান বেশ জোর গলায় আলোচনা শুরু করলেন। তাঁর চিন্তাধারার মানমন্দিরের ওপরে তিনি ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়িয়ে দিলেন। ব্রিটিশ জাতির বংশগত মূর্খতাকে তিনি খুশ মেজাজে অভিজ্ঞ "ইংলিশ কমনসেন্স" বলে চিহ্নিত করলেন। তাঁর মতে সেইটাই হচ্ছে সমাজের আসল কাঠামো।

লর্ড হেনরির দুটি ঠোঁট হাসিতে বেঁকে উঠল; তিনি ঘুরে ডোরিয়েন-এর দিকে তাকালেন; জিজ্ঞাসা করলেন: শরীর ভালো তো? ডিনারের সময় তোমাকে যেন কেমন-কেমন দেখাচ্ছিল।

হ্যারি, না, আমি ভালোই আছি। আমি একটু ক্লান্ত—এই যা।

গতরাত্রিতে তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ডাচেস তো তোমার ভক্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি বলছিলেন একদিন তিনি তোমার সেলবি-র বাড়িতে হাজির হবেন।

কুড়ি তারিখে যাবে বলে তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন।

মনমাউথও কি যাবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়—হ্যারি।

ওই মানুষটাকে আমার মোটেই ভালো লাগে না; যেমন ভালো লাগে না ডাচেসের। মহিলা হিসাবে তিনি চতুর, অত্যন্ত চতুর। দুর্বলতার যে অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য রয়েছে সেই দুর্বলতা তাঁর নেই। কাদার পা থাকার জন্যেই সোনার মূর্তির কদর। তাঁর পা দুটি সুন্দর; কিন্তু সেগুলি কাদার নয়। বরং সাদা পোরসিলিন-এর বলতে পার। অনেক আগুনের ওপর দিয়ে তাদের হাঁটতে হয়েছে এবং আগুন যাকে পোড়াতে পারে না তাকে শক্ত করে দেয়। অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

ডোরিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন: কতদিন তাঁর বিয়ে হয়েছে?

তাঁর মতে অনন্তকাল। আমার বিশ্বাস, তাঁর পিয়ারেজ পাওয়ার সময় থেকে যদি ধর তাহলে, বিয়ে হয়েছে তাঁদের বছর দশেক। কিন্তু মনমাউথের সঙ্গে দশ বছর ঘর করা অনন্ত সময়েই সামিল। আর কারা আসছেন?

উইলোবায় দম্পতি, লর্ড রাগবি এবং তাঁর স্ত্রী, আমাদের লেডি নরবোরো, জিয়োফ্রি ক্লোসিটন, আর ওই জাতীয় মানুষ যাঁরা সাধারণত আমাদের পার্টিতে এসে থাকেন। লর্ড গ্রোসিয়েনকে আমি আসতে বলেছি।

লর্ড হেনরি বললেন: ভদ্রলোকটিকে আমি পছন্দ করি। অনেকের তাঁকে ভালো লাগে না বটে; কিন্তু আমার তো মনে হয় ভদ্রলোক বেশ চমৎকার মানুষ। মাঝে-মাঝে তিনি পোশাকে নিজেকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন; সেই পাপের সব সময় প্রায়শ্চিত্ত করেন বিদ্যার প্রাচুর্যে। আধুনিক বলতে যা বোঝা যায় তিনি তাই।

তিনি আসতে পারবেন কিনা জানি নে, হ্যারি; তাঁর বাবার সঙ্গে হয়তো তাঁকে মন্টি কার্লোতে

যেতে হবে।

হায়রে, মানুষের আত্মীয়স্বজনরা কী জঘন্য, ডোরিয়েন! তিনি যাতে সেদিন আসেন তার জন্যে চেষ্টা কর। আচ্ছা ডোরিয়েন, গতকাল রাত্রিতে তুমি তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল, রাত্রি এগারোটা বাজার আগেই। তারপরে কী করলে তুমি? সোজা বাড়ি গিয়েছিলে?

ডোরিয়েন তাঁর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন; শেষকালে বললেন: না হ্যারি; রাত্রি প্রায় তিনটের আগে আমি বাড়িতে ঢুকিনি।

তুমি কি ক্লাবে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

তারপরেই তিনি ঠোঁট কামড়ালেন: না; তা নয়। ক্লাবে আমি যাইনি; ঘুরে বেড়িয়েছি। কী করেছি তা আমার মনে নেই। সব জিনিসে তোমার এত আগ্রহ কেন হ্যারি? অন্য লোকে কী করে সব সময়েই তুমি তা জানতে চাও। আমি কী করছি তা আমি সব সময়েই ভুলে যেতে চাই। ঠিক কখন কাল রাত্রিতে আমি বাড়িতে ফিরেছি তা যদি তুমি জানতে চাও তাহলে বলব রাত্রি আড়াইটা। 'ল্যাচ কী'-টা আমি বাড়িতে ফেলে এসেছিলাম; চাকরটা আমাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। যদি প্রমাণ চাও—তার সঙ্গে কথা বলতে পার।

কাঁধটা কোঁচকালের লর্ড হেনরি: না, না বন্ধু; তুমি কখন ফিরছ তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। চল আমরা ড্রয়িংরুমে যাই। মিঃ চ্যাপম্যান, ধন্যবাদ; আর শেরি নয়। ডোরিয়েন, নিশ্চয় কিছু একটা তোমার হয়েছে। কী হয়েছে বল। আজ তোমার চালচলনটা ঠিক আগেকার তোমার মতো নয়।

ওসব ছেড়ে দাও, হ্যারি। আমার মেজাজটা আজ ভালো নেই; কেমন যেন চটে উঠছি। আমি কাল বা পরশু তোমার সঙ্গে দেখা করব। লেডি নরবোরোর কাছে আমার হয়ে তুমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ো; ওপরে আর আমি যাচ্ছিনে। আমি বাড়ি যাব—বাড়ি আমাকে যেতেই হবে।

ঠিক আছে ডোরিয়েন; কাল চা খাওয়ার সময় নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ডাচেসও আসছেন।

আসতে চেষ্টা করব হ্যারি।

এই বলেই ডোরিয়েন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাড়িতে ফেরার পথে তাঁর মনে হল যে ভীতিটার গলা টিপে হত্যা করেছিলেন বলে এতক্ষণ তিনি ভেবেছিলেন সেই ভীতিটা আবার তাঁর ফিরে এসেছে। কথায়-কথায় লর্ড হেনরি তাঁকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তাতেই তাঁর স্নায়ুগুলি সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই স্নায়ুগুলিকে তাঁর ঠিক করতে হবে। ধ্বংস করতে হবে তাঁর কাছে যেগুলি বিপজ্জনক হতে পারে সেই জিনিসগুলি, ভ্রূকুটি করলেন তিনি। জিনিসগুলি স্পর্শ করতেও তাঁর ঘৃণা বোধ হল।

তবু সে-কাজগুলি তাঁকে করতেই হবে। করতে যে হবে সেদিক থেকে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। লাইব্রেরিতে ঢুকে তিনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন; তারপরে একটা গোপন ড্রয়ার খুললেন; এরই ভেতরে বেসিল হলওয়ার্ড-এর কোট আর ব্যাগটা তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঘরের ভেতরে বিরাট একটা চুল্লিতে আগুন জ্বলছিল; আরো কয়েকটা কাঠের

গুঁড়ি তিনি তার মধ্যে ফেলে দিলেন। পোড়া কাপড় আর চামড়ার উগ্র গন্ধে ঘর ভরে উঠল; সব কিছু পুড়িয়ে ফেলতে তিনি কোয়ার্টারের মতো সময় লাগল তাঁর। কেমন যেন অবশ হয়ে উঠলেন তিনি। কপালটা ভিজিয়ে নিলেন ঠান্ডা সুগন্ধী ভিনিগারে।

হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন; তাঁর চোখ দুটো অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলজ্বল করতে লাগল; ভয় পেয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ালেন তিনি। দুটি দরজার মাঝখানে হাতির দাঁতের কাজ করা আবলুস কাঠের তৈরি বিরাট একটা কেবিনেই ছিল। সেইটির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি। জিনিসটা তাঁকে কেবল চমৎকৃতই করেনি যথেষ্ট সন্ত্রস্তও করেছিল তাঁকে। আকর্ষণ আর ঘৃণা দুটিই তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছিল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততা বৃদ্ধি পেল তাঁর। একটা উন্মত্ত কামনা গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। তাঁর চোখের পাতা এল নেমে। তবু তিনি কেবিনেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে সোফা থেকে উঠে তিনি সেটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চাবিটি খুলে গোপন একটা বোতামে চাপ দিলেন। তিনকোনা একটা ড্রয়ার বেরিয়ে এল ধীরে-ধীরে, তাঁর আঙুলগুলি তার মধ্যে ঘুরে-ঘুরে একটা জিনিসের ওপরে গিয়ে পড়ল; কালো আর সোনালি গুঁড়ো মেশানো ল্যাকারের ছোটো একটা চিনে বাক্স। ডালাটা খুলতেই খানিকটা চটকটে সবুজ পদার্থ তাঁর নজরে পড়ল। গন্ধটাও তার বড়ো তীব্র।

মুখটা হাসিতে ভরে উঠল তাঁর। কয়েকটি মুহূর্ত দ্বিধা করলেন তিনি। ঘরের আবহাওয়া যথেষ্ট গরম হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাঁপতে লাগলেন; তারপরে পিছিয়ে এসে ঘড়ির দিকে তাকালেন। বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। বাক্সটা যথাস্থানে রেখে ড্রয়ারটি বন্ধ করে তিনি শোওয়ার ঘরে চলে এলেন।

ধোঁয়াটে আকাশে মধ্যরাত্রির সংকেত বেজে উঠতেই ডোরিয়েন গ্রে বেশ সাধারণ ভাবেই পোশাক পরলেন, গলায় জড়ালেন মাফলার; তারপরে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বন্ড স্ট্রিটে গিয়ে একটা বেশ ভালো ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেলেন। তার ভেতরে উঠে নীচু গলায় বিশেষ একটা জায়গায় যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন গাড়োয়ানকে।

গাড়োয়ান ঘাড় নেড়ে বলল: অনেক দূর স্যার।

ডোরিয়েন বললেন: একটা সোভারেন নাও। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারলে আর একটা পাবে।

লোকটি বলল: আচ্ছা স্যার। একঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে দেব আপনাকে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল; ঠান্ডা কনকনে বৃষ্টি। সেই ঝিরঝিরে ঝাপটায় রাস্তার আলোগুলি ভূতের মতো বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। বেশ্যাপাড়ায় লোকজন কমে এসেছিল; ভাঙা-ভাঙা দলে তখনো কিছু বারবনিতাদের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কিছু কিছু সরাইখানা থেকে উঁচু হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অন্য জায়গা থেকে ভেসে আসছিল মাতালদের ঝগড়া আর চিৎকার।

গাড়ির মধ্যে বসে মাথার টুপিটা কপালের ওপরে নামিয়ে ডোরিয়েন গ্রে উদাসীন দৃষ্টিতে সেই বিরাট শহরের নির্লজ্জ খেলা দেখছিলেন। প্রথম পরিচয়ের দিনে লর্ড হেনরি 'প্রবৃত্তি দিয়ে আত্মার পরিশোধন, আর আত্মার সাহায্যে প্রবৃত্তির বিশুদ্ধিকরণের' যে কথাটা তাঁকে বলেছিলেন সেই কথাগুলিই নিজের মনে-মনে বারবার তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন। হ্যাঁ, ওইটাই হল গোপন কথা; সেইভাবে চলতে এর আগেও তিনি অনেকবার চেষ্টা করেছেন; এখনো তাই করতে যাচ্ছেন। সেখানে আফিঙের আস্তানা রয়েছে, ওখানে মানুষে ভুলে থাকার ওষুধ কিনতে পায়; সেখানে পুরনো পাপের ভয়ঙ্কর স্মৃতির আস্তাবল রয়েছে; ওইখানে মানুষ নতুন পাপের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে পুরনো পাপের কথা ভুলে যেতে পারে।

হলদে মড়ার মাথার মতো নীচ-আকাশে ঝুলে পড়তে চাঁদকে দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে বিরাট বিকলাঙ্গ মেঘের কোনো হাতকে দেখা যাচ্ছে সেই চাঁদকে ঢেকে দিতে। আলোর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে; রাস্তাগুলি সরু আর অন্ধকারাচ্ছন্ন। একবার পথের নিশানা ভুল করায় আধ মাইল পিছিয়ে আসতে হল গাড়োয়ানকে। পাশের জানালার শার্সিগুলি ধূসর রঙের কুয়াশায় ভরে উঠেছিল।

"প্রবৃত্তি দিয়ে আত্মার পরিশোধন, আর আত্মার সাহায্যে প্রবৃত্তির বিশুদ্ধিকরণ!'" কথাগুলি তাঁর কানের ভেতরে গুনগুন করতে লাগল। নিঃসন্দেহে তাঁর আত্মা ক্লান্তিতে জর্জরিত। সত্যিই প্রবৃত্তি তাঁর আত্মাকে বাঁচাতে পারবে? নিরপরাধ মানুষকে তিনি হত্যা করেছেন। এরই বা প্রায়শ্চিত্ত কী? হায়রে, কোনো প্রায়শ্চিত্তই এই পাপ থেকে তাঁকে রেহাই দিতে পারবে না। কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই; তবু এখনো তিনি সব কিছু ভুলে থাকতে পারেন। এবং সব কিছু ভুলে যেতে তিনি বদ্ধপরিকর; যে সাপ তাঁকে ছোবল দিয়েছে সেই সাপকে একেবারে পিষে মেরে ফেলতে তিনি পণ করেছেন। আর ওভাবে কথা বলার কী অধিকার ছিল বেসিলের? অন্য লোকের বিচার করার অধিকার কে তাঁকে দিয়েছিল? তিনি যে সব কথা বলেছিলেন সেগুলি যে কেবল ভয়ানক আর বিপজ্জনক তাই নয়; অসহ্য।

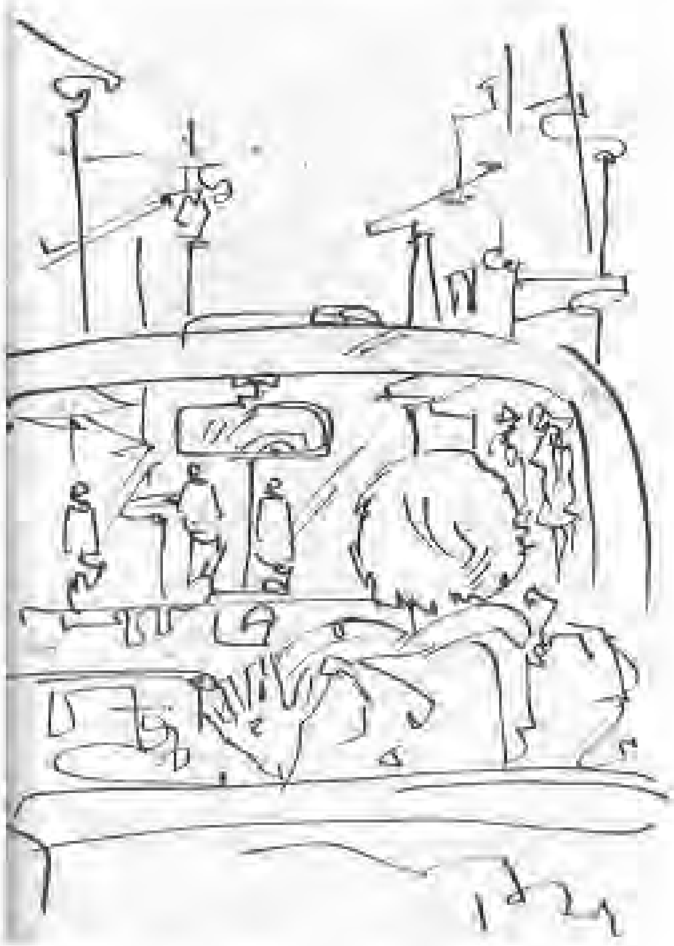

গাড়িটি গড়িয়ে-গড়িয়ে চলতে লাগল। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন গাড়ির গতি বেশ শ্লথ হয়ে আসছে লোকটিকে তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে বললেন। আফিঙের নেশায় অস্থির হয়ে উঠছিলেন তিনি। তাঁর গলা জ্বলতে লাগল, কাঁপতে লাগল হাতগুলি। হাতের ছড়ি দিয়ে ঘোড়াগুলিকে উন্মাদের মতো তিনি পিটতে লাগলেন। গাড়োয়ান হেসে চাবুক কষাল তাদের পিঠে। প্রত্যুত্তরে তিনি হেসে উঠলেন; লোকটি চুপ করে গেল।

পথের যেন আর শেষ নেই। মাকড়শার জালের মতো পথটা কেবল জট পাকিয়ে চলেছে। একঘেয়ে চলা আর তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। কুয়াশা ঘন হয়ে এল। ভয় পেয়ে গেলেন তিনি।

নির্জন ইট-পাঁজার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল গাড়ি। এখানে কুয়াশা পাতলা। বোতলের মতো গনগনে আগুনে চুল্লিগুলি এবার তিনি দেখতে পেলেন। বেশির ভাগ জানালাই অন্ধকার; মাঝে-মাঝে কোনো জানালার ভেতর থেকে অদ্ভুত-অদ্ভুত ছায়া দেখা গেল। একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠল; আর অনেক দূরে অন্ধকারে কোনো ভ্রাম্যমান শৃগালের চিৎকার শোনা গেল। একটা কুঁড়ের সামনে ধাক্কা খেয়ে বেঁকে আবার ছুটতে লাগল গাড়িটা।

একটা উন্মত্ত ক্রোধ তাঁর মনের মধ্যে দাপাদাপি করতে লাগল। একটা কোণে গাড়িটা এসে পৌঁছতেই একটা মেয়ে চিৎকার করে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে দুটো লোক প্রায় একশ গজের মতো তাদের পেছনে ছুটে এল। গাড়োয়ান তাদের পিঠে তার চাবুক বসিয়ে দিল।

শোনা যায় কামনা নাকি বৃত্তাকারে মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ডোরিয়েন গ্রে-ও তা থেকে অব্যাহতি পেলেন না। তাঁর মাথার একটি রন্ধ্র থেকে আর একটি রন্ধ্রে কেবল একটি চিন্তাই ঘুরে বেড়াতে লাগল। মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সবচেয়ে উন্মাদ আর বিপজ্জনক হচ্ছে বেঁচে থাকা। আকাঙ্ক্ষাই তাঁর প্রতি স্নায়ু আর তন্ত্রীকে উগ্র উত্তেজনায় কাঁপিয়ে তুলল। বাস্তব সত্য বলে একদিন কুৎসিত জিনিসকে তিনি ঘৃণা করতেন; আর ঠিক সেই কারণেই আজ কুৎসিত তার প্রিয়। চারুকলা আর সঙ্গ তের চেয়ে অপরিচ্ছন্ন সরাইখানা, ঘৃণ্য বস্তী, বিশৃঙ্খল জীবনের নগ্ন হট্টগোল, এমন কি চোর আর অসামাজিক মানুষের নোংরামিও অনেক বেশি বাস্তব। আর তিনি দিনের মধ্যে মুক্তি পাবেন তিনি।

একটি অন্ধ গলির মোড়ে এসে লোকটি ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে দিল। নীচু ছাদ আর ঘরের চিমনির স্তূপের ওপরে জাহাজের কালো-কালো মাস্তুলগুলি দেখা যাচ্ছিল। উঠোনে

সাদা কুয়াশার মালা ভুতুড়ে পালগুলির ওপরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

লোকটি বলল: এই জায়গাটাই নয় স্যার?

চমকে উঠলেন ডোরিয়েন, মুখ বার করে চারপাশে তাকালেন।

ঠিক আছে।

এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন; গাড়োয়ানকে কথামতো বাড়তি ভাড়া দিলেন; তারপরে জাহাজঘাটার দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন। এখানে-ওখানে বিরাট সওদাগরী জাহাজের গায়ে লাল লন্ঠন জ্বলছিল।

বাঁ দিক ধরে তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে কি না জানার জন্যে মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে তাকালেন। সাত থেকে আট মিনিটের মধ্যে তিনি একটা নোংরা বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন। বাড়িটা দুটো বিরাট ফ্যাকটরির মাঝখানে।ওপরের একটা জানালায় একটা লন্ঠন বসানো ছিল। তিনি থামলেন সেইখানে এবং বিশেষ রকম ধাক্কা দিলেন দরজায়।

কিছুক্ষণ পরে ভেতরে একজনের পায়ের শব্দ তাঁর কানে এল; শব্দ হল শেকল খোলার। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। কোনো কথা না বলে তিনি সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেন। লম্বা হল-এর শেষ প্রান্তে সুবজ রঙের একটা ছেঁড়া পর্দা ঝুলছিল। তিনি ঘরে ঢোকার ফলে রাস্তা থেকে যে একটা দমকা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছিল তারই ধাক্কায় পর্দাটা উড়তে লাগল। পর্দাটাকে একপাশে সরিয়ে তিনি একটা লম্বা নীচু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন; দেখলে মনে হবে ঘরটি একসময় এই তৃতীয় শ্রেণির নাচঘর ছিল। দেওয়ালের চারপাশে ছিল গ্যাস-জেট আর বিবর্ণ আরশি। মেঝের ওপরে ছড়ানো ছিল করাত গুঁড়ো; এখানে-ওখানে কিছু মাটি, আর মদ ছড়ানোর দাগ। ছোটো কয়লার স্টোভের ধারে বসে কয়েকটি মালয় দেশের লোক বাজনা বাজাচ্ছিল—আর ক'জন সাদা দাঁত বার করে দিচ্ছিল তাল। হাতের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে একজন নাবিক টেবিলের ওপরে ঝুঁকে বসেছিল আর একপাশ দিয়ে টানা ছিল নোংরা 'বার'; সেইখানে দুটি শীর্ণ চেহারার মেয়ে একটি বুড়ো মানুষকে দেখে ঠাট্টা করছিল। ডোরিয়েন তাকে পেরিয়ে যেতেই লোকটি তাঁকে উদ্দেশ্য করে গজগজ করতে লাগল।

ঘরের শেষে একটা ছোটো সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি পেরিয়ে একটা অন্ধকার ঘর। সরু-সরু তিনটে সিঁড়ি ওঠার পরেই ডোরিয়েনের নাকে আফিঙের গন্ধ এসে লাগল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি; আরামে তাঁর চোখ দুটি ফুলে উঠল। তিনি ঘরে ঢুকতেই একটি যুবক দ্বিধা-জড়িত কন্ঠে তাঁর দিকে তাকাল।

ডোরিয়েন ফিস-ফিস করে বললেন: আড্রিয়েন, তুমি এখানে?

উদাসীনভাবে উত্তর দিল আড্রিয়েন: আর কোথায় যাব? কোনো লোকই আজ আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

আমি ভেবেছিলেম ইংলন্ড ছেড়ে তুমি চলে গিয়েছ।

ডারলিংটন কিছু করতে রাজি নয়। শেষকালে আমার ভাই টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছে। জর্জ আমার সঙ্গে কথা বলে না; আমি গ্রাহ্য করিনে কিছু।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার; বলল: যতক্ষণ মানুষের কাছে এই জিনিসটা থাকবে ততক্ষণ কোনো বন্ধুর দরকার তার নেই। আমার ধারণা, আমার বন্ধুর সংখ্যা অনেক।

ভ্রূকুটি করলেন ডোরিয়েন; ছেঁড়া মাদুরের ওপর অদ্ভুতভাবে যে সব কিম্ভূতকিমাকার বস্তুগুলি পড়ে রয়েছে সেগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সেই বাঁকানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মুখব্যাদন, আর বিবর্ণ দৃষ্টিগুলি তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। কী অদ্ভুত স্বর্গে তারা যন্ত্রণা ভোগ করছে তিনি তা জানতেন। কোন নরক যন্ত্রণা তাদের কাছে নতুন আনন্দের গোপন রহস্যের দ্বার খুলে দিয়েছে তা জানতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। তাদের অবস্থা তাঁর চেয়ে অনেক ভালো। তিনি দুশ্চিন্তার কারাগারে বন্দি; ভয়ঙ্কর কোনো ব্যাধির মতো স্মৃতি তাঁর আত্মাকে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে ফেলছে। মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হল বেসিল হলওয়ার্ডের চোখ দুটি যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন। তবু তাঁর মনে হল তিনি আর অপেক্ষা করতে পারেন না। আড্রিয়েন সিঙ্গলটনের উপস্থিতি তাঁকে অস্থির করে তুলল। তিনি এমন একটা জায়গায় যেতে চান যেখানে কেউ তাঁকে চিনতে পারবে না। নিজের কাছ থেকেই তিনি পালিয়ে যেতে চান।

একটু থেমে তিনি বললেন: আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি।

জেটির দিকে?

হ্যাঁ।

সেই পাগল বেড়ালটা নিশ্চয় ওখানে রয়েছে। এখন এখানে তারা আর তাকে রাখে না।

ডোরিয়েন অগ্রাহ্যভরে স্রাগ করলেন; বললেন: প্রেমিকাদের নিয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। যে সব মেয়েরা অপরকে ঘৃণা করে তারাই সবচেয়ে উপাদেয়। তা ছাড়া, জিনিস হিসাবেও তারা উৎকৃষ্ট।

একই রকম।

ওদেরই আমি বেশি পছন্দ করি। এস; একটু ড্রিঙ্ক করে যাবে। আমারও কিছু চাই। যুবকটি বিড়-বিড় করে বলল: না; আমার কিছু দরকার নেই।

ঠিক আছে। এস।

ক্লান্তবাবে আড্রিয়েন সিঙ্গলটন উঠে দাঁড়াল; 'বার' পর্যন্ত ডোরিয়েন-এর পিছু-পিছু গেল। ছেঁড়া পাগড়ি আর ময়লা কোট পরে একজন বেয়ারা বিকৃত মুখে অভিনন্দন জানিয়ে এক বোতল ব্র্যান্ডি আর দুটো মগ তাদের সামনে রেখে দিল। মেয়েরা ভয়ে টলতে-টলতে সরে গিয়ে কিচির-মিচির করতে লাগল। ডোরিয়েন তাদের দিকে পেছন করে দাঁড়ালেন; আড্রিয়েন সিঙ্গলটনকে ফিস-ফিস করে কী যেন বললেন।

মেয়েদের একটি মুখের ওপরে বাঁকা হাসি খেলে গেল। সে নাক বাঁকিয়ে ব্যঙ্গের ছলে বলল: আজ আমাদের সৌভাগ্যের দিন।

মেঝের ওপরে পা ঠুকে চিৎকার করে উঠলেন ডোরিয়েন: ভগবানের দোহাই, আমাদের সঙ্গে কথা বলো না। কী চাই তোমাদের? টাকা? এই নাও। ভবিষ্যতে আর কখনো আমার সঙ্গে

কথা বলো না।

মেয়েটির ভিজে চুপসানো চোখ দুটির ভেতর থেকে দুটো লাল ফুলকি চকচক করে উঠল; তারপরে যথারীতি সেগুলি মিলিয়ে গেল। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে কাউন্টার থেকে সে লোলুপ ভাবে মুদ্রা দুটি প্রায় ছোঁ দিয়ে তুলে নিল। হিংসার চোখে তার বন্ধুরা ব্যাপারটা লক্ষ করল।

আদ্রিয়েন সিঙ্গলটন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: কোনো লাভ নেই। আর আমি ফিরে যেতে চাইনে। আর ফিরে গিয়েই বা লাভ কী? আমি এখানে সুখেই রয়েছি।

একটু চুপ করে থেকে ডোরিয়েন বললেন: তোমার যদি কখনো কিছু দরকার হয় আমাকে তা জানাবে তো? না কি?

সম্ভবত।

তাহলে, এখন চলি।

শুকনো মুখ রুমাল দিয়ে মুছে চলে যেতে-যেতে সে বলল: শুভরাত্রি।

ডোরিয়েন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টির মধ্যে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। পর্দাটা সরিয়ে দিতেই একটা মেয়ে বীভৎস গলায় হেসে উঠল। এটি সেই মেয়ে যে কাউন্টারের উপর থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছিল।

মোটা গলায় সে চেঁচিয়ে বলল: শয়তানটা যাচ্ছে।

তিনি বললেন: তুমি গোল্লায় যাও। আমাকে ও নামে ডেকো না।

মেয়েটা বাতাসে হাতের ঝাপটা দিয়ে বলল: তোমাকে প্রিন্স চার্মিং বলে ডাকতে হবে, তাই না?

একটা নাবিক ঝিমোচ্ছিল। এই কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠে উত্তেজিতভাবে চারপাশে তাকাতে লাগল। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ তার কানে এল। সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে; মনে হল, ডোরিয়েন-এর পিছু নিয়েছে সে।

পিটপিটে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ডোরিয়েন দ্রুত জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। আদ্রিয়েন-এ সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন বেসিল হলওয়ার্ড যে জন্যে তাঁকে অপমান করেছিলেন তা কি সত্যি? অর্থাৎ, আদ্রিয়েন-এর অধঃপতনের জন্যে কি তিনিই দায়ী? নিজের ঠোঁটটা কামড়ালেন তিনি; কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো বুজিয়ে দিলেন। কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করলেন তিনি। তবু, তাঁরই বা কি যায় আসে? অন্য লোকের ভ্রান্তির বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে বয়ে বেড়ানোর মতো সময় মানুষের কোথায়? প্রতিটি মানুষ নিজের জীবন নিয়েই বেঁচে থাকে; আর তার জন্যে তাকে যথেষ্ট খেসারৎ দিতে হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে একই ভুলের জন্যে অনেকবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় মানুষকে; অনেকবার নয়; বার বার। মানুষের সঙ্গে হিসাব-নিকাশের খতিয়ান কোনোদিনই ভাগ্য শেষ করে দেয় না। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, জীবনে এমন সময় আসে যখন পাপ, অথবা মানুষ যাকে পাপ বলে, করার প্রবৃত্তি মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করে বসে, যে তার দেহের প্রতিটি স্নায়ু বা মাথার প্রতিটি কোষ একটা ভয়ঙ্কর উন্মাদনায় থরথর

করে কাঁপে। সে-সময় মানুষ তার ইচ্ছার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। স্রোতের টানে অসহায়ের মতো এগিয়ে যায় ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে। বিবেচনা করার শক্তি তখন তার থাকে না; নষ্ট হয়ে যায় বিবেক। অথবা, নষ্ট যদি নাই হয়ে থাকে তো বিদ্রোহ করাই তার আসল সৌন্দর্য হয়ে দাঁড়ায় এবং অবাধ্যতাই হয়ে দাঁড়ায় তার আসল হাতিয়ার। সমস্ত ধর্মযাজকেরা বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে আবাধ্যতাই হচ্ছে চরম পাপ। বিশ্বের প্রথম অমঙ্গলের প্রতীক শয়তানের যখন স্বর্গচ্যুতি ঘটেছিল তখন সে বিদ্রোহী হয়েই নেমে এসেছিল।

সব কিছুর সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে অন্যায় করার জন্যে সমস্ত শক্তি সংগত করে, কলঙ্কিত মন আর বিদ্রোহের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ডোরিয়েন গ্রে তাঁর চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন; পতিতালয়ে যাওয়ার পথটা ছোটো করার জন্যে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে গেলেন; কিন্তু এই সময়ে পেছন থেকে অতর্কিতে দুটো হাত ধাক্কা দিয়ে তাঁকে দেওয়ালের গায়ে ঠেলে দিল; তারপরে, একটা হাত প্রচণ্ড শক্তিতে তাঁর টুঁটিটা চেপে ধরল। সতর্ক হওয়ার এতটুকু সময় তিনি পেলেন না।

বাঁচার জন্যে পাগলের মতো চেষ্টা করলেন তিনি এবং কোনোরকমে তাঁর গলা থেকে আক্রমণকারীর হাতটা সরিয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে রিভলভার বার করার একটা শব্দ তাঁর কানে গেল, তিনি দেখতে পেলেন একটা রিভলভারের মুখ চকচক করছে আর দেখলেন সেই মুখ তাঁর মাথাটা লক্ষ্য করে উঁচিয়ে রয়েছে। আবছায়ার মধ্যে তাঁর নজরে পড়ল একটা স্বাস্থ্যবান বেঁটে লোক তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি: কী চাও?

লোকটি বলল: চোপ। একটু নড়লেই তোমাকে আমি গুলি করে মারব।

তুমি পাগল। আমি তোমার কী করেছি?

উত্তর এল: তুমি সাইবিল ভেন-এর জীবন ধ্বংস করেছ। সাইবিল আমার বোন ছিল। সে আত্মহত্যা করেছে। আমি তা জানি। তোমার জন্যেই সে আত্মহত্যা করেছে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমাকে হত্যা করে তার বদলা নেব আমি। বছরের পর বছর ধরে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোনো সন্ধান পাইনি তোমার। যে-দুজন তোমাকে চিনিয়ে দিতে পারত তারা আজ মৃত। যে প্রিয় নামে সে তোমাকে ডাকত সেইটুকু ছাড়া তোমার সম্বন্ধে আর কিছুই আমি জানতাম না। আজই হঠাৎ সেই নামটা আমার কানে এল। ভগবানের কাছে শেষবারের মতো প্রার্থনা করে নাও, কারণ, আজ তোমাকে মরতেই হবে।

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন ডোরিয়েন গ্রে। তিনি তোতলাতে-তোতলাতে বললেন: আমি তাকে কোনোদিনই চিনতাম না। তার নাম কোনোদিনই আমি শুনিনি। তুমি একটি উন্মাদ।

তার চেয়ে বরং নিজের দোষ স্বীকার কর। কারণ আমি যেমন সত্যি-সত্যিই জেমস ভেন, তেমনি সত্যি-সত্যিই তোমাকে মরতে হবে।

কয়েকটি ভয়াবহ মুহূর্ত। কী করা উচিত বা কী বলা উচিত কিছুই ভেবে পেলেন না ডোরিয়েন।

গর্জন করে উঠল লোকটি:হাঁটু মুড়ে বস। প্রার্থনা করার জন্যে এক মিনিট সময় তোমাকে আমি দিচ্ছি। তার বেশি নয়।

ডোরিয়েনের হাত দুটি নেতিয়ে পড়ল। ভয়ে হিম হয়ে গেল তাঁর দেহ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর মগজে একটা আশার বিজলি খেলে গেল।

তিনি চিৎকার করে বললেন: থাম। কত বছর আগে আমার বোন মারা গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বল।

লোকটি বলল: আজ থেকে আঠারো বছর আগে। একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? বয়সে কী আসে যায়?

বিজয়ীর মতো ডোরিয়েন হেসে বললেন: আঠারো বছর! আঠারো বছর! আলোর নীচে চল; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ।

কথাটা বুঝতে না পেরে জেমস ভেন একটু ইতস্তত করল। তারপরে তাঁকে টানতে-টানতে সেই গলির বাইরে নিয়ে এল।

বাতাসে আলোর শিখাগুলি কাঁপছিল সত্যি কথা, তবু সেই আলোতেই নিজের বিষম ভুলটা সে বুঝতে পারল। কারণ যে লোকটিকে সে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল সে যুবক, তার মুখের ওপরে নিষ্পাপ শিশুর অকলঙ্কিত পবিত্রতা। দেখলে মনে হবে তার বয়স বছর কুড়ির বেশি নয়; যদি একটু বেশিই হয় তাহলে, অতগুলি বছর আগে ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় তার দিদির বয়স যা ছিল তার চেয়ে হয়তো সামান্য একটু বেশি। এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যে মানুষটি তার দিদির মৃত্যুর জন্যে দায়ী এ সে-মানুষ নয়।

হাত ছেড়ে দিয়ে সে পিছু হটে বলল, হায় ভগবান, হায় ভগবান; আর একটু হলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলতাম।

দীর্ঘ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ডোরিয়েন। তার দিকে তাকিয়ে বেশ রূঢ়ভাবেই তিনি বললেন, আর একটু হলে তুমি প্রায় নরহত্যা করে ফেলতে হে! এ থেকে একটা শিক্ষা তোমার হোক। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ইচ্ছেটা কখনো নিজের হাতে রেখ না।

জেমস ভেন বিড়বিড় করে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন স্যার। আমি প্রতারিত হয়েছি। ওই নোংরা বস্তিতে হঠাৎ একটা নাম শুনে আমি ভুল করে ফেলেছি।

পেছন ফিরে এগোতে-এগোতে ডোরিয়েন বললেন, বরং বাড়ি যাও। পিস্তলটাকে সরিয়ে রাখ। না হলে, বিপদে পড়তেগ পার।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেমস ভেন রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে রইল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠকঠক করতে লাগল তার। একটা কালো ছায়া ভিজে দেওয়ালের পাশ দিয়ে গুঁড়ি দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আসছিল এতক্ষণ। একটু পরেই সেই ছায়া আলোর সামনে বেরিয়ে এল; তারপরে নিঃশব্দে সেটি কাছে এসে দাঁড়াল তার। একটি হাত তার হাতের ওপরে এসে পড়তেই চমকে উঠে সে পিছনে ফিরে তাকাল। বার-এ যে সব মেয়েরা মদ খাচ্ছিল এটি সেই দলেরই।

তার সেই কদাকার মুখটা তার মুখের কাছে ধরে মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, শয়তানটাকে তুমি খুন করলে না কেন? ড্যানির কাছে থেকে তুমি যখন ছুটে বেরিয়ে এলে তখনই আমি জানতাম তুমি ওর পেছনে ছুটেছ। ওকে তোমার খুন করা উচিত ছিল। লোকটার অনেক টাকা

রয়েছে, ব্যাটা একেবারে শয়তানের শুরোমণি।

জেমস বলল, আমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি এ সে-লোক নয়। আমি কারো টাকা চাই না। আমি একটি মানুষের জীবন চাই। যে-লোকটিকে আমি খুন করতে চাই তার বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি হবে। এই লোকটির শিশুর চেয়ে বড়ো। ওর রক্ত যে আমার হাতে লাগেনি তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ।

মেয়েটা চিবিয়ে চিবিয়ে হেসে উঠল, শিশুর চেয়ে কিছু বড়ো! তাই বটে! কী বলছ তুমি! আমার যে অবস্থা দেখছ তার জন্যে দায়ী ওই প্রিন্স চার্মিং! আঠারো বছর আগে ওই লোকটা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

জেমস ভেন চিৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা বলছ তুমি।

আবেদন করার ভঙ্গিতে আকাশে হাত দুটি তুলে মেয়েটি বলল, ভগবানের দিব্যি, আমি সত্যি কথা বলছি।

ভগবানের দিব্যি!

আমার কথা যদি সত্যি না হয় তাহলে আমি যেন বোবা হয়ে যাই। এখানে যারা আসে ও হচ্ছে তাদের মধ্যে নিকৃষ্ট। লোকে বলে সুন্দর মুখের জন্যে মানুষটা শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে। প্রায় আঠারো বছর আগে ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। সেই থেকে ওর চেহারার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। যদিও আমার হয়েছে অনেক।

তুমি দিব্যি করে বলছ?

তার সেই চওড়া থ্যাবড়ানো মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা প্রতিধ্বনি: আমি দিব্যি করছি। আমি ওকে বড়ো ভয় করি। আজকের জন্যে আমাকে কিছু টাকা দাও।

একটা কুৎসিত কথা বলে সে ঘুরে দাঁড়াল, দৌড়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। কিন্তু ততক্ষণে ডোরিয়েন গ্রে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। পিছু ফিরে তাকাল জেমস। মেয়েটিও তখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সপ্তাহখানেক পরের কথা। সেলবি রয়্যাল-এর বাড়িতে এসে ডোরিয়েন গ্রে মনমাউথ-এর সুন্দরী স্ত্রী ডাচেস-এর সঙ্গে গল্প করছিলাম। পাশে ছিলেন তাঁর স্বামী লর্ড মনমাউথ, বয়স ষাটের কাছাকাছি, মনে হচ্ছে পরিশ্রান্ত। সময়টা চা খাওয়ার। টেবিলের ওপরে ঢাকনি দেওয়া বিরাট বাতিদান থেকে একটা মিষ্টি আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সান্ধ্য মজলিসে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন ডাচেস স্বয়ং। তাঁর সাদা হাত দুটি লঘুভাবে কাপের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডোরিয়েন গ্রে ফিসফিস করে তাঁকে যা বলছিলেন তাই শুনে তাঁর ঠোঁট দুটি ভরে উঠেছিল হাসিতে। তাঁদের দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরি একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। পিচ রঙের একটি সোফার ওপরে বসেছিলেন লেডি নরবোরো; ব্রেজিল থেকে যে শেষ পোকাটা ডিউক সংগ্রহ করে এনেছিলেন তাঁরই মুখ থেকে সেই কাহিনীটি শোনার ভান করছিলেন তিনি। তিনটি যুদক ধোপদুরস্ত পোশাক পরে মহিলাদের চা পরিবেশন করছিল। মজলিসে উপস্থিত ছিলেন বারোজন। পরের দিন আরো কিছু অতিথিদের আসার কথা। টেবিলের কাছে হেলতে-দুলতে এগিয়ে গিয়ে এবং কাপটি নামিয়ে রেখে লর্ড হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন, কী গল্প হচ্ছে তোমাদের? আশা করি আমি যে সকলের নতুন করে নামকরণের পরিকল্পনা করেছি তা বোধ হয় তুমি শুনেছ, গ্ল্যাডিস? পরিকল্পনাটা বড়ো সুন্দর।

অপরূপ সুন্দর দুটি চোখ তাঁর দিকে তুলে ডাচেস বললেন, আবার আমার নতুন নামকরণ করতে আমি রাজি নই, হেনরি, আমার নিজের যা নাম তাতেই আমি খুশি। এবং মিঃ গ্রে-ও যে তাঁর নামে খুশি সে-বিষয়েও আমি নিশ্চিত।

ডোরিয়েন গ্রে বললেন, প্রিয় গ্ল্যাডিস, পৃথিবীতে এমন কিছু জিনিস নেই যার লোভে আমি দুটি নামের একটিও পরিবর্তন করতে রাজি হব। দুটিই নিঁখুত। বিশেষ করে আমি ফুলের কথা চিন্তা করছিলাম। গতকাল বাটনহোল-এ গোঁজার জন্যে আমি একটা অর্কিড ফুল কেটেছিলাম। ফুলটা কী সুন্দর; সাতটা ভয়ঙ্কর পাপের মতো গোটা গায়ে তার সুন্দর-সুন্দর ফুটকি। কোনো কিছু না ভেবেই মালিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ফুলের নামটা কী। সে আমাকে বলল রবিন সোনিয়ানা বা ওই জাতীয় কোনো ভয়ঙ্কর জিনিস সেটি। কথাটা সত্যি; কিন্তু নামটা শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সুন্দর জিনিসের সুন্দর নাম দেওয়ার শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। নামই তো সব, কাজ নিয়ে আমি কোনোদিন কলহ করি না। আমার একমাত্র বিবাদ শব্দের সঙ্গে। সেই জন্যে সাহিত্যে অশ্লীল নগ্নতাকে আমি ঘৃণা করি। যে লোক কোনো জিনিসকে তার আসল নামে চিহ্নিত করে সে কোদালকে কোদাল বলেই ডাকে। এ ছাড়া অন্য কোনো গুণ তার নেই।

ডাচেস জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে, তোমাকে কী নামে ডাকব, হ্যারি?

ডোরিয়েন বললেন, ওর নাম প্রিন্স প্যারাডক্স।

ডাচেস বললেন, আমি তো ওকে এক নজরে চিনে ফেলতে পারি।

একটা চেয়ারে ওপরে গাটা এলিয়ে দিয়ে লর্ড হেনরি বললেন, থাক, থাক, আর আমি শুনতে চাই না। দুর্নাম থেকে মুক্তি নেই মানুষের। আমি এ উচ্ছ্বাস পছন্দ করি না।

সুন্দরী ঠোঁট থেকে সাবধান বাণী একটা উচ্চারিত হল: রাজতন্ত্র সিংহাসনচ্যুত না হতে

পারে...

তুমি চাও আমি আমার সিংহাসন রক্ষা করি?

হ্যাঁ।

আগামীকাল যেটা সত্য হয়ে দাঁড়াবে আজকে আমি সেই কথাই বলি।

ডাচেস বললেন, আজকের ভুলগুলিকেই আমি পছন্দ করি বেশি।

তুমি আমাকে অস্ত্রহীন করে ফেলছ গ্ল্যাডিস।

তোমার বর্মটা সরিয়ে দিচ্ছি, বর্শটা নয়।

হাতটা সামনের দিকে ঘুরিয়ে তিনি বললেন, সৌন্দর্যের ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ি না আমি।

বিশ্বাস কর হেনরি, ওটাই তোমার ভুল। সৌন্দর্যের দাম তোমার কাছে খুব বেশি।

একথা তুমি বলছ কী করে? স্বীকার করছি আমার কাছে ভালো হওয়ার চেয়ে সুন্দর হওয়া অনেক বালো। কিন্তু তবু সবার আগে এটাও আমি স্বীকার করি যে কুৎসিত হওয়ার চেয়ে ভালো হওয়া অনেক ভালো।

ডাচেস বললেন, তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে সাতটি ভয়ঙ্কর পাপের মধ্যে কুৎসিত জিনিস একটি মারাত্মক পাপ? অর্কিডের সম্বন্ধে তোমার উপমাটা কী?

যাকে তোমরা কুৎসিত বলছ সেটা হচ্ছে সাতটি মারাত্মক গুণের একটি, গ্ল্যাডিস, সাঁচ্চা টোরি হিসাবে ওদের তুমি হেলাফেলা করতে পার না। বিষয়, বাইবেল আর ওই সাতটি মারাত্মক গুণই আমাদের ইংলন্ডকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

ডাচেস জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাহলে তোমার দেশকে পছন্দ কর না?

আমি এই দেশেই বেঁচে রয়েছি।

এই জন্যে যে এর অপগুণ তুমি ভালো করে প্রচারদ করতে পার?

তিলি জিজ্ঞাসা করলেন, এ সম্বন্ধে ইউরোপ কী বলে তাই কি তুমি শুনতে চাও?

কী বলে তারা?

টার্টুফি ইংলন্ডে এসে দোকান খুলে বসেছে।

এটা কি তোমারই কথা, হ্যারি?

আমি এটা তোমাকেই দিলাম।

আমি তা কাজে লাগাতে পারতাম না। জিনিসটা ভয়ঙ্কর রকমের সত্যি।

ভয় নেই তোমার। আমাদের দেশের লোক কোনো বর্ণনাকেই স্বীকার করে না।

তারা বাস্তবধর্মী।

তারা যতটা বাস্তকবধর্মী তার চেয়ে অনের বেশি চতুর। হিসাবের খাতা লিখতে বসে তারা মূর্খতার জের টানে অর্থের প্রাচুর্য দিয়ে, আর পাপের জের টানে শঠতা দিয়ে।

তবু, আমাদের অনেক বড়ো জিনিস রয়েছে।

বড়ো জিনিস আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, গ্ল্যাডিস।

সে-বোঝা আমরা বয়ে এনেছি।

সেকথা সত্যি, তবে আমাদের দৌড় ওই স্টক এক্সচেঞ্জ পর্যন্ত।

ঘাড় নাড়লেন ডাচেস, বললেন, ইংরেজ জাতের ওপরে আমার আস্থা রয়েছে।

ইংরেজ জাতটা বেঁচে রয়েছে কেবল অপরকে ল্যাঙ মারার চেষ্টায়।

উন্নতির পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

ধ্বংসই আমাকে আকর্ষণ করে বেশি।

কিন্তু আর্ট?

ওটা একটা রোগ।

প্রেম?

ওটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ধর্ম?

ওটা হচ্ছে বিশ্বাসের একটা শৌখিন প্রতীক।

তুমি একটি নাস্তিক।

কভি নেহি। নাস্তিকবাদ দিয়েই বিশ্বাসের শুরু।

তোমার কাজটা কী বল তো?

ব্যাখ্যা করার অর্থই হচ্ছে সীমাবদ্ধ করা।

আমাকে একটা ধরতি দাও।

দড়ি ছিঁড়ে যায়। অনন্ত গহ্বরে তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে।

তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছ। অন্য আলোচনা করা যাক এস।

যাঁর বাড়িতে আমরা আজ অতিথি হয়ে এসেছি তাঁকে নিয়ে আলোচনা করলে আনন্দ পাবো। অনেকদিন আগেই তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছে। সেই নামটা হচ্ছে প্রিন্স চার্মিং।

ডোরিয়েন গ্রে বললেন, ওকথাটা আর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো না।

একটু লাল হয়ে ডাচেস বললেন, মিঃ গ্রেকে আজ একটু যেন কেমন-কেমন দেখাচ্ছে। আমার বিশ্বাস ও মনে করে নিছক বৈজ্ঞানিক স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যে মনমাউথ আমাকে বিয়ে করেছে। ওর ধারণা আমাকে বিয়ে করে মনমাউথ আধুনিক প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ একটি নিদর্শন সংগ্রহ করেছে।

ডোরিয়েন হেসে বলেলন, আশা করি মনমাউথ তোমার বুকে পিন ফুটিয়ে দেবেন না ডাচেস।

সে-কথা যদি বল তাহলে আমার চাকরানিই চটে গেলে আমার বুকে পিন ফুটিয়ে দেয় মিঃ গ্রে।

কিন্তু তোমার ওপরে বিরক্ত হওয়ার তার কারণটা কী ডাচেস?

আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি মিঃ গ্রে, একেবারে বাজে কারণে। সাধারণত আমি নটা বাজতে দশ মিনিটে বাড়িতে ঢুকে তাকে বলি আমাকে সাড়ে আটটার মধ্যে সাজিয়ে দাও। এই আমার অপরাধ।

সত্যিই কী অন্যায়। তোমার তাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

সাহস পাই নে, মিঃ গ্রে। কী করে পাব বলুন? সে আমার জন্যে নতুন রকমের টুপি তৈরি করে। লেডি হিলটনের গার্ডেন পার্টিতে আমি যেটা পরেছিলাম সেই টুপিটার কথা তোমার মনে রয়েছে? মনে নেই, কিন্তু মনে থাকার ভান যে করছ তাই যথেষ্ট। সেই টুপিটা সে তৈরি করেছিল তেমন কিছু মালমশলা না দিয়েই। সব ভালো টুপিই এইভাবে তৈরি হয়।

লর্ড হেনরি মাঝপথে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, গ্ল্যাডিস, ঠিক যশের মতো। প্রতিটি যশ অর্জন করার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ একটি করে শত্রু তৈরি করে। জনপ্রিয় হতে গেলে মানুষকে চরিত্র আর দক্ষতার দিক থেকে মাঝামাঝি ধরনের হতে হবে।

মাথা নেড়ে ডাচেস বললেন, উঁহু। ও কথা মহিলাদের সম্বন্ধে খাটে না; আর বিশ্ব শাসন করে এই মহিলারাই। কে যেন বলেছে, আমরা মহিলারা কান দিয়ে ভালোবাসি যেমন পুরুষরা ভালোবাসে চোখ দিয়ে, যদি অবশ্য সত্যিকার ভালোবাসার ক্ষমতা পুরুষদের থাকে।

ডোরিয়েন বিড়বিড় করে বললেন, আমার তো মনে হয় এক ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই আমরা করিনে।

দুঃখের ভান করে ডাচেস বললেন, তাহলে মিঃ গ্রে, তুমি সত্যি-সত্যিই ভালোবাস।

লর্ড হেনির বললেন, প্রিয় গ্ল্যাডিস, একথা তুমি বললে কেমন,করে? পুনরাবৃত্তির ওপরেই রোমান্স বেঁচে থাকে; আর একটা আকাঙ্ক্ষাকে কলায় পরিণত করে এই পুনরাবৃত্তি। তা ছাড়া, প্রতিটিবার মানুষ যখন প্রেমে পড়ে একমাত্র তখনই সে সত্যিকার ভালোবাসে। বস্তুর পার্থক্য আকাঙ্ক্ষার অকাগ্রতাকে পরিবর্তন করতে পারে না; বরং বাড়িয়ে তোলে। জীবনে আমরা একবারই মহৎ অভিজ্ঞতা লাভ করি; আর জীবনের রহস্য হচ্ছে যতবার সম্ভব সেই

অভিজ্ঞতাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

একটু চুপ করে থেকে ডাচেস প্রশ্ন করলেন, মানুষ আহত হলেও, হ্যারি?

লর্ড হেনরি উত্তর দিলেন, আলবৎ।

মুখ ঘুরিয়ে চোখের ওপরে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়ে ডাচেস ডোরিয়েন গ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিঃ গ্রে, তুমি কী বল?

একটু দ্বিধা করলেন ডোরিয়েন; তারপরে মাথাটা পেছনে সরিয়ে হেসে বললেন, হ্যারির সঙ্গে আমি সব সময়েই একমত, ডাচেস।

যখন সে অন্যায় কথা বলে তখনো?

হ্যারি কখনো অন্যায় কথা বলে না, ডাচেস।

ওর দর্শন কি তোমার ভালো লাগে?

সেকথা কোনোদিনই আমি ভাবিনে। কে সুখ চায়? আমি খুঁজে বেড়িয়েছি আনন্দ।

এবং তা তুমি পেয়েছ?

হ্যাঁ; নিশ্চয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ডাচেস-এর; বললেন, আমি শান্তি খুঁজেছি। আমি যদি এখনই গিয়ে পোশাক পরিবর্তন না করি তাহলে আজ সন্ধ্যায় আমাকে শান্তি পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হবে।

দাঁড়িয়ে উঠে ডোরিয়েন বললেন, তোমাকে কয়েকটা অর্কিড এনে দিই, ডাচেস।

লর্ড হেনরি তাঁর আত্মীয়াকে বললেন, তোমার চালচলনটা বেশ জুৎসই হচ্ছে না। খুব সাবধান। ওকে দেখে মেয়েরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আকর্ষণ করার শক্তি ওর অসীম।

সে-ক্ষমতা ওর না থাকলে, কোনো লড়াই হত না।

তাহলে বলতে চাও সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি চলছে তোমাদের?

আমি ট্রোজানদের দলে। একটি মহিলার জন্যে তারা লড়াই করেছিল।

পরাজিত হয়েছিল তারা।

ডাচেস বললেন, বন্দিনী হওয়ার চেয়ে খারাপ জিনিস রয়েছে।

তুমি বলগা ছেড়ে দিয়ে লাফাচ্ছো।

দ্রুতগতিই তো বেঁচে থাকারই অঙ্গ।

আমার ডায়েরিতে আজ রাত্রিতে কথাটা আমি লিখে রাখব।

কোন কথাটা?

যে আগুনে পোড়া শিশু আগুনকে ভালোবাসে।

পোড়া দূরের কথা, আমার গায়ে আঁচও লাগেনি। আমার পাখা পোড়েনি।

এক উড়ে যাওয়া ছাড়া, ওই পাখা দিয়ে তুমি সব কাজই কর।

সাহস আজকাল পুরুষদের কাছ থেকে মেয়েদের কাছে এসে পড়েছে। এটা আমাদের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

তোমার একটি প্রতিদ্বন্দ্বিনী রয়েছেন।

কে?

তিনি হেসে বললেন, লেডি নরবোরো। ভদ্রমহিলা ওকে একেবারে পুজো করে।

তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে। আমাদের মতো যারা রোমান্টিক তাদের কাছে প্রাচীনত্ব ভয়ানক রকমের বিপজ্জনক।

তুমি নিজেকে রোমান্টিক বলছ! তোমার সব কটি ছলাকলাই তো দেখছি বৈজ্ঞানিক।

পুরুষরাই আমাদের সব কিছু শিখিয়েছে।

কিন্তু তোমাদের আত্মাকে উদ্‌ঘাটিত করেনি।

জাতি হিসাবে আমাদের নারীদের ব্যাখ্যা কী?

তোমরা হচ্ছ স্ফিংকস্‌-এর জাতি; তফাৎ এইটুকু যে গোপন রহস্য বলতে তোমাদের কিছু নেই।

তাঁর দিকে তাকিয়ে ডাচেস একটু হেসে বললেন, মিঃ গ্রের এত দেরি হচ্ছে কেন? চল, তাঁকে সাহায্য করিগে। আমার ফ্রকের রঙটা এখনো তাঁকে বলা হয়নি।

তার ফুলের রঙের সঙ্গে তোমার ফ্রকের রঙটা মিলাতেই হবে তোমাকে, গ্ল্যাডিস।এর অর্থই হচ্ছে বেশি তাড়াতাড়ি নিজেকে সমর্পণ করা।

রোমান্টিক আর্টের শুরুই হচ্ছে শেষ থেকে।

কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ একটা খোলা রাখতে হবে তো।

পার্থিয়ানদের মতো?

তারা তো মরুভূমির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

সব সময় মহিলাদের তাদের ইচ্ছামতো সুযোগ দেওয়া হয় না।

লর্ড হেনরি কথা শেষ করার আগেই ফুলগাছগুলি যে ঘরে থাকে সেই দিক থেকে একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। একটা ভারী জিনিস মাটিতে পড়ে যাওয়ারও শব্দ এল কানে। সবাই চমকে ছুটে গেল সেইদিকে। ভয়ে চলচ্ছক্তিহীনা হয়ে গেলেন ডাচেস। ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠলেন লর্ড হেনরি। পাম গাছের পাতার ভেতর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখলেন ডোরিয়েন গ্রে মেঝের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে মূর্ছা গিয়েছেন।

তাঁকে তক্ষুনি বসার ঘরে তুলে নিয়ে আসা হল; শুইয়ে দেওয়া হল সোফার ওপরে। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। বিভ্রান্তের মতো চারপাশে তাকাতে লাগলেন তিনি।

জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে বল তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ; বুঝতে পেরেছি। হ্যারি, এখানে কি আমি নিরাপদ?

এইটুকু বলেই তিনি কাঁপতে লাগলেন।

লর্ড হেনরি বললেন, প্রিয় ডোরিয়েন, তুমি মূর্ছা গিয়েছিলে মাত্র। এ ছাড়া আর কিছু তোমার হয়নি। নিশ্চয় তুমি খুব বেশি পরিশ্রম করছ। ডিনারের তোমার না যাওয়াই ভালো।

দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ডোরিয়েন বললেন, না, না; আমি যাব। আমার নীচে যাওয়াই ভালো। আমি একলা থাকব না।

ঘরে গিয়ে তিনি পোশাক পরিবর্তন করলেন। খেতে বসে খুশির অকারণ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে ভয়ে তিনি শিউরে উঠতে লাগলেন। তাঁর মনে হল ফুল গাছ রাখার ঘরের দেওয়ালের গায়ে সাদা রুমালের মতো, জেমস ভেন-এর মুখ তিনি দেখেছেন। জেমস যেন তাঁর গতিবিধি লক্ষ করছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পরের দিন তিনি আর ঘর ছেড়ে বেরোলেন না। সত্যি কথা বলতে কি যদিও জীবনের বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন, তবু আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে বেশির ভাগ সময়টাই তিনি ঘরের মধ্যে কাটালেন। কেউ যে তাঁর পিছু নিয়েছে, তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই রকম একটা ধারণা তাঁকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলল। বাতাসে কিছু নড়াচড়ার শব্দ হলেই তিনি কেঁপে উঠতেন। জানালার শার্সিতে মরা পাতার ঝাপটা শুনে তাঁর মনে হত সেগুলি বুঝি বা তাঁরই ব্যর্থ প্রতিজ্ঞা আর অর্থহীন অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। চোখ দুটো বুজলেই তিনি দেখতে পেতেন একটি নাবিকের তীক্ষ্ণ দুটো চোখ তাঁর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ করছে। তখনই ভয়ে তাঁর অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত।

কিন্তু সম্ভবত সত্যিই কেউ তাঁর পেছনে ঘোরেনি। সেদিন রাত্রিতে যে দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, যে শাস্তি তাঁকে নিতে হচ্ছিল এটা হয়তো তারই একটা প্রতিচ্ছবি। বাস্তব জীবনটাই হচ্ছে কেমন যেন গণ্ডগোলে। কিন্তু আমাদের কল্পনার মধ্যে একটা সুশৃঙ্খল নীতি রয়েছে। এই কল্পনাই পাপের অনুশোচনায় আমাদের পরিচালিত করে; এই কল্পনার ভেতরে প্রতিটি পাপ প্রতিফলিত করে নিজেকে। বাস্তব জগতে পাপীরা শাস্তি পায় না, পুরস্কৃত না সাধুরা। সবলরা সাফল্য অর্জন করে, অসাফল্যের সমস্ত কালিমা চাপানো হয় দুর্বলের মাথায়। এ ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া যদি কোনো অপরিচিত মানুষ তাঁর বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত তাহলে নিশ্চয় চাকর-বাকরদের কেউ তাকে দেখতে পেত। কারো পায়ের ছাপ যদি বাগানে পড়ত তাহলে মালিই ব্যাপারটা কানে তুলত তাঁর। হ্যাঁ; ওটা তাঁর কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁকে হত্যা করার জন্যে সাইবিল ভেন-এর তাঁর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। সে নিশ্চয় সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে এতক্ষণে। যেমন করেই হোক, তার হাত থেকে তিনি রেহাই পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি কে সেকথা জানতও না, জানার কোনো উপায়ও তার ছিল না। যৌবনের মুখোশ তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তবু ব্যাপারটা যদি নিছক দৃষ্টিভ্রমই হত তাহলে তাঁর বিবেক কি অত ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তির কল্পনা করতে পারত! ভাবতেও গা কেমন ছমছম করে। এইভাবে দিনের পর দিন যদি প্রতিটি অলিগলি থেকে, পথে-প্রান্তর থেকে তাঁর খাওয়ার টেবিলের পাশ থেকে আতঙ্ক স্থির চক্ষু দুটি মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে থআকে, তাঁর সাধারণ গতিকে বিভ্রান্ত করে তোলে তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের পরিণতি কী দাঁড়াবে? এই চিন্তাটা তাঁর মাথার মধ্যে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ভয়ে হিম হয়ে যান; বাতাস হঠাৎ হিমেল হয়ে যায়। হায়রে, উত্তেজনার কী এক উন্মাদ মুহূর্তে তিনি তাঁর বন্ধুকে হত্যা করেছিলেন? সেই হত্যার দৃশ্যটা কী মর্মান্তিক! সবই যেন তিনি আবার দেখতে পেলেন। সে রাত্রির প্রতিটি ঘটনার ভয়ঙ্কর খুঁটিনাটিগুলি তাঁর ভীতি আরো বাড়িয়ে দিল। কালের কালো গুহা থেকে তাঁর পাপ রূপায়িত হয়ে তাঁর চোখের সামনে দাঁড়াল। সন্ধে ছটার সময় লর্ড হেনরি যখন তাঁর বাসায় এসে পৌঁছলেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

পর-পর তিন দিন ঠিক এইভাবেই কাটালেন তিনি। তারপর ঘর থেকে বেরোলেন। সেই পরিচ্ছন্ন পাইন গাছের গন্ধে ভরা শীতের সকাল তাঁর মন আনন্দে ভরিয়ে তুলল, বাঁচার নতুন স্বাদ পেলেন তিনি। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণ নিছক প্রাকৃতিক পরিবেশই নয়। যে দুঃখবোধ তাঁর বাঁচার পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল, ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল তাঁর মনকে, তারই বিরুদ্ধে তাঁর চরিত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যাঁদের মন সুচারু শিল্পের রেশমে গড়া তাঁদের এই রকমই হয়। তাঁদের তীক্ষ্ণ উচ্ছ্বাস হয় আহত হয়, না হয় আত্মসমর্পণ করে। তারা

হয়ে অপরকে হত্যা করে, না হয় তো হত্যা করে নিজেদের। মহৎ প্রেম অথবা মহৎ দুঃখ এইভাবে নিজেদের প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাসেই বিনষ্ট হয়। ছোটো দুঃখ অথবা অগভীর প্রেমই বেঁচে থাকে। তাছাড়া, তিনি যে একটা অমূলক বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছিলেন সে-বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। তাঁর ভীতিকে তাই তিনি কৃপার দৃষ্টিতে না দেখে পারলেন না; কেবল কৃপা নয়, ঘৃণার দৃষ্টিতেও।

প্রাতরাশ শেষ করে ঘন্টাখানেক তিনি ডাচেস-এর সঙ্গে বাগানে বেড়ালেন; তারপরে গাড়িতে চেপে পার্ক পেরিয়ে তিনি শিকার পার্টিতে যোগ দিলেন। পাইন বনের একধারে দেখা হল ডাচেস-এর ভাই স্যার জিয়োফ্রি ক্লাউসটন-এর সঙ্গে। ভদ্রলোক তখন বন্দুকের ভেতর থেকে দুটো টোটা বার করছিলেন। ডোরিয়েন গাড়ি থেকে লাফিয় নেমে এলেন; তারপরে সহিসের হাতে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি শুকনো গাছের ডালের ভেতর দিয়ে সেই দিকে এগোতে লাগলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, জিয়োফ্রি, ভালো শিকার মিলেছে?

না; তেমন আর মিলল কোথায়স, ডোরিয়েন? আমার ধারণা বেশির ভাগ পাখিই বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। আশা করি লাঞ্চের পরে আমরা যেখানে যাব সেখানে নিশ্চয় অনেক ভালো শিকার পাব।

হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে কুড়ি গজের মতো দূরে একটা পুরনো ঘাসের ঝোপ থেকে কালো ডোরা কাটা একটা খরগোশ কান উঁচু করে সামনে বেরিয়ে এল। সে পাশের একটা ঝোপের দিকে দৌড়ে যেতেই স্যার জিয়োফ্রি কাঁধের ওপরে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলেন কিন্তু খরগোশটার চেহারার মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য দেখা গেল যে ডোরিয়েন মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না; তিনি চেঁচিয়ে বললেন, ওকে মেরো না, জিয়োফ্রি। ওটা বাঁচুক।

তাঁর সঙ্গীটি হেসে বললেন, দুত্তোর! কী আজেবাজে বকছ?

খরগোশটা পাশের ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ার আগেই স্যার জিয়োফ্রি ঘোড়াটা টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটো আর্তনাদ শোনা গেল;খরগোশের মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরানি, আর তার চেয়েও ভয়াবহ একটি মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর্তনাদ।

স্যার জিয়োফ্রি চিৎকার করে উঠলেন, হায় ভগবান, যারা জানোয়ার তাড়াচ্ছিল তাদেরই একজনের গায়ে গুলি লেগেছে। লোকটা কী গাধা বল তো! বন্দুকের নলের মুখোমুখি কখনো কেউ দাঁড়ায়?

তারপরে তিনি চেঁচিয়ে সাবধান করে দিলেন, এই গুলি ছোঁড়া বন্ধ কর সব। একটা লোক আহত হয়েছে।

হাতে করে একটা ছড়ি নিয়ে প্রধান দারোয়ান ছুটে এল।

কোথায় স্যার? লোকটা কোথায়?

ঠিক সেই সময় চারপাশে বন্দুক ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল।

ঝোপের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে-যেতে স্যার জিয়োফ্রি রেগে বললেন, এদিকে।

লোকগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখ না কেন বলত? সারাটা দিন আমার নষ্ট করে দিলে।

তারা দুজনে ডালপালা সরিয়ে ঝোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডোরিয়েন তা দেখলেন। একটু পরে একটা লোককে তারা বাইরে টেনে আনল। ভয়ে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তাঁর মনে হস দুর্ভাগ্য তাঁর পিছু নিয়েছে। জিয়োফ্রি জিজ্ঞাসা করলেন লোকটা সত্যি সত্যিই মারা গিয়েছে কিনা। দারোয়াল বলল—হ্যাঁ। দুজনের কথাই কানে এল তাঁর। মনে হল অরণ্য হঠাৎ জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছে। চারপাশ থেকে লোক ছুটে আসছে। তাদের গলার অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল।

কয়েকটি মুহূর্ত একটা অনির্বচনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল তাঁর। মনে হল সময় যেন আর কাটে না। তারপরেই কে যেন তাঁকে কাঁধের ওপরে হাত রাখল। চমকে উঠে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি।

লর্ড হেনরি বললেন, ডোরিয়েন, আজকের মতো শিকার বন্ধ করতে আমি বরং ওদের বলে দিই। শিকার চালিয়ে যাওয়াটা ভালো দেখাবে না।

তিক্তভাবে তিনি বললেন, হ্যারি, আমার ইচ্ছে শিকার চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাক। সমস্ত জিনিসটাই হচ্ছে জঘন্য ভয়াবহ। লোকটা কি...

কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি।

লর্ড হেনরি বললেন, আমার তাই ভয় হচ্ছে। গুলিটা তার বুকে লেগেছে। লোকটা সম্ভবত সঙ্গে-সঙ্গেই মারা গিয়েছে। এস আমরা বাড়ি যাই।

কোনোরকম কথা না বলে রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি তাঁরা দুজনে প্রায় পঞ্চাশ গজ হেঁটে গেলেন; তারপরে লর্ড হেনরির দিকে তাকিয়ে ডোরিয়েন বললেন, ঘটনাটা অশুভ, হেনরি।

লর্ড হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন, কোনটা ওঃ, এই দুর্ঘটনার কথা বলছ? বন্ধু, একে এড়ানো যেত না। দোষ ওই লোকটারই। বন্দুকের নাগালের মধ্যে ওর যাওয়ার দরকারটা কী ছিল? তাছাড়া, আমাদের কী? অবশ্য জিয়োফ্রির ব্যাপারটা খারাপ লাগার কথা। শিকার যারা খেদাই করে আনে তাদের হত্যা করার অর্থ নেই কিছুউ। লোকে ভাববে জিয়োফ্রি বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। কিন্তু জিয়োফ্রি সে-জাতের মানুষ নয়। ও সোজাসুজি গুলি ছোঁড়ে। মরুক গে, ওকথা নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই।

মাথা নাড়ালেন ডোরিয়েন, ঘটনাটা অশুভ হ্যারি—ও তুমি যাই বল? মনে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কারো বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

যন্ত্রণায় মুখটা তাঁর বিকৃত হয়ে উঠল; চোখ দুটোর ওপরে হাত বুলিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন তাঁর, হয়তো আমারই।

বয়স্ক মানুষটি হাসলেন, ডোরিয়েন, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভীতিপ্রদ জিনিস হচ্ছে ক্লান্তি। ওটা হচ্ছে এমন একটা পাপ যার কোনো ক্ষমা নেই। কিন্তু ও নিয়ে আমাদের কিছু ভাবতে হবে না যদি ভদ্রলোকেরা ডিনারের সময় ওইটা নিয়ে কচকচি না করেন। আমি তাঁদের জানিয়ে দেব যে আলোচনাটা নীতিগতভাবেই আমাদের বন্ধ করা উচিত। আর অশুভ ঘটনার কথা যদি বল তো সত্যিকার অশুভ বলে কোনো বস্তু নেই। আমাদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে দুর্ভাগ্য কোনো সংবাদ পাঠায় না। সেদিক থেকে ভদ্রমহিলা অনেক বেশি জ্ঞানী অথবা নিষ্ঠুর,

তাছাড়া, তোমার সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে পারলে যে কোনো মানুষই খুশি হবে।

হ্যারি, পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে আমি রাজি না হব। আমার কথা শুনে অমন করে হেস না তুমি। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলছি। যে হতভাগ্য চাষিটা আজ মারা গেল তার অবস্থাও আমার চেয়ে ভালো। মৃত্যুকে আমার ভয় নেই; মৃত্যুর বদধ্বনিই আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। হায় ভগবান, তুমি কি লক্ষ করনি গাছের পেছনে একটা লোক আমাকে লক্ষ করছিল, অপেক্ষা করে বসেছিল আমার জন্যে?

যেদিকে তাঁর কম্পিত হাতটা বাড়ানো ছিল লর্ড হেনরি সেইদিকে তাকিয়ে দেখলেন। হেসে বললেন, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। মালি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার ধারণা আজ রাত্রিতে টেবিলে কোন কোন ফুল রাখা হবে সেই কথাটাই সে জানতে চায়। তোমার ভয় দেখে অবাক লাগছে আমার। শহরে ফিরে গিয়ে আমার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ো।

মালিকে তাঁদের দিকে আসতে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডোরিয়েন। লোকটি তার টুপিটা একটু তুলে দ্বিধার সঙ্গে লর্ড হেনরির দিকে তাকিয়ে তার মনিবের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বলল: চিঠির উত্তর নিয়ে যাওয়ার জন্য মাদাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

চিঠিটা পকেটে ফেলে দিয়ে বেশ বিরক্তির সঙ্গে ডোরিয়েন বললেন, মাদামকে বলো আমি এখনই আসছি।

উত্তর পেয়ে লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ির পথে এগিয়ে গেল।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, বিপজ্জনক কাজ করতে মহিলারা কত ভালোবাসে। অনেক গুণের মধ্যে তাদের এই গুণটাকে আমি সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করি। যতক্ষণ সবাই তাকিয়ে থাকে ততক্ষণই তারা পুরুষদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে প্রেমের অভিনয় করে।

হ্যারি, তুমি নিজেও বিপজ্জনক কথা বলতে কম ভালোবাস না। বর্তমান ক্ষেত্রে তুমি ভুল করেছ। ডাচেসকে আমার খুব ভালো লাগে সত্যি কথা; কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসিনে।

এবং ডাচেস তোমাকে খুব ভালোবাসে; কিন্তু পছন্দ করে কম। তোমাদের মিলটা হল তাই রাজযোটক।

তুমি কুৎসা রটনা করছ হ্যারি। কুৎসা রটনা করার মতো কোনো কাজ আমরা করিনি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসতে-হাসতে লর্ড হেনরি বললেন, প্রতিটি কুৎসার ভিত্তি হচ্ছে নীতিহীন নিশ্চয়তা।

কথা বলার মোহে সবাইকে তুমি জবাই করতে পার, হ্যারি।

উত্তর এল: কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। জবাই হওয়ার জন্যে সবাই হাঁড়িকাঠের দিকে এগিয়ে চলেছে।

স্বরে গভীর দুঃখের একটা আমেজ মিশিয়ে ডোরিয়েন: আমি যদি ভালোবাসতে পারতাম। কিন্তু ভালোবাসার প্রবৃত্তি আমার নষ্ট হয়েছে, আকাঙ্ক্ষাও তেমন আর নেই। নিজেকে নিয়েই আমি বড়ো ব্যস্ত। আমার ব্যক্তিত্ব আমার নিজের ওপরেই একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি

মুক্তি চাই, পালিয়ে যেতে চাই, চাই ভুলতে। এখানে আসাটাই আমার বোকামি রয়েছে। মনে হচ্ছে হার্ভেকে জাহাজ ঠিক করার জন্যে এখনই একটা টেলিগ্রাম করে দেব। জাহাজের ওপরে মানুষ নিরাপদ।

কার কাছ থেকে নিরাপদ, ডোরিয়েন? তুমি বিপদে পড়েছ। বিপদটা কী জাতীয় তা আমাকে তুমি বলছ না কেন? তুমি জান আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

বিষণ্ণভাবে তিনি বললেন, সেকথা তোমাকে আমি বলতে পারব না। আমার ধারণা ওটা আমার একটা কল্পনা। এই অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনাটা আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। আমার ভয় লাগছে এই ধরনের কোনো একটা দুর্ঘটনা হয়তো আমারও ঘটবে।

পাগল কোথাকার!

তাই যেন হয়; কিন্তু দুশ্চিন্তা না করে আমি পারছিনে। ওই তো ডাচেস আসছে। দেখ, আমরা ফিরে এসেছি।

ডাচেস বললেন, মিঃ গ্রে, আমি সব শুনেছি। বেচারা জিয়োফ্রি খুব ঘাবড়ে গিয়েছে। শুনলাম খরগোশটাকে গুলি করতে তুমিই তাকে নিষেধ করছিলে। কী কাণ্ড!

সেই রকমই বটে। কেন তাকে নিষেধ করতে গেলাম তা আমিই জানিনে। খরগোশ দেখতে বড়ো সুন্দর ছিল। কিন্তু লোকটার কথা তোমার কানে গিয়েছে শুনে আমি দুঃখিত। ঘটনাটা ভয়ানক।

লর্ড হেনরি বললেন, বিরক্তিকর। এর মনস্তাত্ত্বিক কোনো মূল্য নেই। জিয়োফ্রি যদি ইচ্ছে করে এই কাজটা করত তা হলেও না হয় এর একটা সদর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। কেউ সত্যি-সত্যি হত্যা করেছে এই রকম একটি লোকের সঙ্গে পরিচিত হলে খুশি হতাম।

ডাচেস চিৎকার করে উঠলেন, হ্যারি, কী ভয়ঙ্কর মানুষ তুমি! তাই না, মিঃ গ্রে? হ্যারি, মিঃ গ্রে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মূর্ছা যাবেন বলে মনে হচ্ছে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ডোরিয়েন হেসে বললেন, ও কিছু নয়। আমার শরীরটা কেমন নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। এছাড়া আর কিছু নয়। ভয় হচ্ছে আজ সকালে অনেকটা হেঁটেছি। হ্যারি কী বলল তা শুনিনি। খুব বাজে কথা বুঝি? যাই হোক, অন্য সময় বলো। এখন আমি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ি। তোমরা কিছু মনে করো না, কেমন?

এই বলে ডোরিয়েন ভেতরে ঢুকে গেলেন।

হেনরি ঘুরে দাঁড়িয়ে তন্দ্রালু চোখে ডাচেসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ওকে খুব ভালোবাস?

কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিলেন না ডাচেস; সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপরে বললেন, তাই যদি জানতাম।

মাথা নাড়লেন হেনরি; বললেন, জানাটা মারাত্মক। অনিশ্চয়তাই মানুষকে মুগ্ধ করে। কুয়াশার অস্পষ্টতাই চমৎকার।

তাতে পথ হারানোর সম্ভাবনা বেশি।

প্রিয় গ্ল্যাডিস, সব পথেরই লক্ষ্য এক জায়গায়।

সেটা কী?

ভ্রান্তির অবসান।

স্ট্রবেরির পারা ঘেঁটে আমি ক্লান্ত।

ওগুলিই তোমায় ভআলো মানায়।

বাইরের জীবনে।

লর্ড হেনরি বললেন, ওগুলিকে তুমি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলবে।

না, একটিও হারাব না।

মনমাউথের কান রেয়েছে।

বৃদ্ধ বয়সে কানে কম শোনে মানুষ।

অপরের সঙ্গে তোমাকে মিশতে দেখলে ও রাগ করে না?

তাই যদি করত!

লর্ড হেনরি চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখলেন। মনে হল কী যেন খুঁজছেন তিনি।

ডাচেস জিজ্ঞাসা করলেন, কী খুঁজছ?

তোমার মনের চাবিকাঠিটা। তুমি সেটা ফেলে দিয়েছ।

ভয় নেই। এখনো মুখোশ রয়েছে আমার মুখে—হেসে বললেন ডাচেস। তোমার চোখগুলি বড়ো সুন্দর।

মুক্তার মতো দাঁতগুলি বের করে আবার হাসলেন ডাচেস।

ওপরে তাঁর নিজের ঘরে একটা সোফার ওপরে শুয়েছিলেন ডোরিয়েন। যন্ত্রণায় তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠেছিল। হঠাৎ মনে হল জীবনের এই ভয়াবহ বোঝা আর তিনি বইতে পারছে না। বনের ভিতর জন্তু-জানোয়ারের মতো সেই হতভাগ্য লোকটির মৃত্যু তাঁর মন অস্বস্তিতে ভরিয়ে দিয়েছিল।

বিকাল পাঁচটার সময় বেল বাজালেন তিনি। চাকর ঘরে এসে ঢুকতে সেই রাত্রির ট্রেনেই শহরে ফিরে যাওয়ার জন্যে চাকরকে নির্দেশ দিলেন তিনি। সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিতে বললেন, সেই সঙ্গে বলে দিলেন ঠিক সাড়ে আটটার সময় গাড়ি যেন তৈরি থাকে। আর একটি রাতও তিন এ বাড়িতে কাটাবেন না। বাড়িটা অলক্ষণে। এখানে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে মৃত্যু হেঁটে বেড়াচ্ছে। এখানে অরণ্যের ঘাসগুলি রক্তে লাল হয় উঠেছে।

তারপরে একটা চিঠি লিখলেন লর্ড হেনরিকে; জানালেন যে ডাক্তার দেখানোর জন্যে তিনি শহরে যাচ্ছেন; সেই সঙ্গে অনুরোধ করলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে তিনি যেন তাঁর অতিথিদের দেখাশোনা করেন। চিঠিটা লিখে খামে মুড়তে যাবেন এমন সময় চাকর এসে জানাল যে 'হেড-কিপার' তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। ভ্রূকুটি করলেন তিনি; ঠোঁটটাও একেবার কামড়ালেন; তারপরে একটু ভেবে বললেন, পাঠিয়ে দাও।

'হেড-কিপার' ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটা চেকবই বার করলেন ডোরিয়েন; তারপরে বইটি তার সামনে খুলে বললেন, আজ সকালে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তারই জন্যে তুমি এসেছ—তাই না থ্রনটন?—কমলটা তুলে নিলেন তিনি।

হ্যাঁ, স্যার।

লোকটা কি বিয়ে করেছে? ওর কোনো পোষ্য রয়েছে? থাকলে, তারা কেউ অভাবে পড়ুক তা আমি চাইনে। কত টাকা তাদের দিতে হবে বল। আমি তাদের পাঠিয়ে দেব।

লোকটা যে কে তা আমরা কেউ বুঝতে পারছিনে, স্যার। সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম।

তোমরা জান না? কী বলছ? ও কি তোমাদের লোক নয়?

না, স্যার। কোনোদিন ওকে আমরা দেখিনি। নাবিক বলে মনে হচ্ছে স্যার।

ডোরিয়েন গ্রে-র হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল; মনে হল, হঠাৎ তাঁর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, কী বললে? নাবিক?

হ্যাঁ, স্যার। চিহ্ন দেখে সেই রকমই মনে হয়েছে আমাদের।

বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওর কাছ থেকে এমন কিছু পাওনি যা থেকে ওর নামটা কী জানা যায়?

সামান্য কিছু টাকা, আর ছ'নলা একটা পিস্তল। কোনো নাম নেই। চেহারাটা ভালোই, তবে একটু উগ্র। আমাদের ধারণা, নাবিক।

চমকে দাঁড়িয়ে উঠলেন ডোরিয়েন, দেহটা কোথায়? চল—এখনই; আমি দেখব।

মৃতদেহটা হোম ফার্মে রাখা হয়েছে স্যার।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই দেখা গেল ডোরিয়েন গ্রে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লম্বা-চওড়া রাস্তা ধরে ছুটে চলেছেন হোম ফার্মের দিকে। নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছেই তিনি দেখতে পেলেন দুটি লোক বাইরের উঠোনে পায়চারি করছে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন তিনি;তারপরে ওই দুটি লোকের হেপাজতে ঘোড়া আর চাবুকটা রেখে তিনি শেষ প্রান্তের একটা আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে একটা আলো জ্বলছিল। সেই দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ওখানে একটা মৃতদেহ রয়েছে। দরজার সামনে গিয়ে তিনি তালার ওপরে হাত রাখলেন, একটু থামলেন। মনে হল লোকটিকে যেন তিনি চিনতে পেরেছেন। মনে হল এই আবিষ্কার হয় তাঁর জীবনকে বাঁচাবে না হয় ধ্বংস করে ফেলবে। তারপরেই তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে

গেলেন।

ঘরের এক কোণে জঞ্জালের স্তুপের ওপরে একটা মৃতদেহ শোওয়ানো রয়েছে। তার দেহে মোটা শার্ট; পরনে এক জোড়া নীল ট্রাইজার। তার মুখের ওপরে একটা ডোরা কাটা রুমাল। বোতলের মুখে লাগানো একটা বাতি জ্বলছে তার পাশে।

কেঁপে উঠলেন ডোরিয়েন গ্রে। মনে হল নিজের হাতে রুমালটা কিছুতেই তিনি সরাতে পারবেন না। একজন চাকরকে ডেকে তিনি বললেন, রুমালটা সরিয়ে নাও। আমি দেখতে চাই লোকটা কে?

চাকরটা রুমাল সরিয়ে নিল। তিনি দেখার জন্যে সামনে এগিয়ে এলেন। একটা আনন্দের আর্তনাদ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। মৃত লোকটি জেমস ভেন।

মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বাড়ি ফেরার পথে তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন এবার তিনি নিরাপদ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোলাপ জলে আঙুল ডোবাতে-ডোবাতে লর্ড হেনরি বললেন, তুমি ভালো হতে যাচ্ছ একথা আমাকে বলে লাভ নেই ডোরিয়েন। তুমি এমনিতে নিখাদ সোনা। অনুগ্রহ করে নিজেকে পরিবর্তন করো না।

ঘাড় নাড়লেন ডোরিয়েন, না হ্যারি। জীবনে আমি অনেক খারাপ কাজ করেছি। আর আমি করব না। গতকাল থেকেই আমি ভালো কাজ করতে শুরু করেছি।

গতকাল তুমি কোথায় ছিলে?

গ্রামে। একটা ছোটো সরাইখানা—একা।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, বন্ধু, গ্রামে যে-কোনো লোক ভালো থাকতে পারে। সেখানে কোনো প্রলোভন নেই। সেইজন্যেই যারা শহরের বাইরে থাকে তারা অত অসভ্য। সভ্যতা অর্জন করা সহজ ব্যাপার নয়। সভ্য হওয়ার উপায় রয়েছে দুটো: একটা হচ্ছে কৃষ্টি অর্জন করে আর একটা হচ্ছে নোংরামি করে। গ্রাম্য লোকের দুটোর মধ্যে একটা সুযোগও পায় না। তাই তাদের জীবনের গতি রুদ্ধ।

ডোরিয়েন-এর কণ্ঠে প্রতিধ্বনি শোনা গেল, কৃষ্টি আর নোংরামি! দুটির কিছু-কিছু আমি জানি। ওদের দুটি যে একসঙ্গে থাকে সেটাই আমার কাছে এখন ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। কারণ, এখন আমি নতুন আদর্শে বিশ্বাসী। আমি আমার পথ পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি; করেওছি কিছুটা।

কী ভালো কাজটা তুমি করেছ সেকথা এখনো তুমি বলনি। অথবা, একটার বেশি ভালো কাজ তুমি করেছ তাই কি তুমি বললে?

তোমাকে বলছি, হ্যারি। একথা আর কাউকে আমি বলতে পারব না। একজনকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। আত্মম্ভরিতা বলে মনে হবে; কিন্তু আমি কী বলতে চাই তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছ। মেয়েটা খুবই সুন্দরী, সাইবিলের মতো অপরূপা। মনে হয়, তার লাবণ্যই আমাকে প্রথম আকর্ষণ করেছিল। সাইবিল ভেনকে তোমার মনে রয়েছে? ওঃ, কতদিন আগের কথা! অবশ্য হেটি ঠিক আমাদের সমাজের নয়। সে হচ্ছে সরল একটি গ্রাম্য বালিকা। সত্যি সত্যিই আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম। হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সারা মে মাস থেকে প্রতি সপ্তাহেই দু'বার করে আমি সেই গ্রামে যেতাম তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। গতকাল একটা ছোটো বাগানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আপেলের ফুলগুলি লুটিয়ে পড়েছিল তার চুলের ওপরে। সে হাসছিল। আজ সকালেও আমাদের দুজনের এক জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ আমি মনস্থির করে ফেললাম—না, থাক। নিষ্পাপ কুসুম আর আমি ছিঁড়ব না।

বাধা দিয়ে লর্ড হেনরি বললেন, আমার ধারণা, ভাবাবেগের নতুনত্বে তোমার মনে সত্যিকার আনন্দের বান ডাকছিল। যাই হোক, এই রূপকথার উপসংহার আমি টেনে দিতে পারি। সৎ উপদেশ দিয়ে তুমি তার হৃদয়টিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছ। তুমি যে আত্মশুদ্ধির পথ ধরেছ এটাই তার প্রথম পদক্ষেপ।

ছিঃ, ছিঃ; হ্যারি—এরকম ভয়ঙ্কর কথা বলা উচিত নয় তোমার। হেটির হৃদয় ভাঙেনি। সে অবশ্য কেঁদেছিল ঠিক কথা। কিন্তু কোনো অসম্মানের বোঝা তার ঘাড়ে চাপেনি। সে তার স্বপ্নের উদ্যানে পারদিতার মতো বেঁচে থাকত পারে।

এবং অবিশ্বাসী ফ্লোরিজেলের কথা ভেবে কাঁদবে। প্রিয় ডোরিয়েন, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। তুমি কি ভেবেছ সে আর কোনোদিন নিজের সমাজের কাউকে বিয়ে করে সুখী হবে? হয়তো কোনো রুক্ষ মেজাজি অথবা বদরাগী কোনো চাষিকে সে বিয়ে করবে। তোমাকে ভালোবাসার ফলে সে তার স্বামীকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। ফলে, সারা জীবন ধরেই কষ্ট পাবে মেয়েটা। নীতির দিক থেকে তোমার এই আত্মশুদ্ধির কোনো দাম নেই। এমন কি সূচনার দিক থেকেও এটা নগণ্য। তাছাড়া, তুমি কী করে জানলে যে সে এতক্ষণ ওফিলিয়ার মতো জলে ভাসছে না?

হ্যারি, তোমার বাণী অসহ্য। প্রতিটি ব্যাপারেই তুমি ব্যঙ্গোক্তি কর; তারপরে উপসংহার কর করুণতম পরিণিতর কথা বলে। কথাটা তোমাকে বলা উচিত হয়নি আমার। তুমি যা ইচ্ছে তাই বলতে পার; আমি জানি, আমি যা করছি তা ঠিক। যাক ওসব কথা এখন থাক। আমাকে তুমি বোঝাতে চেয়ো না যে আমার জীবনের প্রথম ভালো কাজ, স্বার্থত্যাগ তা যত নগণ্যই হোক—পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আরো ভালো হতে চাই এবং হবও। এখন তোমার কথা বল। শহরে কী ঘটছে? অনেকদিন আমি ক্লাবে যাইনি।

এখনো লোকে হতভাগ্য বেসিলের অন্তর্ধানের কথা আলোচনা করছে।

কিছুটা মদ গ্লাসে ঢালতে-ঢালতে ডোরিয়েন বললেন, ভেবেছিলেম, ওই আলোচনা করতে-করতে এতক্ষণ হয়তো তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

প্রিয় বন্ধু, মাত্র ছটি সপ্তাহ তারা এই আলোচনা করছে; আর ব্রিটিশ জাত তিন মাসের আগে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ক্লান্ত হয় না। সেদিক থেকে বর্তমানে তারা কিছুটা ভাগ্যমান। তাদের আলোচনার বিষয় অনেক। আমার বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে তারা মশগুল, তারপর অ্যালেন ক্যাম্পবেলের আত্মহত্যা। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি আর্টিস্টের রহস্যময় অন্তর্ধান। ব্রিটিশ জাত এখন উদ্ধ্যস্ত হয়ে উঠেছে। স্কটল্যান্ডে ইয়ার্ড নিশ্চিত যে ধূসর রঙের আলেস্টার চাপিয়ে নভেম্বর মাসের ন'তারিখে মধ্যরাত্রিতে যে লোকটি ট্রেনে চেপে প্যারিসের দিকে যাত্রা করেছিল সে লোকটি হতভাগ্য বেসিল ছাড়া আর কেউ নয়। ফরাসি পুলিশ ঘোষণা করেছে যে বেসিল কখনো প্যারিসে নামেননি। আমার ধারণা আর পনেরো দিনের মধ্যে আমরা শুনতে পাব যে বেসিলকে স্যান ফ্রান্সিসকোতে দেখা গিয়েছে। মজার কথাই বটে। যারাই অদৃশ্য হয়ে যায় তাদেরই নাকি স্যান ফ্রান্সিসকোতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। শহরটা নিশ্চয় খুব সুন্দর। পরলোকের সমস্ত কিছু আকর্ষণ নিশ্চয় ওখানে রয়েছে।

ব্যাপারটা নিয়ে কেমন করে অত সহজভাবে তিনি আলোচনা করতে পারছেন সেই ভেবে অবাক হয়ে ডোরিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন, বেসিলের কী হয়েছে বলে তোমার মনে হচ্ছে?

আমি কিছু ভাবতেই পারছিনে। বেসিল যদি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সে যদি মারা গিয়ে থাকে তার সম্বন্ধে আমি কিছু চিন্তা করতেও চাইনে। মৃত্যুটাকেই আমি ভয় করি। ঘৃণা করি মৃত্যুকে।

কেন?—ক্লান্তভাবে প্রশ্ন করলেন ডোরিয়েন।

কারণ—একমাত্র মৃত্যু ছাড়া মানুষ সবকিছুই কাটিয়ে উঠতে পারে। মৃত্যুর আর অশ্লীলতা—ঊনবিংশ শতাব্দীর এই দুটি বাস্তব সত্যকে মানুষ কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারেনি। চল, কফি খাওয়ার ঘরে যাই। সেখানে তুমি আমাকে 'কপিন' বাজিয়ে শোনাবে। আমার স্ত্রী যার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে সেই ছোকরা চমৎকার 'কপিন' বাজাত, বেচারি ভিকটোরিয়া! তাকে আমার খুব ভালো লাগত। সে চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়িটা কেমন নির্জন হয়ে গিয়েছে। অবশ্য বিবাহিতা জীবন একটা অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়—বদ অভ্যাসও বলতে পার। কিন্তু তবু মানুষ তার নিকৃষ্ট অভ্যাসকে হারানোরও দুঃখ করে। কেবল দুঃখই করে না; খুব বেশি দুঃখ করে। তবদ অভ্যাসগুলি মানুষের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

কিছুই বললেন না ডোরিয়েন। কফি খাওয়ার ঘরে উঠে গিয়ে কিছুক্ষণ পিয়ানো বাজালেন; তারপরে কফি আসার পরে তিনি থামলেন; হেনরির দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা হ্যারি, বেসিলকে কেউ খুন করেছে একথা কি তোমার কখনো মনে হয়েছে?

লর্ড হেনরি হাই তুলে বললেন, বেসিল খুব জনপ্রিয় ছিল। তার হাতে থাকত সব সময় একটা ওয়াটারবেরি ঘড়ি। তাকে লোকে খুন করবে কেন? কারো সঙ্গে শত্রুতা করার মতো চালাক সে ছিল না। তবে অবশ্য অদ্ভুত সুন্দর ছবি আঁকার হাত ছিল তার। তাছাড়া মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিল না তার। কেবলমাত্র একবারই তাকে আমার ভালো লেগেছিল। সে-সময়টা তোমার ছবি আঁকতে-আঁকতে সে আমাকে বলেছিল তোমাকে সে পুজো করে, আর তার চিত্রকলার তুমিই হচ্ছ প্রধান প্রেরণা।

বিষণ্ণ সুরে ডোরিয়েন বললেন, বেসিলকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু তাকে কেউ হত্যা করেছে একথা কি লোকে বলছে না?

অবশ্য কিছু-কিছু কাগজে সেই রকম কথাই বলছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমি জানি প্যারিসে অনেক বিপজ্জনক জায়গা রয়েছে, কিন্তু সে-সব জায়গায় যাওয়ার মানুষ সে নয়। কোনো বিষয়েই তার কোনো কৌতূহল ছিল না। এইটাই তার চরিত্রের দোষ।

ডোরিয়েন বললেন, আমি যদি বলি তাকে আমি হত্যা করেছি তাহলে তুমি কী বলবে হ্যারি?

আমি বলব, প্রিয় বন্ধু, যে চরিত্রের অভিনয় করার চেষ্টা তুমি করছ সেই চরিত্রটা তোমায় মানাবে না। সমস্ত পাপই নোংরা, যেমন সমস্ত নোংরাই পাপ। হত্যা করা ডোরিয়েন তোমার কর্ম নয়। এই কথা বলে তোমার অহঙ্কারকে আমি আঘাত করছি বলে দুঃখিত; কিন্তু তোমার পক্ষে ওইটাই সত্যি। সমাজের নীচু স্তরের মানুষরাই এই ধরনের কাজ করে। তার জন্যে আমি তাদের দোষ দিইনে। আমার বিশ্বাস, আমাদের কাছে আর্টের যা দাম, ওদের কাছে খুন-খারাপির দাম সেই রকম—অদ্ভুত চমক জজোগানোর উপায় মাত্র।

চমক জাগানোর উপায় মাত্র? তুমি কি তাহলে মনে কর যে একবার খুন করেছে সে দ্বিতীয়বার খুন করবে না? ওকথা আমাকে বলো না।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, বারবার করতে-করতে যেকোনো জিনিসই মানুষকে আনন্দ দেয়। এইটাই হচ্ছে মানুষের জীবনের একটা অতি প্রয়োজনীয় রহস্য। আমার ধারণা, হত্যা করাটা ভুল। ডিনারের পরে যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা যায় না এমন কোনো কাজ মানুষের করা উচিত নয়। কিন্তু বেচারা বেসিলের কথা থাক। তুমি যা বললে সেই রকম রোমান্টিক

পরিণতি যদি তার ঘটে থাকে তাহলে তো ভালোই। কিন্তু আমি তা ভাবতে পারছিনে। আমার ধারণা বাসে করে যেতে-যেতে সে সিন নদীতে পড়ে গিয়েছে; বাস কন্ডাকটর চেপে দিয়েছে ব্যাপারটা। হ্যাঁ, ওই ধরনেরই কিছু একটা ঘটেছে তার। তুমি কি জান, আর ভালো ছবি আঁকার ক্ষমতা তার ছিল না। গত দশ বছরের মধ্যে তার ছবির মান অনেকটা নেমে গিয়েছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন ডোরিয়েন। লর্ড হেনরি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন; কিছুক্ষণ পায়চারি করার পরে বললেন, হ্যাঁ, তার ছবির মান অনেক নেমে গিয়েছে। মনে হচ্ছে কিছু যেন অভাব রয়ে গিয়েছে তার ছবিতে। আদর্শ হারিয়ে ফেলেছে সে। তোমার সঙ্গে তার নিবিড় বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার পর থেকেই তার এই অধঃপতন শুরু। তোমাদের মধ্যে ভাঙন ধরল কেন? আমার ধারণা, তাকে আর তোমার ভালো লাগত না। তাই যদি হয় তাহলে সে তোমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবে না। বিরক্তিকর মানুষদের স্বভাবই ওই রকম। আচ্ছা, তোমার যে ছবিটা সে এঁকেছিল সেটা কোথায় বল তো? ছবিটা শেষ হওয়ার পরে আর সেটা দেখেছি বলে তো মনে হয় না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অনেক দিন আগে তুমি একবার বলেছিলে ছবিটাকে তুমি সেলবিতে পাঠিয়ে দিয়েছ। পথে সেটা হারিয়ে গিয়েছে। তাই না? সেটা কি ফিরে পেয়েছ? পাওনি। হায়-হায়! ছবিটা সত্যিই বড় সুন্দর। আমিই সেটা কিনতে চেয়েছিলাম। বেসিলের ওটা একটা প্রথম শ্রেণির ছবি। তারপর থেকেই তার ছবির মান নামতে শুরু করেছে; তারপর থেকে তার ছবিগুলি হয়েছে সৎ বাসনা আর নিকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন—একবারে নির্ভেজাল ব্রিটিশ চিত্রকরদের চিত্রকলার প্রতীক। ছবিটা পাওয়ার জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে? দেওয়া উচিত তোমার।

ডোরিয়েন বললেন, ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত দিয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটা সত্যিই আমার ভালো লাগেনি। আমি দুঃখিত যে ওই ছবির মডেল হয়েছিলাম আমি। ছবিটা দেখে হ্যামলেট নাটকের দুটো লাইন আমার মনে পড়ে যায়—লাইন দুটো হচ্ছে—

"দুঃখের চিত্রের মতো
হৃদয়হীন একটা মুখ।"

হ্যাঁ; আমার প্রতিকৃতিটা ওই রকমই।

লর্ড হেনরি হেসে বললেন, জীবনকে যে চিত্রকরের দৃষ্টি দিয়ে দেখে তার কাছে মস্তিষ্কটাই হচ্ছে তার হৃদয়।

তারপরে তিনি চোখ দুটি অর্ধেক বুজিয়ে ডোরিয়েনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আচ্ছা ডোরিয়েন, মানুষ সারা পৃথিবী জয় করল কি হারাল তাতে কী যায় আসে? কে যেন বলেছিল—তার নিজের আত্মা?

ডোরিয়েন এতক্ষণ ঠুং ঠুং করে পিয়ানোর সুর তুলছিলেন; প্রশ্নটা শুনে তিনি তাঁর দিকে চোখ দুটো বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, এ-প্রশ্ন কেন?

লর্ড হেনরি বললেন, পশ্নটা করেছি এই ভেবে যে তুমি হয়তো এর উত্তর দিতে পারবে। এ ছাড়া আর কিছু নয়। গত সোমবার আমি পার্কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। মার্বেল আর্চের পাশে নোংরা পোশাক পরে একদল লোক ততোধিক নোংরা একটি ধর্মযাজকের বাণী শুনছিল। যেতে-যেতে শুনলাম ধর্মযাজকটি চিৎকার করে তাঁর শ্রোতাদের ওই প্রশ্নটি করছেন।

ব্যাপারটা আমার কাছে নাটকীয় বলে মনে হল। এই ধরনের কৌতুককর ঘটনা লন্ডন শহরে হামেশাই ঘটছে। ভিজে রবিবার; লোংরা ম্যাকিনটস পরা কোন ক্রিশ্চান পাদরী, তাঁর চারপাশে ছাতা মাথায় দিয়ে একদল বিবর্ণ শ্রোতা দাঁড়িয়ে। ঠিক সেই সময় পাদরীর এই ধরনের উচ্ছ্বাসভরা প্রশ্ন তীক্ষ্ণভাবে সবাইকে গিয়ে আঘাত করছে। একদিন দিয়ে ভালোই—পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রশ্নটা সত্যিই আমাদের ভাবিয়ে তোলে। সেই ভবিষ্যৎ বক্তাকে আমি বলব বলে ভেবেছিলাম যে আর্টের আত্মা রয়েছে, তাঁর নেই। কিন্তু ভয় হল, মানুষটি সম্ভবত আমার বক্তব্যের নিগূঢ় তত্ত্বটি বুঝতে পারবে না।

থাক, থাক হ্যারি। আত্মা হচ্ছে ভয়ঙ্কর বাস্তব সত্য। একে কেনাও যায় না, বিক্রি করাও যায় না; একে নিয়ে খেলা যায় না ছিনিমিনি। একে বিষাক্ত করা যায় অথবা করা যায় নিখুঁত। আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মা রয়েছে। আমি তা জানি।

ডোরিয়েন, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

নিশ্চয়।

তাহলে ওটা একটা মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়। যে জিনিস মানুষ একেবারে সত্যি বলে বিশ্বাস করে তা কোনোদিনই সত্যি হতে পারে না। বিশ্বাসের মারাত্মক পরিণতি আর রোমান্সের শিক্ষা হল ওই। খুব গম্ভীর হয়ে পড়লে দেখছি। না, না, অতটা সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই। আমাদের যুগের কুসংস্কারদের নিয়ে তোমার কী করার রয়েছে; আমারই বা রয়েছে কী? কিছু নেই। আত্মায় আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি। ওসব কথা থাক। তুমি বরং কিছু বাজাও। বাজাতে-বাজাতে বল, তোমার ওই যৌবনের গোপন রহস্যটা কী? তোমার চেয়ে আমি মাত্র বছর দশেকের বড়ো। আমাকে দেখ, আমি একেবারে বুড়িয়ে গিয়েছি। হয়ে গিয়েছি ফ্যাকাশে। কিন্তু তোমার সৌন্দর্যের আগুন এতটুকু কমেনি। আজ তোমাক যেমন সুন্দর দেখছি চিরকালই তুমি সেইরকম। পরিবর্তন তোমার হয়েছে; কিন্তু চেহারায় নয়। তোমার গোপন রহস্যরটা কী জানলে আমি খুশি হতাম। শারীরিক পরিশ্রম করা, সকালে ওঠা, আর সম্ভ্রান্ত হওয়া ছাড়া, যৌবন ফিরে পাওয়ার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। যৌবনের মতো জিনিস আর নেই। যৌবনের অজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা হাস্যকর। একমাত্র তাদের কথা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনি যারা আমার চেয়ে বয়সে কম। মনে হয় তারাই আমার পথিকৃৎ। জীবন তার নতুনতম সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তাদের কাছে খুলে দিয়েছে। নীতিগতভাবেই, বৃদ্ধদের আমি প্রতিবাদ করি। গতকাল কী ঘটেছে সে সম্বন্ধে যদি তাদের মতামত চাও তাহলে তারা গম্ভীরভাবে যে মতামত দেবে তা হচ্ছে ১৮২০ সালের। থেম না, বাজাও। আজ রাত্রিতে আমি সঙ্গীতে ডুবে থাকতে চাই। আজ মনে হচ্ছে তুমি যেন যুবক অ্যাপোলো; আর আমি মার্সিয়াস, তোমার গান শুনে মাতোয়ারা। আমারও দুঃখ রয়েছে, ডোরিয়েন; এমন দুঃখ যা তুমি জান না। বার্ধক্যের ট্র্যাজেডি এই নয় যে সে বৃদ্ধ; ট্র্যাজেডি হচ্ছে আর একজন যুবক। মাঝে মাঝে নিজের সৎ ভাষণে আমি নিজেই চমকে উঠি। আঃ, ডোরিয়েন, তুমি কত সুখী! জীবনের সব সুরা তুমি পান করেছ। আঙুরের নির্যাসে ভরিয়ে দিয়েছ তোমার আত্মা। কিছুই তোমার কাছে গোপন নেই। সবই তুম সঙ্গীতের মতো উপভোগ করেছ। এত ভোগের পরেও তোমার ক্লান্তি নেই, বিকৃতি ঘটেনি চোমার চেহারায়। তুমি সেই আগের মতো অপরূপ সুন্দর।

আমি সেই আগের মানুষ আর নেই, হ্যারি।

আছ; সেই আগের মতোই অবিকল। তোমার বাকি জীবনটা কীভাবে কাটবে তাই আমি অবাক হয়ে ভাবি। আত্মত্যাগ করে এ জীবনকে তুমি নষ্ট করে দিয়ো না। তুমি একেবারে নিখুঁত। ঘাড় নেড়ে আমার কথার প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তুমি জান আমার কথাই ঠিক। তাছাড়া, প্রতারণা করো না নিজের সঙ্গে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে জীবন নির্ভর করে না। জীবনটা হচ্ছে স্নায়ু আর তন্ত্রীর ঘন সন্নিবেশ; এদের মধ্যে মানুষের চিন্তারা লুকিয়ে থাকে। কামনা বা স্বপ্নের জাল বোনে। নিজেকে তুমি নিরাপদ অথবা সবল বলে ভাবতে পার; কিন্তু আমি তোমাকে বলছি ডোরিয়েন আমাদের জীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটো-ছোটো মুহূর্তের ওপরে—ঘরের বিশেষ কোনো রঙ, সকাল বেলাকার আকাশের মোহ, বিশেষ কোনো সুগন্ধ, একটা ভুলে যাওয়া কবিতা—এরাই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তোমার সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করতে পারলে আমি খুশি হতাম ডোরিয়েন। আমাদের দুজনের বিরুদ্ধেই পৃথিবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে—কিন্তু সে সব সময়েই তোমার জন্যে পূজার উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে। আমি খুশি যে তুমি কোনোদিন কোনো মূর্তি গড়নি, কোনো ছবি আঁকনি, নিজেকে বাদ দিয়ে আর কিছুই সৃষ্টির কাজে অনর্থক সময় নষ্ট করনি তুমি। জীবনটাই হচ্ছে তোমার কাছে একটা আর্ট; তোমার দিনগুলিই তোমার সনেট।

পিয়ানো থেকে উঠে নিজের চুলগুলির ভেতর দিয়ে আঙুল বুলিয়ে নিলেন ডোরিয়েন; বললেন, হ্যাঁ, জীবনটা আমার কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি সেই জীবন আর চাইনে, হ্যারি। তাছাড়া, আমাকে নিয়ে তুমি আর ওই উচ্ছ্বাস দেখিয়ো না। আমার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। যদি জানতে তাহলে বিতৃষ্ণায় তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিতে। হাসছ তুমি, হেস না।

তুমি বাজনা থামালে কেন, ডোরিয়েন? যাও, বাজাও। ওই ধোঁয়াটে আকাশের বুকে যে মধুচাঁদ উঁকি দিয়েছে তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। তোমার সঙ্গীতসুধা পান করার জন্যে ও অপেক্ষা করছে। তোমার গান শুরু হলেই ও পৃথিবীর কাছাকাছি নেমে আসবে। গাইবে না? তাহলে ক্লাবে চল। ক্লাবে তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে একজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে হচ্ছে যুবক লর্ড পোল—বুর্নেসাইথ-এর বড়ো ছেলে। ইতিমধ্যেই সে তোমার নেকটাই পরার ঢঙটা রপ্ত করে নিয়েছে।

বিষণ্ণভাবে ডোরিয়েন বললেন, না, থাক। আজ আমি বড়ো ক্লান্ত, হ্যারি। ক্লাবে আজ আর যাব

না। প্রায় এগারোটা বাজে। আমি আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব।

আর একটু থাক। আজকের রাত্রিতে যে বাজনা তুমি বাজালে এমন সুন্দর বাজনা আর কখনো আমি শুনিনি।

ডোরিয়েন হেসে বললেন, তার কারণ, আমি ভালো হতে যাচ্ছি।

আমার কাছে তুমি পালটাতে পার না ডোরিয়েন। সব সময়েই আমরা পরস্পরের অচ্ছেদ্য বন্ধু।

তবু একবার একখানা বই পড়তে দিয়ে আমার মনকে তুমি বিষাক্ত করে তুলেছিলে। তার জন্যে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। হ্যারি প্রতিজ্ঞা কর, ওই বই তুমি আর কাউকে পড়তে দেবে না? এতে মানুষের ক্ষতি হয়।

হেনরি বললেন, বন্ধু, এবারে তুমি নীতি আওড়াতে শুরু করলে। মনে হচ্ছে যে সব পাপ করে তুমি নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ সেই পাপ মানুষ যাতে না করে সেই বাণী প্রচার করার জন্যে পাদরীদের মতো তুমি শীঘ্রই রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে। নিশ্চয় ওরকম কিছু করার মতো গাদ্যিক তুমি হবে না। তা ছাড়া লাভও নেই। তুমি আর আমি যা তা-ই এবং ভবিষ্যতেও তা-ই থাকব। আর বই পড়ে নষ্ট হওয়ার কথা যদি বল, ওটা কিছু নয়। মানুষের কাজের ওপরে আর্টের কোনো প্রভাব নেই। আর্ট একেবারে বন্ধ্যা। যে বইগুলিকে পৃথিবী জঘন্য বলে প্রচার করেছে সেগুলি পৃথিবীর লজ্জাকর ইতিহাস। যাকগে, বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলে। কাল এস—এগারোটার সময়। আমরা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাব। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খআব। তারপরে আমি তোমাকে লেডি ব্রাঙ্কসালের বাড়িতে নিয়ে যাব। কিন্তু আমর ডাচেসের সঙ্গেও লাঞ্চ খেতে পারি। সে বলছিল আজকোল তোমার সঙ্গে তার নাকি আর দেখা হয় না? গ্ল্যাডিসকে তোমার কি আর ভালো লাগে না? জানি তার চতুর কথা মানুষকে কষ্ট দেয়। যাই হোক, কাল বেলা এগারোটার সময় এখানে থেক।

সত্যিই কি আসতে হবে, হ্যারি?

নিশ্চয়। পার্ক এখন বড়ো মনোরম। আমার ধারণা তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে এত সুন্দর লিল্যাক আর কখনো ওখানে ফোটেনি।

তাই হবে। কাল এগারোটার সময় এখানে আমি আসব। শুভরাত্রি, হ্যারি।

দরজার কাছে গিয়ে তিনি একটু দাঁড়ালেন; মনে হল, আর কী যেন বলবেন। তারপরে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বড়ো সুন্দর রাত্রি, গরম। এত গরম যে কোটটা খুলে তিনি হাতের ওপরে চাপালেন; গলায় সিল্ক স্কার্ফও জড়োলেন না। সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে যখন তিনি বাড়ির দিকে হেঁটে আসছিলেন সেই সময় দুটি যুবক সান্ধ্য পোশাক পরে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। একজনে আর একজনকে বলল, এই লোকটি ডোরিয়েন গ্রে। সেই কথা কানে গেল তাঁর। কেউ তাঁকে নির্দেশ করলে, অথবা তাঁর দিকে তাকালে বা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করলে তিনি যে বেশ খুশি হতেন সেকথাটা তাঁর মনে পড়ল। অন্য লোকের মুখে নিজের নাম শুনে এখন তাঁর ভালো লাগল না। এই ছোটো গ্রামটিতে তিনি প্রায়ই আসতেন। এখানে আসতে তিনি ভালোবাসতেন এই জন্যে যে এখানে তাঁকে কেউ চিনত না। তাঁকে ভালোবাসতে যে মেয়েটিকে তিনি প্রলুব্ধ করেছিলেন তাকে বলেছিলেন যে তিন দরিদ্র। মেয়েটি সে-কথা বিশ্বাস করেছিল। তিনি তাকে একবার বলছিলেন যে তিনি দুষ্টু প্রকৃতির; সেকথা শুনে মেয়েটি হাসত; বলত দুষ্ট লোকেরা চিরকালই বড় আর কদাকার। কী হাসিই না সে হাসত! মনে হত থ্রাস পাখি গান করছে। তুলোর পোশাক পরা আর মাথার ওপরে বড়ো টুপি চাপানো মেয়েটিকে কী সুন্দরই না দেখাত। মেয়েটি কিছুই জানত না; কিন্তু সমস্ত সম্পদই তার ছিল; সে-সব তিনি হারিয়েছেন।

বাড়িতে ফিরে দেখলেন তাঁর চাকর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে শুতে বলে লাইব্রেরির সোফাতে গিয়ে তিনি বসলেন। তারপরে লর্ড হেনরি যে-সব কথা তাঁকে বলেছিলেন সেই সব কথা নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন।

মানুষের কোনোদিন পরিবর্তন হয় না এটা কি সত্যি কথা? শিশুকালের কলঙ্কহীন শুচিতা আর গোলাপ-শুভ্র শৈশবের দিনগুলি ফিরে পাওয়ার জন্যে প্রাণ তাঁর আকুল হয়ে উঠল। তিনি জানতেন যে নিজেকে তিনি কলুষিত করেছেন, আবর্জনায় বোঝাই করেছেন নিজের মনকে, তাঁর কল্পনাকে করে তুলেছেন ভয়ঙ্কর। অপরের ওপরে কুৎসিত প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি; আর সেজন্যে ভয়ানক আনন্দও পেয়েছেন তিনি। আর তাঁর সহচর্যে যে-ই এসেছে, সে যত সুন্দর অথবা সম্ভবনাময়ই হোক না কেন, তারই জীবনে অপমানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। এরকম একটা জীবনকে কি সংশোধন করা যায় না? তাঁর কি কোন আশা নেই?

হায়রে, গর্ব আর কামনার কী ভয়ঙ্কর একটি মুহূর্তেই না তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর জীবনের সমস্ত ঝড়-ঝাপটা আর কামনার কলঙ্ক বুকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকুক তাঁর প্রতিকৃতি, আর চির যৌবনের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে থাকবেন তিনি। তাঁর জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার জন্যে দায়ী সেই প্রার্থনাটি। প্রতিটি পাপ তাঁর ওপরে তার কলঙ্কের ছাপ রেখে যাক—উচিত হত সেইটাই। শাস্তির মধ্যে দিয়েই হত তাঁর শুদ্ধি। ন্যায়পরায়ণ ভগবানের কাছে মানুষের সত্যিকার প্রার্থনা হচ্ছে—আমাদের অপরাধের শাস্তি দাও প্রভু। আমাদের পাপ ক্ষমা কর—এরকম কোনো প্রার্থনা ভগবানের কাছে করা উচিত নয়।

অনেকদিন আগে লর্ড হেনরি অদ্ভুতভাবে খোদাই করা একটা আরশি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটি দাঁড় করানো ছিল তাঁর টেবিলের পাশে। সেটাকে তিনি তুলে নিলেন। ঠিক এমনিভাবে আর এক বিভীষিকাময়ী রাত্রিতেও তিনি এটিকে তুলে নিয়েছিলেন; অশ্রুতে ভরা চোখ দিয়ে এর চকচকে মুকুরের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সেদিন তিনি আঁতকে উঠেছিলেন। একজন তাঁকে খুব ভালোবাসত, সে একবার তাঁকে উদ্দেশ্য করে পাগলের ভাষায় লিখেছিল, তোমার চেহারা হাতির দাঁত আর সোনা দিয়ে গড়া; তাইতো আমার

চোখে পৃথিবীর এই পরিবর্তন। সেই কথাগুলি আবার তাঁর মনে পড়ে গেল। মনে-মনে বারবার আওড়াতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ নিজের সৌন্দর্যের ওপরে তাঁর ঘৃণা জন্মাল। মুখ বিকৃত করে সেই রুপোর আরশিটাকে সজোরে আছাড় দিলেন মেঝের ওপরে; ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল আরশিটা। এই সৌন্দর্য আর যৌবনের জন্যে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। সেই সৌন্দর্য আর যৌবনই তাঁকে ধ্বংস করে ফেলল। ওই দুটি বস্তু না থাকলে তাঁর জীবন কলঙ্কমুক্ত হতে পারত। সৌন্দর্য তাঁর কাছে মিথ্যা একটা আবরণ ছাড়া আর কিছু নয়, যৌবন কিছু নয় বিদ্রূপ ছাড়া। আসলে যৌবনটা কী? একটা সবুজ, কাঁচা সময় কিছুই নয়। যৌবনে ভাবও গভীর নয়, চিন্তাও বড়ো রুগ্ন। সেই যৌবনের পোশাক তাঁর গায়ের ওপরে কেন? ওই যৌবনই তাঁকে নষ্ট করে দিয়েছে।

অতীতের কথা চিন্তা না করাই ভালো। কোনো কিছু দিয়েই তাকে বদলানো যাবে না। নিজের কথা, ভবিষ্যতের কথাই ভাবতে হবে তাঁকে। সেলবি কবরখানার একটা বেনামী গর্তের মধ্যে জেমস ভেল-এর মৃতদেহ লুকানো রয়েছে। নিজের ল্যাবরেটরিতে অ্যালেন ক্যাম্পবেল একদিন রাত্রিতে নিজের বুকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছে; কিন্তু যে গোপন সংবাদ জানতে সে বাধ্য হয়েছিল সেটিকে বাইরে প্রকাশ করে দেয়নি। বেসিল হলওয়ার্ড-এর অন্তর্ধান নিয়ে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে তা শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে। এখনই তা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সেদিক থেকে তিনি নিরাপদ। তা ছাড়া, বেসিল হলওয়ার্ড-এর মৃত্যুটাও তাঁর মনের ওপরে বোঝা দাঁড়ায়নি। আসলে যে জিনিসটা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে সেটা হচ্ছে তাঁর আত্মার অপমৃত্যু। বেসিল যে প্রতিকৃতিটা এঁকেছিলেন সেইটিকে তাঁর জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। তার জন্যে তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে পারবেন না। এই প্রতিকৃতিটাই যত নষ্টের মূল। বেসিল তাঁকে সব কথা বলেছিলেন যেগুলি তিনি সহ্য করতে পারেননি। সেই কথাগুলি আজও তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে চলেছেন। হত্যাটি সংগঠিত হয়েছে নিছক মুহূর্তের উত্তেজনায়। অ্যালেন ক্যাম্পবেলের কথা যদি ধরা যায়, তাহলে নিজেকেই নিজে সে হত্যা করেছে। এ-পথটা বেছে নিয়েছে সে নিজেই। এর জন্যে তিনি দায়ী নন।

একটি নতুন জীবন! এইটিই তিনি চেয়েছিলেন। তারই জন্যে তিনি অপেক্ষা করেছেন। সেদিক থেকে প্রথম পদক্ষেপ তিনি আগেই ফেলেছেন। যাই হোক, একটি নিষ্পাপ জীবনকে তিনি কলুষিত করেননি। আর কখনো নিষ্পাপকে তিনি পাপের পথে টানবেন না। তিনি সৎ হবেন।

হেটি মার্টনের কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আর একটা কথা তাঁর মনে এল, বন্ধ ঘরের মধ্যে যে প্রতিকৃতিটা রয়েছেএ সেটার ওপরেও কি পরিবর্তনা দেখা দিয়েছে? আগের মতো এখন নিশ্চয় সেটা অতখানি ভয়ঙ্কর দেখাবে না। তিনি যদি পবিত্র হতে পারেন তাহলে সম্ভবত ছবিটার মুখ থেকে এ যাবৎ যত কালিমা জমেছে তা ধীরে-ধীরে মুছে যাবে। ব্যাপারটা নিজের চোখে একবার দেখে আসবেন তিনি।

টেবিল থেকে বাতিটা নিয়ে পা টিপে-টিপে তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর যৌবনোদ্দীপ্ত মুখের ওপরে একটা আনন্দের জ্যোতি ফুটে বেরোল; তাঁর ঠোঁটের চারপাশে সেই জ্যোতি মুহূর্তের জন্যে পড়ল ছড়িয়ে। হ্যাঁ; তিনি সৎ হবেন, ভালো হবেন, যে ভীতিপ্রদ জিনিসটাকে তিনি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটা আর তাঁর কাছে ভয়াল মূর্তিতে দেখা দেবে না। মনে হল বুকের ওপর থেকে একটা ভারী বোঝা যেন অনেকদিন পরে নেমে গেল।

যথারীতি ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে তিনি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন; তারপরে প্রতিকৃতির সামনে থেকে লাল পর্দাটা দিলেন সরিয়ে। যন্ত্রণার আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি,

ঘৃণায় রি-রি করে উঠল তাঁর সারা শরীর। কোনো পরিবর্তন ঘটেনি প্রতিকৃতিটির—একমাত্র চোখ দুটি ছাড়া, চোখ দুটোর ভেতর থেকে একটা ধূর্ত চাহনি ফুটে বেরিয়েছে; মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে প্রবঞ্চকের তির্যক বলিরেখা। ছবিটা আরো জঘন্য হয়েছে, আগের চেয়েও কদাকার। যে লাল ফুটকিগুলো তার হাতের ওপরে কায়েমি হয়ে বসেছিল সেগুলো আরো বেশি লাল হয়ে উঠেছে—মনে হচ্ছে নতুন কোনো রক্তপাতের স্বাক্ষর তারা। ভয়ে কাঁপতে লাগলেন তিনি। তাহলে যে ভালো কাজটা তিনি করেছেন সেটা কি নিছক দম্ভ প্রকাশ করার জন্যে? কিন্তু ঠাট্টা করে লর্ড হেনরি না বলেছিলেন—নতুন কোনো অনুভূতির আকাঙ্ক্ষায়? অথবা হৃদয়ের পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও মানুষ মাঝে মাঝে ভালো কাজ করে ফেলে। এটা কি সেই ধরনেরই কিছু একটা কাজ? কিন্তু এর পেছনে রয়েছে সব কিছুর সমষ্টি? আচ্ছা, ওই লাল ছাপটা আরো বড়ো হয়েছে কেন? ওর ওই জরাগ্রস্ত বিকৃত আঙুলগুলির ওপরে ওই লাল ছোপটা রোগের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। রঙ দিয়ে আঁকা পায়ের ওপরে রক্ত ঝরে-ঝরে পড়েছে—হাতের ওপরেও রক্তের ছিটে—অথচ ওই হাতে তার কোনো ছোরা নেই। স্বীকার করবেন? এর অর্থ কী এই যে যে-পাপ তিনি করেছেন তা নিজের মুখে স্বীকার করতে হবে? আত্মসমর্পণ করে ফাঁসিকাঠে বাড়িয়ে দিতে হবে তাঁর গলাটা? হেসে ফেললেন তিনি; ওই রকম কিছু করার চিন্তাটাই তাঁর কথা বিপজ্জনক বলে মনে হল। তা ছাড়া, স্বীকার করলেই বা তাঁর কথা বিশ্বাস করবে কে? নিহত মানুষটির কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। তার সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। নীচের ঘরে সে সব জিনিস ছিল সেগুলি তিনি নিজেই পুড়িয়ে ফেলেছেন। বিশ্বের লোক বলবে তিনি একটি উন্মাদ। তা সত্ত্বেও যদি তিনি তাঁর কাহিনিটা বলতে থাকেন লোকে তাঁকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখবে।...তবু, অপরাধ স্বীকার করে জনসাধারণের দেওয়া অপমান নিজের ঘাড়ে তুলে নেওয়াই তাঁর কর্তব্য; প্রকাশ্যে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাঁর। স্বর্গ আর মর্ত্য দু'জায়গাতেই পাপের কথা স্বীকার করার জন্যে ভগবান মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাই তিনি করুন না কেন, যতক্ষণ না তিনি তাঁর পাপ স্বীকার করছেন ততক্ষণ তিনি নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারবেন না। পাপ! অবহেলায় কাঁধ কোঁচকালেন তিনি। বেসিল হলওয়ার্ডের মৃত্যুটা তাঁর কাছে কিছু নয়। তিনি ভাবছিলেন হেটি মার্টনের কথা। কারণ তাঁর হৃদয়মুকুর—যার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন তিনি—সেই মুকুরটা ভেজাল। দম্ভ? কৌতূহল? প্রবঞ্চনা? তাঁর তথাকথিত আত্মত্যাগের মধ্যে সত্যিকার কিছু আর কি নেই? আরো কিছু ছিল—অন্তত তাই তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু কে বলবে...না। আর কোনো প্রবৃত্তি ছিল না। দম্ভের খাতিরেই তিনি মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রবঞ্চনা করার প্রয়োজনে তিনি ভালোমানুষের মুখোশ পরেছেন। কৌতূহলই তাঁকে আত্মত্যাগে প্ররোচিত করেছে। এতক্ষণে সব বুঝতে পারলেন তিনি।

কিন্তু এই হত্যা? এটা কি চিরজীবন তাঁর পিছু-পিছু ঘুরবে? চিরদিনই কি অতীতের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে তাঁকে? সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত তাঁক সবকিছু স্বীকার করতে হবে? কক্ষনো না—কিছুতেই না। তাঁর অপরাধের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে মাত্র একটা জিনিস এখনো বেঁচে রেয়েছে। সেটা হল ওই প্রতিকৃতি। হ্যাঁ, ওটাই হল শেষ সাক্ষী। ওটাকেই তিনি নষ্ট করে ফেলবেন। ওটাকে এতদিন তিনি রেখেছেনই বা কেন? একদিন ছবিটা দেখে তিনি আনন্দই পেতেন। কেমন করে ওটা দিন-দিন পালটে যাচ্ছে, বৃদ্ধ হচ্ছে দিন-দিন তাই তিনি দেখতেন। সম্প্রতি সেরকম কোনো আনন্দ আর তাঁর হয় না। ওটার কথা ভেবে-ভেবে দুশ্চিন্তায় সারা রাত তিনি জেগে থাকেন। বাইরে গেলে ভয়ে তাঁর বুকটা ধরফড় করে—পাছে কেউ যদি তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেই ছবিটা দেখে ফেলে এই আশঙ্কায় সব সময় তিনি বিব্রত হয়ে থাকেন। তাঁর অনেক আনন্দের মুহূর্তগুলি এইভাবে বরবাদ হয়ে গিয়েছে। বিবেকের মতো ওটা তাঁকে চাবুক কষাচ্ছে; হ্যাঁ; ওটাই যেন তাঁর বিবেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটাকে তিনি ধ্বংস করে ফেলবেন।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। যে ছোরা দিয়ে বেসিলকে হত্যা করেছিলেন সেই ছোরাটা তাঁর চোখ পড়ে গেল। ওটাকে তিনি অনেকবার পরিষ্কার করেছেন। এখন আর কোনো চিহ্ন নেই ওর গায়ে। চকচক করছে ছোরাটা। ওটা একদিন চিত্রকরকে হত্যা করেছে; এখন হত্যা করবে তাঁর ছবিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অতীত নিহত হবে। তারপরেই তিনি মুক্ত, স্বাধীন। এই ভয়ঙ্কর আত্মিক জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেলে প্রতিদিন যে সতর্কতার বাণী ও উচ্চারণ করছে তা চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। শান্তি আসবে তাঁর জীবনে। তিন ছোরাটাকে তুলে নিয়ে ছবিটার বুকে বসিয়ে দিলেন।

একটা আর্তনাদ শোনা গেল; সেই সঙ্গে একটা জিনিস ভেঙে পড়ার শব্দ হল, আর্তনাদটা যন্ত্রণার আর্তিতে এতটা জোরালো হয়ে উঠল যে ঘুম ভেঙে গেল চাকরদের। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল তারা। নীচে পার্কের ভেতর দিয়ে দুটি ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। সেই আর্তনাদ শুনে তাঁরাও থমকে দাঁড়ালেন; তাকিয়ে দেখলেন সেই বিরাট বাড়িটার দিকে। হাঁটতে-হাঁটতে একটা পুলিশের সঙ্গে দেখা হল তাঁদের। তাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁরা। পুলিশের লোক বারবার বেল বাজাল; কোনো উত্তর এল না ভেতর থেকে। একেবারে ছাদের কয়েকটা জানালা থেকে কিছুটা আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওইটুকু ছাড়া গোটা ঘরটাই অন্ধকারে ঢাকা। কিছুক্ষণ পরে লোকটি সেখান থেকে সরে গিয়ে পাশের একটা বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে দেখতে লাগল।

দুজনের মধ্যে বয়স্ক ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িটা কার কনস্টেবল?

মিঃ ডোরিয়েন গ্রের স্যার।

ভদ্রলোক দুটি দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন না করে পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করে নিজেদের পথ ধরলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্যান হেনরি অ্যাসটনের কাকা।

বাড়ির ভেতরে যেখানে চাকররা থাকে সেখানে নীচু গলায় আলোচনা শুরু হল। বৃদ্ধা মিসেস লিফ নিজের হাত মোচড়াতে-মোচড়াতে কাঁদতে লাগলেন; ভয়ে নীল হয়ে গেল ফ্রান্সিস। কী যে ঘটল কেউ তা বুঝতে পারল না।

মিনিট পনেরো পরে সহিস আর একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দরজায় ধাক্কা দিল তারা। ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল না কারো। তারা চিৎকার করে ডাকল। চারপাশ চুপচাপ। দরজা খোলার ব্যর্থ চেষ্টার পরে, তারা ছাদের ওপরে উঠে লাফিয়ে পড়ল বারান্দায়। গিল পুরানো হওয়ার ফলে, জানালাটা সহজেই খুলে গেল।

ভেতরে ঢোকার পরে প্রথমেই নজরে পড়ল তাদের মনিবের প্রতিকৃতির দিকে। প্রথম যেদিন ছবিটিকে তারা দেখেছিল, যৌবন আর সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে সেই ছবিটি তখনো ঠিক তেমনিভাবেই ভাস্বর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দেখল মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি মৃতদেহ; পরনে তার সান্ধ্য পোশাক; বুকের মধ্যে আমূল বিদ্ধ একটা ছোরা। শরীরটা তার শুকনো; গোটা গায়ে তার বার্ধক্যের কুঞ্চন; দেখলে ঘৃণা হয় মানুষের; কদাকার। হাতের আঙটিটা পরীক্ষা করার আগে তারা কিছুতেই বুঝতে পারেনি ওই মৃত কদাকার মানুষটি আসলে কে?